আহকামুল কুরআন

ইমাম আল হুজ্জাতুল ইসলাম
আবূ বকর আহমাদ বিন আলী যাস্‌সাস (র)

৩

অনুবাদ
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)

আহ্‌কামুল কুরআন

(কুরআনের বিধান)

৩য় খণ্ড

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহ্‌মাদ ইবনে
আলী আর-রাযী আল-যাস্‌সাস আল-হানাফী (রহ)

অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৮-২৯৮৪৩১, ০১৭১-৯০৭৭৮৫

আহ্কামুল কুরআন (৩য় খণ্ড)

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহ্মাদ ইবনে আলী
আর-রাযী আল-যাস্সাস আল-হানাফী (রহ)

অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯১

২য় প্রকাশ
(খায়রুন প্রকাশনী প্রথম)
মহররম ঃ ১৪২৫
চৈত্র ঃ ১৪১০
মার্চ ঃ ২০০৪

প্রকাশক ঃ
খায়রুন প্রকাশনী
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

কম্পোজ ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স (ওয়ালী উল্যাহ ভূইয়া)
১০/ই-এ/১, মধুবাগ, নয়াটোলা, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ মোস্তাফা নাসিরুল হক

মুদ্রণ ঃ আফতাব আর্ট প্রেস
২/১, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ২৫০.০০ টাকা

ISBN 984-8455-11-0 (Set)

প্রসঙ্গ কথা

আল্লামা আবূ বকর আল-যাস্‌সাস রচিত 'আহ্‌কামুল কুরআন' তাফসীর সাহিত্যে একটি অসামান্য অবদান। প্রায় বারো শো বছর পূর্বে রচিত এই গ্রন্থখানি তাফসীর জগতে এক অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লামা আল-যাস্‌সাস ছিলেন সেকালে হানাফী মাযহাবের অবিসম্বাদিত ইমাম। তাই এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্বভাবতই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি কুরআন মজীদের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হানাফী ফিকাহ্ অনুসারে সমস্যাবলীর সমাধান নির্দেশ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এক অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাদের দৈনন্দিন জীবনের তাবৎ কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। এ কারণে তাফসীর সাহিত্য হিসেবে এ গ্রন্থখানি এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ইসলামী পণ্ডিত ও আলেম সমাজেও এটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক তাফসীরখানির ভাষা অত্যন্ত সুপ্রাচীন-ক্লাসিকধর্মী; এর বাক-রীতিও বেশ জটিল। আধুনিক কোন ভাষায় এর অনুবাদ করার কাজও অত্যন্ত দুরুহ। তবু গ্রন্থটির গুরুত্ব ও উপযোগিতা বিবেচনা করে বাংলায় এর ভাষান্তরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও অনুবাদক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)। জীবনের শেষভাগে নানান কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তিনি এ কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। পুরো গ্রন্থটির ভাষান্তর সুসম্পূর্ণ করার জন্যে তিনি চেষ্টা করছিলেন প্রাণপনে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তাই গ্রন্থের অর্ধেকের কিছু বেশি অংশের ভাষান্তর সম্পন্ন হবার পরই তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আকাংক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদ কর্মটি সুসম্পূর্ণ হতে পারেনি।

তবে মরহুম মওলানার ইন্তেকালের পর অনুবাদ কর্মের উদ্যোক্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁর অনূদিত অংশটিকে দুটি বিরাট খণ্ড রূপে প্রকাশ করে এবং বিদগ্ধ পাঠক মহলে তা যথারীতি সমাদৃতও হয়। তারপর দীর্ঘ একটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণের ব্যাপারে আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এদিকে গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণের ব্যাপারে পাঠক মহল থেকে মওলানা মরহুমের গ্রন্থাবলী প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত খায়রুন প্রকাশনীর কাছে ক্রমাগত দাবি আসতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খায়রুন প্রকাশনী আজ গ্রন্থটি পুনঃমুদ্রণের এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মওলানা মরহুমের সৃষ্টি ও অবদানকে ধরে রাখার এবং এর বাকী অংশ অনুবাদ করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমানকে দায়িত্ব দেয়ায় খায়রুন প্রকাশনী নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দুটি বিরাট খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতা ও ব্যবহারের সুবিধার দিকে বিবেচনা করে দুটি খণ্ডকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। বর্তমানে মুদ্রণ ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটির অঙ্গ সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ পারিপাট্য যথাসম্ভব উন্নত করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি, গ্রন্থটির এই সংস্করণও বিদগ্ধ পাঠক মহলে যথারীতি সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ গ্রন্থকার ও অনুবাদক উভয়কে এই মহতী উত্তম কর্মের প্রতিফল দান করুন।

বিনয়বনত
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

সূচীপত্র

আহ্কামুল কুরআন

আহ্কামুল কুরআন
আহ্কামুল কুরআন

তৃতীয় খণ্ড

فاعلم انه لا اله الا الله محمد رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা আল-ইমরান

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

هُوَالَّذِيْنَ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ -

সেই মহান আল্লাহ্ই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তন্মধ্য থেকে বহু আয়াত মুহকাম— সুদৃঢ় স্পষ্ট— এগুলোই কিতাবের মূল। আর অন্যান্য আয়াত মুতাশাবিহ— সাদৃশ্যপূর্ণ-অস্পষ্ট।

শায়খ আবূ বকর বলেন ঃ 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ্' শব্দের তাৎপর্য আমরা এ কিতাবের শুরুতে ব্যাখ্যা করেছি। এ দুটির প্রত্যেকটি দুটি অর্থে বিভক্ত। সে দুটিরও একটি সমগ্র কুরআনের গুণ বোঝায় আর অপরটি কুরআনের কতক অংশকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে অপর কিছু অংশ বাইরে থেকে যায়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

الٓرٰ - كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ -

কিতাব, তার আয়াতসমূহ সুদৃঢ়-পরিপক্ক করা হয়েছে। (সূরা হুদ ঃ ১)

বলেছেন ঃ

الٓرٰ - تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ -

এসব আয়াত সুদৃঢ় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন কিতাবের। (সূরা ইউনুস ঃ ১)

এ আয়াত দুটিতে সমগ্র কুরআনের পরিচিতি বলা হয়েছে— তা সুদৃঢ়।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ -

আল্লাহ্ তা'আলা অতীব উত্তম কথা একখানি সাদৃশ্যপূর্ণ ও বারবার আবৃত্তি হওয়া কিতাবরূপে নাযিল করেছেন। (সূরা জুমার ঃ ২৩)

এ আয়াতে সমগ্র কুরআনকে 'মুতাশাবিহ'— 'সাদৃশ্যপূর্ণ' বলা হয়েছে। এরপর অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ -

এ আয়াত কুরআনের কতকাংশকে 'মুহকাম' ও অপর কতক অংশকে 'মুতাশাবিহ' বলা হয়েছে। সমগ্র কুরআনের মুহকাম হওয়াই ঠিক এবং তা পরিপূর্ণও। এ দুটি গুণের কারণে কুরআন সর্বপ্রকারের কথার তুলনায় অধিক মর্যাদাবান। তবে তা থেকে বহু আয়াত মুহকাম এবং তা-ই কিতাবের মূল— এর অর্থ এমন শব্দ যাতে কোন শরীকদারী নেই। তা শুনে শ্রোতা একটি অর্থই বুঝতে পারে। এ বিষয়ে যে মতবৈষম্য রয়েছে, তা আমরা উল্লেখ করেছি। তবে এ আয়াতের 'মুহকাম' শব্দটি এ তাৎপর্য অবশ্যই ধারণ করে, তা হয় তার দিকে প্রত্যাবর্তিত 'মুতাশাবিহ' বোঝায় এবং তাৎপর্য তার উপর ধারণ করে অথবা তা সেই মুতাশাবিহ বোঝায় যাতে সমগ্র কুরআনকে শামিল করা হয়েছে 'মুতাশাবিহ' কিতাব বলে। এ 'মুতাশাবিহ'-এর অর্থ একই ধরনের বা সাদৃশ্যপূর্ণ কথা। পারস্পরিক পার্থক্য না থাকা, কথাসমূহের সাংঘর্ষিক না হওয়া— একটির অপরটির বিপরীত না হওয়া। কুরআনের কিছু অংশ 'মুতাশাবিহ' বলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এ পর্যায়ে আগেরকালের মনীষীদের যেসব কথা-বার্তা তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'মুহকাম' হল মনসূখকারী আর 'মুতাশাবিহ' হল নাকচ হওয়া আয়াত, আমাদের মতে তা 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ'-র একটি প্রকার। কেননা মুহকাম ও মুতাশাবিহর উক্ত দুটি ছাড়া আরও বহু দিক থাকাটা নিষিদ্ধ হয়নি। তাই মনসূখকারী আয়াতকে 'মুহকাম' নাম দেয়া খুবই সঙ্গত। কেননা তার অর্থ বা হুকুমটাও সুপ্রতিষ্ঠিত। আরবরা সুদৃঢ় নির্মাণকে 'মুহকাম' নামে অভিহিত করে। যে দৃঢ় গিঁট খোলা সম্ভব হয় না উহাকে 'মুহকাম' বলা হয়। তাই মনসূখকারী আয়াতকে 'মুহকাম' বলা খুবই সঙ্গত। কেননা স্থিতি ও স্থায়িত্বই এ আয়াতের গুণ। আর মনসূখ হওয়া আয়াতকে 'মুতাশাবিহ' বলা যেতে পারে। কেননা তিলাওয়াতে তা মুহকাম আয়াতের মতই । তবে হুকুম প্রমাণ করার ব্যাপারে তা তার বিপরীত। ফলে তিলাওয়াতকারীর নিকট তার হুকুমটা সংশয়পূর্ণ হয়। এদিক দিয়ে মনসূখ আয়াতকে মুতাশাবিহ্‌ বলাও সঙ্গত। যাঁরা বলেছেন, মুহকাম হচ্ছে সেই আয়াত, যার শব্দগুলো বারবার আবর্তিত হয়নি আর 'মুতাশাবিহ' হচ্ছে বারবার আগত শব্দের আয়াত, কেননা তার যুক্তি শ্রোতার নিকট সংশয়পূর্ণ হয়ে থাকে— এটা তো এমন সব ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে বর্তমান, যাতে কারণটা সংশয়পূর্ণ হয়ে থাকে। তাতে তার কারণ শ্রোতার নিকট বর্ণনাও স্পষ্ট করা কর্তব্য। এ পর্যায়েও 'মুতাশাবিহ' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। আর যার মধ্যে নিহিত কারণ শ্রোতার নিকট অস্পষ্ট নয়, তা-ই মুহকাম, তাতে কোনরূপ সংশয়ের স্থান নেই— যেমন উপরোক্ত কথকের কথা থেকে স্পষ্ট হয়। এ-ও মুহকাম ও মুতাশাবিহ্‌র একটি প্রকার। এ নাম তাতে ব্যবহার করা বৈধ ও সঙ্গত।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুহকাম হচ্ছে সেই আয়াত, যার মর্মার্থ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। আর মুতাশাবিহ সেই আয়াত যার মর্মার্থ জানান যায় না। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا –

লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কবে ঘটবে ?

(সূরা আরাফ ঃ ১৮৭)

এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াত। এ আয়াতটিকে 'মুহকাম' বলা যায়, বলা যায় মুতাশাবিহ্— উভয়-ই। কেননা যার অর্থ ও সময় জানা যায়, তাতে তাশাবুহ্— অস্পষ্টতা কিছু নেই। তার তাৎপর্য সুদৃঢ় করা হয়েছে। আর যার মর্মার্থ, তাৎপর্য ও সময় জানা যায় না, তা শ্রোতার নিকট অস্পষ্ট। তাকেও এ নামে অভিহিত করা সঙ্গত। ব্যবহৃত শব্দ এ সব দিকই আত্মস্থ করে। বর্ণনাটি থেকে তা-ই বোঝা যায়। শব্দ-ই যদি তা ধারণ না করত, তাহলে তারা যে মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন, তার উল্লেখ তাঁরা কখনই করতেন না। আমরা একটি কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি, তা হল 'মুহ্‌কাম' তা যার একটি মাত্র অর্থ ধারণ করে, আর মুতাশাবিহ্ তা যা দুইটি অর্থ ধারণ করে, এ নাম যেসব দিক ধারণ করে, এটা তার একটি। কেননা এ প্রকারের মুহতাশাবিহ্‌কে 'মুহকাম' বলা হয়। কেননা তা যা বোঝায়, তা সুদৃঢ়, তার অর্থ সুস্পষ্ট। তার মুতাশাবিহ্‌কে 'মুতাশাবিহ্' নাম দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তা একদিক দিয়ে মুহকামের মতই, তার অর্থ গ্রহণও সম্ভব। আর তা বাদে তা অন্য কিছুর মত-ও, যার অর্থ মুহকামের বিপরীত। আর এ দিক দিয়েই তাকে মুতাশাবিহ্ বলা হয়েছে। মুহ্‌কাম ও মুতাশাবিহ— উভয়কেই আমাদের বলা তাৎপর্য শামিল করে, তার উদ্দেশ্য বোঝা ও জানার জন্যে আমরা আল্লাহ্‌র এ কথাকে দলীল বানিয়েছি। তিনি বলেছেন ঃ

'তার কিছু আয়াত মুহকাম— এগুলোই মূল কিতাব। আর অন্যান্য আয়াত মুতাশাবিহ।' ফলে যাদের মনে বক্রতার ভাবধারা বিদ্যমান, তারা মুতাশাবিহ আয়াত অনুসরণ করে ফিতনা সৃষ্টি করার ও তার মর্ম উদ্ঘাটনের জন্যে। এ আয়াতের বিস্তারিত তাৎপর্য তো আমাদের জানা-ই আছে। অতএব মুতাশাবিহ্ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের আলোকে বুঝতে হবে। তার বিপরীত অর্থ তা থেকে কখনই গ্রহণ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ 'মুহকাম' আয়াতের পরিচিতিতে নিজেই বলেছেন ঃ 'এ মুহকাম আয়াত-ই মূল কিতাব।' الْأُمُّ —'মা'। 'মা' তাই যা থেকে তার উৎপত্তি ও প্রকাশ এবং সেদিকেই তার প্রত্যাবর্তন নয়। এই কারণে 'মুহকাম' আয়াতকে 'মা' বলা হয়েছে। অতএব মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ মুহকাম আয়াতের ভিত্তিতে বুঝতে হবে, তার দিকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। এ কথাকে অধিক তাগিদপূর্ণ করা হয়েছে এ কথা দ্বারা ঃ 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা মুতাশাবিহ (যার তাৎপর্য স্পষ্ট নয়) আয়াতের পিছনে লেগে পড়ে ফিত্‌না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও তার একটা ব্যাখ্যা (যে কোন ভাবে) পেয়ে যাওয়ার জন্যে। মুহ্‌কাম আয়াতের ভিত্তিতে মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণ না করাকে মনে বক্রতার রোগ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, সে ফিত্‌নার সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। 'ফিত্‌না' বলতে এখানে কুফর ও গুমরাহী বুঝিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ —'ফিত্‌না হত্যাকাণ্ড থেকে অধিক শক্ত গুনাহের কাজ।' (সূরা বাকারা ঃ ১৯১) বলা হয়েছে মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে লাগা এবং তা থেকে মুহকাম আয়াতের বিপরীত তাৎপর্য গ্রহণ সত্যের বিপরীত মানসিকতা। লোকেরা তা থেকে গুমরাহী ও কুফর পেতে চায়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এ আয়াতের 'মুতাশাবিহ' শব্দটি বলতে সেই শব্দ বুঝিয়েছে যার তাৎপর্য কেবলমাত্র মুহকাম আয়াতের ভিত্তিতে গ্রহণ করা কর্তব্য। পরে এই শব্দে নিহিত থাকা তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। পূর্বে মুতাশাবিহ্‌র কয়েক প্রকারের কথা আমরা বলেছি। শব্দের ধারণ ও সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও তা বিভিন্ন। আমরা দেখলাম, যিনি বলেছেন এই

মুহকাম ও মুতাশাবিহ্‌ অর্থ মনসূখকারী ও মনসূখ হয়ে যাওয়া আয়াত। দুটি আয়াতের নাযিল হওয়ার তারিখ জানা গেলে যিনি জানেন তার নিকট কোন অস্পষ্টতা বা সংশয় থাকে না। তিনি জানতে পারেন যে, এটা মনসূখ ও তার হুকুম পরিত্যক্ত। আর মনসূখকারী আয়াতটির হুকুম প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর, তাহলে তাতে শ্রোতার মনে সংশয় সৃষ্টির কিছু থাকে না। কেননা তিনি দুটি আয়াতের হুকুম জানেন যে, এ হুকুম দুটির মধ্যে একটি মনসূখ হয়েছে। আর শ্রোতা নাযিল হওয়ার তারিখ জানে না বলেই তার মনে সংশয় থেকে যায়। এর ফলে একটি শব্দের মুহকাম হওয়ার কারণ তা অন্যটি অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হয় না। আর তার ফলে দুটোই মুতাশাবিহ্‌ হয়ে যায় না। কেননা এ দুটির প্রতিটিই মনসূখকারী হতে পারে, হতে পারে মনসূখ হয়ে যাওয়া। ফলে আল্লাহ্‌র এ কথায় এর কোন প্রবেশ নেই ঃ 'তার কিছু আয়াত মুহকাম— তা-ই কিতাবের মূল এবং অন্যগুলো মুতাশাবিহ্‌।

'মুহ্‌কাম' তা-ই, যার শব্দ বারবার আসে না, এ কথাটিও আলোচ্য আয়াতের ক্ষেত্রে বলা যায় না। কেননা তার অর্থ মুহকাম আয়াতের ভিত্তিতে নেয়ার প্রয়োজন হয় না। তা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করতে হয়। অভিধানের আলোকে যে অর্থ হতে পারে, তা-ই গ্রহণ করতে হয়।

'যার সময় ও নির্দিষ্ট অর্থ জানা যায় তা মুহ্‌কাম' আর 'যার মর্মার্থ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না তা মুতাশাবিহ্‌'— যেমন কিয়ামতের ব্যাপার, আর যেসব ছোট ছোট গুনাহ আল্লাহ এই দুনিয়ায় আমাদের অবগতির বাইরে রেখেছেন, এ প্রকারের আয়াতও আলোচ্য আয়াতের হুকুমের বাইরে অবস্থিত। কেননা মুতাশাবিহ্‌র তত্ত্ব জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা মুহ্‌কাম আয়াতের আলোকেও বোঝা যায় না। আমরা ইতিপূর্বে মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতের বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করেছি, তা এর মধ্যেও গণ্য নয়। তার একটিকে অন্যটির ভিত্তিতে বোঝার প্রশ্ন নেই। তবে এই শেষে উল্লেখ করা দিকটির ভিত্তিতেই তার অর্থ জানতে হবে। তা হল মুতাশাবিহ্‌ শব্দ বহু অর্থের ধারক, তাকে মুহকামের আলোকে বুঝতে হবে, যার মধ্যে সেই বিভিন্নতার অর্থের অবকাশ নেই। এর শব্দে বহু অর্থের অবকাশ নেই কিতাবের শুরুতে পেশ করা দৃষ্টান্তসমূহের ন্যায়। আমরা বলেছি, তা দুটি প্রকারের বিভক্ত— তাঁর কিছু বিবেক-বুদ্ধিগত এবং কিছু শুনার মাধ্যমে পাওয়া। আগের কালের লোকদের থেকে এসব দিকের সন্ধান পাওয়া নিষিদ্ধ কিছু নয়। তা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ নাম তা শামিল করে। আগের কালের লোকদের থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। মুহকাম আয়াতের আলোকে এ শেষোক্ত দিকটিই সাব্যস্ত হওয়া উচিত। কেননা মুতাশাবিহ্‌ আয়াতের সমস্ত দিকই মুহকাম আয়াতের আলোকে নির্ধারিত হওয়া অসম্ভব। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ -

উহার তত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

এর অর্থ— সমস্ত মুতাশাবিহ্‌র আয়াতের তাৎপর্য। এর ইলম অন্য কারোর আয়ত্ত নয়। সমস্ত মুতাশাবিহ্‌ আয়াতের তাৎপর্য আমাদের জ্ঞানে আয়ত্ত করাকে এ আয়াতে অস্বীকার করা

হয়েছে। তবে কোন কোন মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য দলীলের ভিত্তিতে বলাকে অস্বীকার করা হয়নি। যেমন ইল্‌ম আয়ত্ত করা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَا بِمَا شَاءَ -

আল্লাহ্‌র কোন ইল্‌মই মানুষেরা আয়ত্ত করতে পারে না। তবে আল্লাহ যা বলে, তা পারে। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

আয়াতটির ধরনই প্রমাণ করে যে, কোন কোন মুতাশাবিহ্‌র অর্থ আমরাও জানতে পারি। জানতে পারি মুহকাম আয়াতের আলোকে, মুহকাম আয়াতের অর্থ ধারণ করে। তবে তাকে মুহ্‌কাম আয়াতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা ওয়াজিব হওয়া তা থেকে প্রমাণিত হয় না। সেই সাথে এ-ও বোঝায় যে, আল্লাহ্‌র ইলম ও জ্ঞান-তত্ত্ব আমরা লাভ করতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌র কথা 'তার তত্ত্ব আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না' সম্পূর্ণ নিষেধকারী হয় না। কেননা কোন কোন মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য জানা সম্ভব হয়েছে। যেসব বিষয়ের ইল্‌ম আমাদের আয়ত্তাধীন হতে পারে না— কিয়ামতের সময়ও সগীরা গুনাহ— সেই পর্যায়ে গণ্য। যেসব শব্দ 'মুজমাল' যার ব্যাখ্য হওয়া দরকার; কিন্তু তার ব্যাখ্যা বলা হয় না, এরূপ শব্দও 'মুতাশাবিহ্' গণ্য হতে পারে বলে অনেকে মনে করেছে। তার ইল্‌ম আমরা লাভ করতে পারি না।

وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّسِخُوْنَ فِىْ الْعِلْمِ -

তার তত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আর ইল্‌মে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত লোকগণ।

আলিমগণ এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন, আয়াতটি رَاسِخُوْنَ فِىْ الْعِلْمِ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। 'ওয়াও' (و) অক্ষর দ্বারা পূর্ব ও পরবর্তী কথাকে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন বলা হয় ঃ আমি জায়দ ও উমরের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। 'ও' অক্ষর দিয়ে জায়দ ও উমরকে এ বাক্যে যুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের আরও দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন ঃ 'তার ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না' এ পর্যন্ত এসে আয়াতটি শেষ হয়ে গেছে। 'ওয়াও' (و) অক্ষরটি পরবর্তী কথার সূচনাকারী মাত্র, তা পূর্ববর্তী কথাকে একত্রিত করেনি।

প্রথমোক্ত মত যাঁদের, তাঁরা মনে করেন, ইলমে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত লোকেরা কোন কোন মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য জানেন, যদিও সমস্ত মুতাশাবিহ্ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন না। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাসান বসরী থেকে পাওয়া বর্ণনা উক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করে। যাদের হৃদয়ে সংশয় রয়েছে, তারা সংশয় সৃষ্টি করতে চায়। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। 'কিন্তু ইলমে যারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা তার তত্ত্ব জানেন এবং বলেন— 'আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি।' ইবনে নজীহ্‌র বর্ণনানুযায়ী এ কথাটি মুজাহিদের। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে আবদুল আজীজ থেকেও এ কথাই জানা গেছে। তাঁরা বলেছেন ঃ মুতাশাবিহ্ আয়াতের তত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না, ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা অবশ্য তা জানেন! তাঁরাই বলেন যে, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। রুবাই ইবনে আনাস থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত শব্দও এ অর্থ ধারণ করে। কথাটি এভাবে দাঁড়ায় ঃ

সমস্ত মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা তার কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন এবং তাঁরা এ ঈমানের কথা বলেন যে, এ সব-ই আমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে আসা। অর্থাৎ তা মুহ্কাম আয়াতের আলোকে বুঝাবার মত দলীল তাদের নিকট রয়েছে। যা তাঁরা জানেন না, তার ইলম পাওয়ার কোন পথ তাদের আয়ত্তে নেই। তাঁরা কতক মুতাশাবিহ্ আয়াতের তত্ত্ব জানেন আর কতক আয়াতের তত্ত্ব জানেন না বলে আমরা এ সমস্তের প্রতিই ঈমান রাখি, সবই আমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে— এ কথা তাঁরা বলেন। যে বিষয়ের ইলম আমাদের নেই, তা আমাদের না জানার মধ্যে আমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত। তা আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিক দিয়েই আমাদের জন্যে কল্যাণময়— একথা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। তিনি আমাদেরকে তা-ই জানান, যা আমাদের জন্যে কল্যাণকর। তাই সবকিছুর বিশুদ্ধতার কথা তাঁরা স্বীকার করেন, যা জানেন আর যা জানেন না, তা সবই সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দেন।

অনেকে মনে করেন, 'তার তত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না' এ পর্যন্ত এসেই বাক্য শেষ হয়ে গেছে। এছাড়া অন্য কোন মত সহীহ্ নয় وَالرَّاسِخُوْنَ এবং واو (ওয়াও) পরবর্তী কথার সূচনা করেছে, তার পূর্ব ও পরবর্তী কথাকে একত্রিত বা যুক্ত করেনি— যদি দুটি কথা যুক্ত হতো, তাহলে কথাটি এবং বলেন ঃ 'আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি।' একথা সূচিত হওয়ার জন্যে আবার 'ওয়াও' (و) লেখা হতো। বলেছেন, যারা প্রথম কথাটি গ্রহণ করেছেন, তা-ও ভাষার দিক দিয়ে সঠিক হতে পারে। কুরআনে এ রকমের কথা বলার দৃষ্টান্ত আছে। 'ফাই' বণ্টন বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ ..... شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

জনপদবাসীদের নিকট আল্লাহ যা তাঁর রাসূলকে যুদ্ধ ছাড়াই দান করেছেন, তা আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে ..... কঠিন আযাব— পর্যন্ত। (সূরা হাশর ঃ ৭)

পরে পার্থক্য সৃষ্টি করে 'ফাই' যারা পাবে তাদের উল্লেখ করেছেন এই বলে ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا -

তা সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যে, যারা তাদের ঘর-বাড়ি-দেশ থেকে বহিষ্কৃত-বিতাড়িত হয়েছে, চায় আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। (সূরা হাশর ঃ ৮)

এরপর রয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ -

আর যারা তাদের পরে এসেছে (ও আসবে), তাদের জন্যেও। (সূরা হাশর ঃ ১০)

এরাও নিঃসন্দেহে প্রথমোক্ত লোকদেরই অংশ পাওয়ার যোগ্য। এখানে 'ওয়াও' অক্ষরটি পূর্ব ও পরবর্তীকে একত্রিত ও যুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর বলেছেন ঃ

يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ -

এর অর্থ, তারা বলে ঃ হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাদের ও আমাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদেরকে ক্ষমা কর। (সূরা হাশর ঃ ১০)

আর 'ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা' বাক্যটিও অনুরূপ। তার অর্থ ঃ

'যাঁরা ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত তাঁরা তার তাৎপর্য জানেন'— 'মুতাশাবিহ' আয়াতের অর্থ বোঝার জন্যে যে দলীল রয়েছে তার সাহায্যে। তারাই বলে ঃ আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। এরা পূর্ববর্তীর সাথে যুক্ত। তার আওতার মধ্যে শামিল।

আরবী সাহিত্যেও এরূপ বলা যখন চলে, তখন মুহকাম আয়াতের আলোকে মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণ করা ওয়াজিব। আয়াত থেকেই তা বোঝা যায়। তাহলে কথা দাঁড়াল, ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য জানতে পারবেন, যদি তাঁরা মুহ্‌কাম আয়াতকে তার দলীল বানান।

অপর একটি দিক দিয়েও বিচেনা করা যায়। 'ওয়াও' অক্ষরটি যখন প্রকৃতপক্ষেই পূর্ব ও পরবর্তী কথাকে একত্রিত করারও অর্থ দেয়, তখন উহার সে অর্থই এখানেও গ্রহণ করা দরকার। তা-ই এই অক্ষরটির আসল তাগিদ। কোন দলীল না থাকলে সেটিকে নতুন কথার সূচনা অর্থে গ্রহণ করা সঠিক হবে না। আর এখানে তার আসল অর্থ না গ্রহণ করে অন্য কোন অর্থে গ্রহণ করার কোন দলীল এখানে নেই। কাজেই এখানে সেই একত্রকরণ অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুহ্‌কাম আয়াত যদি নিজ বিবেক-বুদ্ধি মত কয়েদযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা হয় আর প্রত্যেক বাতিল পন্থীই যদি নিজের জন্যে সেই দাবি করে, তাহলে মুহকাম আয়াতকে দলীল বানানো অর্থহীন হয়ে যাবে।

তাহলে জবাবে বলা যাবে, মুহকাম আয়াত কয়েদযুক্ত হবে বিবেক-বুদ্ধির পরিচিতিতে যা আছে তার সাথে। তখন শব্দটিও ভাষাভাষীদের বিবেক-বুদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। বিবেক-বুদ্ধির হুকুম বা ফয়সালা প্রয়োগে কতিপয় প্রাথমিক কথার প্রয়োজন দেখা দেবে না। বরং শ্রোতা তার তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী বাস্তবভাবেই হবে, সেই নিয়মে যা বুদ্ধিমান লোকদের বিবেক-বুদ্ধিতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। খারাপ অভ্যাস অনুযায়ী হবে না, যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে। যা এরূপ হবে তা-ই মুহ্‌কাম। তার অর্থ তাতে ব্যবহৃত শব্দ অনুযায়ী প্রকৃতভাবেই হবে। তাতে খারাপ অভ্যাসের কোন স্বীকৃতি নেই।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, যার মনে বক্রতা আছে সে মুতাশাবিহ্ আয়াতের পেছনে লেগে পড়ে। সে তো মুহ্‌কাম আয়াতের প্রতি লক্ষ্য দেয় না ?

তার জবাবে বলা হবে, রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতটি নাজরানের খ্রীস্টান প্রতিনিধিদল সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তারা ঈসা-মসীহ্ (আ) সম্পর্কে নবী করীম

—৩/৩

(স)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তারা প্রশ্ন করেছিল, তিনি কি আল্লাহ্‌র কলেমা ও তাঁর থেকে আসা রূহ্ ছিলেন না ? রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি তাই ছিলেন। তারা বলেছিল, আমাদের জন্যে এটাই যথেষ্ট। তখন আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

যাদের হৃদয়ে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহ্ আয়াতের পেছনে লেগে থাকে। তারপর নাযিল করেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ -

আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত যেন। তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বলেছেন হও, তখন হয়ে গেল। (আল-ইমরান ঃ ৫৯)

পরে খ্রীস্টানরা আল্লাহ্‌র কলেমাকে তাদের কথার দিকে বিকৃত করে ফিরিয়ে নিল। তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র মতই 'চিরন্তন সত্তা'র রূপ দিল। আর 'আল্লাহ্ থেকে আসা রূহ' কথাটিকে তারা বদলিয়ে বলতে লাগল, তিনি আল্লাহ্‌র অংশ। তাঁরই মত শাশ্বত— যেমন মানুষের রূহ। অথচ আল্লাহ 'কলেমা' শব্দ দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, আগের নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে তার সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ জন্যে তাকে 'কলেমা' বলেছেন এ হিসেবে যে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। তাকে তাঁর রূহ নাম দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তাকে কোন পুরুষের ঔরসজাত বানান নি। বরং তিনি জিবরাঈল (আ)-কে আদেশ করলেন, তিনি মরিয়ম (আ)-এর গর্ভে ফুঁকে দিলেন। আল্লাহ্ এ কাজটিকে নিজের কৃত বলে দাবি করলেন তাঁকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে। যেমন বলা হয় 'আল্লাহ্‌র ঘর' আল্লাহ্‌র আকাশ, আল্লাহ্‌র জমিন। এ-ও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ঈসা (আ)-কে 'রূহ' বলেছেন, যেমন কুরআনকে রূহ বলা হয়েছে এ আয়াতটিতে ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا -

এবং এমনিভাবে আমরা তোমার প্রতি রূহ ওহীরূপে নাযিল করলাম আমার একান্ত আদেশে। (সূরা শূরা ঃ ৫২)

ওহী বা কুরআনকে এ আয়াতে 'রূহ' বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, 'রূহ' যেমন মানুষের বৈষয়িক জীবনের উৎস, কুরআন তেমনি মানুষের দ্বীনী জীবনের উৎস। বাঁকা মতের লোকেরা এ কথাটিকে নিজেদের ভুল মত সমর্থনে ব্যবহার করেছে। তাদের আকীদায় যে কুফর ও গুমরাহী রয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটিয়েছে এই কথাটিকে কেন্দ্র করে। কাতাদাহ বলেছেন, চিন্তার বক্রতার ধারক ও মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে লেগে যাওয়া লোক (সে কালের) হারুরীয়া ও সাবায়ীয়া ফিরকার লোক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ -

কাফিরদের বল, তোমরা নিশ্চিতই পরাজিত হবে, এবং জাহান্নামে একত্রিত হবে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও ইবনে ইস্‌হাক থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের দিন কাফির কুরায়শরা যখন ধ্বংস হল, তখন নবী করীম (স) মদীনার ইয়াহূদীদেরকে 'কাউনকা' বাজারে একত্রিত করে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কুরায়শদের উপর যেরূপ বিপদ এসেছে, তাদের উপরও অনুরূপ বিপদ আসার ভয় দেখালেন ও হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা বলল, আমরা কুরায়শদের মতনই। ওরা যুদ্ধ জানে না। আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে জানতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে। জানতে পারবেন, আমরা ভিন্ন মানুষ। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ 'কাফিরদের বল, তোমরা অবশ্যই পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে আর জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ স্থান।

এ আয়াতে বলা কথা রাসূলে করীম (স) নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা তাতে মুমিনদের যে বিজয় লাভের ও মুশরিকদের পরাজিত হওয়ার যে আগাম খবর দেয়া হয়েছে, তা অল্প দিনের মধ্যেই দিনের মধ্যেই দিনের ন্যায় সত্য প্রমাণিত হয়েছে। খবর অনুযায়ী বাস্তবে ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছে। ভবিষ্যতের ব্যাপারে যেসব গায়বী খবর দেয়া রয়েছে এ-ও তেমনি। এটা হঠাৎ ঘটে যওয়া কোন ঘটনা নয়। সংবাদদাতার দেয়া খবর ঘটনার বিপরীত হয়নি। তা সম্ভব হয়েছিল এ জন্যে যে, তা ছিল আল্লাহ্‌র দেয়া সংবাদ। এক মাত্র তিনিই গায়ব জানেন। তিনি ছাড়া সৃষ্টির আর কেউ-ই ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। এমনভাবে যে পরবর্তী সময়ে হুবহু তাই ঘটবে যা আগেভাগে বলা হয়েছিল। তাতে একবিন্দু এদিক-ওদিক হবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

দুইটি জনবসতি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তার একটি বাহির। যুদ্ধ করছে আল্লাহ্‌র পথে— এ ব্যাপারে তোমাদের জন্যে বড় নিদর্শন রয়েছে।

ইবনে মাসঊদ (রা) কর্তৃক আল-হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। মুমিন বাহিনীই মুশরিকদের জন্যে দ্বিগুণ প্রদর্শিত হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে। আর তারা নিজেরা তাদের তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগ ছিল। কেননা মুশরিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার আর মুসলিমরা ছিল মাত্র তিন শ' এবং আরও কিছু (তেরজন)। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অন্তরকে সাহসী ও শক্তিশালী বানাবার জন্যে তারা খুব স্বল্প সংখ্যক মনে হচ্ছিল।

অন্যরা বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ছিল' ..... আয়াতটুকুতে কাফিরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছিল, যাদের কথা 'কাফিরদের বল, তোমরা পরাজিত হবে ও জাহান্নামে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে' এতে বলা হয়েছে। এর সাথে যোগ করেই বলা হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ছিল .... এর সম্পূর্ণ কথা এ দাঁড়ায় যে, কাফিরা মুমিনদেরকে তাদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছিল। আর আল্লাহ তাদেরকে চর্ম চক্ষে তাই দেখিয়েছিলেন, যেন তাদের অন্তরে ভয় জাগ্রত হয়, যেন তা মুমিনদের জন্যে তাদের উপর অধিফ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ ব্যাপারটি মুসলমানদের সাহায্যের একটি দুয়ার ছিল। আর কাফিরদের জন্য ছিল বড় লজ্জার কারণ।

ঐ আয়াতটিতে নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার দুটি প্রমাণ নিহিত রয়েছে। একটি হল— অল্প সংখ্যক বাহিনীটির বিজয় সাধিত হওয়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহনীর উপর। সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়েও মুসলমানরা কম, কাফিররা অনেক অগ্রসর। এটা ছিল এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। আর তা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন আর দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে সিরিয়া প্রত্যাগত ব্যবসায়ী কাফেলা ও মক্কা থেকে যুদ্ধের জন্যে আগত কুরায়শ বাহিনী— এ দু'টির একটি অবশ্যই পাইয়ে দেবেন। আর নবী করীম (স) মুসলমানদেরকে আগে-ভাগেই বিজয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন। এক-একটি স্থান দেখিয়ে বলেছিলেন, এখানে অমুক ব্যক্তি মরে পড়ে থাকবে, এখানে অমুক ব্যক্তি। যুদ্ধশেষে ঠিক তা-ই দেখা গিয়েছিল। একদিকে আল্লাহ্র ওয়াদা এবং অপর দিকে রাসূল (স)-এর আগাম খবর সবই সত্য হয়ে উঠেছিল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

زُيِّـنَ لِلنَّـاسِ حُـبُّ الشَّهَـوَاتِ -

লোকদের নিকট কামনা-বাসনার প্রেম চাকচিক্যপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল-হাসান বলেছেন, চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছে শয়তান। কেননা শয়তানের স্রষ্টা যত কঠিনভাবে শয়তানের নিন্দা করেছেন, তত আর কেউ নয়। অন্য কিছু লোক বলেছেন, আল্লাহ্ই চাকচিক্যময় বানিয়েছেন। সে দিকে মানুষের অন্তরের টান তো মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। যেমন অপর আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا -

পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে তাকে আমিই পৃথবীর জন্যে সৌন্দর্য বা অলংকার বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা কাহাফ ঃ ৭)

অন্যরা বলেছেন ঃ যা ভালো তাকে চাকচাক্যিময় বানিয়েছেন আল্লাহ। আর যা মন্দ তাকে চাকচিক্যময় বানিয়েছে শয়তান।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ -

যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ও অন্যায়-অকারণে হত্যা করে নবীগণকে এবং হত্যা করে তাদেরকেও যারা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে উঠে ন্যায়পরতার আদেশ করে ..

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম ঃ হে রাসূল! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি পাবে কোন সব লোক? জবাবে বললেন ঃ সেই ব্যক্তি, যে কোন নবীকে হত্যা করেছে কিংবা সেই ব্যক্তি, যে ভালো

কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ করতে লোকদেরকে নিষেধ করে। এ কথা বলে তিনি এ পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

এবং নবীগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে-অকারণে এবং হত্যা করে সেই লোকদেরকে যারা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে উঠে লোকদের ন্যায়পরতা ইনসাফের আদেশ করে। অতএব তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

এবং পরে বললেন ঃ হে আবূ উবায়দা! বনী ইসরাঈলীরা দিনের প্রথম ভাগে একঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৪৩ জন নবীকে হত্যা করেছিল। তখন বনী ইসরাঈলীদের দাসদের মধ্য থেকে একশ বার জন লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং নবীগণের হত্যাকারীদিগকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে শুরু করেছিল। পরিণামে বনী ইসরাঈলীরা সেই দিনের শেষ ভাগে এই শেষোক্ত লোকদিগকে হত্যা করল। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কেই কথা বলেছেন।

এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, হত্যার ভয় থাকা সত্ত্বেও অন্যায় করতে অস্বীকার করা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্পূর্ণ জায়েয। বরং তা একটি অত্যন্ত কল্যাণময় মর্যাদা। তা করলে বিরাট বিপুল সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হওয়া যাবে। কেননা উক্ত আয়াতে 'আমর বিল মারুফ ও নিহী আনিল মুনকার' করার অপরাধে নিহত ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করেছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও অন্যান্যরা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা স্পষ্ট করে বলা উত্তম জিহাদ।

কোন কোন বর্ণনায় এ কাজের দরুন নিহত হওয়ার কথা আছে বলে বলা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ইকরামা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন শহীদ (হযরত) হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং সে, যে অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য কথা স্পষ্ট করে বলার অপরাধে নিহত হয়েছে। আমর ইবনে উবায়দ বলেছেন ঃ ন্যায় ও ইনসাফের আওয়াজ তোলার কারণে নিহত হওয়া নেক আমলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাজ। এর তুলনায় অধিক উত্তম নেক আমল আর কিছু আছে বলে আমরা জানি না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'অতএব ওদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।' এ কথাটি যদি ওদের আগের কালের— পূর্ববর্তী বংশীয় লোকদের সম্পর্কে জানানো খবর হয় এভাবে যে, যাদেরকে সম্বোধন করে এক্ষণে এ কথাটি বলা হল, তারা তাদের পূর্বের লোকদের ওসব অন্যায় কার্যকলাপে রাজি ছিল, তাহলে পূর্বের ও বর্তমানে লোকদের প্রতি একসাথে এ আযাবের দুঃসংবাদ দেয়া হয়েছে মনে করতে হবে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ -

বল ঃ তাহলে তোমরা আগে আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করতে কেন?

আল্লাহ্‌র এ কথাটিও ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ط قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِى بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে তাগিদ করেছেন যে, আমরা কোন রাসূলের প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না তিনি আমাদের নিকট এমন একটি কুরবানী না আনবেন, যাকে আগুন খেয়ে ফেলবে। তুমি বল ঃ আমার পূর্বে বহু রাসূল তোমাদের নিকট অকাট্য দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন। আর তোমরা যা বলছ তা-ও। তাহলে এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তদেরকে হত্যা করেছিলে কেন, তোমরা সত্যবাদী হলে এ কথার জবাব দাও।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৩)

এ আয়াতে হত্যা কার্যটি তাদের কৃত বলা হয়েছে, যাদের সাথে এখন কথা বলা হচ্ছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে এরা নিজেরা সেই হত্যাকার্য করেনি। তবে এরা আগের লোকদের দ্বারা নবী হত্যার কাজ হয়েছিল তার প্রতি এরা রাজি ছিল, তা সমর্থন করেছিল। এর ফলে নবী হত্যা অপরাধের আযাবে এরাও শরীফ হবে। কেননা এরা তাদের নবী হত্যাকে সমর্থন করছিল। ফলে এরাও সে কাজে অন্ততঃ মনে-মনে শরীক হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ -

যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ দেয়া হয়েছে— আহ্‌লি কিতাব নামে পরিচিত হয়েছে— তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব কিতাবীদের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে .... তুমি কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে, যখন ওদেরকে তওরাতের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কেননা তওরাত তো আল্লাহ্‌র-ই কিতাব। তা ছাড়া অন্যান্য সব কিতাব বোঝায়, যাতে নবী করীম (স) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়া হয়েছে। এ সব কিতাবে নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার যে কথা আছে তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করতে— তা সমর্থন করতে বলা হয়েছিল। যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

বল ঃ তোমরা তওরাত নিয়ে আস এবং তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৩)

তখন আহ্‌লি কিতাবের একটা দল পিছনে সরে গেল, তওরাত নিয়ে মুকাবিলায় এল না। কেননা তারা জানত যে, তাদের কিতাবেই নবী করীম (স)-এর কথা বলা হয়েছে এবং তিনি

সত্য নবী। তারা যদি তা না-ই জানত, তাহলে এ আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও তারা পিছনে সরে যেত না। অবশ্য তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঈমান এনেছিল। তারা জানত যে, তাদের কিতাবে তাঁর নবুয়তের সত্যতার ঘোষণা রয়েছে, তারা ঈমান এনে তার-ই সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। তওরাত ও অন্যসব আসমানী কিতাবে শেষ নবীর যে গুণ-পরিচিতির উল্লেখ আছে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে তা সবই সত্য ও বাস্তব দেখতে পেয়েছিল।

এ আয়াতটিতেও নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে। কেননা তাদের নিকট রক্ষিত আসমানী কিতাবসমূহে নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার যেসব প্রমাণ রয়েছে, সে বিষয়ে যদি তারা পূর্ণভাবে অবহিত না হতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই পিছনে ফিরে যেত না। বরং তারা দ্রুততার সাথে এগিয়ে এসে দেখাত যে— না, তাদের কিতাবে তেমন কিছু নেই। এভাবে তারা মুহাম্মাদ (স)-এর দাবিকে বাতিল প্রমাণ করতে পারত। তাই যখন তারা পশ্চাদপসরণ করল, রাসূলের দাবিকে চ্যালেঞ্জ করল না, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে. তাদের কিতাবে কি আছে, তা তারা খুব ভালো ভাবেই জানত। এ ব্যাপারটিরই দৃষ্টান্ত হচ্ছে আরবদের প্রতি আল্লাহ্‌র দেয়া চ্যালেঞ্জ। বারবার বলা হয়েছে, কুরআন যদি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের রচিত বলে ধারণা করে থাক, তাহলে তোমরা তো সেই আরবীরই বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, তোমরাও অনুরূপ কালাম রচনা করে পেশ কর। কিন্তু তারা সে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করেনি। তার পরিবর্তে তারা মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে শুরু করল। কেননা তারা ভালো করেই জানে যে, কুরআনের মত কালাম রচনা করতে তারা কখনই সক্ষম হবে না। আল্লাহ্ নাজরানের খ্রীস্টানদেরকে মুকাবিলা করার জন্যে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন ঃ

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ -

বল, আস, আমরা আমাদের পুত্র ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের ডাকি ..... (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬১)

এর শেষে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ -

অতঃপর আমরা কাতর কণ্ঠে কাঁদব এবং তারপর আমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্ লানত হওয়ার দো'আ করব। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬১)

তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন, ওরা যদি উপস্থিত হয় এবং মুবাহিলা করে, তাহলে আল্লাহ্ উপাত্যটাকে নিশ্চয়ই আগুনে ভরে দিতেন এবং তারা তাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যেতে পারত না।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতাই প্রমাণিত হয়। নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন।

হাসান ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতিও আহুত হচ্ছে এ কথায় যে কিতাব রয়েছে, তা কুরআন বোঝায়। কেননা দ্বীনের মৌলনীতি, শরীয়াতের বিধান এবং আগে কিতাবসমূহে রাসূলের গুণ-সিফাত যা-ই উল্লিখিত রয়েছে, তাতে তওরাত কুরআনের

মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে ডাকার আরও অনেক তাৎপর্য হতে পারে। রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়ত-ও হতে পারে— যেমন এইমাত্র বললাম। ইবরাহীম (আ)-এর ব্যাপারও হতে পারে। কেননা তিনিও ইসলামের নবী ছিলেন, ইসলাম-ই ছিল তাঁর দ্বীন। শরীয়াতের 'হদ্দ' ইত্যাদি দণ্ডও তার অর্থ হতে পারে। যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আহ্‌লি কিতাবের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করেছিলেন এবং তাদেরকে যিনাকারের দণ্ড কি, জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তারা বলেছিল, শাস্তি হচ্ছে জুতা মারা, উত্তপ্ত করা। প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা 'রজম'-এর কথা গোপন রেখেছিল। তারা কিতাব পড়তে পড়তে 'রজম'-এর আয়াতটির স্থানে এলে নবী করীম (স) থামিয়ে দিলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম উপস্থিত ছিলেন। কাজেই উক্ত 'কিতাব' শব্দটির অর্থ এ সবই হতে পারে। এ সবের প্রত্যেকটির দিকেই তাদেরকে ডাকার কথা এখানে বলা হয়ে থাকতে পারে। এ আয়াতে এ প্রমাণও রয়েছে যে, যে লোক তার প্রতিপক্ষকে শরীয়াতের হুকুম পালনের জন্যে ডাকলে সেই ডাকে সাড়া দেয়া তার কর্তব্য। কেননা এ ডাক তো আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আসার ডাক। এ আয়াতটিও এ পর্যায়ের ঃ

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ –

যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় জনগণের পরস্পরের মধ্যে বিচার করা ও হুকুম জারি করার জন্যে তখন তাদের মধ্যের কিছু লোক পাশ কাটিয়ে থাকে।

(সূরা নূর ঃ ৪৮)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ –

বল ঃ হে আমাদের আল্লাহ ! তুমি-ই দেশ ও রাজ্যের মালিক। তুমি যাকে চাও শাসনকর্তৃত্ব দান কর আর যার হাত থেকে তুমি চাও সে কর্তৃত্ব কেড়ে নাও। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৬)

'মূল্‌ক-এর মালিক' এমন একটা গুণগত ব্যাপার, যা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ-ই পাওয়ার অধিকারী নয়। আর তিনিই সমগ্র মালিক— দেশ ও রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক। কেউ কেউ বলেছেন ঃ দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত কর্তৃত্বের তিনি মালিক। আবার বান্দাগণের মালিক-ও বলেছেন কেউ কেউ। তারা যে সব জিনিসেরই মালিক হয়েছে, তারও মালিক তিনি। মুজাহিদ বলেছেন, মূল্‌ক' বলতে এখানে নবুয়ত বুঝিয়েছেন। "তুমিই 'মূল্‌ক' দাও যাকে তুমি চাও"-এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি, ধন-মাল ও জনগণের উপর মালিকানা। আল্লাহ তা মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে দিতে পারেন, দিয়ে থাকেন। আর দ্বিতীয় হল ব্যবস্থাপনা ও শাসন-প্রশাসনিক কর্তৃত্ব। এ ব্যাপারটি কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট, সে মুসলিম, যে পূর্ণাঙ্গ ন্যায় বিচারবাদী। কাফির ও ফাসিক লোকেরা তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কোনক্রমে পেতে পারে না। মুসলিম উম্মাকে শাসন করা ও তাদের সামষ্টিক ব্যবস্থা পরিচালনার কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সম্বলিত বিধানের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার। তাই তা কাফির ও ফাসিকের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না। এরূপ পরিচিতি যার, সে কখনই মুসলমানদের উপর শাসন কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَايَنَالُ عَهْدِ الظّٰلِمِيْنَ -

আমার দেয়া কর্তত্ব জালিম লোকেরা পেতে পারে না। (সূরা বাকারা ঃ ১২৪)

যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاۤجَّ اِبْرَاهِمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ -

তুমি কি বিবেচনা করে দেখেছ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ইবরাহীমের সাথে তার রব্ব-এর ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করেছিল শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাকে 'মূল্‌ক' দান করেছেন ? (সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ নিজেই নমরুদ কাফিরকে রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তাহলে দুই ধরনের কথা হল— এর মধ্যে সঙ্গতি সাধন কিভাবে সম্ভব? এর একটা জবাব এই দেয়া হয়েছে যে, হতে পারে, এ আয়াতে 'মূলক' বলতে কাফিরকে ধন-মাল দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ জবাবও দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নবুয়ত দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তা-ই হচ্ছে ইবরাহীম (আ) ও নমরুদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কারণ। কেননা ইবরাহীম (আ) শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী আদেশ-নিষেধের কাজ করতেন।[১]

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মুমিন লোকেরা কাফিরদিগকে মুমিনদের পরিবর্তে— বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক বা নেতা ও কর্তারূপে কখনই গ্রহণ করবে না।

এ আয়াতে কাফিরদিগকে অলী, বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক, কর্তারূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা অলী-ই কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এ দৃষ্টিতে এ কথাটি নিষেধ বাণী, কোন সংবাদ প্রদান নয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদিগকে কাফিরদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেছেন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ আয়াত ঃ

لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا -

মুমিনরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে গোপন সম্পর্কশীল বানাবে না, তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করতে কসুর করবে না। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১৮)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَاۤءَهُمْ اَوْ اَبْنَاۤءَهُمْ -

---

১. এ অর্থও হতে পারে যে, কাফির-ফাসিক ব্যক্তি মুসলিম উম্মত শাসন করার সুযোগ পেলেও তাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকতে পারে না। তার এ ক্ষমতা আল্লাহ্‌র বিশ্ব-ব্যবস্থা পরিচালনার মাশিয়্যাত অনুযায়ী মাত্র। আল্লাহ্‌র রিজা (رضا) অনুযায়ী নয়।

তোমরা এমন জনগোষ্ঠী পাবে না, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে সেই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতামূলক মুকাবিলা করছে, তারা তাদের পিতা-দাদা-চাচা কিংবা তাদের পুত্র, পৌত্র, বংশধর হলেও।
(সূরা মুযাদালা ঃ ২২)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

উপদেশ নসীহত সমাপ্ত হওয়ার পর জালিম লোকদের সাথে একত্রিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসো না। (সূরা আন'আম ঃ ৬৮)

বলেছেন ঃ

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ -

তোমরা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবে না যতক্ষণ তারা অন্য কথায় মশগুল বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকবে। যদি বসো, তাহলে তোমরাও তখন তাদের মতই হয়ে যাবে।
(সূরা নিসা ঃ ১৪০)

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ -

তোমরা জালিম লোকদের প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হবে না, ঝুঁকে পড়বে না। অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা হূদ ঃ ১১৩)

বলেছেন ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا -

যারা আমার দ্বীন থেকে ভিন্নমুখী হয়েছে— ফিরে গেছে এবং বৈষয়িক জীবন ছাড়া আর কিছু তাদের লক্ষভূত নয়, তুমি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (সূরা নজম ঃ ২৯)

বলেছেন ঃ

وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -

এবং মূর্খ— দ্বীন জানে না— এমন লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।
(সূরা 'আরাফ ঃ ১৯৯)

বলেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ -

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাদের উপর রূঢ় ও কঠোর হও।
(সূরা তওবা ঃ ৭৩)

বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاۤءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদিগকে অলী, বন্ধু, পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করবে না। আসলে ওরাই পরস্পরের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক। (সূরা মায়িদা ঃ ৫১)

বলেছেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَابِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ -

আর চোখ তুলেও তাকাবে না সে সব জাকজমকপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রীর দিকে, যা আমরা ওদের মধ্যের বিভিন্ন লোকদের দিয়েছি শুধু তাদের পরীক্ষায় ফেলে যাচাই করার উদ্দেশ্যে।

(সূরা ত্ব-হা ঃ ১৩১)

এসব আয়াতে ইসলাম বিরোধীদের সাথে উঠাবসা ও ঘনিষ্ঠতা করতে নিষেধ করার পর তাদের বিপুল ধন-মাল ও দুনিয়ার জাঁকজঁমকপূর্ণ জীবনধারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বনুল-মুস্তালিক গোত্রের উটগুলো নিয়ে গেলেন। চর্বির কারণে উটগুলোর চানা শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি তা তাঁর কাপড় দিয়ে মুছে ফেলে ছিলেন এবং চলে গেলেন উপরোক্ত আয়াতের কারণে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু-পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুতাই দিতে থাকবে। (সূরা মুমমতাহানা ঃ ১)

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ -

আমি মুশরিকের সাথে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলিমের সাথে নিঃসম্পর্ক ও দায়িত্বমুক্ত।

একথা শুনে প্রশ্ন করা হল, তা কেন হে রাসূল ? বললেন ঃ

لَا تَرَاءَ نَارُهُمَا -

ওদের দুজনাকে আগুন গ্রাস করবে।[১]

---

১. অর্থাৎ মুশরিককে জ্বালাবার আগুন মুসলিমকেও গ্রাস করবে। এ কারণে মুশরিকের পাশের ঘরে মুসলিমের থাকা উচিত নয়। দুজনার বসত ঘর দূরে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সেখানে মুসলিমের অবস্থান করা উচিত নয়, যেখানে মুশরিক আগুন জ্বালাতেন, তা মুসলমানের ঘর পেয়ে যায়। বরং মুসলমান মুসলমানের সাথে বাস করবে। মুশরিকের প্রতিবেশি হওয়া পছন্দনীয় নয়। কেননা ওদের বিশ্বাস নেই, ওদের জন্যে কোন নিরাপত্তাও নেই (النهاية)

অপর হাদীসে রাসূল (স)-এর কথা ঃ

اَنَابَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ اَقَامَا بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ -

মুশরিকদের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করা মুসলমানের কারোর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি না। আমি তার সম্পর্কে দায়িত্বমুক্ত।

এ আয়াত ও হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, কাফিরদের সাথে মুসলমানদের কঠোর ও নির্মম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বন্ধুতা-আন্তরিকতা-ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নয়। এ নীতি ততদিন যতদিন তার দ্বারা জীবন বিনষ্ট হওয়ার বা অঙ্গহানি হওয়ার বা বড় কোন ক্ষতি সাধিত হওয়ার ভয় মনে জাগ্রত থাকবে। সে ভয় না থাকলে তাদের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা বা বসবাস করা জায়েয— আকীদা তাদের শুদ্ধ না হলেও।

আনুগত্য ও আন্তরিক সম্পর্কে দু'টি দিক। একটি— যে লোক এমন লোকের দায়িত্ব নেয় যারা তার কাজে সন্তুষ্ট, তার সাহায্য-সহযোগিতা ও সুপরিচিতি রক্ষা করা। এ জিনিসকে বলা হয় সাহায্য-সহযোগিতার বন্ধুত্ব আনুগত্য। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -

আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদের অলী-বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)

অর্থাৎ তিনিই তাদের সাহায্যের জন্যে দায়িত্বশীল। আর 'মুমিনরা আল্লাহ্র অলী' অর্থ তারা আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত, আল্লাহ্র কাজে এগিয়ে আসা লোক।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

জেনে রাখ, আল্লাহ্র অলী, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারীদের কোন ভয় নেই, নেই দুঃখ-দুশ্চিন্তার কোন কারণ। (সূরা ইউনুস ঃ ৬২)

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً -

তবে তোমরা যদি ওদের ব্যাপারে ভয় পাও এবং কিছুটা আত্মরক্ষা করতে চাও।

এখানে যে ভয়-এর কথা বলা হয়েছে, তা হল প্রাণ বিনষ্ট হওয়ার ভয় বা কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার ভয়। তখন ওদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ করে বাঁচতে চাও ওদের আকীদা গ্রহণ না করেই। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ভিত্তিতেই এ তাৎপর্য বলা হল। ইসলামে বিশেষজ্ঞ জমহুর এ তাৎপর্যই বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মরওয়াজী আমাদের নিকট আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই, আল-জুরজানী, আবদুর রাযযাক, মামার, কাতাদাহ সূত্রে আল্লাহ্র এ কথাটির তাৎপর্যে বলেছেন ঃ

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মুমিন তার দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরকে বন্ধু পৃষ্ঠপোষক বানাতে পারবে না, তা নিষিদ্ধ।

(আর এর পরবর্তী কথার তাৎপর্য হিসেবে বলেছেন) তবে এ দুজনের মধ্যে যদি কোনরূপ নৈকট্য থেকে থাকে, তাহলে তাকে তার সাথে সম্পর্কে পৌছিয়ে দেবে। কাফিরের নৈকট্যের এটাই একমাত্র যোগসূত্র এবং তার সাহায্যে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। আত্মরক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে কুফর প্রকাশ করা জায়েয, একথা এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়।

এর দৃষ্টান্তের আর একটি আয়াত হল ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ -

অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পর হৃদয় যদি ঈমানের উপর অবিচল ও দৃঢ় স্থিতিশীল থাকে, তখন কুফরি প্রকাশ করতে মজবুর ও বাধ্য হলেও এবং তা প্রকাশ করলেও কোন দোষ হবে না, যদি শুধু নিজেকে মৃত্যু ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই তা করা হয়। এরূপ অবস্থায় কুফর প্রকাশ করার সুযোগ আল্লাহ্‌র দেয়া একটা রুখসত মাত্র। তা করা কিন্তু মোটেই ওয়াজিব নয় শরীয়াতের দিক দিয়ে। বরং 'তাকীয়া'র এ নীতি গ্রহণ না করাই ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে উত্তম মর্যাদার কাজ।

কুফর প্রকাশ করতে বাধ্য লোক সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সে যদি তা করতে রাজি না হয় এবং এর ফলে নিহত হয়, তাহলে সে উত্তম মর্যাদাভিষিক্ত হবে সে ব্যক্তির তুলনায় যে তা করেছে। কেননা সে ঈমানের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

হযরত যুবায়র ইবনে আজী (রা)-কে মুশরিকরা পাকড়াও করলে তিনি তাকীয়ার এ পথ অবলম্বন করেননি। ফলে তিনি নিহত ও শহীদ হন। এজন্যে তিনি মুসলমানদের নিকট অধিক মর্যাদাবান বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) এরূপ অবস্থায় পড়ে কুফর প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তখন তোমার মনে অবস্থা কি ছিল? বললেন, ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ ওরা যদি আবার সেরূপ করে তাহলে তুমিও তাই করবে। মোট কথা, শরীয়াতে এরূপ করার অনুমতি— রুখসত— আছে।

বর্ণিত হয়েছে; মুসায়লিমাতাল কায্যাব নবী করীম (স)-এর দুজন সাহাবীকে পাকড়াও করে। তাঁদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল! তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করল, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, এ সাক্ষ্য কি তুমি দাও? বললেন, হ্যাঁ। তখন তাকে ছেড়ে দেয়। পরে অন্য জনকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করে ঃ মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও? বললেন ঃ হ্যাঁ। পরে জিজ্ঞাসা করল ঃ আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তুমি কি তার সাক্ষ্য দাও? তিনি বললেন, আমি বধির। তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। তখন সে তার গর্দার কেটে দেয়, হত্যা করে। এ সংবাদ রাসূলে করীম (স)-কে বললে তিনি বললেন ঃ 'এ নিহত ব্যক্তি নিজের ঈমানী সত্যতা ও প্রত্যয়ের দৃঢ়তা নিয়ে চলে গেছে এবং একটা মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। এ জন্যে তিনি তাকে মুবারকবাদ দিলেন।

আর অপর জন আল্লাহ্‌র দেয়া রুখসত কবুল করেছে। কাজেই তার সম্পর্কে কিছুই বলার নেই।

এ বর্ণনায় প্রমাণিত হল, এরূপ অবস্থায় 'তাকীয়া' করার অনুমতি আছে। তবে তাকীয়া না করা-ই উত্তম। যে যে ব্যাপারে দ্বীন ইসলামে ইয্‌যত বৃদ্ধি পায়, তা করা এবং সে জন্যে নিহত হতেও রাজি হওয়াকে হানাফী ফিকাহবিদগণ উত্তম বলেছেন রুখসতের নীতি গ্রহণের পরিবর্তে। কেননা তাতে ঈমানের পরিপন্থী কাজের আশ্রয় লওয়া হয়। লক্ষণীয়, যে লোক দ্বীনের দুশমনের সঙ্গে জিহাদ করে নিজের জীবন নিঃশেষ করে দিল, সে তো জিহাদ থেকে সরে থাকা ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবেই, এভাবে নিহত হয়ে যারা শহীদ হয়, আল্লাহ্ তাদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তাদের উন্নত অবস্থার কথা বলেছেন। তারা জীবিত, আল্লাহ্‌র নিকট রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে। কুরআনেই বলা হয়েছেঃ দ্বীন ইসলাম প্রচার ও বিজয়ীকরণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ও কুফর প্রচার ও বিজয়ের পথ পরিহার করা অতীব উত্তম কাজ— 'তাকীয়া' নীতি গ্রহণের তুলনায়।

আলোচ্য আয়াত এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াত প্রমাণ করে যে, মুসলমানের উপর কাফিরের কোন ব্যাপারেই কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। কোন মুসলমানের অল্প বয়স্ক পুত্র তার মা'র ইসলাম গ্রহণের দরুন ইয়াতীম-ও হয়, তাহলেও কোন কাফির তার 'অলী' বা অভিভাবক হতে পারবে না, কাজকর্ম ও বিষয়ে দেয়া ও অন্যান্য কোন ব্যাপারে। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যিম্মী একজন মুসলমানের হত্যাপরাধের 'আকিলা' দেবে না, মুসলমানও 'আকিলা' দেবে না যিম্মীর হত্যাপরাধের কারণে। কেননা এটাও অভিভাবকত্বের কাজ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَآلَ اِبْـرَاهِـيْـمَ وَآلَ عِـمْـرَانَ -

ইবনে আব্বাস (রা) ও আল-হাসান থেকে বর্ণিত, আল-ইবরাহীম হচ্ছে সে সব মুমিন যারা তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমানদার। আল-হাসান বলেছেন, আল-ইমরান ঈসা-মসীহ্। কেননা তিনি ইমরান-কন্যা মরিয়মের পুত্র। অবশ্য এ-ও বলা হয়েছে যে, আল-ইমরানই আল ইবরাহীম। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ —ওরা পরস্পরের সন্তান। তাঁরা হচ্ছেন, মূসা ও হারুন (আ)— ইমরানের দুই পুত্র। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, আল-আ-ল ও আহ্‌লি বায়ত একই অর্থবোধক। যেমন কেউ যদি 'অমুকের আল-এর জন্যে অসিয়ত করে, তাহলে তার অর্থ হবে 'অমুকের আহলি বায়ত। দাদার দিক দিয়ে একই বংশের লোকেরা তাতে গণ্য হবে পিতৃবংশের দিক দিয়ে। যেমন বলা হয় ঃ আল-নবী (স) আহলি বায়ত। এ দু'টি কথা একই তাৎপর্য প্রকাশ করে। তাঁরা বলেছেন, 'আল' যার সাথে সম্পর্কিত, সে এর মধ্যে নয়। যেমন আমরা বলি ঃ আল-আব্বাস বা আল-আলী। এর অর্থ আব্বাসের সন্তানগণ, আলীর সন্তানগণ, যারা বংশের দিক দিয়ে পৈতৃক সূত্রে এ দুজনের সাথে সম্পর্কিত। এটাই প্রচলিত ও পরিচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ -

পরস্পরের কাচ্চা-বাচ্চা।

হাসান ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, ওরা দ্বীনের সাহায্য কাজে পরস্পর সহযোগী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ -

মুনাফিকরা গুমরাহীতে একত্রিত ও পরস্পরের সহযোগী। (সূরা তওবা ঃ ৬৭)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ -

মুমিনরা হেদায়েতের পথে একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ, পরস্পরের সহযোগী। (সূরা তওবা ঃ ৭১)

বলেছেন, পরস্পরের বাচ্চা-কাচ্চা অর্থ, বংশধারায় সম্পর্কযুক্ত। কেননা তারা সকলেই আদম সন্তান। পরে নূহ-এর সন্তান, তারপর ইবরাহীমের সন্তান।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا -

হে রব্ব! আমার গর্ভে যা আছে তাকে তোমার জন্যে মানতস্বরূপ পেশ করেছি মুক্ত স্বাধীন অবস্থায়।

শ'বী থেকে বর্ণিত, তিনি উক্ত কথাটি খালিস ইবাদতের জন্যে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। মুজাহিদ বলেছেন ঃ ইবাদতখানার খাদিম বানাবার মানত করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনুল জুরাইর বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত আনুগত্যের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে তাকে মুক্ত রাখার মানত করেছিলেন।

'মুহর্‌রব' বা তাহরীর শব্দটি দুটি দিককে শামিল করে। একটি মুক্ত ও আযাদ করা। আর দ্বিতীয়টি ফাসাদ উত্থান-পতন-অস্থিরতা থেকে তাকে খালাস করার কথা বলেছিলেন। 'আমি তোমার জন্যে আমার গর্ভস্থ সন্তানকে মুক্ত ও স্বাধীন করে ইবাদতের জন্যে খালেস করে ছেড়ে দেয়ার' কথা বলা হয়েছে। এ ভাবেই তাকে লালন-পালন ও বর্ধিতকরণের ওয়াদা করেছেন। তাকে কেবল সেই কাজে মশগুল করা ও অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না করার কথা বলেছেন। তাকে যখন ইবাদতখানার খাদিম বানাতে ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল করার কথা বলেছেন। মূলত এসব কথা একই তাৎপর্য প্রকাশ করে। 'আমি মানত করেছি, বলে তিনি তাঁর দিক থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন ঃ

فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অতএব তুমি তা আমার নিকট থেকে কবুল কর। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

আমাদের শরীয়াতে এরূপ মানত ও উৎসর্গকরণ সহীহ্। পিতা মানত করে তার ছোট পুত্র সন্তানকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারে। ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া তাকে অন্য কোন কাজে লাগাবে না। তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে, ইসলামী শরীয়াত ও দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা দেবে। এ ধরনের মানতে কোন দোষ নেই। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ সম্ভব।

'মানত করেছি তোমার জন্য' কথাটি নিজের দিক থেকে উপস্থাপন। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে লোক এরূপ মানত করবে, সে মানত পুরা করা তার অবশ্য কর্তব্য। এ-ও বোঝা যায় যে, মানত আসন্ন বিপদের সাথে সম্পর্কিত এবং ভবিষ্যতে করণীয়। কেননা একথা জানা যে, ইমরান-স্ত্রী সন্তান উৎসর্গ করার যে মানত করেছিলেন তা সন্তান প্রসবের পর পুরা হতে পারে, যা একান্তই ভবিষ্যতের ব্যাপার। সময় পূর্ণ হলেই মানত অনুযায়ী সন্তানকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যে খালেস করে দেয়া সম্ভব। এ থেকে জানা যায় যে, অজ্ঞাত জিনিসের উপরও মানত করা যেতে পারে। কেননা আলোচ্য মানতটি গর্ভস্থ সন্তান— পুরুষ কি মেয়ে তা না জেনেই করা হয়েছিল। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের উপর তার শিক্ষা-দীক্ষার, তার সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণের উপর মায়ের-ও এক ধরনের অভিভাবকত্ব আছে। তা না থাকলে ইমরানের স্ত্রীর পক্ষে এ মানত করা সম্ভব হতো না, যা তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের বিষয়ে করেছিলেন। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মার অধিকার আছে তার সন্তানের নাম নির্দিষ্ট করার। মা নাম ঠিক করলে তা অবশ্যই সহীহ্ হবে— অবশ্য পিতা যদি সে নাম ঠিক করে। কেননা আলোচ্য ঘটনায় দেখা যায়, ইমরান-স্ত্রী বলেছেন ঃ

وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ -

আমি তার নাম রাখলাম মরিয়ম।

আল্লাহ্ তাঁর রাখা এ নামটি মেনে নিয়েছিলেন এবং তা বহাল রেখেছিলেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ -

তার রব্ব তা খুবই সুন্দরভাবে কবুল করলেন।

আল্লাহ্ই ভালো জানেন— ইমরান স্ত্রী তাঁর সন্তানকে বায়তুল মাকদিসে ইবাদতের জন্যে খালিস করে দেয়ার যে মানত করেছিলেন, তা আল্লাহ খুব সুন্দরভাবে কবুল করেছিলেন। অবশ্য এর পূর্বে কোন মেয়েকে এ কাজের জন্যে কখনই গ্রহণ করা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا -

যাকারিয়া তার (মরিয়মের) দায়িত্ব গ্রহণ করল।

অর্থাৎ মরিয়মের সাহায্য-সহযোগিতার দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। নবী করীম (স) থেকেও এ ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন ঃ

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِىْ الْجَنَّةِ كَهَا تَيْنِ -

আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবকত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এ রকম হব।

এই বলে তিনি পাশাপাশি দুটি অঙ্গুলি দেখালেন। এর অর্থ ঃ যে লোক ইয়াতীমের সাহায্য সহযোগিতায় দায়িত্বশীল হবে, সে জান্নাতে পাশাপাশি স্থান ও মর্যাদা পাবে। শব্দটি كَفَّلَ পড়া

হলে তার অর্থ হবে, আল্লাহ্ই তাঁকে এ দায়িত্ব দিলেন। তিনিই মরিয়মের দেখাশুনা ও প্রয়োজনাদি পূরণ করতে নির্দেশ দিলেন। كَفَلَ ও كَفَّلَ এ দুভাবেই শব্দটি পড়া সহীহ্। অর্থের দিক দিয়ে কথাটি দাঁড়াবে; তিনি নিজেই এ অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে এর দায়িত্বশীল বানালেন। আল্লাহ্র কথা ঃ

قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً -

বললেন ঃ হে রব্ব! তুমি তোমার নিকট থেকে আমার জন্যে একটি পবিত্র বাচ্চা দান কর।

এ আয়াতে 'হেবা' শব্দটির অর্থ ঃ 'মূল্য না নিয়ে কোন জিনিসের মালিক বানানো'। সাধারণ কথায় বলা হয় ঃ ওরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে দেয়া নেয়া করল। পুত্র দান কথাটি বোঝাবার জন্যে কালামে 'হেবা' শব্দটি পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও মূলত এটা 'হেবার' কোন ব্যাপার ছিল না। কেননা এখানে তাঁকে পুত্রের মালিক বানিয়ে দেয়ার দো'আ করা হয়নি। সন্তান জন্মিলে সে হয় মুক্ত, স্বাধীন। কারোর মালিকানা সম্পদে পরিণত হয় না। কিন্তু এখানে তিনি চাইলেন যে, তাঁকে একটি সন্তান খালেসভাবে দেয়া হোক, যাকে তিনি আল্লাহ্র ইবাদতে তাঁর নবুয়তের ও ইলমের উত্তরাধিকার হিসেবে উৎসর্গ করবেন। এ কারণে তিনি 'হেবা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ জিহাদে আত্মদানকে আল্লাহ্র নিকট নিজকে বিক্রয় করা বলেছেন। বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَا لَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন তাদেরকে জান্নাত দেয়ার বিনিময়ে। (সূরা তওবা ঃ ১১১)

মুমিনদের জিহাদ করার আগে ও পরে আল্লাহই তাদের জান-মাল সবকিছুরই মালিক। তা সত্ত্বেও তিনি জিহাদে তাদের আত্মদানকে ক্রয় করা বলেছেন। তার বিনিময়ে তাদেরকে বিপুল সওয়াব দানের ওয়াদা করেছেন বলে। লোকেরা বলে ঃ অমুকের অপরাধটা আমাকে দান কর। এখানেও কোন জিনিসের মালিক বানিয়ে দেয়ার ব্যাপার নেই। ও কথার অর্থ হচ্ছে, অপরাধের শাস্তিটা বাতিল করা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

সেই সন্তান হবে সাইয়্যেদ— সরদার, নারীর বিমুখ ও নেককারদের মধ্যে থেকে নবী। ....

'সাইয়্যেদ' শব্দের অর্থ সরদার বা শ্রেষ্ঠ। বোঝা যায়, এ শব্দটি আল্লাহ্ ছাড়া মানুষ সম্পর্কেও ব্যবহার করা যায়, কেননা আল্লাহ্ নিজেই হযরত ইয়াহইয়া (আ) সম্পর্কে এ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। অথচ 'সাইয়্যেদ' তো তাকেই বলে যার আনুগত্য করা কর্তব্য। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, সাহাবী হযরত সাদ ইবনে মুয়ায (রা) যখন তাঁর ও বনী কুরায়শ গোত্রের মধ্যে সালিসী করার জন্যে এসেছিলেন, তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

—৩/৫

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ -

তোমরা তোমাদের সাইয়্যেদ বা নেতার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও।

নবী করীম (স) হযরত হাসান (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ

اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ -

আমার পৌত্র-দৌহিত্র সাইয়্যেদ।

বনু সালমা গোত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের সাইয়্যেদ— নেতা— কে, হে বনু সালমা? জবাবে তারা বলেছিল, হুর ইবনে কায়স আমাদের সাইয়্যেদ। তিনি বলেন, না, বরং তোমাদের সাইয়্যেদ সাদা-কোকড়া চুল বিশিষ্ট আমর ইবনে জুমূহ। এসব থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যার আনুগত্য করা হয়— করা বাধ্যতামূলক হয়, সে-ই সাইয়্যেদ বা নেতা। যে শুধু মালিক বা বাদশাহ, সে-ই সাইয়্যেদ নয়। কেননা তা যদি হতো, তাহলে 'গরুর সাইয়্যেদ' বা 'কাপড়ের' সাইয়্যেদ, বলা হতো, কিন্তু তা বলা হয় না, বলা ঠিকও নয়। যদি বান্দার 'সাইয়্যেদ' বলা হয়।

এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, বনু আমের গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। তারা এসে বলল ঃ 'আপনি আমাদের 'সাইয়্যেদ' এবং আপনি আমাদের প্রতিদানশীল। জবাবে নবী করীম (স) বললেন ঃ সাইয়্যেদ তো মহান আল্লাহ। তোমরা তোমাদের ভাষায় ওধরনে কথা বল, শয়তান যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে অথবা নবী করীম (স) সমস্ত বনী আদমের সর্বোত্তম সাইয়্যেদ ছিলেন। কিন্তু ওদেরকে দেখলেন, ওরা কৃত্রিমতা করছে, সেই কারণে তিনি উক্তরূপ কথা বলেছিলেন। এবং ওদের কথাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর এ পর্যায়ের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

اِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَيَّ الثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ -

যারা দ্রুত আবোল-তাবোল কথা বলে, মুখের মধ্যে রেখে কথা বলে, যা ঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না, কৃত্রিমভাবে বাড়াবাড়ি করে কথা বলে, তারা আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি।

এ কারণে বনু আমরের লোকদেরকে ঐরূপ বলেছিলেন। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা মুনাফিককে সাইয়্যেদ বলবে না। কেননা সে যদি সাইয়্যেদ হয়, তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি মুনাফিককে সাইয়্যেদ বলতে এ কারণে নিষেধ করেছেন। কেননা মুনাফিক নেতা হলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا -

হে আমাদের রব্ব! আমরা তো আমাদের সরদার নেতাদের ও আমাদের মধ্যে বড় লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছি ....। (সূরা আহযাব ঃ ৬৭)

এ আয়াতে গুমরাহ লোকদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা সরদার বা সাইয়্যেদ বলেছেন। তা কি করে বলা হল ?

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ তাদেরকে সাইয়্যেদ বলেছেন এজন্যে যে, ওরা নিজেরাই গুমরাহ্কারী লোকদিগকে উচ্চ মর্যাদায় বসিয়েছিল এবং কর্তব্য হিসেবে তাদের আনুগত্য করেছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নেতা— সরদার হওয়ার ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য ছিল না, তার অধিকারীও ছিল না। অথচ ওদের ধারণায় তারাই ছিল ওদের সরদার— নেতা। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ -

ওরা যাদেরকে ইলাহ্ বানিয়েছিল, তারা ওদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। (সূরা হুদ ঃ ১০১)

এ আয়াতে ওদের বানানো ইলাহ্কে আল্লাহ্-ও ইলাহ্ বলেছেন, যদিও ওরা প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্ নয়। আল্লাহ্ ওদের বলা কথাকেই হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। তিনি নিজে ওদেরকে 'ইলাহ' বলেন নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا -

বলল ঃ হে রব্ব! তুমি আমার জন্যে একটি চিহ্ন ঠিক করে দাও। বললেন, তোমার চিহ্ন হল, তুমি লোকদের সাথে তিন দিন পর্যন্ত কেবল ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলবে।

বলা হয়, হযরত যাকারিয়া তার স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হওয়ার একটা আলামত চেয়েছিলেন, যেন সেই আলামত দেখে তিনি আনন্দ ও সুখ লাভ করতে পারেন। তখন তাঁর মুখের উপর বন্ধন চাপিয়ে দেন। তিনি লোকদের সাথে কেবল ইশারায় কথা বলতে পারতেন। হাসান, রবী ইবনে আনাস ও কাতাদাহ থেকে এ বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিতে কথা বলার মিয়াদ স্বরূপ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ তিন দিনের উল্লেখ আছে। সূরা মরিয়মের আয়াতে এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গেও ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا সমান তিনটি রাতির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি আয়াতে দিনের সংখ্যা বলা হয়েছে। আর অপর আয়াতে রাতের সংখ্যা বলা হয়েছে। এতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুটি সংখ্যার কোন একটি— সমস্ত থেকে— ব্যবহারের সময় তার পরিমাণটা শেষ সময়ে বোঝা যায়। অর্থাৎ শেষ সময়টিও তার মধ্যে মনে করতে হবে। এ কারণে তিনদিন বললে তার সাথে তিন রাতও বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে তিন রাত বললে তার সাথে তিন দিন-ও শামিল করতে হবে। লক্ষণীয়, এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার ইচ্ছা হলে প্রত্যেকটিকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا -

সাত রাত ও আট দিন লাগাতার। (সূরা হাক্কাহ ঃ ৭)

যদি শুধু প্রথম সংখ্যাটাই বলা হতো, তা থেকে তার শেষ পর্যন্ত সাত দিনও বুঝতেই হতো।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ -

ফেরেশতা যখন বলল ঃ হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন। আর সমকালীন বিশ্ব নারীকুলের উপর তোমাকে অধিক মর্যাদাবান বানিয়েছেন।

اصطفك। অর্থ, তাঁর সময়-কালের নারীকুলের উপর তাঁকে অধিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। এ কথা হাসান ও ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে ছাড়া এর অর্থ বলেছেন, বিশ্ব নারীকুলের উপর তাঁকে অধিক মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন ঈসা মসীহ্ (আ)-এর তাঁর গর্ভে জন্ম হওয়ার কারণে। হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন ঃ তোমাকে পবিত্র করেছেন ঈমান অস্বীকার করার গুনাহ থেকে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এটা সমর্থনযোগ্য। কাফিরকে ময়লা অপবিত্র বলে অভিহিত করা যেমন সমর্থনযোগ্য তাদের কুফর-এর কারণে। মুশরিকদেরও নাপাক বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ -

মুশরিকরা না-পাক, ময়লা। (সূরা তওবা ঃ ২৮)

কুফর-এর ময়লা-ই বোঝানো হয়েছে। 'তোমাকে পবিত্র করেছেন' কথাটিতেও সেই অর্থ হবে; কুফর-এর ময়লা থেকে পবিত্র করে ঈমানের পবিত্রতায় ভূষিত করেছেন।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ -

মুমিনরা ময়লা বা অপবিত্র নয়।

অর্থাৎ কুফরির ময়লা তাদের মধ্যে নেই। এ আয়াতটিতেও এ কথা-ই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

হে ঘরের লোকজন! আল্লাহ্ তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিতে এবং তোমাদের সার্থকভাবে পবিত্র করতে চান। (আল-আহযাব ঃ ৩৩)

এ আয়াতে যে পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর পবিত্রতা। এ-ও বলা হয়েছে যে, উক্ত কথার অর্থ হল, তোমাকে হায়য-নিফাস ইত্যাদির সমস্ত মলিনতা থেকে পবিত্র করেছেন। ফেরেশতারা মরিয়মকে পবিত্র করা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি তো নবী ছিলেন না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ -

হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্বে কেবলমাত্র পুরুষদেরকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমরা অহী নাযিল করতাম। (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

একজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ও গোটা ব্যাপারই যাকারিয়া নবী (আ)-এর মুজিযা ছিল। অন্যরা বলেছেন ঃ হযরত মসীহ্ (আ)-এর নবুয়ত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রমাণ করা ও মেঘের ছায়া ফেলার জন্যে এরূপ কথা বলা হয়েছে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নবুয়ত দানের পূর্বের ব্যাপার নিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَامَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكَ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ -

হে মরিয়ম। তোমার রব্ব-এর জন্যে বিনয়-অবনত হও, সিজদা কর এবং রুকূকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকূ কর।

সাঈদ বলেছেন, এর অর্থ তোমার রব্ব-এর জন্যে খালেস— একনিষ্ঠ হও। কাতাদাহ বলেছেন, এ কথার অর্থ ঃ ইবাদতকে চিরস্থায়ী ও সার্বক্ষণিক বানাও। মুজাহিদ বলেছেন, নামাযে দাঁড়ানোকে দীর্ঘ কর। قُنُوْتُ শব্দের অর্থ, কোন কাজে স্থায়ী হওয়া। দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়ানোর কথা এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। এর পরে 'সিজদা কর রুকূ কর' কথা থেকেও তা-ই বোঝা যায়। মোটামুটি এ আয়াতে দাঁড়াতে, রুকূ করতে ও সিজদা দিতে হুকুম করা হয়েছে। এ কয়টি নামাযের রুকন। রাসূল (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ -

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যে নামায পড়া হয়, তা-ই উত্তম নামায।

এখানে যে সিজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা পড়লেই সিজদা করা জরুরী নয়। কুরআনী জ্ঞানের অধিকারী সকলেরই এ মত। অন্যান্য কয়েকটি আয়াতে 'সিজদা' শব্দের উল্লেখ থাকায় সেখানে অবশ্য পাঠকারীকে সিজদা করতে হবে। এখানে তা করতে হবে না এজন্য যে, এখানে শুধু সিজদার কথাই বলা হয়নি, সেই কিয়াম ও রুকূর কথাও বলা হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশ করা হয়েছে বোঝা গেল, শুধু সিজদা করতে বলা হয়নি। এ আয়াতে যে, (واو) 'ওয়াও' অক্ষরটি আছে, তা পরম্পরা বোঝাবার জন্যে নয়, তাও বোঝা গেল, কেননা রুকূ তো সিজদার আগে করতে হয়। অথচ এ আয়াতে সিজদার পরে উল্লিখিত হয়েছে। সিজদার কথা আগে এসেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلاَ مَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ -

মরিয়মের অভিভাবককে হবে তার সিদ্ধান্তের জন্যে লোকেরা যখন তাদের কলম নিক্ষেপ করেছিল, তখন— হে নবী তুমি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হাসান ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী আবদুর রাযযাক— মামার— কাতাদাহ সূত্রে আল্লাহ্র কথা 'যখন তাদের

কলম নিক্ষেপ করেছিল' এ পর্যায়ে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মরিয়মের অভিভাবক কে হবে তা ঠিক করার জন্যে লোকেরা দাবি উত্থাপন করেছিল। তখন যাকারিয়া (আ) 'কুরয়া' ফেলেছিলেন। বলা হয়, এখানে যে কলমের কথা বলা হয়েছে, মূলত তা তীর, যা দিয়ে বাজি ধরা হয়। তারা তা প্রবহমান পানির উপর ফেলেছিল। তাতে যাকারিয়া (আ)-এর 'কলম' সর্বাগ্রে পৌছে গিয়েছিল এবং অন্যদের কলম পিছনে পড়ে গিয়েছিল। এটা ছিল হযরত যাকারিয়ার মুজিযা। রুবাই ইবনে আনাস থেকে এ বর্ণনাটি পাওয়া গেছে। এ বাখ্যার দৃষ্টিতে বলা যায়, মরিয়মের অভিভাবক হওয়ার ইচ্ছায় সকলেই বাজি ধরেছিল।

অনেকে বলেছেন, সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, মানুষের জীবন যাপন তখন খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এ কারণে মরিয়মের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্ন নিয়ে লোকেরা পরস্পরের প্রতিরোধে লেগে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যাকারিয়া (আ)-ই উত্তমভাবে তাঁর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর কালামে যাকারিয়া (আ)-কে এ দায়িত্ব দেয়ার কথা বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজেও এ দায়িত্ব পাওয়ার প্রার্থী ছিলেন। অনেকে এ ঘটনাকে দলীল বানিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, ক্রিতদাস রোগাক্রান্ত হলে ও তার পরে মরে গেলে তার মনিব মালিকদের সে ছাড়া আর কোন সম্পদ থাকা না থাকা অবস্থায় তারা 'কুরয়া' ফেলতে পারে, তা করা জায়েয। কিন্তু আসলে এটা দাসমুক্তির কোন ব্যাপার নয়। কেননা মালিকদের একজনের দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হওয়া অনুরূপ ঘটনার জায়েয হওয়াই প্রমাণ করে। যে মুক্ত স্বাধীন তাকে দাস বানাতে পারস্পরিক রাজি হওয়া জায়েয নেই। ক্রীতদাস মরে গেলে সে স্বতঃই মুক্ত হয়ে যায়। তা সকল ক্ষেত্রেই কার্যকর। তাই মরে যাওয়া ক্রীতদাসের মালিকানা 'কুরয়া'র মাধ্যমে হস্তান্তর করা জায়েয নয়। যে স্বাধীন মুক্ত হয়ে গেছে, তার সেই আযাদী হস্তান্তরিত করাও জায়েয নয়।

কলম নিক্ষেপ করা বন্টনের ব্যাপারে 'কুরয়া' করার সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন। প্রতিপক্ষকে বিচারকের নিকট পেশ করাতেও তাই। এ ব্যাপারটি রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের কথার দৃষ্টান্ত। তিনি যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁর বেগমগণের মধ্যে কে সঙ্গে যাবেন, তা ঠিক করার জন্য 'কুরয়া' ব্যবহার করতেন। 'কুরয়ার' ফলে রাজী হওয়া কুরয়া ছাড়াই জায়েয। মরিয়মের (আ) অভিভাবকত্বের ব্যাপারটিও সেই রূপ ছিল। যার মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তাকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে পারস্পরিক রাজী হওয়া জায়েয নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ -

ফেরেশতা যখন বললে, হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ্।

'সুসংবাদ' হচ্ছে গুণগত কোন খবর। মূলত যে ভালো ও খুশীর সংবাদ জানলে মুখমণ্ডলে খুশীর আলো ফুটে উঠে, তা-ই হচ্ছে 'বাশারত'। এ সুসংবাদ যদিও ফেরেশতা-ই শোনাল; কিন্তু বলল যে, আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন। কেননা মূলত আল্লাহ্ই হচ্ছেন সুসংবাদদাতা, যদিও তা উচ্চারিত হয়েছে ফেরেশতা কর্তৃক।

হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এ কথা বোঝাবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তা হলো ঃ তুমি যদি অমুক ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ অমুক ব্যক্তিকে দাও, তা হলে আমার দাস মুক্ত। এরপর যদি সে আসে এবং তার আসার খবর দেয়ার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দেয়, প্রেরিত ব্যক্তি গিয়ে তাকে বলে ঃ অমুকে তোমাকে বলছে, সে এসেছে। তা হলে তার কসম ভঙ্গ করার অপরাধ হবে। কেননা প্রেরিত ব্যক্তি সুসংবাদদাতা। যে সুসংবাদের দায়িত্ব নিয়েছিল সে-ই আনন্দ সৃষ্টি করেছে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, প্রথম খবরদাতাই সুসংবাদদাতা, দ্বিতীয় সংবাদদাতা সুসংবাদদাতা নয়। কেননা তার দেয়া খবরে আনন্দ হয়নি। 'বাশারত' শব্দটি বলে অনেক ক্ষেত্রে শুধু খবর অর্থ করা হয়। যেমন কুরআনের কথা ঃ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ -

ওদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের খবর দাও। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২১)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ এ কথাটুকুর তিনটি অর্থ হতে পারে। একটি, জন্মদাতা—পিতা-ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।

যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

তাকে মাটির উপাদানে সৃষ্টি করেছেন (মৌলিকভাবে)। পরে তাকে বললেন ঃ হও, অমনি হতে থাকল।

এ কারণে পিতা ছাড়া 'হও' শব্দ বলার পর তিনি হলেন বলে তাঁকে কালেমা— 'কথা বা আদেশ' অভিহিত করেছেন। এটা পরোক্ষভাবে বলা কথা। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ -

তিনি তাঁর কালেমা যা তিনি মরিয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। (সূরা নিসা ঃ ১৭১)

দ্বিতীয় দিক হল, প্রাচীন আসমানী কিতাবে আগেই তাঁর আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছিল। এই দৃষ্টিতে তাঁকে 'কালেমা' বলা হয়েছে। আর তৃতীয় দিক হল, আল্লাহ তাঁর দ্বারা লোকদের হেদায়েত দান করিয়েছেন, যেমন করে তাঁর কালামের দ্বারা মানুষকে হেদায়েত করেন ঃ এ কারণে তাঁকে কালাম বা 'বাণী' বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ -

অতএব আপনি বলুন, তোমরা আস, আমরা ডাকব আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের মেয়েলোকদেরকে এবং তোমাদের মেয়েলোকদেরকে। আর আমরা আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদেরকে।

এর পূর্বে খ্রীস্টানদের কথা ঃ 'মুসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র'-এর প্রতিবাদে একের পর এক যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এটা ছিল নাজরান থেকে আগত খ্রীস্টান-প্রতিনিধি দলের কথা। ওদের নেতা এবং অনুসারী তার মধ্যে ছিল। দুজনই নবী করীম (স)-কে বলল, কোন পুরুষের ঔরস ছাড়া সন্তান জন্ম হতে পারে একথা কি বিশ্বাস করেন ? এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত। ইবনে আব্বাস (রা) হাসান ও কাতাদাহ থেকে উক্ত কথা বর্ণিত হয়েছে।

এর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ -

এবং আমি এমন কিছু কিছু জিনিস হালাল ঘোষণা করাব, যা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে।

শেষের দিকে রয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব। অতএব তোমরা সকলেই তাঁরই বান্দা হও— ইবাদত কর।

ইনজীলেও একথা উদ্ধৃত রয়েছে। কেননা তাতে রয়েছে ঃ 'আমি আমার পিতার ও তোমাদের পিতার নিকট যাইতেছি, তিনি আমার ইলাহ্। তোমাদেরও ইলাহ। ইনজীল যে ভাষায় লিখিত, তাতে 'পিতা' বলা হয় সাইয়্যেদ (সরদার বা নেতা)-কে। আমরাও দেখছি, আমার পিতা ও তোমাদের পিতা বলা হয়েছে। বোঝা যায়, এখানে সেই পিতৃত্ব বোঝায় না। যার ঔরসে পুত্র সন্তান জন্মে। প্রমাণ যখন তাদের বিপরীতে গেল, যা তারা জানে, তারা তা স্বীকার করে নেয়। তিনি আদমের ন্যায় কোন পিতা ছাড়াই যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে তাদের সব শোবাহ সন্দেহ ভিত্তিহীন প্রমাণ করা হয়। এ সময় তাদেরকে মুবাহিলা করার আহ্বান জানন্দানো হয় আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ -

তোমার প্রকৃত ইলম অর্জিত হওয়ার পর এ বিষয়ে যদি তোমার সাথে ঝাগড়া করতে আসে, তাহলে তুমি বল, ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের ঘরের সব লোক একত্রিত হয়ে মুবাহিলা করি ....

নবী করীম (স) হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর হাত ধরে উপস্থিত হলেন এবং যে খ্রীস্টানরা তাঁর সাথে তর্ক করেছিল, তাদেরকে মুবাহিলা করার জন্যে ডাকলেন। কিন্তু তারা পশ্চাদপসরণ করে। তারা পরস্পর বলাবলি করে, তোমরা যদি তাঁর সাথে মুবাহিলা কর, তাহলে উপত্যকা তোমাদের জন্যে আগুনভর্তি হয়ে উঠবে। ফলে খ্রীস্টান ও খৃস্টান মত কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে খতম হয়ে যাবে।

খ্রীস্টানরা যে মনে করে, হযরত ঈসা (আ) হয় ইলাহ, না হয় ইলাহর পুত্র— উপরোক্ত আয়াতে তা খণ্ডন ও অস্বীকার করা হয়েছে। সেই সাথে তা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণকারীও। কেননা তিনি প্রকৃতই নবী, একথা তারা যদি বুঝতে না-ই পারত, তাহলে 'মুবাহিলা' থেকে কোন্ জিনিস তাদেরকে বিরত রাখল ? তারা নিজেরাই পশ্চাদপসরণ করে গেল এবং মুবাহিলা করা থেকে বিরত থাকল, এ থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, তারা নিজেরাই মুজিযার দলীলসমূহের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহেই বুঝতে পেরেছির যে, তিনি প্রকৃতই সত্য নবী। পূর্ববর্তী নবীগণের পেশ করা কিতাবাদিতে যে তাঁর প্রশংসা ও গুণ-পরিচিতি উল্লিখত ছিল, তা তো তাদের পড়া ছিলই।

এ কাহিনী থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা) রাসূলে করীম (স)-এর বংশধর ছিলেন। কেননা রাসূল (স) যখন 'মুবাহিলা' করার জন্যে যাওয়ার সময় তাঁদের দুজনার হাত ধরে রওয়ানা হলেন ও বললেন ঃ আস, আমরা আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের ডাকি, অথচ এ দুজন ছাড়া তাঁর বংশধারায় পুত্র তো আর কেউ ছিল না।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত হাসান (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

إِنَّ ابْنِىْ هٰـذَا سَيِّدٌ –

নিশ্চয়ই আমার (বংশের) এ পুত্রটি 'সাইয়্যেদ' (হবে)।

তাঁদের দুই ভাইয়ের কোন একজন শিশু অবস্থায় তাঁর গাত্রে প্রস্রাব করেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ لَا تُزْرِمُوا ابْنِىْ-তোমরা আমার এ পুত্রকে লজ্জা দিও না, মন্দ ভেবো না। তাঁরা দুই ভাই রাসূল (স)-এর বাচ্চা-কাচ্চাদের মধ্যে শামিল, যেমন ঈসা (আ)-কে আল্লাহ নিজেই ইবরাহীম (আ)-এর বাচ্চা-কাচ্চা— বংশধর বলেছেন। বলেছেন ঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ (আন আম ঃ ৮৪) ইবরাহীমের বংশধর থেকেই দাউদ ও সুলায়মান এবং পরবর্তীতে وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى (আন'আমঃ ৮৫) এবং যাকারিয়া ও ঈসা। হযরত ঈসা (আ)-কে ইবরাহীম (আ)-এর বংশের পুত্র বলা হয়েছে তার মার দিক দিয়ে। কেননা তাঁর পিতা তো কেউ নেই।

অনেক আলিম এ মত দিয়েছেন, নবী করীম (স) দুই ভাইকে নিজের পুত্র বলেছেন, এটা বিশেষ তাৎপর্যবহ। এদের দুজন ছাড়া আর কারোর সম্পর্কে তিনি এরূপ বলেন নি। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা এঁদের দুজনকে আমার পুত্র, বিশেষ অর্থে বলেছেন বলে প্রমাণ করে। তাই একথা অন্য কারোর জন্যে বলা সহীহ হবে না। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ সব কার্যকারণ ও বংশীয় সম্পর্ক কিয়ামতের দিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু কেবলমাত্র আমার কার্যকারণ ও বংশীয় সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকবে।

ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ কেউ যদি অপর কারোর সন্তানের নামে কিছু অসিয়ত করে, যদিও তার নিজ ঔরসজাত কোন সন্তান না থাকে, থাকে তার পুত্র ও কন্যার সন্তান, তাহলে সে অসিয়ত পুত্রের সন্তানের জন্যে কার্যকর হবে, কন্যার সন্তানের জন্যে হবে না। হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ কন্যার সন্তানও সে অসিয়তের আওতার মধ্যে পড়বে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র কথা ও নবী করীম (স)-এর এ

—৩/৬

পর্যায়ের কথা কেবলমাত্র হাসান ও হুসায়ন (র) সম্পর্কিত হতে পারে, পুত্র নামে অভিহিত হতে পারেন; অন্য কোন লোক-ই নয়। কেননা সাহাবীর কথাও এ পর্যায়ে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষেরা নিজেদের পিতৃপুরুষের সাথেই সম্পর্ক দেখায়, নিজেদের গোত্র ও জাতির নামে পরিচয় প্রকাশ করে, মাতার পূর্বপুরুষের সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করে না। হাশিমী বংশের কোন লোক যদি রোমান বা হাবশী কন্যার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে সে নিজেকে হাশিমী বলে পরিচয় দেবে। কেননা সে সন্তানের পিতা হাশিমী বংশের লোক। তার মার দিক দিয়ে কোন পরিচয় সাধারণত দেবে না। আরব কবিও তাই বলেছেন ঃ

بَنُونَا بَنُو اَبْنَا ئِنَا وَ بَنَاتِنَا - بَنُو هُنَّ اَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْاَبَاعِدِ -

আমাদের পুত্র, ও আমাদের পুত্র ও আমাদের কন্যারা আমাদের, তাদের বংশের পুত্ররা দূরবর্তী ব্যক্তিদের পুত্র।

এই প্রেক্ষিতেই বলতে হয়, হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর নবী করীম (স)-এর পুত্র হিসেবে পরিচয় দান শুধু তাঁদের বেলাতেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। এরূপ পরিচয়দানের আর কেউ-ই শামিল নয়। এ দুইজন বাদে অন্যদের সম্পর্কে লোকদের কথোপকথন থেকে তা-ই জানা যায়, বোঝা যায় বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্যভাবে। কেননা অন্য সব লোকই পিতা ও পিতার পূর্ব বংশের সাথে সম্পর্ক দেখায়, মার পৈতৃক বংশের সাথে সম্পর্কের পরিচয় দেয় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ -

বল ঃ হে আহ্‌লি কিতাব লোকেরা! তোমরা এমন একটি বাণীর দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর দাসত্ব স্বীকার করব না। .....

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ এর অর্থ আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন— ন্যায়পর-নিরপেক্ষ বাণী, তা তোমাদের ও আমাদের সকলের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ, তোমরা-আমরা অভিন্ন হয়ে যাই যদি আমরা তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা হই। আয়াতের পরবর্তী অংশ ঃ

اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বান্দা হব না, তাঁর সাথে কোন জিনিস শরীক মানব না এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাদের কতক অন্য কতক লোককে রব্ব বানিয়ে নেব না।

এ গোটা কথাটিই সেই বাণী। এর সত্যতা পুরোপুরি বিবেকসম্মত, যুক্তিসঙ্গত। কেননা সব মানুষই তো আল্লাহ্‌র বান্দা, দাসানুদাস। তারা পরস্পরের দাসত্বের অধিকারী হতে পারে না। তাদের কোন লোক অপর কোন ব্যক্তির অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করতে বা মেনে নিতে পারে না। তবে যে অধীনতা ও আনুগত্যে ফলত আল্লাহ্‌র অধীনতা ও আনুগত্য হবে, তা অবশ্যই করা যাবে। আল্লাহ্‌ তাঁর নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ নিজেই দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও সে

আনুগত্যের জন্যে কাজটির معروف বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়াত উভয় দিক দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত ও কল্যাণময় হওয়ার শর্ত তিনিই আরোপ করেছেন। অথচ আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, নবী কখনই معروف -এর বিপরীত কাজের আদেশ দেবেন না। নবীর আনুগত্যের জন্যে এরূপ শর্ত আরোপের কারণ হল, অন্য কোন লোক-ই যেন বিনা শর্তে নিজের আদেশ-নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করতে সাহস না পায়, তার সুযোগ গ্রহণ করার দুঃসাহস না করে। মানুষ যেন মানুষকে কেবল আল্লাহ্র আনুগত্যের ভিত্তিতেই তার আনুগত্য করতে বলে ও বাধ্য করে। লোকদের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ পর্যায়ে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ -

তারা মারূফ কাজে তোমার নাফরমানী বা অনানুগত্য করবে না, এর উপর তুমি তাদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ কর। (সূরা মুমতাহানা ঃ ১২)

মারূপ কাজে রাসূল (স)-এর অনানুগত্য পরিহার করার শর্ত এ আয়াতে আরোপিত হয়েছে। এ কথায় এ বিষয়ে তাগিদ ধ্বনিত হয়েছে যে, তারা যেন কাউকেই আল্লাহ্র আদেশ পালন ছাড়া অন্য কিছুতে আনুগত্য করতে বাধ্য না করে। এমন আনুগত্যই লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক, যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ভিত্তিক হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَايَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ কোন জিনিস হালালকরণে ও হারামকরণে অনুসরণ করবে শুধু মাত্র তাতে, যা আল্লাহ নিজে হালাল বা হারাম করেছেন।

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ আয়াতটি ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ -

ওরা ওদের বুদ্ধিমান লোক ও পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তওবা ঃ ৩১)

আবদুস সালাম ইবনে হারব আতীক ইবনে আইয়ূন— মুসয়িব ইবনে সাদ আদী ইবনে হাতিম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আদী ইবনে হাতিম বলেন, আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার গলায় স্বর্ণ নির্মিত ক্রুশ লাগানো ছিল। নবী করীম (স) বললেনঃ

اَلْقِ هٰذَا الْوَثَنَ عَنْكَ -

তুমি এ মূর্তিটি তোমার থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দাও।

এরপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি বললাম ঃ হে রাসূল! আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তারা কি সে জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল করেনি, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন ? তখন তোমরাও কি সে জিনিসকে হালাল মেনে

নাও নি ? আল্লাহ্‌র হালাল করা জিনিস তারা কি তোমাদের জন্যে হারাম করে দেয়নি ও তোমরা তা মেনে নাও নি ? বললেন ঃ এ-ই তো ইবাদত। এভাবেই তোমরা তাদের ইবাদত করেছ। আর এ জিনিসকেই আল্লাহ বলেছেন তাদেরকে রব্ব বানানো, রব্ব রূপে গ্রহণ করা। কেননা তারা তাদের ঠিক সেই মর্যাদা দিয়েছে, যা হতে পারে তাদের রব্ব-এর, তাদের সৃষ্টিকর্তার। কেননা সৃষ্টিকর্তারই এ অধিকার মানতে হয় যে, তিনি যা হালাল ঘোষণা করবেন, তা-ই হালাল হবে, আর যা-ই হারাম করেছেন তা-ই হারাম রূপে পরিগণিত হবে। তিনি যা হারাম করেন নি তা কেউ হারাম করতে পারে না, তিনি যা হালাল করেন নি, তা-ও কেউ হালাল করতে পারে না, এ হালাল বা হারামকরণে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই আনুগত্য করা যেতে পারে না, কেননা তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্‌র ইবাদতের বাধ্যবাধকতায় সব মানুষই সর্বতোভাবে সমান। সকলেই তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য। ইবাদত কেবল তার-ই জন্যে— তাঁরই উদ্দেশ্যে হতে পারে, অন্য কারোর জন্যে নয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ -

হে আহ্‌লি কিতাব লোকেরা! তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করছ কেন ?

শেষে— اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা কি বুঝ না, বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও না ?

ইবনে আব্বাস, হাসান ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাজরান এলাকার ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানরা নবী করীম (স)-এর নিকট একত্রিত হয়েছিল। তারা ইবরাহীম (আ)-এর বিষয়টি নিয়ে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করেছিল। ইয়াহূদীরা বলেছিল, ইবরাহীম (আ) ইয়াহূদী ছিলেন। আর খ্রীস্টানরা বলেছিল, তিনি ছিলেন খ্রীস্টান। আল্লাহ তা'আলা এদের দুটি গোষ্ঠীর দাবিই অস্বীকার করেছেন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর কথার মধ্যবর্তী বাণী হল ঃ

وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرٰاةُ وَلَا نْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِه -

ইয়াহূদীদের কিতাব তওরাত ও খ্রীস্টানদের ইন্‌জীল নাযিল হয়েছে ইবরাহীমের (দুনিয়া থেকে) চলে যাওয়ার পর।

তাহলে ইয়াহূদীরা খ্রীস্টান হওয়া ঐতিহাসিকভাবেই সম্ভব নয়। এটা তো সহজেই বুঝতে পারা যায়। ইয়াহূদীবাদ খৃস্টবাদ— দুটোই ইবরাহীম (আ)-এর পরবর্তী ব্যাপার। তাই তাঁর ইয়াহূদী বা খ্রীস্টান হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ-ও বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদীবাদ হযরত মূসা (আ)-এর মিল্লাত থেকে বিকৃত হয়ে তৈরী হয়েছে। আর হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়াত থেকে বিকৃত হয়ে খ্রীস্টবাদ গড়ে উঠেছে। তাঁর জীবনকালে তওরাত ও ইনজীল নাযিল হয়নি। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে গড়ে উঠা মিল্লাতের সাথে তাঁর কোনরূপ সম্পর্ক থাকা কিরূপে সম্ভব হতে পারে ?

যদি প্রশ্ন তোলা হয় ঃ ওকথা সত্য হলে হযরত ইবরাহীমের 'হানীফ-মুসলিম' হওয়াও অসম্ভব হবে। কেননা কুরআন-ও তো তাঁর অনেক অনেক পরে নাযিল হয়েছে। অথচ কুরআনেই তাঁকে 'হানীফ-মুসলিম' অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। তা কি করে সম্ভব হবে ?

জবাবে বলা যাবে 'হানীফ' অর্থ সুদৃঢ় ঋজু দ্বীন। الحنيف-এর আভিধানিক অর্থ হল সুদৃঢ়তা। আর মুসলিম হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য, আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহ্র আইন পালনকারী। সত্যপন্থী যে কোন ব্যক্তিকেই উক্ত অভিধায় অভিহিত করা যায়। আমরা জানি, ইবরাহীম (আ) প্রাচীনকালীন নবীগণের একজন। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ-ই উক্ত পরিচিতিতে পরিচিত হয়েছিলেন। তাই ইবরাহীম (আ)-কে 'হানীফ' 'মুসলিম' বলা খুবই যুক্তিযুক্ত। যদিও কুরআন তাঁর অনেক পরে নাযিল হয়েছে। উক্ত পরিচিতি কুরআনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তা কুরআনের অনুসারী ছাড়া অন্যদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হতে পারে। সব মুমিনই এ পরিচিতিতে পরিচিত হতে পারে। কিন্তু ইয়াহূদীবাদ খ্রীস্টবাদ তওরাত ও ইনজীলের শরীয়াত থেকে বিকৃত হয়ে নাম ধারণ করেছে। কাজেই সে দুটির পূর্বে কোন লোক সে নামে অভিহিত হতে পারে না।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কর্ত-বিতর্ক করা সম্পূর্ণ জায়েয বরং কর্তব্য। কর্তব্য বাতিল পন্থীদের ধর্মমতের বাতুলতা প্রমাণ করা ও তা নস্যাৎ করে দেয়া। যেমন করে আল্লাহ্ স্বয়ং ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষত হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে তাদের ভুল ধারণা ও মিথ্যা অভিযোগ বাতিল করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ -

হে ঐ সব লোকেরা! যারা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করেছ সে বিষয়ে, যে বিষয়ের ইলম তোমাদের আছে, তাহলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন ইলম নেই, সে বিষয়ে তোমরা তর্ক-বিতর্ক করছ কেন?

সত্য উদ্ঘাটনের ও সত্যের সত্যতা প্রমাণের পক্ষে এ আয়াত সুস্পষ্টতম দলীল। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ যুক্তিভিত্তিক তর্ক করা যদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধই হতো, তাহলে জ্ঞানভিত্তিক তর্ক ও মূর্খতাভিত্তিক তর্কের মধ্যে পার্থক্য করা হতো না, যেমন আলোচ্য আয়াতে করা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ حَاجَجْتُمْ فِيمَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এখানে সে বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, যা তাদের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যে বিষয়ে ইলম নেই বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অবস্থার দিকে। কেননা তাঁর সম্পর্কে তারা জানত না বলেই তিনি ইয়াহূদী ছিলেন কিংবা খ্রীস্টান ছিলেন বলে তারা দাবি তুলেছিল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهٖ إِلَيْكَ -

আহলি কিতাব লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যাদের নিকট এর অর্থ, তুমি বিপুল

সম্পদেও তাকে বিশ্বাস করতে পার। এখানে ب অক্ষর ও على একটার পর একটা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয় وَمَرَرْتُ عَلَيْهِ ও مَرَرْتُ بِفُلَانٍ শব্দটি সম্পর্কে হাসান বলেছেন, তার এক হাজার ও দুইশ মিসকাল। আবূ নযরা বলেছেন, এক পাত্র ভর্তি স্বর্ণ। আর মুজাহিদ বলেছেন, সত্তর হাজার। আবূ সালিহ্ বলেছেন, একশ রতল। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে আহ্লি কিতাবের কোন কোন লোকের আমানতদারী গুণের কথা বলেছেন। বলা যেতে পারে, তিনি খ্রীস্টানদের বোঝাতে চেয়েছেন। অনেকে এ আয়াতে তাদের পরস্পরের সাক্ষ্য গ্রহণ করার দলীল বলে মনে করেছেন। কেননা সাক্ষ্যদান একটা আমানতদারী কাজ বটে। যেমন মুসলমান আমানতদার হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। কিতাবী লোকও তাই। বিশেষভাবে এজন্যে যে, কুরআনেই তাদেরকে আমানতদারী গুণে ভূষিত করা হয়েছে। তাই কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

যদি বলা হয়— এ আয়াত অনুযায়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েয। কেননা এ আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানরা তাদের নিকট আমানত রাখলে তা তারা অবশ্যই রক্ষা করবে ও ফেরত দেবে।

জবাবে বলা যাবে, বাহ্যত আয়াতটির তা-ই বক্তব্য বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা উক্ত কথাকে সর্বসম্মতভাবে বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট করেছি। তাছাড়া আয়াতটি মুসলমানদের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েয বলেছেন। কেননা তাদের আমানত আদায় তাদের হক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ জায়েয, তা বোঝায় না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا –

ওদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাকে একটি দীনারের আমানত দিলেও সে তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবে না। হ্যাঁ, যদি তার উপর সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ভিন্ন কথা।

মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেছে ঃ এর অর্থ, তুমি যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে তার নিকট তাগাদা করতে পার, তাহলে হয়ত ফেরত দেবে। সুদ্দী বলেছেন ঃ তুমি যদি বাধ্যতামূলকভাবে তার মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকতে পারে, তাহলে...... আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এ দুটি অর্থই দেয়। একটা তাগাদা করতে আর একটি একেবারে লেগে থাকা। আর এক সাথেও এ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে তা থেকে। তবে مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا বাধ্যতামূলকভাবে লেগে থাকার তুলনায় বারবার তাকাদা করতে থাকার অর্থটা-ই উত্তম মনে হয়। এ আয়াত এ কথারও দলীল যে, যার নিকট পাওনা রয়েছে তা পাওয়ার জন্যে তার সাথে থাকার অধিকার আছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ –

তা এ কারণে যে, তারা বলেছে, উম্মী লোকদের মধ্যে আমাদের উপর কোন পথ নেই।

কাতাদাহ্ ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াহূদীরা বলেছে, আরবদের যেসব ধন-সম্পদ

আমরা পেয়ে গেছি, সে ব্যাপারে আমাদের উপর দাবি করার কোন উপায় নেই। কেননা ওরা তো মুশরিক। তাদের ধারণা, তারা একথাটি তাদের কিতাবে পেয়েছে।

এ-ও বলা হয়েছে যে, তারা উক্ত কথাটি বলেছিল তাদের ধর্মমতের সমস্ত বিরোধী লোকদের সম্পর্কে। তারা তাদের ধন-মালকে নিজেদের জন্যে হালাল মনে করত। কেননা তারা মনে করে, সব মানুষেরই উচিত তাদের বিরুদ্ধতা করা। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা দাবি করত যে, উক্ত কথা আল্লাহ্ই তাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ দাবির মিথ্যা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলেছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

ওরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা জেনে শুনেই বলে।

অর্থাৎ তাদের উক্ত কথা সত্য নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا -

যেসব লোক আল্লাহ্র চুক্তি ও তাদের কিরা-কসম স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে।.....

আ'মাশ সুফিয়ান আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে লোক কিরা-কসম করে কোন মুসলিম ব্যক্তির ধন-মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে, সে ভয়ানক অপরাধী হবে। সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় তিনি তার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ।'

আশ্‌আস ইবনে কায়স বলেছেন, আমার ও অপর এক ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ ও ঝগড়া ছিল। আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূল (স)-এর নিকট মামলা দায়ের করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি ? আমি বললাম, কোন প্রমাণ নেই। তখন বললেন ঃ তাহলে বিশ্বাসীকে কিরা-কসম করতে হবে। আমি বললাম ঃ এখন-ই কি তাকে কিরা-কসম করতে হবে ? পরে আবদুল্লাহ্র কথাটার অনুরূপ কথার উল্লেখ করলেন। এ সময় উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

মালিক আল-উলা ইবনে আবদুর রহমান, মা'বাদ ইবনে কা'ব তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক, আবূ আমামাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন, যে লোক তার কিরা-কসম দ্বারা কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং জাহান্নাম তার জন্যে আবশ্যিক করে দেবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করল, যদি খুব সামান্য জিনিস হয়, হে রাসূল! তাহলেও কি তাই হবে ? বললেন ঃ ইরাক গাছের একটি ডাল নিলেও তাই হবে।

শ'বী আল-কামা, আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি তার ভাইর ধন-মাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে কিরা-কসম করবে, সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ থাকবেন।

উপরোদ্ধৃত আয়াত ও পরে উল্লেখ করা হাদীসসমূহে প্রমাণ করে যে, যে মাল বাহ্যত অন্য কারোর, শুধু কিরা-কসম করেই তা কেউ পেতে পারে না। যার নিকট যে মাল আছে, সে দাবি করে যে, সে মাল তার, কিরা করে তাও কেউ নেয়ার অধিকারী হতে পারে না। বাহ্যত সে মাল তারই। তা অন্য কেউ পেয়ে যেতে পারে না। উপরোদ্ধৃত আয়াত ও হাদীসসমূহের বাহ্যিক অর্থ হল, যে মাল বাহ্যত অন্য কারোর, তা কেউ তার কিরা-কসম করে পাবে না, তা নিষিদ্ধ। কিরা-কসম দ্বারাই তা পাওয়া যেতে পারে না। কেননা এখানে সে মালের কথা বলা হয়নি, যা তার মালিকানা বলে আল্লাহ্‌র নিকটও স্বীকৃত। বরং সেই মালের কথা বলা হয়েছে, যা আমাদের নিকট রয়েছে— যা বাহ্যত আমাদের মালিকানা। কেননা আমাদের মতে মালিকানাটা বাহ্যিক অবস্থার দৃষ্টিতেই প্রমাণিত হতে পারে, প্রকৃত তা কার, সে বিচার মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

যাঁরা বলেন যে, কিরা-কসম রদ্দ করা হবে, তাঁদের এ কথা যে বাতিল, তার দলীল এ আয়াতে রয়েছে। কেননা বাহ্যত যে মালিকানা অন্য কারোর, তার নিকট থেকে তা ফিরে পাওয়া সম্ভব এ কিরা-কসমের দ্বারাই। উক্ত ব্যাপারটিও প্রমাণ করে যে, মূলত কিরা-কসম সম্পদ পাওয়ার অধিকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বানানো হয়নি। তার অবকাশ রাখা হয়েছে শুধু উপস্থিত ঝগড়া মেটাবার জন্যে।

আল-আওয়াম ইবনে হাওশব ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে আবূ আওফাকে বলতে শুনেছেন ঃ এক ব্যক্তি পণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে সেই আল্লাহ্‌র নামে, যিনি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, কিরা করে বলেছে যে, আমি এর মূল্য আদায় করে দিয়েছি, অথচ সে তা দেয়নি। .... এ সময় উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। আল-হাসান ও ইকরামা থেকে বর্ণিত— এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সেই লোকদের ব্যাপারে, যারা ছিল ইয়াহূদী আহবার আলিম-পণ্ডিত-বুদ্ধিমান। তারা নিজেদের একটি কিতাব লিখে কিরা করে দাবি করেছিল যে, এ কিতাব আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। এভাবেই তারা এ দাবিও করেছিল যে, উম্মীদের কোন পথ বা উপায় আমাদের উপর নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلْوُوْنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ ...... وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ -

তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী লোক এমন আছে যারা তাদের জিহ্বাকে কিতাব পাঠের সময় নানাভাবে ঘুরায়-ফিরায় .... অথচ তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসেনি।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, গুনাহ-নাফরমানী আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হয় না। তা আল্লাহ্‌র কাজ থেকেও নয়। কেননা তা যদি আল্লাহ্‌র কাজ থেকে হতো, তাহলে তা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই হতো। অথচ উক্ত আয়াতে গুনাহ্‌ নাফরমানী আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হওয়ার কথা সাধারণভাবেই অস্বীকার করেছেন। তাঁর কাজ থেকে হলেও তা তাঁর নিকট থেকেই হতো আরও জরুরীভাবে। তাহলে তা সাধারণভাবে অস্বীকার করা জায়েয হতো না এই বলে যে, তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নয়।

যদি বলা হয়, কিরা-কসম আল্লাহ্র নিকট থেকে, এ কথা তো সাধারণভাবে বলা হয়; কিন্তু সর্বতোভাবে তা আল্লাহ্র নিকট থেকে, তা বলা যেতে পারে না। কুফর ও নাফরমানীর কাজগুলো এমনি-ই।

জবাবে বলা যাবে, নিরংকুশ অস্বীকৃতি সাধারণ ও ব্যাপক ভাবধারা-সম্পন্ন। কিন্তু নিরংকুশ ইতিবাচক কথা সে 'রকম' হয় না। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে কর, যদি বল ঃ জায়দের নিকট কোন খাবার নেই। এ কথাটির তাৎপর্য হল কম বা বেশি-খাবার বলতে কিছুই নেই। পক্ষান্তরে যদি বল ঃ তার নিকট খাবার আছে, তাহলে তার নিকট সমস্ত খাবার থাকার সাধারণ অর্থ মনে করা যাবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

তোমরা যা ভালোবাস— তা তোমাদের প্রিয় জিনিস— তা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ তোমরা লাভ করতে পারবে না।

اَلْبِرُّ শব্দের অর্থ এখানে দুটি বলা হয়েছে। একটি জান্নাত। তা আমর ইবনে মায়মুন ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত।

অপর অর্থ, পরম কল্যাণময় কাজ, যার বদলে লোকেরা সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়।

আর نَفَقَة অর্থ, ব্যক্তির প্রিয় জিনিস আল্লাহ্র পথে দিয়ে দেয়া যেমন দান, সাদকা ইত্যাদি।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন হুমাইদ, আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'তোমরা যা ভালোবাস তা ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ পাবে না' কথাটি যখন নাযিল হল, আর 'কে আছে, আল্লাহ্কে করযে হাসান দেবে' নাযিল হল, তখন আবূ তালহা (রা) বললেন, হে রাসূল! অমুক অমুক স্থানে প্রাচীর বেষ্টিত আমার জমি-বাগান রয়েছে, তা আল্লাহ্র পথে দান করে দিলাম। আমি যদি এ দানকে গোপন রাখতে পারতাম, তাহলে প্রকাশ করতাম না। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ তুমি এ সব তোমার নিকটবর্তী বা নিকটাত্মীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট কর।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আবূ আমর ইবনে হুমাস, হামজাতা ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তোমাদের প্রিয় জিনিস ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত কল্যাণ ও পূর্ণাঙ্গ সওয়াব কখনই পাবে না' আয়াতটি খুবই ভারী হয়ে দাঁড়ালো আমার নিকট। আমাকে আল্লাহ কি কি নিয়ামত দিয়েছেন, আমি তা মনে মনে স্মরণ ও হিসাব করলাম। তখন আমার ক্রীতদাসী আমীমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় জিনিস আর কোনটিই পেলাম না। তাই আমি বললাম, সে মুক্ত স্বাধীন কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে। আল্লাহ্র জন্যে আমার কৃত কাজ পুনরায় না করা যদি আমার অভ্যাস না হতো, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই বিয়ে করতাম। তাই আমি নিজে তাকে বিয়ে না করে আমি তাকে নাফের নিকট বিয়ে দিলাম। এখন সে তার সন্তানের মা।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই, আবদুর রাযযাক, মামর, আইয়ূব প্রমুখ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ উক্ত আয়াত যখন নাযিল

হল, জায়দ ইবনে হারিসা তার ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হল— সে ঘোড়াটিকে খুবই ভালোবাসতো। সে বলল, হে রাসূল! এ ঘোড়াটি আল্লাহ্‌র পথে দিয়ে দিলাম। পরে নবী করীম (স) উসামা ইবনে জায়দকে তার উপর সওয়ার করে দিলেন। দেখা গেল, তা দেখে জায়দ খুব সুখ বোধ করছেন। নবী করীম (স) যখন তার এ অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন, আল্লাহ এ দান কবুল করেছেন।

হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এটা ছিল ফরয যাকাত সম্পর্কে আয়াত। আল্লাহ্‌ ধন-মালে তা ফরয করেছেন এ হুকুম ও ঘোষণার মাধ্যমে।

আবূ বকর (র) বলেছেন ঃ আয়াতটির ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে উমরের দাসীর মুক্তি প্রমাণ করে যে, তিনি মনে করেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় করা হবে, তাতেই সে ব্যয়টা হবে, যা উক্ত আয়াতে করতে বলা হয়েছে। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মতে ফরয নফল সর্ব প্রকারের ব্যয়ই এর মধ্যে সাধারণভাবে শামিল। অনুরূপভাবে আবূ তালহা ও জায়দ ইবনে হারিসার কাজ প্রমাণ করে যে, উক্ত হুকুমটি কেবল ফরয দানের সীমাবদ্ধ— নফল শামিল নয়, এ কথা তাঁরা মনে করতেন না। এ প্রেক্ষিতে 'তোমরা কখনই পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ বা সওয়াব পাবে না' কথাটির অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্যের সেই উচ্চতর মনযিল কখনই পাবে না যতক্ষণ না তোমরা ব্যয় করবে সেই জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস।' আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্যে এ আয়াতে চূড়ান্ত ও সর্বাধিকভাবে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা প্রিয়তম জিনিস আল্লাহ্‌র জন্যে ব্যয় করা নিয়তের সত্যতা যথার্থতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রমাণ করে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

কুরবানীর গোশ্‌ত ও রক্ত কখনই আল্লাহ্‌কে পাবে না। এবং আল্লাহ্‌কে পাবে তাকওয়া। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৭)

ভাষার অভিধানে এরূপ ব্যবহার সঙ্গত, যদিও এ কথায় আসলকে অস্বীকার করতে চাওয়া হয়নি। পূর্ণত্ব অস্বীকার বুঝিয়েছে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لَايَجِدُ مَا يُنْفِقُ وَلَا يَفْطُنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ -

তোমরা যাকে এক মুঠি বা দুই মুঠি খাবার বা একটি খেজুর বা দুটি খেজুর দাও, সে প্রকৃত মিসকীন ব্যক্তি নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন হচ্ছে সে, যে পায় না কি খরচ করবে, তারা চিন্তাও করতে পারে না যে তা দান করবে'।

এ হাদীসে অত্যাধিক বেশি করে মিসকীনের মিসকিনী বা দারিদ্র্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যের ব্যাপারে মিসকিনীতে পুরাপুরি অস্বীকার করা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِلَّا مَاحَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ -

সর্ব প্রকারের খানা-ই বনী ইসরাঈলীদের জন্যে হালাল ছিল, শুধু তা বাদে যা ইসরাঈল নিজে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিল।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এ স্পষ্ট অর্থ, সর্বপ্রকারের খাদ্য বনী ইসরাঈলীদের জন্যে মুবাহ ছিল। তবে ইসরাঈল নিজের জন্যে কিছু কিছু খাদ্য হারাম করে নিয়েছিল।

ইবনে আব্বাস ও আল-হাসান থেকে বর্ণিত, ইসরাঈল অস্থি ব্যথায় আক্রান্ত হলে তার সবচাইতে প্রিয় খাদ্য নিজের জন্যে হারাম করে, তা হল উটের গোশ্‌ত, যদি আল্লাহ শেফা দান করেন। এটা ছিল মানতস্বরূপ কাজ। কাতাদা বলেছেন, উটের রগ খাওয়া হারাম করেছিল। এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, 'ইসরাঈল' হচ্ছে হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর নাম। তিনি মানত করেছিলেন, তিনি যদি তার কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন তাহলে তিনি তাঁর প্রিয়তম খাদ্য পানীয় নিজের জন্যে হারাম করে নেবেনে আর তা ছিল উটের গোশ্‌ত ও দুগ্ধ।

আলোচ্য আয়াতটির নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য ছিল, নবী করীম (স) উটের গোশত হালাল ঘোষণা করেছিলেন, তা তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। কেননা পূর্ববর্তী নবীর ফয়সালাকে মনসূখ করা তারা জায়েয মনে করতে পারেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। এ আয়াতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, উঠের গোশত ও দুগ্ধ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশংধরদের জন্যে সম্পূর্ণ হালাল ছিল। ইসরাঈল নিজের জন্যে তা হারাম করেছিলেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তখন নবী করীম (স) তাদের চ্যালেঞ্জ দেন তওরাত কিতাবে তা লেখা আছে বলে। কিন্তু তারা সে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে সাহস পায়নি। তারা তওরাত নিয়ে আসেনি এ ভয়ে যে, তাতে নবী করীম (স)-এর কথাই সত্য প্রমাণিত হয়ে পড়বে। মন্‌সূখ না হওয়া সম্পর্কে তাদের কথা বাতিল হয়ে গেল। কেননা কোন জিনিস কখনও মুবাহ্ থাকলে তা নিষিদ্ধ হলে পুনরায় তা মুবাহ হতে পারে।

এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স)-এর নবুয়ত সত্য। কেননা তিনি তো উম্মী ছিলেন। কোন কিতাব কখনও পড়েন নি। আহলি কিতাব লোকদের সাথে বৈঠকে কখনও বসেনও নি। ফলে আগের নবীগণের কিতাবের তত্ত্ব তাঁর পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল। তা সম্ভব হয়েছিল আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ইসরাঈল যে খাবার নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন, তা তাঁর নিজের জন্যেই হারাম ছিল, সমগ্র বনী ইসরাঈলীদের জন্যেও হারাম ছিল। তা আল্লাহ্‌র উক্ত কথা ঃ 'বনী ইসরাঈলের জন্যে সব খাদ্যই হালাল ছিল। তবে যা ইসরাঈল নিজের জন্যে হারাম করেছিল, তা এর বাইরে।' আল্লাহ বনী ইসরাঈলের জন্যে যা হালাল করেছিলেন তা থেকে বাদ পড়ে গেল তা যা ইসরাঈল নিজের জন্যে নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন, তা সব বনী ইসরাঈলের জন্যেও হারাম হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন তোলা যায়, মানুষের পক্ষে নিজের উপর কোন কিছু হারাম করা কি করে জায়েয হতে

পারে, হারামকরণ বা মুবাহ্‌করণে যে সার্বিক কল্যাণ নিহিত থাকে তা তো মানুষের জানা নেই। বিশেষ করে ইবাদতে নিহিত কল্যাণ সংক্রান্ত ইলম একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোর জানা থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

জবাবে বলা যেতে পারে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তা করা সম্পূর্ণ জায়েয। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে যেমন ইজতিহাদ করা জায়েয শরীয়াতের হুকুম আহ্‌কামে। ইজতিহাদের ফলে লব্ধ শরীয়াতের হুকুম এভাবেই আল্লাহ্‌র বিধানে পরিণত হয়। ব্যক্তির জন্যে নিজের হালাল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া-ও তো জায়েয। অনুরূপভাবে নিজের ক্রীতদাসীকে মুক্তি দিলেই সে তার জন্যে হারাম হয়ে যায়। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র দেয়া অনুমতিক্রমে নিজের জন্যে কোন হালাল খাদ্য হারাম করে নিতে পারে। এ অনুমতি হয় শরীয়াতের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে কিংবা পাওয়া যাবে ইজতিহাদের মাধ্যমে। ইসরাইল নিজের জন্য যে খাদ্য হারাম করে নিয়েছিলেন, তা হয় তা নিজের ইজতিহাদের ফলশ্রুতি ছিল, যা তিনি এ ব্যাপারে করেছিলেন অথবা তা ছিল আল্লাহ্‌র দিক দিয়ে বিশেষভাবে তাঁর জন্যে 'তাওকীফ'— যার দরুন হারামকরণ তাঁর জন্যে মুবাহ হয়েছিল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুক্রমেই তা হয়েছিল। আয়াত থেকে বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, এ হারামকরণটা তাঁর ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের ব্যাপার ছিল। কেননা হারামকরণ কাজটি তাঁর দ্বারাই সজ্ঘটিত হওয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ্‌ই বলেছেন। তা যদি তাওকীফ-এর ফলে হতো তাহলে আল্লাহ্‌র কথাটি হতোঃ 'তবে আল্লাহ্‌ বনী ইসরাঈলের প্রতি যা হারাম করেছেন .....।" কিন্তু আয়াতে বলা হয়েছে, হারামকরণের কাজটি ইসরাঈল করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, হারামকরণকে ইজতিহাদের পন্থায় ইতিবাচক করার অধিকার তাঁকে দান করা হয়েছিল। আর এ কথাই প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স)-কে শরীয়াতের বিধানে ইজতিহাদ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। অন্যান্য নবী ও বিশেষজ্ঞের জন্যেও। তবে নবী করীম (স) এ ব্যাপারে অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকারী এবং উপযুক্ত। কেননা কিয়াস-এর দিক সমূহ ও ইজতিহাদ করে একটা প্রকাশ করার ইলম ও যোগ্যতা তাঁর ছিল অনেক বেশি। উসূলুফিকহ্‌ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসরাঈল নিজের জন্যে যে খাদ্য হারাম করেছিলেন তা একটি সজ্ঘটিত ঘটনা। ব্যবহৃত শব্দ থেকে হারামকরণ ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করে না। কিন্তু এ গোটা ব্যাপারটিই আমাদের নবী করীম (স) উপস্থাপিত শরীয়াতে সম্পূর্ণ মনসূখ হয়ে গেছে। তার প্রমাণ এই যে, নবী করীম (স) মারিয়াকিবতিয়া— অন্য বর্ণনায় মধু নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র সে দুটিকে তাঁর জন্যে হারাম করেন নি। তিনি যে কিরা করেছিলেন তা ভাঙ্গিয়ে তার কাফফারা দেয়ার বিধান দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতি আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা এই ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ .... قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ -

হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করছ কেন ? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে চাও ..... তোমাদের কিরা ভঙ্গ করা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে ফরয করেছেন। (সূরা তাহরীম ঃ ১-২)

অর্থাৎ কিরা করে হালালকে হারামকরণের ক্ষেত্রে কিরার কাফফারা দেয়া ফরয করা হল। হারামকরণকে মেনে নেয়া হল না।

হানাফী ফিকাহবিদগণ মত দিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাসী বা নিজ মালিকানার কোন জিনিস কিরা করে হারাম করে, তাহলে তাতে তা তার উপর হারাম হয়ে যায় না। হারামকরণের পর-ও সে তা মুবাহ মনে করবে, তবে কিরার কাফফারা দিতে হবে—যেমন কেউ যদি কিরা করে যে, সে এ খাদ্য খাবে না। তবে হলফ ও কিরার মধ্যে একটা দিক দিয়ে তাঁরা পার্থক্য করেছেন। যেমন যদি বলে ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি এ খাবার খাব না, তাহলে সমস্ত খাবার খেয়েই তাকে এ কসম ভাঙতে হবে। আর যদি শুধু বলে ঃ এ খাবারটা আমার নিজের উপর হারাম করে নিয়েছি, সে সেই খাবারের একটা অংশ খেয়েই সে হারাম করণকে ভেঙ্গে ফেলবে। কেননা কিরাকারী যখন হারাম করে নিয়েছি বলে হলফ করবে, তখন সে খাদ্যের একটি অংশ খেয়ে সেই হলফ ভঙ্গ করার ইচ্ছা করেছে। এ কথটি সেরূপই দাঁড়াবে, যেমন বলবে আল্লাহ্র কসম, আমি এ খাবার থেকে কিছুই খাব না। এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তার উপর এসব জিনিস থেকে কোনটি হারাম করেন নি। কাজেই তার হারামকরণে কম ও বেশি— সবই শামিল হবে। আর যে লোক নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করেছে, সমস্ত খাদ্য থেকে কিছুই খাবে না বলে কিরা করেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ -

মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছে, তা মক্কায় অবস্থিত। তা অতীব বরকত সম্পন্ন এবং সারে জাহানের লোকদের হেদায়েত কেন্দ্র।

মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেছেন, কাবা ঘরের পূর্বে পৃথিবীতে আর কোন ঘরই নির্মিত হয়নি। হযরত আলী ও হাসান বলেছেন, কাবাই প্রথম ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে।

بَكَّةَ 'বাক্কাতা' সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। জুহ্রী বলেছেন, 'বাক্কা' হচ্ছে মসজিদ ও মক্কা হল সমস্ত হারাম। মুজাহিদ বলেছেন, 'বাক্কা'ই মক্কা। এ কথাটি যিনি বলেছেন, তাঁর কথা হল, শব্দের بَ পরে ميم এ বদল হয়ে গেছে। যেমন মস্তক মুণ্ডন করা হলে আরবীতে سَبَدَ ও سَمَدَ দুটি দুইটি শব্দই বলা হয়। আবূ উবায়দা বলেছেন, 'বাক্কা' হচ্ছে মক্কার অভ্যন্তর। এ-ও বলা হয়েছে, بَكٌّ অর্থ ভীড়। যেমন ভীড় হলে আরবী ভাষায় বলা হয়— يَبُكُّهُ ও بَكٌّ تَبَاكَ النَّاسَ —লোকদের ভীড়ের স্থান সম্পর্কে এরূপ বলা হয়। কাজেই আল্লাহ্র ঘরকেও بكه নামে অভিহিত করা যায়। কেননা লোকেরা সেখানে নামাযে বরকতের জন্যে ভীড় করে। আর মসজিদের চতুষ্পার্শ্বকেও 'বাক্কা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে এ কারণে যে, লোকেরা তওয়াফ করার জন্যে সেখানে ভীড় করে।

আল্লাহ্‌র কথা هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ 'সমগ্র জাহানের লোকদের হেদায়েতের কেন্দ্র। কেননা এ ঘরে আল্লাহ্‌র কথা বলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ করে। কেননা এখানে যেসব নিদর্শন রয়েছে, তা আল্লাহ ছাড়া কারোর পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এখানে সর্বপ্রকারের বর্বরতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। হারাম শরীফে হরিণ ও কুকুর-ও এক সাথে থাকতে পারে। কুকুর হরিণের উপর উত্তেজিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, আর হরিণও ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করবে না।

এ ঘর আল্লাহ্‌র তওহীদের ও কুদরতের অকাট্য প্রমাণ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'ঘর' বলতে এখানে কাবা ঘর ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ গোটা হারাম বুঝিয়েছেন। কেননা উক্ত অবস্থা সমস্ত হারাম এলাকায়ই বিরাজমান।

আল্লাহ্‌র কথা مُبٰرَكًا অর্থাৎ সে ঘর বিপুল কল্যাণময় প্রতিষ্ঠান। 'বরকত' বলতে বিপুল কল্যাণের বিরাজমানতা বোঝায়। তার ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রম উৎকর্ষ বোঝায়। البرك অর্থ প্রমাণিত হওয়া, স্থিতিশীল হওয়া। কোন জিনিস নিজ অবস্থায় স্থিতিশীল হলে আরবী ভাষায় বলা হয়ঃ

بَرَكَ بَرْكًا وَبُرُوْكًا-

এ আয়াতটিতে বায়তুল হারামে হজ্জ করতে উৎসাহ নিহিত আছে। কেননা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাতে বিপুল কল্যাণ ও বরকত, কল্যাণের ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি রয়েছে। সে সাথে তওহীদ ও দ্বীন-ইসলামের দিকে হেদায়েত প্রাপ্তির সূক্ষ্মতাও রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ -

সেখানে সুস্পষ্ট অকাট্য নিদর্শনসমূহ ও মাকামে ইবরাহীম অবস্থিত।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতের কথা ঃ مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ বুঝিয়েছে যে, কাবা ঘর নির্মাণ কালে যে শক্ত পাথরখণ্ডের উপর হযরত ইবরাহীম (আ) দাঁড়িয়ে থেকে পাথর গাথার কাজ করেছিলেন, তার উপর আল্লাহ্‌র কুদরতে তাঁর দুই পা বসে গিয়েছিল, যেন তা প্রমাণ হয়ে থাকে এবং তওহীদ ও ইবরাহীম (আ)-এর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য নিদর্শন হয়ে থাকে। তার আরও নিদর্শন রয়েছে। যেমন জন্তু-জানোয়ার-প্রাণী মাত্রেরই সেখানে নিরাপত্তা রয়েছে। এক সময় সেখানে বহু হিংস্র জীব-জন্তু থাকত, যা শিকারী ও আক্রমণকারী। জাহিলিয়াতের সময় প্রাণের ভয়ে মানুষ সেখানে পূর্ণ মাত্রার নিরাপত্তা পেতে পারত। অথচ হারামের বাইরে মানুষের ছিনতাই হতো অবাধে। ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত প্রতি বছর হজ্জের সময় কত কোটি কোটি পাথর-কংকর আহরিত ও নিক্ষিপ্ত হয়ে আসছে তার কোন শেষ বা হিসাব-নিকাশ নেই। প্রস্তর ভিন্ন স্থান থেকে আহরণ করে নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। এ ঘরের উপর দিয়ে সরাসরিভাবে পাখীর উড্ডয়ন নিষিদ্ধ। রোগী সেখানে আরোগ্য লাভ করে। তার মহান মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী অতি শিগগীরই প্রতিশোধমূলক শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থাই অক্ষুণ্ন-অব্যাহত হয়ে রয়েছে আবহমানকাল ধরে। 'আসহাবুল ফীল'— হস্তীওয়ালা বাহিনী এ ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আসতে শুরু করলে পথিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায় আবাবীল

পাখীর নিক্ষিপ্ত কংকর দ্বারা। এ সব হারাম শরীফের মহানত্ব ও পবিত্রতার অকাট্য নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের চিহ্ন ধরা পাথরখন্ড কাবা ঘরের ভেতরে নয়, ঘরের বাইরে সংরক্ষিত।

অপরাধীর হারামে প্রবেশ কিংবা হারামে অপরাধ করা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا -

যে লোকই এখানে প্রবেশ করবে, সে-ই পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে।

আবূ বকর বলেছেন, প্রথমে বলা হয়েছে (পৃথিবীতে) সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে লোকদের জন্যে তার পর বলা হয়েছে ঃ 'যে লোকই সেখানে প্রবেশ করবে।' এরপর আয়াত ও নিদর্শনসমূহের উল্লেখ হয়েছে, যা সমগ্র হারাম এলাকায় মওজুদ রয়েছে। এরপর ঃ 'যে-ই সেখানে প্রবেশ করবে' এর অর্থ সেই সমগ্র হারাম এলাকা-ই বুঝতে হবে। 'যে লোকই সেখানে প্রবেশ করবে সে-ই নিরাপদ হবে' বলে মানুষের জান-প্রাণের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ বোঝায়। সে প্রবেশের পূর্বে নিজে অপরাধী হলেও সেখানে প্রবেশের পর অপরাধ করলেও। তবে ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, হারাম-এর মধ্যে প্রাণ বধের অপরাধ করলে তাকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। প্রাণ বধের তুলনায় ছোট অপরাধ করলেও তাই; আর একথা জানা-ই আছে যে, 'আল্লাহ্‌র যে লোক-ই সেখানে প্রবেশ করবে, সেই নিরাপদ হবে' কথাটি মূলত একটি আদেশ, যদিও তা বলা হয়েছে সংবাদ দান হিসেবে। যেন বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্‌র হুকুমেই সে নিরাপদ (অর্থাৎ আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দিতে আদেশ করেছেন)। যেমন বলা হয় ঃ 'এটা মুবাহ, এটা নিষিদ্ধ।' এরূপ কথার অর্থ হয়, এটা আল্লাহ্‌র হুকুমে মুবাহ, এটা আল্লাহ্‌র হুকুমে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে এই করতে আদেশ করেছেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, কোন লোক নিজেই তা মুবাহ বানিয়ে নেবে বা নিষিদ্ধ করে নেবে। 'মুবাহ্'র কথার অর্থ হবে ঃ তুমি এ কাজটা করতে পার। এটা করলে তোমার কোন সওয়াব নেই যেমন, তেমনি কোন আযাবও ভোগ করতে হবে না। আর যা নিষিদ্ধ, তাতে কথাটি হবে ঃ তুমি এ কাজ করো না, করলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌র 'যে লোকই সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে' কথাটিও এমনি আমাদের জন্যে একটি আদেশ। আর রক্তপাত সেখানে নিষিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে একথাটি আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ -

তোমরা মসজিদে হারাম-এর নিকট ওদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাধায়, তাহলে তোমরা তাদের হত্যা কর। (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)

এ আয়াতে জানানো হয়েছে, হারামে প্রাণহত্যা ঘটা জায়েয হবে, সেখানে মুশরিকদিগকে হত্যা করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ শুরু করে।' যে লোক সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে' কথাটি নিছক খবর হলে খবরদাতার উহ্য থাকা কখনই জায়েয হতো না। তাই বলতে হবে, এটি আমাদের জন্যে আদেশ বিশেষ এবং তাকে হত্যা করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সে সাথে তার উপর জুলুম করা ও তাকে হত্যা থেকে নিরাপত্তা দানেরও আদেশ দেয়া হয়েছে। সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না। সে যদি এমন অপরাধ করে থাকে, যার দণ্ড হত্যা, তা থেকেও নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। যে হত্যা দণ্ড পাওয়ার যে যোগ্য নয়, তা থেকেও সে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাবে। জুলুম হিসেবে হত্যা থেকেও সে রক্ষা পাবে। অন্যথায় হারাম-এর কথিত বিশেষত্ব ক্ষুণ্ন হবে। কেননা হারাম ও হারামের বাইরে—এ ব্যাপারে সমান। কেননা প্রত্যেকটি মানুষকে জুলুম থেকে নিরাপদ রাখা আমাদের কর্তব্য— তা আমাদের পক্ষ থেকে হোক কিংবা আমাদের ছাড়া অন্যদের পক্ষ থেকে। আমরা যদি তা করতে সমর্থ হই, তাহলে আমরা জানবো যে, আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, দণ্ডপদ, যার অধিকারীর দিক থেকে নিরাপত্তা দেয়ার এ আদেশ। এর বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে, তার হারামে কৃত বা হারামের বাইরে কৃত অপরাধের দরুন দাণ্ডের দাবিদার থেকে তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব। তবে শরীয়াত বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ কথার প্রমাণ দাঁড়িয়ে গেছে যে, হারামে যদি কেউ হত্যাকাণ্ড ঘটায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা ওদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ করে। তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর।' এ কথায় হারামের ভেতরে কৃত অপরাধও হারাম ছাড়া অন্যত্র কৃত অপরাধ এবং অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে— যখন সে এসে হারামে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

হারামের বাইরে অপরাধ করে হারামে এসে আশ্রয় নিলে শরীয়াতের হুকুম কি হবে, এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, বাইরে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে হারামে আশ্রয় নিলে সে যতক্ষণ হারামে অবস্থান করবে, তার কিসাস করা যাবে না। কিন্তু সে অবস্থায় তার কাছে কিছু বিক্রয় করা যাবে না, তাকে খাবার দেয়া যাবে না— যেন সে হারাম থেকে বের হতে বাধ্য হয়। বের হলেই তাকে কিসাস করতে হবে। আর যদি হারামের মধ্যেই হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তাহলে তাকেও সেখানেই হত্যা করা যাবে। তার অপরাধ যদি নরহত্যার কম হয় হারামের বাইরে, পরে সে হারামে প্রবেশ করে, তাহলে তখন তার বিচার করা যাবে।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, হারামের মধ্যেই উভয় ধরনের অপরাধের বিচার করা যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়র, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আতা, তাঊস ও শবী বলেছেন, বাইরে হত্যাকার্য করে হারামে আশ্রয় নিলে তাকে হত্যা করা যাবে না। ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ তবে তার সঙ্গে বসা যাবে না, তাকে সহযোগিতা দেয়া যাবে না, তার নিকট কিছু বিক্রয় করা যাবে না, যেন সে হারাম থেকে

বাইরে আসতে বাধ্য হয়। আর বের হলেই তাকে হত্যা করা হবে। যদি সে হারামের মধ্যে অপরাধ করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। কাতাদাহ্ ও হাসান থেকে বর্ণিত, হারামের ভেতরে অপরাধ করুক, কি অন্যত্র, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হারাম নিষেধ করে না। হাসান বলতেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে লোক-ই সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হবে' জাহিলিয়াতের অবস্থার বর্ণনা মাত্র। তখন সর্ব প্রকারের অপরাধ করেও যে হারামে প্রবেশ করতে পারবে তার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হতো না হারাম থেকে বাইরে না আসা পর্যন্ত। ইসলাম এসে এ নীতিকে আরও শক্ত ও তীব্র করেছে। যে লোক দণ্ডের যোগ্য সে হারামে আশ্রয় নিলে তার উপর দণ্ড কার্যকর করা হবে।

হিশাম হাসান ও আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজনই বলেছেন, হারামের বাইরে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করে হারামে আশ্রয় নিলে তাকে হারাম থেকে বহিষ্কৃত করা হবে এবং তার বিচার করা হবে। মুজাহিদও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত তার সাথে উঠা-বসা না করা, কেনা-বেচা না করার দ্বারা তাকে বের হতে বাধ্য করার কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। উক্ত আয়াতাংশের তাফসীর হিসেবে আতা থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ও হাসান থেকে অপরাধীকে বাইরে বের করা পর্যায়ে এ একই তাৎপর্য সকলের নিকট গ্রহণীয় বলে মনে হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ মসজিদে হারামের নিকট করবে না, যতক্ষণ তারা তা করতে শুরু না করবে'-এর তাৎপর্য 'এবং যে লোক তথায় প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হবে' এর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে যথাস্থানে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। আমরা তার কারণস্বরূপ বলেছি যে, 'হারামে প্রবেশই তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করে যখন সে তথায় আশ্রয় নেবে যদি তার অপরাধ হারামে না হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মন্তব্য ও বক্তব্য ইতিপূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি। তার প্রমাণ করে যে, হারামের বাইরে নরহত্যা করে হারামে আশ্রয় নিলে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। কেননা হাসান থেকে এ পর্যায়ে দুটি কথা বর্ণিত হয়েছে। কথা দুটি পরস্পর বিরোধী। তার একটি কাতাদাহ্‌র বর্ণনা ঃ তাকে হত্যা করা যাবে। আর অপরটি হিশাম ইবনুল হাস্‌সানের বর্ণনা ঃ তাকে হারামে হত্যা করা যাবে না; বরং তাকে হারাম থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে, তার পরে হত্যা করা যাবে। আমরা এ-ও বলেছি যে, বহিষ্কৃত করার কাজটি সম্ভবত তার পক্ষে হারামকে সংকীর্ণ করে, তার সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ না করেই করতে হবে। তাতে সে হারামের বাইরে যেতে বাধ্য হবে। ফলে এতে দুটি বর্ণনার মাঝে বিরোধিতার কোন কথা হাসান-এর পক্ষে পাওয়া গেল না। থাকল অপর দুটি কথা, যা সাহাবা ও তাবেয়ীনের মত। তা হল, হারামের বাইরে করা অপরাধের কিসাস হারামের মধ্যে করা নিষিদ্ধ। তবে হারামের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যে তাকে পাকড়াও করা এবং মামলার মাধ্যমে তাকে হত্যা বা যে দণ্ডই সে পেতে পারে দেয়া যাবে। এ পর্যায়ে আগেরকালের ও পরবর্তী কালের ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى -

হত্যার কিসাস করা তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮)

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا -

যে লোক অকারণ নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে একটা কর্তৃত্ব বানিয়ে দিয়েছি ....
(সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩৩)

এ আয়াতদ্বয় সাধারণভাবেই কিসাস বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, তা হারামের মধ্যে হোক বা বাইরে।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'যে-ই সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা পাবে' দাবি করে যে, হারামের বাইরে কৃত অপরাধে অপরাধী হত্যা থেকে রক্ষা পাবে। আর 'কিসাস ফরয করা হয়েছে' ও এ পর্যায়ের যেসব আয়াত কিসাস বাধ্যতামূলক করে, তা— যেমন পূর্বে বলেছি— হারামে প্রবেশ করার দরুন নিরাপত্তার উপর বিন্যস্ত। এসব আয়াত কিসাস সংক্রান্ত সাধারণ আয়াত থেকে বিশেষীকৃত— স্বতন্ত্র অবস্থায় প্রযোজ্য। উপরন্তু 'তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে' আল্লাহ্র এ কথাটি কিসাস বাধ্যতামূলক করার জন্য অবতীর্ণ। হারাম সম্পর্কে তাতে কিছুই নেই। পক্ষান্তরে 'যে লোক সেখানে প্রবেশ করবে নিরাপদ হবে' কথাটি হারাম সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্ধৃত।' যে সেখানে আশ্রয় নেবে তার সম্পর্কে এ কথা। এমতাবস্থায় একটি কথা নিজ নিজ কৃত সম্পর্কে যে নির্দেশ করবে এবং নিজের অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হবে অবিসংবাদিতভাবে। আর কিসাস সংক্রান্ত আয়াত হারাম প্রসঙ্গে আসতে পারবে না।

অপর দিক থেকে বলা যায়, কিসাস বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারটি হারামে নিরাপদ হওয়ার অগ্রবর্তী ব্যাপার। কেননা কিসাস বাধ্যতামূলক না হলে এবং তা অগ্রবর্তী ব্যাপার না হলে হারামে তার নিরাপত্তা লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না, তার উপর কোন হক্-এর দাবিও উঠতে পারত না। অতএব হারামে প্রবেশ করার পর নিরাপত্তা লাভের ব্যাপারটির প্রশ্ন তার পরে আসবে। আর হাদীসের দিক দিয়ে ইবনে আব্বাস ও আবূ শুরাইহ আশ শবী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে হারাম বানিয়েছেন। আমার পূর্বে অন্য কারোর জন্যে সেখানে রক্তপাত হালাল করেন নি। আমার পরেও তা কারোর জন্যে হালাল হবে না। আমার জন্যেও শুধু দিনের বেলা ঘন্টাখানিক সময়ের জন্যে মাত্র হালাল করা হয়েছিল।

এ হাদীস-ই প্রমাণ করে যে, সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীর অপরাধের এবং তার মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যে কাউকে হত্যা করা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। তবে তার মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যে অপরাধীকে অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে— এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। এক্ষণে বাইরে অপরাধ করে সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারটি বিবেচ্য। হাম্মাদ ইবনে সালামাতা হাবীব মুয়াল্লিম-আমর ইবনে শুয়াইব— তাঁর পিতা— তাঁর দাদা সূত্রে নবী করীম (স) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকটই সর্বাধিক খারাপ ও দুষ্ট প্রকৃতির সে, যে হত্যাকারীর পরিবর্তে অপর জনকে হত্যা করল কিংবা হারামে হত্যা করল অথবা হত্যা করল জাহিলিয়তের প্রতিশোধ স্বরূপ।

এ হাদীস-ও সাধারণভাবে হারামে অবস্থানকারী যে-কাউকে হত্যা করাকেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অতএব এ থেকে বিশেষীকরণ সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র দলীলের ভিত্তিতে। তবে হত্যার কম মানের অপরাধের জন্যে অপরাধীকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। কেননা হতে পারে, কোন ঋণী ব্যক্তি ঋণ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে হারামে আশ্রয় নিয়ে বসেছে। তাকে আটক করা হবে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'ঋণগ্রস্তকে পাওয়া গেলে তাকে ধরা ও শাস্তি দেয়ার অধিকার আছে।' ঋণের জন্যে আটক করা-ই তার শাস্তি। এ হচ্ছে হত্যার কম মানের অপরাধের ব্যাপার। অতএব হত্যার কম মানের যে হক তার প্রত্যেকটার জন্যেই পাকড়াও করা হবে, হারামে আশ্রয় নিলেও। ঋণের ব্যাপারে আটক করার সঙ্গে তুলনা (কিয়াস) করেই এ মত দেয়া হয়েছে। হত্যার কম মানের অপরাধে— কোন কিছু পাওনা থাকলে তাকে পাকড়াও করা জায়েয হওয়া ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে হারামে করা অপরাধে অপরাধকারীকেও তার অপরাধে জন্যে পাকড়াও করা হবে হত্যার অপরাধে এবং তার কম মানের অপরাধেও। হারামের বাইরে অপরাধ করে তারপর হারামে প্রবেশ করলে হারামে তাকে হত্যা করা জরুরী নয়। বরং তার সাথে ক্রয়-বিক্রয় না করা, তাকে কোনরূপ সহযোগিতা না দেয়া কর্তব্য হবে, যেন সে হারামের বাইরে যেতে বাধ্য হয়। হত্যাপরাধীকে হারামে হত্যা না করাই আমাদের নিকট প্রমাণিত মত, তাই অপর হুকুমটি তার উপর কার্যকর করতে হবে। আর তা হচ্ছে, তার সাথে ক্রয়-বিক্রয় না করা, তাকে কোনরূপ সহযোগিতা না দেয়া। এ সমস্ত বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে হারামের বাইরে অপরাধ করে লোক হারামে আশ্রয় নিয়েছে তার সম্পর্কে কি করা হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা ইতিপূর্বের আলোচনায় এ বিষয়ের দলীল পেশ করেছি। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও। তা একটা ঐকমত্যের ধারায় ফেলতে হবে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস ইবনে কামিল, ইয়াকুব ইবনে হুমায়দ, আবদুল্লাহ্ ইবনুল অলীদ, সুফিয়ান সওরী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির— জাবির সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَسْكُنُ مَكَّةَ سَافِكُ دَمٍ وَلَا آكِلُ رِبًا وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ -

মক্কায় কোন রক্তপাতকারী, সূদখোর ব্যক্তি, চোগলখোর ব্যক্তি বাস করতে পারবে না।

এ হাদীস-ও প্রমাণ করে যে, হত্যাকারী হারামে প্রবেশ করলে তাকে আশ্রয় দেয়া যাবে না, তার সাথে উঠাবসা, ক্রয়-বিক্রয় ও পানাহারের সুযোগ করে দেয়া যাবে না, তা চলবে যদ্দিনে সে সেখান থেকে বাধ্য হয়ে বাইরে না আসছে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ কোন রক্তপাতকারী মক্কায় বাস করতে পারবে না।

আবদুল বাকী আহমদ ইবনুল হাসান ইবনে আবদুল জব্বার, দাউদ ইবনে আমর, মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম, ইবরাহীম ইবনে মায়সারাতা, তায়ূস, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ হত্যাকারী হারামে প্রবেশ করলে তার সাথে উঠা-বসা, ক্রয়-বিক্রয় ও আশ্রয়দানের কাজ করা যাবে না। তার সন্ধানকারী যখন তার পেছনে পেছনে এসে বলবে ঃ অমুকের রক্তপাতের দরুন তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হারামের বাইরে নিয়ে যাবে।

'যে লোক হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হবে' আল্লাহ্‌র এ কথাটির দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র এ কথাটি ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ -

লোকেরা কি দেখেনি, আমরা হারামকে নিরাপদ— শান্তিপূর্ণ বানিয়েছি। অথচ তার চারদিকে মানুষকে ছিনতাই করে নেয়া হচ্ছে। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৭)

এ কথাও ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا -

আমরা কি তাদের জন্যে একটি নিরাপত্তাপূর্ণ হারাম প্রতিষ্ঠিত করিনি ?(সূরা কাসাস ঃ ৫৭)

এ কথাও ঃ

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا -

আমরা যখন আল্লাহ্‌র ঘরকে লোকদের জন্যে আবর্তন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা পূর্ণ বানিয়েছি। (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)

এ আয়াত কয়টি প্রায় একই অর্থ জ্ঞাপন করে। প্রমাণ করে, হত্যাপরাধ করে হারামে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ যদিও হারামে প্রবেশের পূর্বে সে হত্যার শাস্তিতে হত্যার যোগ্য ছিল। এ আয়াতসমূহে কখনও 'আল-বায়ত' (ঘর) বলা হয়েছে, কখনও বলা হয়েছে 'হারাম'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শান্তি— নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়ায় সমগ্র হারাম আল্লাহ্‌র ঘরের অন্তর্ভুক্ত। এ ঘরে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা যাবে না— এ বিষয়ে কোন মতভেদও নেই। কেননা আল্লাহ্ এ ঘরের পরিচয় দিয়েছেন শান্তি ও নিরাপত্তা কেন্দ্র হিসেবে। তাই সমগ্র হারাম সম্পর্কেও এ আইন কার্যকর হবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে।

যদি বলা হয়, যে লোক আল্লাহ্‌র ঘরের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাল, তাকে সেখানে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু যে লোক হারামের মধ্যে হত্যা করল, তাকে হত্যা করা যাবে। এ পার্থক্যের কারণে আল্লাহ্‌র ঘর ও হারাম তো এক ও অভিন্ন হল না।

জবাবে বলা যাবে, বিরাট মর্যাদার দিক দিয়ে ঘরের হুকুমই হারামের হুকুম আল্লাহ্ এক করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর কালামে কখনও ঘর এবং কখনও হারাম উল্লেখ করেছেন। এজন্যে উভয় সমান ও অভিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যে বিষয়ে বিশেষ দলীল পাওয়া যাবে, সে দলীল অনুযায়ী সে বিশেষ কাজটি করা যাবে। ঘরের মধ্যে হত্যাকারীর ব্যাপারে বিশেষ দলীল পাওয়া গেছে। তাই তার বিশেষীকরণ বাঞ্ছনীয়। থেকে গেল হারাম সংক্রান্ত হুকুম। কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক দাবি হল উভয়ের সমান হওয়ার। আসল ও প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

হজ্জ ফরয

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -

আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতে সামর্থ্যবান লোকদের উপর আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করা ফরয।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ হল, আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের পথের উপর সামর্থ্য থাকার শর্তের ভিত্তিতে হজ্জ করা লোকদের জন্যে বাধ্যতামূলক ফরয। পথ সংক্রান্ত হুকুমের তাৎপর্য হল, যার-ই ইচ্ছে পৌছা সামর্থ্যভুক্ত, তারই জন্যে তা বাধ্যতামূলক, যখন সে পর্যন্ত পৌছার সাধ্য ও সামর্থ্য হবে। আর তা হচ্ছে— সে পর্যন্ত পৌছা সম্ভব হওয়া। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ -

বের হওয়ার কোন পথ খোলা আছে কি ? অর্থাৎ মনযিলে পৌছার পথ ? (সূরা মুমিন ঃ ১১)

বলেছেন ঃ

هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ -

ফেরত দেয়ার কোন পথ আছে কি ? (সূরা শূরা ঃ ৪৪)

এখানেও পৌছে যাওয়ার অর্থ নবী করীম (স) এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থের মধ্যে পাথেয় ও যানবাহনের ব্যবস্থাও শর্তের মধ্যে শামিল।

আবূ ইসহাক, হারিস, আলী নবী করীম (স) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً يُبْلِغُهُ بَيْتَ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْنَصْرَانِيًّا -

যে লোক পাথেয় ও যানবাহনের মালিক হল যা তাকে আল্লাহ্র ঘরে পৌঁছে দেবে, তার পরও সে হজ্জ করল না, এ ব্যক্তি ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান হয়ে মরবে, তার কোন পার্থক্য নেই।

আল্লাহ্র কথা ঃ যে লোক সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্যবান— আল্লাহ্র জন্যে আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করা সে লোকদের বাধ্যতামূলক ফরয।...... এতেও সে কথাই বলা হয়েছে। ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আল-জাওজী মুহাম্মাদ ইবনে উব্বাদ, ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স)-কে আল্লাহ্র কথা ঃ 'যাতায়াত পথে সামর্থ্যবান ব্যক্তিরই আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক ফরয' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ 'হজ্জের দিকে পথ' বলতে পাথেয় ও যানবাহন বোঝানো হয়েছে। ইউনুস হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এ আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ হে রাসূল سَبِيْل 'পথ' বলে এখানে কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? জবাবে বললেন ঃ পাথেয় ও যানবাহন। আতা আল-খুরাসানী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ السبيل অর্থ পাথেয় ও যানবাহন এবং তার ও ঘরের মধ্যে কারোর প্রতিবন্ধক না হওয়া। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন ঃ আয়াতে হজ্জের জন্যে পাথেয় ও যানবাহনের কথাই বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্ যে পথের সামর্থ্যের কথা বলেছেন, তার অর্থ পাথেয় ও যানবাহন থাকা ও পাওয়া যাওয়া। হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে এ দুটি জিনিস পাওয়ার মধ্যেই সামর্থ্য সীমাবদ্ধ নয়। কোন জীনের ভয়ে কাতর রোগী, যানবাহনে চলতে সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ, দুর্বল স্বাস্থ্য, আর যার যার পক্ষে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়, তারাও আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম বলে মনে করতে হবে এবং তাদের উপরও হজ্জ ফরয নয়। কেননা তাদের পাথেয় ও যানবাহন থাকলেও তারা হজ্জে যেতে সমর্থ হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হল, নবী করীম (স) যে পাথেয় ও যানবাহনের শর্ত করেছেন তা-ই সামর্থ্যের সকল শর্ত নয়। তা থেকে বোঝা গেল, যার পক্ষে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব, যে যদি পাথেয় ও যানবাহন না-ও পায়, তবু তার উপর হজ্জ ফরয, এ মতটি উপরোক্ত কথার ভিত্তিতে বাতিল প্রমাণিত হল। নবী করীম (স) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হজ্জ ফরয হওয়া বিশেষিত হয়েছে সওয়ার হওয়ার সাথে, পায়ে চলার সাথে নয়। যার পায়ে হেটে চলা ছাড়া— যা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর— কাবা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়, তার উপর হজ্জ ফরয নয়।

যদি বলা হয়, পাথেয় ও যানবাহন না পাওয়া অবস্থায় পায়ে হেটে যাওয়া সম্ভব হলে মক্কা ও ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ঘন্টাখানিকের দূরত্ব হওয়া হজ্জ ফরয হওয়ার বাধ্যতামূলক না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা যাবে, পায়ে চলে মক্কা যাওয়া যার জন্যে খুব কঠিন ও দুঃসহ কষ্টকর নয়, তার পক্ষে সহজ ব্যাপার হবে তার তুলনায়, যে পাথেয় ও যানবাহন পেল তার ঘর-বাড়ি মক্কা থেকে দূরবর্তী হওয়া অবস্থায়। একথা জানা যে, পাথেয় ও যানবাহনের শর্ত তো এজন্যে যে, পৌঁছতে যেন কষ্ট না হয়। চললে ক্ষতিকর কোন কিছু দেখা না দেয়। লোক যদি হয় মক্কার অধিবাসী ও মক্কার নিকটবর্তী এলাকার, তার পক্ষে দিনের বেলা ঘন্টাখানিক সময়ে পায়ে হেটে পৌঁছা সম্ভব। সে-ও কোনরূপ কষ্ট ছাড়া পৌঁছতে সক্ষম। আর কঠিন দুঃসহ কষ্ট ছাড়া যদি কাবা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব না হয়, আল্লাহ তার বেলায় আদেশকে হালকা করে দিয়েছেন। তার জন্যে হজ্জ বাধ্যতামূলক ফরয নয়। তবে রাসূল (স) বর্ণিত শর্ত পাওয়া গেলে হজ্জ বাধ্যতামূলক ফরয হবে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِىْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

দ্বীন পালনে তোমাদের উপর আল্লাহ কোন কষ্ট বা অসুবিধা চাপিয়ে দেন নি।

(সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মেয়েলোকের হজ্জ পালনে একটি বড় শর্ত হচ্ছে মুহরম ব্যক্তিকে সঙ্গে পাওয়া। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَسَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مُحْرَمٍ اَوْ زَوْجٍ -

তিন দিনের দূরত্বের পথে মুহরম পুরুষ বা স্বামীর সঙ্গ ছাড়া আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার মেয়েলোকের পক্ষে সফর করা হালাল নয়।

আমর ইবনে দীনার আবূ মাবদ, ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) ভাষণ দিয়ে বলেছেন ঃ 'কোন মেয়েলোক মুহরম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া সফর করবে না।' এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ হে রাসূল! আমি অমুক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালে আমার স্ত্রী হজ্জ করার ইচ্ছা করেছিল। সে কি হজ্জ করতে যাবে ? রাসূল (স) বললেন ঃ 'তুমি তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ করতে যাও।'

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলের কথা ঃ 'মুহরম সঙ্গী ছাড়া মেয়েলোক সফর করবে না' কথাটি হজ্জ করতে ইচ্ছুক মহিলাকেও শামিল করে। এর তিনটি কারণ। একটি, প্রশ্নকারী উক্ত কথা থেকে তা-ই বুঝতে পেরেছে। এ কারণে তার হজ্জের নিয়তকারী স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। নবী করীম (স) তা অস্বীকার বা প্রতিবাদ করেন নি। বোঝা গেল, নবী করীম (স) তাঁর নিষেধাত্মক কথাটি হজ্জ ও অন্যান্য সাধারণ সব রকমের সফরই শামিল করে। দ্বিতীয় রাসূল (স)-এর কথা ঃ 'তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর' এতেই 'মুহরম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া মেয়ে লোক সফরে যাবে না।' কথাটিও শামিল। আর তৃতীয়, সেই পুরুষকে যুদ্ধ ত্যাগ করে তার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করতে যাওয়ার হুকুম করলেন। মুহরম পুরুষ বা স্বামী সঙ্গী ছাড়া স্ত্রীর পক্ষে হজ্জ করতে যাওয়া যদি জায়েয-ই হতো, তাহলে তাকে যুদ্ধ ত্যাগ করে যাওয়ার অনুমতি নিশ্চয়ই দিতেন না। যুদ্ধ ছিল তার জন্যে ফরযে কিফায়া। এ কথায় এ মসলারও দলীল রয়েছে যে, স্ত্রীর হজ্জ ছিল ফরয, নফল নয়। কেননা তার হজ্জ যদি নফল হতো, তাহলে স্বামীকে যুদ্ধ ত্যাগ করে যেতে বলতেন না। তা স্ত্রীর হজ্জের তুলনায় নফল ফরয ছিল বলেই এরূপ বলেছিলেন।

আরও একটি দিক দিয়ে বিবেচনা করা যায়। নবী করীম (স) প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করেন নি যে, তার স্ত্রীর হজ্জ ফরয ছিল, না নফল। এতে এ দলীল রয়েছে যে, মুহরম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া স্ত্রীর ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ফরয হজ্জ ও নফল হজ্জের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীর জন্যে মুহরম পুরুষ সঙ্গী থাকা সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শর্ত। স্ত্রীর ইদ্দত পালন না হওয়াও সামর্থ্যের শর্তভুক্ত। এ ব্যাপারেও কোন মতভেদ নেই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ -

তোমরা ইদ্দত পালনে রত মেয়েলোকদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করো না, তারাও বাইরে যাবে না। তবে তারা যদি কোন নির্লজ্জতার কাজ করে তাহলে অন্য কথা।

(সূরা তালাক্ ঃ ১)

ইদ্দত পালনে রত না হওয়া যখন হজ্জের সামর্থ্যের শর্তভুক্ত, তখন মুহ্রম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া স্ত্রীর সফর নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যেও তা শামিল হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যানবাহনে চড়ে স্থির হয়ে থাকতে পারাও সামর্থের একটি শর্ত। তা এজন্যে যে, আবদুল

বাকী ইবনে কানে মূসা ইবনুল হাসান ইবনে আবূ উব্বাদ মুহাম্মদ ইবনে মুসয়িব আওয়ায়ী আ-যুহরী সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, খাশয়াম বংশের একটি মেয়েলোক বিদায় হজ্জের সময়ে নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, বলেছিল, হে রাসূল! আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্গণের উপর যে হজ্জ ফরয করেছেন, আমার পিতা তা বৃদ্ধাবস্থায় জানতে পারেন। তিনি যানবাহনে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? জবাবে রাসূল (স) বললেন— হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পার। এ হাদীসে নবী করীম (স) মেয়েলোকটিকে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করার অনুমতি দিলেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিকেই বাধ্যতামূলকভাবে হজ্জ করতে বলেন নি। এ থেকে বোঝা গেল, হজ্জে পৌঁছতে পারাটাও হজ্জের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত শর্ত। এ পর্যায়ের লোকদের জন্যে পাথেয় ও যানবাহন পাওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক না হলেও অন্যরা তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ করবে, এটা অত্যন্ত জরুরী। স্থায়ী রোগী, দুর্বল স্বাস্থ্যহারা ও মেয়েলোক— যারা হজ্জ করতে পারেনি, তাদের উপর হজ্জ ফরয হলে মৃত্যুকালে হজ্জ করার জন্যে তাদের অসিয়ত করে যাওয়া উচিত। তা এ জন্যে যে, হজ্জে পৌঁছার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের ধন-মাল তাদের মালিকানায় এসে গেলে তাদের সে ধন-মালের উপর হজ্জের ফরজিয়ত ধার্য হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কার্যত তারা যদি তা করতে না পারে, তাহলে অসিয়ত করে যাওয়া কর্তব্য। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার দুটি তাৎপর্য। একটি, পাথেয় যোগাড় হওয়া ও যানবাহন পাওয়া বা ব্যবহার করতে পারা এবং কার্যত তা নিয়ে হজ্জে চলে যেতে পারা। যার এরূপ অবস্থা হবে, তাকে হজ্জের জন্যে বের হয়ে পড়তে হবে। আর দ্বিতীয় দিক হল, তা ব্যক্তিগতভাবে নিজের পক্ষে করতে না পারা কোন রোগের কারণে বা বেশি বয়স হওয়ার কারণে, অথবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে অথবা এ কারণে যে, সেই মেয়েলোক. তার পক্ষে মুহরম পুরুষ বা স্বামীকে সঙ্গীরূপে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এ সব লোকের জন্যে তাদের ধম-মাল দ্বারা হজ্জ করার ব্যবস্থা করা কর্তব্য যখন তার কোন দিন সামর্থ্য হওয়ার আশাটুকুও থাকবে না। নিজে সে কাজ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। রোগী কিংবা মেয়েলোক যদি তাদের পক্ষ থেকে অন্য লোক দ্বারা হজ্জ করায়, অতঃপর রোগী কোন দিন ভাল হল না এবং মেয়েলোকও মুহরম পুরুষ সঙ্গী পেলো না, এমন কি দুজনই মৃত্যুমুখে পতিত হল, তাহলে এ দুজনার হজ্জের ফরয আদায় হয়ে যাবে। পরে যদি রোগী ভালো ও সুস্থ হয় এবং মেয়েলোক মুহরম সঙ্গী পেয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে তখন নিজেদেরকেই হজ্জ করতে হবে। খাশয়াম বংশের মেয়েলোকটি যে নবী করীম (স) -কে বলেছিল যে, আমার পিতা হজ্জ ফরয হওয়ার কথা এমন সময় জানতে পেয়েছেন বা তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এমন সময় যখন তিনি খুব-ই বৃদ্ধ, যানবাহনে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না এবং নবী করীম (স) তাকে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে বলেছেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার মাল-সম্পদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল, যদিও সে নিজে যানবাহনে চলে গিয়ে হজ্জ করতে সক্ষম নয়। কেননা মেয়েলোকটির কথা ছিল হজ্জের ফরজিয়াত তাকে এমন সময় পেয়েছে যখন সে বয়োবৃদ্ধ। নবী করীম (স) তার কথার প্রতিবাদ করেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার ধন-মালের উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল। নবী করীম (স) হজ্জ করতে আদেশ করলেন তাকেই, যে এ খরচ দিয়েছিল যে, তার জন্যে হজ্জ ফরয। তাই তার হজ্জ ফরয হওয়াই প্রমাণিত হয়।

গরীব ব্যক্তির হজ্জ করার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী মায্হাবের ফিকাহ্‌বিদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তার উপর হজ্জ ফরয নয়। যদি করে, তাহলে ইসলামের হজ্জ হিসেবেই তা আদায় হবে! ইমাম মালিকের মত বর্ণিত হয়েছে, সে যদি পায়ে হেঁটে কাবায় পৌঁছতে পারে, তাহলে তার উপর-ও হজ্জ ফরয। ইবনুল যুবায়র ও হাসান থেকে বর্ণিত, সামর্থ্য তাকে যতদূর পৌঁছায়, তা যেভাবেই হোক-না কেন। নবী করীম (স)-এর কথাঃ 'পাথেয় ও যানবাহন ব্যবহার করতে পারাই হচ্ছে সামর্থ্য। এ কথাই প্রমাণ করে যে, গরীব লোকের উপর হজ্জ ফরয নয়। তবু সে যদি কাবা পর্যন্ত পৌঁছে যায় পায়ে চলে, তাহলে সেখানেই সে সামর্থ্যবান হয়ে গেল, যেমন মক্কার অধিবাসীদের ব্যাপার। কেননা এ তো জানা কথা যে, পাথেয় ও যানবাহনের প্রশ্ন কেবল দূরের লোকদের বেলায়। গরীব ব্যক্তি যখন কোন-না-কোন ভাবে মক্কায় পৌঁছে গেছে, তখন পাথেয় ও যানবাহনের কোন প্রশ্ন থাকে না। নতুন করে সেখানে পৌঁছার কথা উঠবে না। তাই তার জন্যে হজ্জ বাধ্যতামূলক হবে তাৎক্ষণিকভাবে। তাই সে যখন হজ্জ করবে তখন সে তা করবে তার উপর ধার্য হওয়া ফরয হিসেবেই।

ক্রীতদাস সম্পর্কেও মতের বিভিন্নতা রয়েছে। সে যদি হজ্জ করে, তাহলে তা কি ইসলামের বিধান মুতাবিক হজ্জ হবে! হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদদের মত হল, তার হজ্জ হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তার হজ্জ আদায় হবে। হানাফী মাযহাবের মতের যথার্থতার প্রমাণ হচ্ছে সেই হাদীস, যা আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম, হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ রবীআতা ইবনে সুলায়মের মুক্ত দাস, আবু ইসহাক, হারিস, আলী (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যে লোক পাথেয় ও যানবাহনের মালিক হল, যা তাকে আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তা সত্ত্বেও যদি সে হজ্জ না করে তাহলে সে ইয়াহূদী হিসেবে মরুক কি খ্রীস্টান হিসেবে তার কোন হিসেব নেই। রাসূল (স)-এর এ কথাটি আল্লাহ্‌র এ কথারই ভাবগত অর্থ ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ سْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ -

আল্লাহ্‌র জন্যে কাবা ঘরের হজ্জ করা ফরয সেই লোকের, যে সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য লাভ করবে। আর যে হজ্জ ফরয হওয়াকে অমান্য করবে, আল্লাহ সারে জাহানের উপর অ-নির্ভরশীল।

এ প্রেক্ষিতেই নবী করীম (স) জানিয়েছেন যে, হজ্জ বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত হচ্ছে পাথেয় ও যানবাহন পাওয়া। আর ক্রীতদাস যেহেতু কোন কিছুর মালিক হয় না। এ কারণে হজ্জ ফরয হয়েছে যাদের জন্যে, সে তাদের মধ্যে গণ্য নয়। সামর্থ্য পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবটাতেই পাথেয় ও যানবাহন ব্যবহারের অধিকারী বা মালিক হওয়াকে সামর্থের শর্ত বলা হয়েছে। হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসেও তাই বলা হয়েছে। এ-ও জানা যে, পাথেয় ও যানবাহনের শর্তের তাৎপর্য নবী করীম (স)-এর নিকট সামর্থ্যবানের নিজের ওদুটির মালিক হওয়া। অন্য লোকের মালিকানাভুক্ত পাথেয় ও যানবাহনের কথা

নিশ্চয়ই বলা হয়নি। ক্রীতদাস যখন কোন অবস্থায়ই কোন কিছুর মালিক হয় না, তখন তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার কথা বলাও হয়নি। অতএব সে হজ্জ করলেও তা হবে না।

যদি বলা হয়, গরীব ব্যক্তির উপর-ও হজ্জ ফরয করা হয়নি। কেননা পাথেয় ও যানবাহনের সে মালিক বা অধিকারী নয়। তা সত্ত্বেও সে কোন-না-কোন ভাবে হজ্জ করলে তা হয়ে যাবে, ক্রীতদাসেরও তাই হওয়া উচিত।

জবাবে বলা যাবে, দরিদ্র ব্যক্তি ও তাদের মধ্যে যাদের উপর হজ্জ ফরয। কেননা সে তো মালিক হতে পারে। কিন্তু ক্রীতদাস সেরূপ নয়। তবু গরীবের উপর এখন হজ্জ ফরয নয় এ জন্যে যে, সে এ মুহূর্তে ওদুটি জিনিস পাচ্ছে না। তা এজন্য নয় যে, সে তার মালিক হওয়ার অধিকারী নয়। তাই সে যখন মক্কায় পৌঁছে যাবে, তখন পাথেয় ও যানবাহনের মুখাপেক্ষী থাকবে না। তখন সে সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে, যারা ওদুটি পেয়েছে এবং মক্কায় পৌঁছেছে সেই পাথেয় খরচ করে ও যানবাহনে সওয়ার হয়ে। হজ্জ ফরয হওয়ার ফরমানটি ক্রীতদাসদের প্রতি নয়, তার কারণ এ নয় যে, সে পাথেয় ও যানবাহন পাচ্ছে না। তা এজন্যে যে, সে তার মালিক হতে পারে না। মালিক হলেও সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে না যাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। এ কারণে সে হজ্জ করলেও তা হবে না। এক্ষেত্রে সে অল্প বয়স্ক বালকের পর্যায়ে গণ্য। বালকের উপর হজ্জ ফরয নয়। তার কারণ এ নয় যে, সে পাথেয় ও যানবাহন পায় না। বরং এ জন্যে যে, তার উপর হজ্জের ফরমান জারি-ই হয়নি। কেননা তার প্রতি এ ফরমান জারি হওয়ার শর্ত হচ্ছে পাথেয় ও যানবাহনের মালিক হওয়া। যেমন তার একটি শর্ত হল এই যে, তার প্রতি ফরমান জারি হওয়া সহীহ্ হবে। তাছাড়া ক্রীতদাস তো ধন-মালের ফায়দা পেতে পারে না। তার মনিবের অধিকার আছে হজ্জে যেতে তাকে নিষেধ করার। এটা সর্ববাদীসম্মত কথা। ক্রীতদাসের যা কিছু ফায়দা তা তার মনিবের মালিকানা। সে যদি হজ্জ করে তাহলে তা তার মনিবের করা হজ্জ হয়ে যাবে। অতএব তার হজ্জ ইসলামসম্মত হজ্জ হবে না। সে কথার এ-ও একটি প্রমাণ যে, ক্রীতদাস সংগৃহীত পাথেয়র ফায়দা ব্যবহারে মালিক হতে পারে না। মনিব তার পাথেয় মাল ভোগ করার অধিকারী। তাছাড়া মনিবের খিদমত করাই তার কাজ, সে তাকে হজ্জে যেতে নিষেধ করতে পারে। মনিব যদি অনুমতি দেয়ও তবুও সে যেন ফায়দার মালিকত্ব তাকে ধার দিল। এতে মনিবের মালিকানা বিনষ্ট করা হবে। এ কারণে ক্রীতদাসের হজ্জ হবে না। গরীব মানুষ সেরূপ নয়। কেননা সে তার মুনাফার নিজেই মালিক। তার দ্বারা যদি সে হজ্জ করে, তাহলে তার হজ্জ আদায় হবে। কেননা এক্ষণে সে সামর্থ্যবান লোকদের একজন।

যদি বলা হয়, মনিব দাসকে জুম'আর নামায পড়া থেকেও বিরত রাখতে পারে। আর জুম'আর নামায যাদেরকে পড়তে বলা হয়েছে, ক্রীতদাস তাদের মধ্যেও গণ্য নয়। তার উপর তা ফরয নয়। তা সত্ত্বেও যদি সে জুম'আর নামাযে যায় ও তা আদায় করে, তাহলে তার জুম'আ আদায় হবে। তাহলে হজ্জ কি সে রকম হতে পারে না?

জবাবে বলা যাবে, যুহর নামায তার উপর ফরয। তা পড়তে নিষেধ করার—তা পড়া থেকে বিরত রাখার মনিবের কোনই অধিকার নেই। তাই সে জুম'আ পড়লে তার উপর থেকে যুহরের ফরয পড়ে যাবে যা পড়ার সে অধিকারী ছিল এবং সে জন্যে মনিব-মালিকের অনুমতিরও কোন

প্রশ্ন থাকতে পারে না। ফলে সে জুম'আর নামায পড়ে যেন যুহরের ফরযটাই আদায় করল। এ কারণে তা হবে। দসের উপর অপর এমন কোন ফরয ধার্য নয়, যা করার সে অধিকারী। ফলে হজ্জ আদায় করে সে কোন ফরয আদায়ের কাজ করল না। তাই তা হওয়ার রায়ও আমরা দিতে পারি না। তা করলে সে এমন কাজ করেছে যা করার সে মালিক ছিল, তা আমরা বলতে পারি না। এ কারণে দাস ও গরীব ব্যক্তির হজ্জ পালন এক জিনিস নয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত ক্রীতদাসের হজ্জ পালন সম্পর্কে এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে বশর ইবনে মূসা, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক, ইয়াহয়া ইবনে আয়ূব, হরা ইবনে উসমান, জাবিরের দুই পুত্র, তাদের পিতার সূত্রে আম্মদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ কোন বালক যদি দশটি হজ্জও করে, পরে সে পূর্ণ বয়স্কতা পায়, তবুও তার মক্কা পৌঁছার সামর্থ্য হলে তাকে আবার হজ্জ করতে হবে। কোন আরব বদ্দু যদি দশবারও হজ্জ করে এবং পরে সে হিজরত করে তাহলেও তাকে আবার হজ্জ করতে হবে, যদি সে সামর্থ্য লাভ করে। যদি কোন মনিবের মালিকানাভুক্ত— ক্রীতদাস দশটি হজ্জও করে, পরে সে দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত হতে সামর্থ্য লাভ করে, তাহলে তাকে আবার হজ্জ করতে হবে।

আবদুল বাকী মূসা ইবনুল হাসান ইবনে আবূ উবাদ, মুহাম্মাদ ইবনুল মিনহাল, ইয়াযীদ ইবনে জুরাই, শবাতা, আমাশ, আবূ যুবইয়ান, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে বালকই হজ্জ করবে, পরে সে পূর্ণ বয়স্ক হলে আর একটি হজ্জ তাকে করতে হবে। যে আরব বেদুঈন-ই হজ্জ করবে; সে হিজরত করে, তাহলে তাকে আর একটি হজ্জ করতে হবে। আর যে ক্রীতদাস হজ্জ করবে, পরে সে মুক্তি পেলে তার কর্তব্য হবে আর একবার হজ্জ করা।' এ হাদীসে নবী করীম (স) ক্রীতদাসকে আর একটি হজ্জ করা কর্তব্য করে দিয়েছেন। পূর্বে দাসত্বাবস্থায় কৃত হজ্জকে তিনি হজ্জ গণ্য করেন নি। তার সে হজ্জকে নাবালকের হজ্জের মত মনে করেছেন।

যদি বলা হয়, রাসূলে করীম (স) অনুরূপ কথা আরব বেদুঈন সম্পর্কেও বলেছেন। তা সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বে করা তার হজ্জকে হজ্জ গণ্য করেছেন।

জবাবে বলা যাবে, হিজরত ফরয হওয়ার পূর্বে মরু-বেদুঈন সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে হিজরত ফরয না থাকা অবস্থায় সে কথা বলা যায় না। নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের পর বলেছেন ঃ 'মক্কা জয়ের পর হিজরত ফরয নয়।' হিজরতের পর পুনরায় হজ্জ করার কর্তব্যটা অতঃপর অবশিষ্ট থাকল না। তখন আবার হজ্জ করা ফরয নয়।

ক্রীতদাসের হজ্জ সম্পর্কে আমরা যা বলেছি, সে কথাই ইবনে আব্বাস, হাসান ও আতা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথাঃ 'আল্লাহ্‌র লোকদের কর্তব্য বায়তুল্লাহ হজ্জ করা' এর বাহ্যিক অর্থ একটি হজ্জ করারই দাবি করে। কেননা তাতে বারবার হজ্জ করার কথা বা তার ইশারাও কোথাও নেই। তাই যখনই কেউ হজ্জ করল, আয়াত অনুযায়ী তার কর্তব্য পালিত হয়ে গেছে মনে করতে হবে। নবী করীম (স) সে বিষয়ে তাগিদ করে বলেছেন যা ইয়াযীদ ইবনে হারুন, সুফিয়ান ইবনে হুসেইন, জুহরী, আবূ সিনান, আবূ দাউদ, দুয়ালী, ইবনে আব্বাস

সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। আক্‌রা ইবনে হাবিস (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট প্রশ্ন করে বললেন, হে রাসূল! হজ্জ কি প্রত্যেক বছরই করতে হবে কিংবা একবার মাত্র ?জবাবে তিনি বললেন, না বরং মাত্র একবার। যদি কেউ এর বেশি বার করে তাহলে তা হবে নফল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ -

যে লোক হজ্জের ফরয হওয়াকে অমান্য করবে, আল্লাহ তো সারাজাহান থেকে অমুখাপেক্ষী।

অকী ফতর ইবনে খলীফা, নুকাই আবূ দাউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে 'যে লোক অমান্য করল' এ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে বলেছিলেন ঃ কাফির যদি হজ্জ করে তবে সে সওয়াব পাওয়ার আশা করতে পারে না। আর যদি সে আটক হয়, তাহলে তার পরিণতিকে ভয় করবে না। মুজাহিদ-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাসান বলেছেন ঃ তার অর্থ, যে লোক হজ্জ করতে অস্বীকার ও হজ্জের হুকুম অমান্য করবে ...। এর আয়াতটি জবরিয়া ফিরকার মতকে বাতিল প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ যে লোক পাথেয় ও যানবাহন পাবে, সে হজ্জ করার সামর্থ্যবান হবে। তা কার্যত করার পূর্বেই। কিন্তু ওদের মত হল— যে হজ্জ কার্যত করেনি সে সামর্থ্যবান কখনই হয়নি। তাই ওদের মাযহাব মাযুর— অক্ষম গণ্য হবে, বাধ্যবাধকতা মুক্ত হবে কার্যত হজ্জ না করা পর্যন্ত। কেননা আল্লাহ হজ্জকে বাধ্যতামূলক করেছেন তার জন্যে যে তা করতে সামর্থবান্য হয়েছে। আর হজ্জ না করা পর্যন্ত সে সামর্থবানও হয় নি। তাই কুরআনের আয়াত ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐকমত্য হয়েছে এ কথায় যে, হজ্জের ফরয বাধ্যতামূলক তার জন্যে, যার সেই সামর্থ্য আছে। অর্থাৎ শারীরিক সুস্থতা ও পাথেয় যানবাহন প্রাপ্তি। ফলে ওদের মত বাতিল প্রমাণিত হল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَاءُ -

হে আহলি কিতাব লোকেরা! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দাও সেই ব্যক্তিকে যে ঈমান গ্রহণ করেছে ? তোমরা সেই পথকে বাঁকা করতে চাও, এ অবস্থায় যে তোমরা সব প্রত্যক্ষদর্শী।

জায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন, একদল ইয়াহূদীদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তারা আওস ও খাজরাজ বংশের লোকদেরকে পারস্পরিক ঝগড়ার উস্কানি দিতেছিল। তাদের মধ্যকার প্রাচীনকালের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে গোত্রীয় প্রতিহিংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা দ্বীন-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ছিল। এটা ছিল জাহিলিয়াতের আত্ম-অহংকারের ব্যাপার।

হাসান থেকে বর্ণিত, এ আয়াতটি ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান সকলের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। কেননা তারা সকলেই তাদের কিতাবে লিখিত রাসূল (স)-এর গুণ-পরিচিতি গোপন করেছিল।

যদি বলা হয়, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির লোকদেরকে 'শহীদ' বলেছেন। অথচ তারা অন্য লোকদের জন্যে অকাট্য প্রমাণ নয়। তাই لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 'তোমরা লোকদের জন্যে শহীদ— অকাট্য দলীল বা পথ-প্রদর্শক হবে' এ দলীলের ভিত্তিতে 'ইজমায়ে উম্মত' ও অকাট্য দলীলের প্রমাণ বলে আখ্যায়িত কর, তা সহীহ্ হতে পারে না।

এর জবাবে বলা যাবে, মহান আল্লাহ্ আহলি কিতাব লোকদেরকে বলেন নি যে, তোমাদের অন্যদের জন্যে শহীদ বা পথ-প্রদর্শক— অকাট্য দলীল। কিন্তু মুসলিম উম্মাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ তোমরা সকল মানুষের জন্যে শহীদ— সাক্ষ্যদাতা, পথ প্রদর্শক। যেমন তার পরে বলেছেন ঃ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا -

এবং রাসূল হচ্ছে তোমার জন্যে শহীদ, পথ-প্রদর্শক, নেতা (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

ফলে এ আয়াত দ্বারা মুসলিম উম্মতের সত্যতা এবং তাদের ইজ্মার যথার্থতা আল্লাহ নিজেই সপ্রমাণিত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতের অংশ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ এর অর্থ এবং شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এর অর্থ ও তাৎপর্য এক এবং অভিন্ন নয়। এর অর্থে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি 'তোমরা শহীদ' অর্থ ঃ তোমরা অবহিত, জান শুন যে, তোমাদের কথা বাতিল যা তোমরা আল্লাহ্র দ্বীন থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার জন্যে বল। আর এ ধরনের লোক আহলি কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আর দ্বিতীয়, شُهَدَاءُ অর্থ عُقَلَاءُ বুদ্ধিমান, বিবেকবান। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ -

অথবা যে খুব লক্ষ্য দিয়ে কান পেতে কথা শুনে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে। (সূরা ক্বাফ ঃ ৩৭)

অর্থাৎ সে সমঝদার। কেননা সে অকাট্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে, যার দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যেমন ভয় তাঁকে করা উচিত।

আবদুল্লাহ, হাসান ও কাতাদাহ থেকে حَقَّ تُقَاتِهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তা হল, তাঁর আনুগত্য করা হবে এমনভাবে যে, তাঁর নাফরমানী করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। তাঁর শোকর করবে, না-শোকরি বা কুফরি কখনই করবে না। তাঁকে স্মরণে রাখবে এমনভাবে যে, কখনই ভুলে যাবে না। এ-ও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ সর্ব প্রকারের নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে।

এ আয়াত মনসূখ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন কথা এসেছে। ইবনে আব্বাস ও তায়ূস থেকে

বর্ণিত, এ আয়াত মুহকাম, সুদৃঢ়, প্রতিষ্ঠিত, কখনই মনসূখ হয়নি। আর কাতাদাহ্, রুবাই ইবনে আনাস ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত, তাঁদের মতে এ আয়াতটি মনসূখ হয়েছে এ আয়াত দ্বারা ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ -

অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যতটা সামর্থ্যবান হও। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এ আয়াত কখনই মনসূখ হতে পারে না। কেননা তার অর্থ হল, সর্বপ্রকারের গুনাহ্ নাফরমানীর কাজকে ভয় করে পরিহার করা। শরীয়াত পালনে বাধ্য সকল মানুষেরই কর্তব্য সর্বপ্রকারের গুনাহ্ নাফরমানী থেকে দূরে সরে থাকা। এ আয়াত যদি মনসূখ হয়ে গিয়ে থাকত, তাহলে কোন কোন গুনাহ্ নাফরমানীর কাজ করা মুবাহ হয়ে যেত। কিন্তু তা কখনই জায়েয হতে পারে না।

বলা হয়েছে, তা মনসূখ মনে করা যেতে পারে যদি তার অর্থ এই করা হয় যে, ভয় ও শাস্তির অবস্থায় আল্লাহ্‌র হক আদায় করা এবং তাতে 'তাকীয়া' তরক করা। পরে এ 'তাকীয়া' করার অবস্থায় ও জোরজবরদস্তির মুখে তা মনসূখ মনে করা। আর দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে مَا اسْتَطَعْتُمْ 'যতটা সক্ষম হবে তোমরা' কথাটির প্রয়োগ হবে সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে তোমরা নিজেদের উপর বিপদের আশংকা বোধ কর না। বোঝাতে চাওয়া হয়েছে সেসব অবস্থা যাতে মার-পিট ও হত্যাকাণ্ডের আশংকা হবে না। কেননা যেসব কাজ করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য বা কষ্টকর, তাতে সামর্থ্য না হওয়ার কথা বলা হয়। যেমন আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا -

তারা শুনতে সক্ষম হচ্ছিল না। (সূরা কাহাফ ঃ ১০১)

তার অর্থ, শ্রবণ কাজটি তাদের জন্যে খুবই কষ্টদায়ক ছিল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -

তোমরা সকলে সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধর।

নবী করীম (স) থেকে حبل শব্দের অর্থ বর্ণিত হয়েছে ঃ এখানে এ শব্দের অর্থ কুরআন। আবদুল্লাহ্, কাতাদাহ ও সুদ্দী থেকে একথা বর্ণিত হয়েছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, এ শব্দটি দ্বারা দ্বীন-ইসলাম বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে, এর অর্থ, আল্লাহ্‌র সাথে কৃত চুক্তি। কেননা তা মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়। যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তি একটা রজ্জু পেয়ে তা ধরে নিজেকে উপকূলে তুলতে পারে, এ-ও তেমনি। নিরাপত্তাদান حبل বা রজ্জু বলা হয়। কেননা নিরাপত্তা ও মুক্তিলাভের একটা উপায়। যেমন আল্লাহ্‌র কথায় সে অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ -

ওরা লাঞ্ছিত দারিদ্র্য পীড়িত। তবে যদি তারা আল্লাহ্‌র রজ্জু ও মানুষের রজ্জু পায় তবে ....।

এ আয়াতে শব্দটি 'নিরাপত্তা' অর্থেই ব্যবহৃত। তবে তোমরা সকলে সম্মিলিত—ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জু শক্ত করে ধারণ কর। এ আয়াতে ঈমানদার লোকদিগকে ঐক্যবদ্ধ হতে আদেশ করা হয়েছে এবং ছিন্ন-ভিন্ন হতে নিষেধ করেছেন وَلَا تَفَرَّقُوْا 'এবং তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ো না' বলে। এর অর্থ, আল্লাহ্র দ্বীন থেকে ছিন্নভিন্ন হওয়া, যে দ্বীনকে বাধ্যতামূলকভাবে একত্রিত হয়ে ধারণ করতে আদেশ করা হয়েছে, তারই ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে বলা হয়েছে। সে দ্বীন থেকে ছিন্নভিন্ন হতে নিষেধ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ও কাতাদাহ থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে, হাসান বলেছেন, এর অর্থ, তোমরা ছিন্নভিন্ন হবে না রাসূলে করীম (স) থেকে। দুই গোষ্ঠীর লোকেরা একথাকে দলীল বানিয়েছে। এক গোষ্ঠী হচ্ছে তারা যারা 'কিয়াস' ও 'ইজতিহাদ'কে আইনের সূত্র মাত্র মানতে অস্বীকার করেছে। সে সঙ্গে তাঁরা বলেন যে, ইজতিহাদী বিষয়ে বলা বিভিন্ন ও বহু সংখ্যক কথার মধ্যে মাত্র একটি কথা-ই সহীহ্ ও সত্য হতে পারে। যাদের সিদ্ধান্ত সত্যের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হবে না, তারা ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ো না। কাজেই পরস্পর মতদ্বৈততা ও বিচ্ছিন্নতা কখনও আল্লাহ্র দ্বীন হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তো ছিন্নভিন্ন হতে নিষেধ করেছেন।

তাদের এ কথায় আমরা একমত নই। কেননা শরীয়াতের বিধান মূলত বহু দিক সম্পন্ন। তাতে কিছুদিক এমন, যার বিরুদ্ধতা করা জায়েয নয়; সর্বাবস্থায় তার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধি স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়; অথবা সর্বাবস্থায় তার ইতিবাচকতাই প্রমাণিত হয়। তবে যা কখনও ওয়াজিব হয়, কখনও হয় মুবাহ, কখনও হয় নিষিদ্ধ। এ সব বিষয়ে মতের বিভিন্নতার অবকাশ রয়েছে। সেই মতপার্থক্য সহ-ই আল্লাহ্র ইবাদত সম্ভব। যেমন নামায-রোযার তুহুর-ওয়ালী ও হায়যওয়ালী মেয়েলোক। নিজ বাড়িতে উপস্থিত ও সফরে রত ব্যক্তির নামায 'কসর' করা বা পূর্ণ নামায পড়া এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য বিষয়, এ বিভিন্ন অবস্থার লোকদের জন্যে শরীয়াতের হুকুম বিভিন্ন হওয়া খুবই সম্ভব এবং তা অসঙ্গত নয়; ফলে এসব ক্ষেত্রে একজন একভাবে ইবাদতকারী হবে, অন্যজন অন্যভাবে ইবাদত পালন করবে। তাই জায়েয সীমার মধ্যে বিভিন্ন মত সৃষ্টিকারী ইজতিহাদের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, তা কোনক্রমেই নিষিদ্ধ হতে পারে না। এভাবে দলীলও নাযিল হতে পারে। সর্বপ্রকারে মতভেদই যদি মন্দ ও নিষিদ্ধ হবে তাহলে 'নস' ও 'তওকীফ'-এর দিক দিয়ে শরীয়াতের বিধানে বিভিন্ন তত্ত্ব আসা কখনই জায়েয ও সঙ্গত হতে পারত না। তাই নস্-এর ক্ষেত্রে যা জায়েয, তা ইজতিহাদেরও জায়েয হবে বৈকি। স্ত্রীদের দেয় নফকায়, বিভিন্ন জিনিসের মূল্যে গুরুত্বে ও বিপুল সংখ্যক অপরাধের ধরনে-ধারণে দুইজন মুজতাহিদ দুই রকমের ও ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারেন। তাতে কেউ-ই নিন্দনীয় বা তিরস্কৃত হবেন না। এ হচ্ছে ইজতিহাদী বিষয়াদি সম্পর্কিত কথা। এতটুকু মতপার্থক্যও যদি নিন্দনীয় হয়, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তার বিরাট অংশের ভাগীদার হবেন, সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যাপারে তাঁদের নিকট থেকে বিভিন্ন মত আমরা কখনই শুনতে পেতাম না। এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কশীল, ওতপ্রোত, ঐক্যবদ্ধ। প্রত্যেকেই অপর সাহাবীর ভিন্ন মত কোনরূপ তিরস্কার নিন্দা-ছাড়াই সহজভাবে শুনেন, মেনেও নেন। তাঁদের মতপার্থক্য মতবিরোধ সৃষ্টি করেনি, এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা একই পথের সহযাত্রী। তাঁদের ইজমা বা ঐকমত্যকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও তাঁর কিতাবের

বহু আয়াতে প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছেন। ইজমার সত্যতা যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِخْتِلاَفُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ -

আমার উম্মতের মতের বিভিন্নতা রহ্‌মত বিশেষ।

বলেছেন ঃ

لاَ تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلاَلِ -

আমার উম্মত কখনই গুমরাহীর উপর একমত হবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথা 'তোমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ও না' বলে উক্ত ধরনের মতপার্থক্য করতেও নিষেধ করেন নি। এ আয়াতটুকুতে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল দুটির যে কোন একটি। হয় 'নস' (نص মূল ও অকাট্য দলীল) সমূহ, অথবা যার উপর বিবেক-বুদ্ধিগত বা পূর্বশ্রুত দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার একটি মাত্র অর্থ হতে পারে এবং কুরআনের আয়াতের বক্তব্য— যা প্রমাণ করে যে, এর তৎপর্য হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মৌলনীতিতে মতপার্থক্য ও বিভিন্নতা— খুটিনাটি ব্যাপারে নয়— যাতে মতপার্থক্য হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ -

আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। পরে তিনি তোমাদের হৃদয়সমূহে প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন।

অর্থাৎ ইসলাম দ্বারা এ কাজ করেছিলেন। এতে এ বিষয়ের দলীল যে, নিন্দিত-তিরস্কৃত বিভিন্নতা-বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে যা আয়াতে নিষিদ্ধ হয়েছে তা হল দ্বীন-ইসলামের মৌলনীতিসমূহে, তাঁর খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতপার্থক্য নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহই প্রকৃত ব্যাপার ভালো জানেন।

'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' ফরয

আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক জনগোষ্ঠী অবশ্যই গড়ে উঠতে হবে, যারা সর্বোচ্চ ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাতে থাকবে এবং নিষেধ করতে বিরত রাখতে— চেষ্টিত থাকবে মুনকার (শরীয়াত পরিপন্থী কাজ থেকে)।

গ্রন্থকার আবূ বকর বলেছেন ঃ এ আয়াত দুটি তাৎপর্য ধারণ করে আছে। একটি হচ্ছে, ভালো শরীয়াতসম্মত কার্যাবলীর আদেশ করা— সেদিকে দিক নির্দেশনা দেয়া এবং মন্দ ও

শরীয়াত পরিপন্থী কাজ করতে নিষেধ করা— বিরত রাখতে চেষ্টায় রত থাকা আর দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছে, তা একটি ফরযে কিফায়ার কাজ, মূলত এক-ব্যক্তির জন্যে তা ফরয নয়, যখন অন্যরা সে কাজটি করতে থাকবে, তখন তার কর্তব্য পালিত হবে। কেননা আল্লাহ্র কথা হল ঃ তোমাদের মধ্যে থেকে একটি জনগোষ্ঠী হতে হবে— সকলকে এবং প্রত্যেককে নয়। এর প্রকৃততায় কিছু লোক তা করলে এবং অপর কিছু লোক ব্যক্তিগতভাবে তা না করলেও কর্তব্য পালিত হয়ে যাবে।

এ থেকে বোঝা গেল যে, এ কাজটি ফরয বটে, তবে তা ফরযে কিফায়া, ফরযে আইন নয়। কিছু সংখ্যক লোক এ কাজে নিযুক্ত থাকলে অবশিষ্টদের কর্তব্য পালন হয়ে যাবে। কোন কোন লোক অবশ্য বলেন যে, এ কাজ প্রত্যেকটি ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে ব্যক্তিগতভাবেই ফরয। তাঁরা কথাটির মূল তাৎপর্যকে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেন। 'তোমাদের মধ্য থেকে একটি জনগোষ্ঠী অবশ্যই হতে হবে'— একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন আল্লাহ্র কথা يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের কোন কোন গুনাহ। কিন্তু আসলে এর অর্থ তোমাদের সব গুনাহ। এ কথা যে সহীহ তার প্রমাণ হল, কিছু লোক এ কাজটা করলে অন্যদেরও কর্তব্য পালিত হয়ে যাবে। যেমন জিহাদ, মৃতের গোসল, কাফন পরানোর কাজ এবং জানাযার নামায পড়া ও দাফন করার কাজ। এসব যদি ফরযে কিফায়া না হতো, তাহলে কিছু লোকের তা করার ফলে অন্যদের কর্তব্য পালিত হয়ে যেত না।

'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার'- এর কথা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের বহু সংখ্যক আয়াতে বলেছেন। একটি আয়াত হল ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমরাই হচ্ছো সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। কেননা তোমরা ভালো শরীয়াতসম্মত কাজের আদেশ কর ও মন্দ শরীয়াত বিরোধী কাজ বন্ধ কর— করতে নিষেধ কর ও বিরত রাখ। (আলে-ইমরান ঃ ১১০)

লুকমানের উপদেশ হিসেবে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَابُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

হে প্রিয় পুত্র! তুমি নামায কায়েম করো এবং মা'রূফের আদেশ করো ও মুনকার-এর নিষেধ করো এবং এক্ষেত্রে তোমার উপর যে বিপদই আসুক তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো। মনে রাখবে, এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উঁচু সাহসিকতার ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার কাজ। সূরা লোকমান ঃ ১৭)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَإِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ -

ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দুটি দল যদি পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। পরে তাদের মধ্য থেকে একটি দল যদি অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই কর। (সূরা হুজরাত ঃ ৯)

বলেছেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

বনী ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে যারা কুফরি নীতি গ্রহণ করেছে তাদের উপর দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার জবানীতে অভিসম্পাত করা হয়েছে। তা এজন্য যে, তারা নাফরমানীর নীতি গ্রহণ করেছে। আর তারা তো সীমালঙ্ঘন করেই চলেছিল। তারা যে অন্যায় কাজ করত তা থেকে পরস্পর নিষেধ ও বিরত রাখতে চেষ্টা করত না। তারা সব সময় খারাপ কাজেই লিপ্ত থাকত। (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮,৭৯)

এ কয়টি আয়াত এবং এ অর্থের অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর কাজ ইতিবাচকভাবে চলতে থাকুক। এর বহু মনযিল বা পর্যায় রয়েছে। তার প্রথম পর্যায়ে হাত বা শক্তি দ্বারা অন্যায় কাজের প্রতিরোধ বা মূলোৎপাটন— যদি তা করা সম্ভব হয়। যদি সম্ভব না হয়, তা হাত বা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে জীবনের উপর হুমকি আসার আশংকা হয়, তাহলে মুখের কথা ও ভাষার দ্বারা তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করতে হবে। আর তা করাও যদি কঠিন হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তার প্রতি অস্বীকৃতি জানাতে হবে।

হাদীসে একথা-ই বলা হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর ইবনে আহমদ ইবনে ফারিস ইউনুস ইবনে হাবীব, আবূ দাউদ, তায়ালিসী, শু'বা, কায়স ইবনে মুসলিম, তারিক ইবনে শিহাব সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ মারওয়ান নামাযের আগে খুতবা দিতে এগিয়ে এলেন। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল ঃ তুমি সুন্নাতের বিরুদ্ধতা করেছ; (ঈদের দিনের খুতবা তো) নামাযের পরে দেয়ার নিয়ম। সে বলল ঃ হে অমুকের বাপ, তা পরিত্যক্ত হয়েছে। শু'বা বলেছেন, সে (মারওয়ান) বড়ই বাকপটু ছিল। এ সময় সাহাবী আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন ঃ এ লোকটি— যে এইমাত্র কথা বলল— তার কর্তব্য আদায় করেছে। কেননা আমাদেরকে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ -

তোমাদের মধ্যে যে লোক কোন অন্যায়— শরীয়াত পরিপন্থী কাজ দেখতে পাবে, সে যেন তার হাত বা শক্তি দিয়ে তা অস্বীকার করে। যদি তার সামর্থ্য না পায়, তাহলে মুখে— ভাষার দ্বারা— তার প্রতিবাদ করবে। আর তার সামর্থ্যও না-থাকলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। তবে এটা দুর্বলতম ঈমানের কাজ।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বসরী আবূ দাঊদ, মুহাম্মদ ইবনুল-উলা, আবূ মুআবিয়া, আ'মাশ, ইসমাইল ইবনে রজা তার পিতা-আবূ সাঈদ এবং কায়স ইবনে মুসলিম, তারিক ইবনে শিহাব, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন— রাসূলে করীম (স)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ -

তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক অন্যায়— শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখতে পাবে, সে যদি তা নিজ হাতে বা শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে তার হাত বা শক্তি দ্বারাই তা পরিবর্তন করে দেবে। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার মুখ ও ভাষা দ্বারা তার পরিবর্তন করবে। আর যদি তা-ও তার ক্ষমতায় না কুলায় তাহলে তার অন্তর দ্বারা তার পরিবর্তন কামনা করবে। তবে এটা দুর্বলতম ঈমানের কাজ।

এসব হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) বর্ণিত তিনটি উপয়ে অন্যায় ও শরীয়াত বিরোধী কাজকে অস্বীকার করার কর্তব্যের কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলেছেন এবং আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন নিজ নিজ পার্থক্যপূর্ণ সাধ্য অনুযায়ী। বোঝা গেল, হাত দ্বারা বা শক্তি দ্বারা তা পরিবর্তন করতে না পারলে তার কর্তব্য হল মুখের কথা বা ভাষা দ্বারা তার পরিবর্তন সাধন করা। যদি তারও সাধ্য না হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তাকে অস্বীকার করা, তাকে ঘৃণা করা ও মেনে নিতে কোন ক্রমেই রাজি না হওয়ার অধিক কিছু করা তার কর্তব্য নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইউনুস ইবনে হাবীব, আবূ দাঊদ, শু'বা, আবূ ইসহাক, আবদুল্লাহ্ ইবনে জরীর আলবজলী, তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন; নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعَاصِيْ هُمْ أَكْثَرُ وَأَعَزُّ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرُوا إِلَّا عَمَّهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ -

যে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজ করা হবে অথচ তার নাফরমানীর কাজ যারা করে তাদের চেয়ে অধিক ও অধিক শক্তিশালী তা সত্ত্বেও তারা তা পরিবর্তন করে না, বন্ধ করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর সাধারণ ও ব্যাপক আযাব নাযিল করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ-ই-মুহাম্মাদুন্নফাইলী, ইউনুস ইবনে রাশিদ, আলী ইবনে বুযায়মাতা, আবূ উবায়দাতা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَىْ الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَاهٰذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهُ لَايَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ اَنْ يَّكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ. فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ...... فَسِقُوْنَ -

বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে সর্ব প্রথম ত্রুটি দেখা দিল এভাবে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উপদেশ দিল, বলতো ঃ হে ব্যক্তি, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তুমি যা করছ তা ত্যাগ কর। কেননা ও কাজ করা তোমার জন্যে হালাল নয়। পরের দিন তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সেই পরিত্যাজ্য কাজ করতে নিষেধ করে না। বরং তার পানাহারে ও উঠাবসায় তার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এরূপ যখন তারা করতে থাকে তখন আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত করে দেন। এর পর উপরে উদ্ধৃত আয়াত পাঠ করেন ঃ বনী ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে কুফরি নীতি অনুসারীদের উপর দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার জবানীতে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। তা এ জন্যে যে, তারা নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হয়ে ছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেই চলেছিল। ..... ফাসিক পর্যন্ত। (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮)

তারপর বললেন ঃ

كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ عَلٰى يَدَىْ لِظَالِمٍ وَلَتَاْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا وَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا -

না, কখনও নয়! তোমরা অবশ্য-অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে, তোমরা জালিমের হাত শক্তভাবে ধরে রাখবে, তাকে সত্য নীতির উপরে বলিষ্ঠভাবে স্থাপিত রাখবে, সত্যের সীমার মধ্যে তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখবে।

আবূ দাউদ বলেছেন, খালফ ইবনে হিশাম আবূ শিহাব আল-হুনাত, আলউলা ইবনুল মুসাররাব, আমর ইবনে মুররা, সালিম, আবূ উবায়দা, ইবনে মাসউদ সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন। সে বর্ণনায় একথাটুকু অতিরিক্ত রয়েছে ঃ

اَوْلَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ -

অথবা তোমাদের পরস্পরের অন্তর দ্বারা আল্লাহ্ পরস্পরের অন্তর প্রভাবিত করে দেবেন। পরে তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে যেমন তাদেরকে অভিশপ্ত করেছে।

এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'নাহী আনিল মুনকার'-এর শর্ত হচ্ছে, একবার অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে পরে সে নাফরমানীর কাজে লিপ্ত থাকা ব্যক্তির সাথে উঠাবসা বা একসাথে পানাহার করা যাবে না। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) যা বলেছেন, তা এ আয়াতটির ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন ঃ

تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

তুমি ওদের বহু লোককেই কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব করতে দেখতে পাবে। (সূরা মায়িদা ঃ ৮০)

যারা পাপ কাজে লিপ্তদের সাথে একসাথে উঠাবসা ও পানাহার অব্যাহত রেখেছে, তারা কার্যত 'নাহী আনিল মুনকার'কে অগ্রাহ্য করেছে, সে দায়িত্ব পালন করেনি। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কথা ঃ 'লোকেরা যেসব পাপ কাজ করছিল, তা থেকে তারা পরস্পরকে বিরত রাখেনি, রাখতে চেষ্টা করেনি। সে সাথে রাসূল (স)-এর কথা ঃ অন্তত, মুখের কথা ও ভাষার সাহায্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে— তা পালন করেনি। তা মুখে করে থাকলেও কার্যত তাদের সাথে উঠাবসা ও পানাহার করায় তা কোন ফায়দা দেয়নি।

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, অহব ইবনে বকীয়া, খালিদ, ইসমাঈল, কায়স সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) হাম্‌দ ও সানা বলার পর বলেছেন ঃ তোমরা কুরআনের একটি আয়াত পাঠ কর কিন্তু তার প্রয়োগ কর এমন বিষয়ে যা তার আসল প্রয়োগক্ষেত্র নয়। আয়াতটি হল ঃ

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

তোমাদের নিজেদের ব্যাপারেই তোমাদের দায়িত্ব পালন কর্তব্য। তোমরা যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হও, তাহলে যে গুমরাহ হল, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
(সূরা মায়িদা ঃ ১০৫)

এরপর তিনি বললেন ঃ আমরা নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْ ذُوْا عَلَى يَدَيْهِ يُوْشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ -

লোকেরা যখন জালিমকে জুলুম করতে দেখতে পায়, তখন যদি তারা তার দুই হাত শক্ত করে ধরে জুলুম থেকে বিরত রাখতে চেষ্টিত না হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে সাধারণ ও ব্যাপক আযাবে পরিবেষ্টিত করবেন, তার আশংকা রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ আবূর রুবাই সুলায়মান ইবনে দাউদ আল-আতকী ইবনুল মুবারক, উতবা ইবনে আবূ হুকাইম, আমর ইবনে জারিয়াতাল, লুখামী, আবূ উমাইয়্যাতাশ—

শাবানী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি আবূ সালাবাতা আল খুশানীকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, হে আবূ সালাবাতা عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ আয়াত সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? বললেন, আল্লাহ্‌র নামে বলছি, আমি এ বিষয়ে একজন অবহিত লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যিনি নিজে এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ বরং তোমরা মারূফ কাজের আদেশদান নীতি অবলম্বন কর এবং পরস্পরকে অন্যায় পাপ কাজ থেকে বিরত রাখ। এমন কি তোমরা যখন একজন লোভী-স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়ানুসারী, নফসের কামনা-লালসার অনুসারী, প্রভাবশালী হীনমানসিকতা সম্পন্ন ও প্রত্যেক মতের লোক কেবল নিজের মতের উপর আত্মপ্রসাদ লাভে মগ্ন দেখতে পাবে, তখন তোমার নিজেকে ঠিক রাখতে সচেষ্ট হবে, অন্য লোকদেরকে নিজ থেকে ছেড়ে দেবে। কেননা তোমাদের সম্মুখে ধৈর্য রক্ষার দিনগুলো রয়েছে। তখন ধৈর্য ধারণ জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠ করে ধরার ন্যায় কঠিন হবে। এরূপ অবস্থায়ও শরীয়াত পালনকারীর জন্য পঞ্চাশ ব্যক্তির আমলের সমান সওয়াব পাবে, যারা তার মতই আমল করছে। বলেছেন, অন্য বর্ণনাকারী বাড়তি কিছু কথা বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি প্রশ্ন করলেন, হে রাসূল! আপনি কি পঞ্চাশজন আমলকারীর কথা বলেছেন ওদের মধ্য থেকে? জবাবে বললেন, না, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন।

এ দীর্ঘ হাদীস প্রমাণ করে যে, 'আমর বিল মা'রূপ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর দুটি অবস্থা রয়েছে। একটি অবস্থা যখন অন্যায়কে বদলে দেয়া ও তা দূর করা সম্ভব হয়। কাজেই যার নিজ হাতে তা বন্ধ ও দূর করা সম্ভব সে তাই করবে। নিজের হাতে বা শক্তি দিয়ে তা দূর করার কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি, তা দূর করা যাবে তরবারি ব্যবহার করে— শক্তি প্রয়োগ করে।[১] অন্যায়কারী যদি তার উপর আক্রমণ করে, তাহলে তারও কর্তব্য তা-ই করা। যেমন এক ব্যক্তি তাকে বা তার সম্মুখে অন্য আর একজনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, দেখতে পেল। কিংবা তার ধন-মাল নিয়ে যাচ্ছে কিংবা কোন নারীর উপর ধর্ষণ চালাতে প্রস্তুত হয়েছে, এ ধরনের আরও অনেক হতে পারে। তখন যদি জানা বা বোঝা যায় যে, সে মুখের কথায় বিরত হবে না কিংবা ধারালো অস্ত্র ছাড়া-ই সে তাকে হত্যা করবে, তাহলে তখন তাকে হত্যা করা তার কর্তব্য। উপরোদ্ধৃত হাদীসের ভিত্তিতে যে অন্যায় পাপ হতে দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত বা শক্তির দ্বারা দূর করে। হাত দ্বারা এ অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে সেই অন্যায় থেকে বিরত রাখা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করাই তার কর্তব্য। এটা তার জন্যে ফরয। যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, তার হাত বা শক্তি দিয়ে সে কাজ বন্ধ করতে চাইলে, তাকে তা থেকে অস্ত্র ছাড়া বিরত রাখতে চাইলে তার নিজের তা থেকে বিরত হয়ে যাওয়া উচিত, তাকে হত্যার জন্যে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়। আর যদি হাত দ্বারা তাকে বিরত রাখতে চায় কিংবা কথার দ্বারা তাকে বিরত রাখা সম্ভব বলে প্রবল ধারণা হয়, পরে তাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, সে অন্যায়ও দূর করা না যায় তাকে ভয় প্রদর্শন ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করতে চাওয়া ছাড়া, তাহলে তাকে হত্যা করাই কর্তব্য।

১. বর্তমানে আফগান মুজাহিদরা তা-ই করছে— অনুবাদক

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ধন-মাল কেড়ে নিয়েছে এবং তাকে হত্যা করে লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার করা ও তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব মনে হয়, তাহলে তোমাকে তাই করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা এরূপ কথাই বলেছেন চোর সম্পর্কে। সে মাল চুরি করে নিয়েছে, মাল ফেরত না দিলে তাকে হত্যা করা যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা সিঁদ কাটা চোর সম্পর্কেও একথা বলেছেন, প্রয়োজন হলে তুমি তাকে হত্যা করতে পার। যে ব্যক্তি তোমার দাঁত উপড়ে বা ভেঙ্গে দিতে চায়, তাকে হত্যা করতে পার বলে মত দিয়েছেন। তবে তা সেখানেই করা জায়েয হবে যেখানে তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসার কেউ নেই।

আমরা এই যা বললাম, তা এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে ঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ -

তোমরা যুদ্ধ কর সেই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যারা বিদ্রোহ করে, যেন তারা আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে ফিরে আসে। (সূরা হুজরাত ঃ ৯)

এ আয়াতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। সে যুদ্ধ ততক্ষণ বন্ধ হবে না, যতক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে ফিরে না আসছে এবং যে অন্যায় কাজে তারা লিপ্ত ও বিদ্রোহ করেছে তা থেকে বিরত না হয়। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে লোক অন্যায়-শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখতে পাবে, সে যেন তা তার হাত বা শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করে' ও তা-ই কর্তব্য বানিয়ে দেয়। কেননা তা নিজের হাতে বদলে দেবার আদেশ করেছেন যে ভাবে ও যে উপায়েই তা করা সম্ভব হবে তা-ই তাকে করতে হবে। কিন্তু তা যখন হত্যা করা ছাড়া সম্ভব নয়, তখন তা-ই করতে হবে, যেন শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়। শাসকরা অন্যায়ভাবে যে কর বা শুল্ক জনগণের পণ্যদ্রব্য থেকে অন্যায়ভাবে আদায় করে (আজকের ভাষায় যা ঘুষ ও দুর্নীতি লুটপাট), তাদের রক্তপাত মুবাহ। মুসলমানদের কর্তব্য তাদের হত্যা করা। যার পক্ষেই তাদের হত্যা করা সম্ভব তার জন্যই তা করা ফরয। এজন্যে আগে থেকে কোন ভয়-ভীতি দেখাবারও প্রয়োজন নেই। প্রথমে কথার দ্বারা এ অন্যায় থেকে ফেরাবার চেষ্টা করাও জরুরী নয়। কেননা তাদের অবস্থা জানাই আছে, তারা এ কাজে অগ্রসর হলে তারই যে কোন কথাও মানবে না তা তো জানাই আছে। কেননা সে কাজ নিষিদ্ধ জানা সত্ত্বেও তারা এ কাজ করতে যাচ্ছে। তাই তাদেরকে বিরত রাখার জন্যে ভয়-ভীতি দেখানোও নিষ্ফল, তারা তা থেকে বিরত হবে না। ফলে তারা যে অন্যায় ও পাপ কাজ করছে তা বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। অতএব যে লোক এ কাজে লিপ্ত তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ জায়েয। আর তাদের হত্যা করতে অগ্রসর হলে যদি ভয় হয় যে, তারাই পূর্বাহ্নে আক্রমণ ও হত্যা করবে, তাহলে তাদেরকে ত্যাগ করাও জায়েয । তবে তখনও তাদের দূরে রাখতে ও তাদের উপর কঠোরতা করা যা দিয়েই সম্ভব এবং তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করাও জায়েয। এমনিভাবে যারাই এ ধরনের নাফরমানীর কাজে লিপ্ত তাদের ধ্বংস করার জন্যে যে কোন পন্থা অবলম্বন করা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে এবং পৌনপুনিকতা সহকারে করা কর্তব্য। তার জন্যে সিদ্ধান্ত তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি— যেভাবেই সম্ভব সে অন্যায় বন্ধ করা নিজ হাতে বা

শক্তির বলে অবশ্য কর্তব্য। যদি হাত বা শক্তি দ্বার সম্ভব না হয়, তাহলে মুখের কথা ও ভাষা প্রয়োগ করে তা করতে হবে। তা করতে হবে যখন এই আশা করা যাবে যে মুখের কথার ভাষায় প্রতিবাদ করা হলে তা দূর বা বন্ধ করা সম্ভব হবে। তারা সে কাজ বন্ধ করবে ও সে কাজ থেকে তারা বিরত থাকবে। যদি সে আশা করা না যায়, যখন প্রবল ধারণা হবে যে, তা একটি অন্যায় ও পাপ কাজ জানা সত্ত্বেও তারা মুখের কথায় তা থেকে বিরত হবে না, তখন তার সে বিষয়ে চুপ হয়ে যাওয়া জায়েয হবে। তবে তখন তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে, তাদের সাথে সম্পর্কহীনতা স্পষ্ট করে তুলতে হবে। কেননা এরূপ অবস্থা সম্পর্কেই রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ -

তাহলে তা বন্ধ করতে হবে মুখের কথার দ্বারা। আর তা সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে তার বন্ধ হওয়া কামনা করতে হবে।

রাসূল (স)-এর কথা فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ -এর এ করা হয়েছে যে, তাদেরকে সে অন্যায় পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে তার প্রতিবাদ করতে হবে অন্তর দ্বারা— মনে মনে। তা তাকীয়ার মাধ্যমে করা হোক কিংবা তাকীয়া ছাড়াই। কেননা তাঁর কথা اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ-এর অর্থ হল মুখের কথার দ্বারা তা দূর করা যদি সম্ভবপর না হয়, তাহলে চুপ থাকা তার জন্যে মুবাহ অবস্থায়। যদিও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَ يْتُمْ (মায়িদা ঃ ১০৫) আয়াতের তাৎপর্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে ঃ তুমি মা'রূফ কাজের আদেশ কর এবং মুনকার কাজ করতে নিষেধ কর, যতটা তোমার থেকে গ্রহণ করা হয়। যদি গ্রহণ করানো হয়, তাহলে তুমি নিজেকে তা থেকে বাঁচাতে যত্নবান হও। পূর্বোদ্ধৃত আবূ সালাবাতা আল-খুশানীর হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে। কেননা তাতে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা মা'রূপ কাজ করতে আদেশ করা নীতি গ্রহণ কর এবং অন্যায় কাজ থেকে পরস্পরকে বিরত রাখতে চেষ্টা কর। এমনকি, তোমরা যখন সকল লোককে লোভী স্বার্থপর ইন্দ্রিয়ানুসারী ও কামনা-লালসা চরিতার্থতাকারী প্রভাবশালী নীচ স্বভাবের এবং নিজের মতে আত্মশ্লাঘা বোধকারী ব্যক্তিকে দেখতে পাবে, তখন তুমি নিজেকে রক্ষা করতে যত্নবান হও। অন্যান্য সাধারণ লোককে তোমার থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা কর। অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন— লোকেরা যখন তোমার কথা মানতে রাজিই হয় না, তারা নিজেদের কামনা-বাসনা-লালসার পেছনেই চলতে থাকে, তাদের নিজেদের মতকেই চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করে বসবে, তখন তুমি তাদেরকে ত্যাগ করতে পার। তখন তোমার নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হওয়াই বরং তোমার কর্তব্য। তখন জনগণের ব্যাপারাদি পরিহার করতে পার। মুখের কথার প্রতিবাদ না করাও তখন মুবাহ। যার অবস্থা এরূপ, এটা তার জন্যে কর্ম বিধান।

ইকরামা থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে বলেছেন ঃ শনিবারওয়ালা (ইয়াহূদী)-দের মধ্যে যারা লোকদেরকে ওয়ায ও নসীহত করা থেকে বিরত হয়েছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছিল, তা জানবার জন্যে আমি খুবই আগ্রহী। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি সে বিষয়ে আপনাকে জানাব। আপনি এ দ্বিতীয় আয়াতটি পাঠ করুন ঃ

اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ -

যারা নিজেরা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকল, আমরা তাদেরকে নাজাত দিলাম।
(সূরা আরাফ ঃ ১৬৫)

তখন বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তখন তিনি আমাকে একটি বিশেষ পোশাক পরিয়ে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) এ থেকে এ বিশেষ প্রমাণ গ্রহণ করলেন যে, যারা নিজেরা পাপ কাজ করেছে এবং বলা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকেনি, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আর যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা থেকে বিরত রয়েছিল, তাদেরকে আযাব দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতই বানালো, যারা সেই অন্যায়ে লিপ্ত রয়েছে।

আমরাও তা-ই মনে করি। কেননা তারা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেনি, বরং সে পাকা কাজে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, এমন কি, অন্তর দিয়েও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেনি। আল্লাহ্ নিজেই তাঁর কালামে প্রাচীন কালের নবীগণকে হত্যা করার অপরাধে নবী করীম (স)-এর সময়ের ইয়াহূদীদেরকে অভিযুক্ত করেছেন। কেননা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের নবী হত্যার সমর্থক ছিল। তিনি বলেছেন ঃ

قَدْجَاءَكُمْ رَسُلٌ مِنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ -

আমার পূর্বে বহু সংখ্যক নবী-রাসূল অকাট্য দলীল প্রমাণ সহ এসেছে এবং তোমরা যা বলছো তা নিয়ে, তাহলে তোমরা তাদের হত্যা করেছ কেন? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৩)

এ আয়াত ঃ

فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

তাহলে তোমরা আল্লাহ্র পূর্ববর্তী নবীগণকে হত্যা করতে কেন, যদি তোমরা ঈমানদারই ছিলে? (সূরা বাকারা ঃ ৯১)

এ আয়াতদ্বয়ে নবী হত্যার অপরাধ তখনকার সময়ের ইয়াহূদীদের কৃত বলেছেন। অথচ তখনকার ইয়াহূদীরা নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে নবী হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল না। তারা নিজেরা তো হত্যা করেনি। তবে হ্যাঁ, তারা খুব রাজি ও খুশী ছিল এজন্য যে, তাদের পূর্ব পুরুষরা নবীগণের হত্যাকারী ছিল। অনুরূপভাবে যারা শনিবারওয়ালাদের দুষ্কর্ম বন্ধ করতে ও তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেনি, তাদেরকে যুক্ত করা হয়েছে তাদের সাথে যারা প্রত্যক্ষ ভাবে এ কাজ করত। এ ভাবে উভয় শ্রেণীর লোককে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

আমাদের এটাই মত এবং তার কারণ এই যে, তারা প্রত্যক্ষভাবে নবী-হত্যায় শরীক না থাকলেও এ কাজকে সমর্থন করেছে এবং তাদের বর্তমান কাজ দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, এরা অন্তর দিয়েও সে কাজকে অন্যায় মনে করছে না।

তাই পাপ কাজকে অন্তর দ্বারা যে লোক অপছন্দ ও অস্বীকার করবে, সে যদি তা দূর ও বন্ধ করতে কার্যতও সক্ষম না হয়, তবু সে কাজ যে লোক কার্যত করে তাকে দেয়া আযাবে সে

পড়বে না। বরং সে তো সেই লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের সামলাও, তোমরা নিজেরা হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক হলে কেউ যদি গুমরাহ হয়ে যায়, তাহলে তার গুমরাহী তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

মুকররম ইবনে আহমাদুল কাযী, আহমাদ ইবনে আতায়তুল কুফী, আল-হুমলী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, ইবরাহীম আসসায়েগ-এর নিহত হওয়ার খবর যখন ইমাম আবূ হানীফার নিকট পৌঁছল, তখন তিনি কাঁদলেন এমনভাবে যে, আমরা মনে করলাম, তিনি মরে যাবেন। তখন আমি তাঁর নিকট একাকীত্বে জানতে চাইলাম, এর কারণ কি! জবাবে বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, লোকটি বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন। আর আমি এ বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে খুবই ভয় পোষণ করতাম। বললাম, এ কান্নার কারণটা কি? বললেন, লোকটি আমাকে প্রশ্ন করতেন এবং আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে নিজে খুবই কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষার নীতি গ্রহণ করতেন। খুব বেশি তাকওয়া-পরহেযগারী সম্পন্ন ছিলেন। আমি যখনই তাঁর নিকট কোন জিনিস পেশ করতাম, সেই বিষয়ে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তা গ্রহণ করতে রাজি হতেন না, তার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করতেন না। কখনও কিছু পছন্দ হলে অবশ্য তিনি গ্রহণ করতেন, আহার করতেন। তিনি একদা আমার 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম যে, তা আল্লাহ্র তরফ থেকে ধার্যকৃত ফরয— অবশ্য কর্তব্য। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বায়'আত করব। পরে দুনিয়া তার ও আমার মধ্যে অন্ধকার দাঁড় করে দিল। তখন আমি বললাম, তা কিভাবে, কেন ? বললেন, তিনি আমাকে আল্লাহ্র একটি হক আদায়ের দিকে আহ্বান করেছিলেন; কিন্তু আমি সেদিকে যাওয়া থেকে বিরত থাকলাম এবং তাঁকে বললাম ঃ সে কাজ যদি এক ব্যক্তি করে, তাহলে সে নিহত হবে, এবং মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু সে কাজে সে যদি সাহায্য সহযোগিতাকারী লোক পায় যারা নেককার এবং একজন তাদের প্রধান নেতা হয় যে আল্লাহ্র দীনের উপর অবিচল ও নিরাপত্তাপূর্ণ, এদিক ওদিক হবে না, তাহলে লোকদের বিরাট কল্যাণ সাধনে সক্ষম হতে পারে। বললেন, তিনি সেই দাবিই করছিলেন। যখন যখনই আমানত দাতা তাগাদা করত, যখন যখনই আমার তাগাদায় অগ্রসর হয়ে আসতেন, আমি তাঁকে বলতাম ঃ এ বিরাট কাজ একজন লোকের পক্ষে করা সম্ভব নয়, যা নবীগণ করতে পারতেন। কেননা তাঁরা আসমান থেকে নিয়োগ ও সাহায্য-সহযোগিতা পেতেন। এ কাজ ফরয, কিন্তু অন্যান্য সব ফরযের মত নয়। কেননা অন্যান্য ফরয তো ব্যক্তি এককভাবে আদায় করে। আর এ ফরয যদি কেউ একাকী করতে শুরু করে, তা হলে সে তার রক্ত ও জীবন দিতে বাধ্য হয়। ফলে আমার ভয় হয়, এ কাজ করে সে নিজেকে হত্যা করতেই সাহায্য করে বসবে হয়ত। আর এ পথে একজন ব্যক্তি যদি একবার নিহত হয়, তাহলে অন্য কোন ব্যক্তি নিজেকে এ অবস্থার সম্মুখীন করতে সাহস পাবে না। বরং সে তখন অপেক্ষায় রত হবে। ফেরেশতাগণ তো এ দিকে লক্ষ্য করেই বলেছিল ঃ হে আল্লাহ্! তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে বানাবে, যে সেখানে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে ? তোমার হামদ সহকারে তসবীহ তো আমরাই

পড়ছি এবং তোমার পবিত্রতা আমরাই বর্ণনা করছি! আল্লাহ্ বললেন ঃ 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না।'

পরে সে মরো চলে যায়। সেখানে ছিল আবূ মুসলিম। সে তার সাথে অত্যন্ত রুঢ় কঠোর ভাষায় কথা বলে। তখন খুরাসানের ফিকাহবিদগণ তার ব্যাপারে নিয়ে একত্রিত হন। সেখানে সেখানকার আবিদ-জাহিদগণও উপস্থিত থাকেন। পরে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। পরে তারা আবার তাকে পাকড়াও করে। তখন তারা তাকে খুব ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে। পরে আবার তারা তাকে ধরে। এ সময় সে বলে ঃ আল্লাহ্র জন্যে তোমার জিহাদ অপেক্ষা উত্তম কোন জিনিস আমি পাচ্ছি না। আমি নিশ্চয়ই তোমার বিরুদ্ধে আমার মুখ দ্বারা জিহাদ করব, আমার হাত দ্বারা কিছু করার শক্তি আমার নেই। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে দেখিয়েছেন, আমি এ ব্যাপারে তোমাকে ঘৃণা করি। পরে তাকে তারা হত্যা করে।

আবূ বকর আল-জাস্সাস বলেছেন, এইমাত্র কুরআন ও নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম, তাতে প্রমাণিত হয় যে, 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয। আমরা এ-ও বলেছি যে, তা এমন ফরয যা কিছু লোক আঞ্জাম দিলে অন্যদের কর্তব্যও পালিত হয়ে যাবে, এটা তাদের উপর ফরয থাকবে না। এ ফরযের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে নেক্কার-অনেককার কেউ-ই কোন মতভেদ করে না। কেননা কোন কোন ফরয যদি কিছু লোক ত্যাগও করে তবু অন্য লোকের ফরয তো থেকেই যায়। যেমন কিছু লোক নামায না পড়লে অন্য লোকদের উপর সে ফরয যথারীতি দাঁড়িয়েই থাকে। আর নামায তরক করলেও রোযা ও অন্যান্য যাবতীয় ফরয কিছুতেই রহিত হয় না। অনুরূপভাবে যদি কেউ সমস্ত মারুফ কাজ না করে ও সমস্ত 'মুনকার' কাজ থেকে বিরত না-ও থাকে, তবুও 'আম্র বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুন্কার'-এর কর্তব্যটা রহিত হবে না।

তাল্হা ইবনে আমর আতা ইবনে আবূ রিবাহ, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁর নিকট একত্রিত হয়ে তাঁকে বললেন ঃ হে রাসূল! আমরা যদি মারুফ-এর কাজ করি এমন ভাবে যে, কোন মারুফই অবশিষ্ট থাকল না যা আমরা করিনি, এবং সব মুনকার থেকেই আমরা বিরত থাকলাম এমনভাবে যে, কোন মুন্কারই আর বেঁচে থাকল না যা থেকে আমরা বিরত থাকিনি, তার পরও আমাদের জন্যে এ সুবিধাটুকু হবে না যে আমরা ' আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর কাজ করব না ? জবাবে তিনি বললেন ঃ

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ -

না, তোমরা মারুফ কাজের আদেশ করতেই থাক, যদিও তোমরা নিজেরা তার সমস্তটা কর না এবং মুনকার থেকে নিষেধ করার কাজ করো, যদিও তোমরা তার সবটা থেকে বিরত থাক না।

এ হাদীসে নবী করীম (স) 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর কর্তব্য

অন্যান্য ফরয কাজের মতই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা অবশ্য পালনীয় হিসেবে, তার কোন কোন দিকে যতই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাক না-কেন।

মুসলিম উম্মতের আলিম এবং আগের ও পরের সমস্ত ফিকাহবিদ এ কাজের ফরজিয়াতকে অগ্রাহ্য করেন নি। তবে খড়কুটা তুল্য কিছু লোক এবং জাহিল আহলি হাদীসগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তারা বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও 'আমর বিল-মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুন্‌কার' কাজ অস্ত্র সহকারে করাকে অস্বীকার করেছে। বরং তারা আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' কাজটিকেই একটা ফিতনা' নামে অভিহিত করেছেন। সে কাজে যখন অস্ত্র ধারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখনও তা করতে তারা রাজি নয়। বিদ্রোহীদের মুকাবিলা সশস্ত্রভাবে করতেও তারা প্রস্তুত নয়। অথচ তারা আল্লাহ্‌র আদেশ শুনতে ও জানতে পেরেছে ঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ -

তোমরা বিদ্রোহী লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণে তারা আল্লাহ্‌র ফরমান মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়। (সূরা হুজরাত ঃ ৯)

আয়াতের শব্দে স্পষ্ট ভাষায়ই তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ ও অস্ত্র প্রয়োগ করার আদেশ রয়েছে। তারা এ-ও ধারণা করে নিয়েছে যে, শাসক যে-ই হোক, তার জুলুম ও নিপীড়নের প্রতিবাদ করা যাবে না। আর নরহত্যা তো স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃকই নিষিদ্ধ। যে শাসক নয়, তার বিরুদ্ধে শুধু কথা বলা যাবে। আর হাত-ও ব্যবহার করা যাবে শূন্য হাতে, অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া। এর ফলে বিদ্রোহীরা গোটা উম্মতের উপর ভয়াবহ বিরোধী শত্রু হয়ে দাঁড়াল। কেননা তারা লোকদেরকে বিদ্রোহী দলের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত ও নিরস্ত করে রেখেছে। শাসকের জুলুম-নিপীড়ন মুখ বুঁঝে সহ্য করতে বাধ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি এই হল যে, ফাসিক-ফাযির লোকেরা প্রভাবশালী ও বিজয়ী হয়ে দাঁড়াল গোটা উম্মাহ্‌র উপর। অগ্নিপূজারী ও ইসলামের দুশমনরা আশকারা পেয়ে গেল। এমন কি শান্তি নিরাপত্তা শেষ হয়ে গেল, জুলুম প্রকাশমান ও ব্যাপক হয়ে পড়ল। শহর-নগর-জনপদ ধ্বংস ও বিরান হয়ে গেল। দ্বীন-ও গেল, দুনিয়াও গেল। নাস্তিকতা ও বাড়াবাড়ি বৃদ্ধি পেল। দ্বৈতবাদী, অগ্নিপূজা[১] ও সুদক ধর্মের প্রসার হয়ে পড়ল। আর এসব মতবাদই 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' এবং শাসকের জুলুম-পীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে।

মুহাম্মদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে উবাদুল ওয়াসিতী, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, ইসরাঈল, মুহাম্মাদ ইবনে জাহাদাতা, আতীয়াতাল আওফা, আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

১. মূলে الخرمية। বলা হয়েছে। এ শব্দটি নিয়েছে মজুসীদের একটি শাখা দল, যারা জন্মান্তরবাদ ও সবকিছু করা বৈধ এ মতবাদে বিশ্বাসী। 'খারসাতুন' নামে প্রাচীন পারস্যের একটি গ্রাম। এই দল সেই গ্রামের লোক ছিল।

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ اَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী শাসক বা আমীরের নিকট স্পষ্ট সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

মুহাম্মাদ ইবনে উমর আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে মুসয়িব আল-মরওজী আবূ উমারাতা, আল-হাসান ইবনে রশীদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইবরাহীম আস্-সায়েগকে ইকরামা-ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছি, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আবদুল মুত্তালিব পুত্র হামযা শহীদদের শ্রেষ্ঠ সরদার। যে লোক অত্যাচারী নেতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করে; আর তার ফলে সে নিহত হয়, সে-ও।'

আল্লাহ কথা ঃ

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ -

আর আল্লাহ্ বান্দাদের জন্যে জুলুম চান না।

এ আয়াত দাবি করে, সর্বপ্রকারে জুলুম-ই আল্লাহ্র ইচ্ছার বিপরীত। অতএব কেউ যেন কারোর উপর জুলুম করতে ইচ্ছুক না হয়। আল্লাহ্ নিজেও লোকদের উপর জুলুম করতে চান না, লোকদের পরস্পরে জুলুম হোক, তা-ও তিনি চান না। কেননা খারাপ ও মন্দ হওয়ার দিক দিয়ে এ দুটি সম্পূর্ণ সমান। আল্লাহ্ যদি লোকদের পরস্পরে জুলুম চাইতেন, তাহলে তিনি নিজেও লোকদের উপর জুলুম করতে চাইতেন, চাওয়া সঙ্গত হতো। বিবেচ্য, যে লোক নিজে অন্যের উপর জুলুম করতে ইচ্ছুক হয় আর যে মানুষদের পরস্পরে জুলুম হোক তা চায়— এ দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অন্যায়, মন্দ ও পাপ হওয়ার দিক দিয়ে এ দুটি অবস্থা-ই অভিন্ন। তেমনিভাবে তার জুলুমের ইচ্ছা তাঁর ও অন্যান্য সকলের দিক থেকেই নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমরা সর্বোত্তম জাতি! তোমরা ভালো কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর।

আয়াতে كُنْتُمْ -এর কয়েকটি তাৎপর্য বলা হয়েছে।

আল-হাসান থেকে বর্ণিত, এর অর্থ সুসংবাদ। আগের কালের আসমানী কিতাবে যে জাতিসমূহের উল্লেখ হয়েছে তাদের সম্পর্কিত খবর। আল-হাসান বলেছেন, সে সব জাতির মধ্যে আমরা সর্বশেষ, যারা আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, আল-হাসান ইবনে আবূ রুব্বাই, আবদুর রাযযাক, মামর, বহজ ইবনে হাকীম, তাঁর পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ 'তোমরা সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী, জনগণের কল্যাণে

তোমাদেরকে অস্তিত্ব দেয়া হয়েছে।' এ পর্যায়ে বলেছেন ঃ তোমরা সত্তরটি উম্মতের বাসনা পোষণ কর। তন্মধ্যে তোমরা সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা সম্মানার্হ আল্লাহ্‌র নিকট। ফলে এর অর্থ হল, তোমরাই সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। এ বিষয়ে আল্লাহ তাঁর নবীগণকে অবহিত করেছেন, যেসব কিতাব তাঁদের নিকট নাযিল হয়েছে সেই সবের মাধ্যমে।

এ-ও বলা হয়েছে, كان শব্দটির প্রবেশ ও নির্গমন একটি পর্যায়ে, তবে তা তার প্রবেশ পরিমাণ অনুযায়ী। তা অনিবার্যভাবে আদেশ সঙ্ঘটিত হওয়ার তাগিদের জন্যে। কেননা তা সেই পর্যায়ের যা প্রকৃত পক্ষেই ছিল। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

আর আল্লাহ্ তো অতীব ক্ষমাকারী ও অতিশয় দয়াবান ছিলেন। (সূরা নিসা ঃ ৯৬)

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا -

আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও সুবিজ্ঞানী ছিলেন। (সূরা নিসা ঃ ১৭)

এর অর্থ প্রকৃত পক্ষেই তা সঙ্ঘটিত।

বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ -

এর অর্থ ঃ তোমরা সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী হয়ে পড়েছ।

তার অর্থ বর্তমান অবস্থায় তোমরা সর্বোত্তম জাতি— জনগোষ্ঠী। এ অর্থও বলা হয়েছে যে, লওহে মাহফুজে তোমরা সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী ছিলে। বলা হয়েছে, যদ্দিন তোমরা আছ! তা প্রমাণ করে, প্রথম দিন থেকেই তোমরা এরূপ।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, মুসলিম উম্মাহ্‌র ইজমা সহীহ্। তার কতিপয় দিক রয়েছে। একটি, তোমরা সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী ছিলে। তবে তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এ গুণবাচক প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে যতক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র হক আদায়ে রত থাকবে ও গুমরাহ হবে না। দ্বিতীয়ত তাদের সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেসব কাজ করতে আদিষ্ট তাতে তারা মারূফ কাজের আদেশ করে। সে আদেশ আসলে আল্লাহ্‌র। কেননা 'মা'রূফ' মাত্রই আল্লাহ্‌র আদেশ। তৃতীয়, তারা মুনকারকে অস্বীকার করে। আর মুনকার হচ্ছে তা যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আর তারা এ প্রশংসনীয় মর্যাদার অধিকারী হবে তখন, যখন তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে মগ্ন থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হল, উম্মত যা-ই অস্বীকার-অগ্রাহ্য-অপছন্দ করবে, তা-ই 'মুনকার'। আর যারই আদেশ করবে, তা-ই মা'রূফ। তা-ই আল্লাহ্‌র হুকুম। এ তাৎপর্য উম্মতের গুমরাহীর উপর একমত হওয়াকে নিষিদ্ধ করে, তা ঘটতে পারে না বলে দাবি জানায়। এবং যার উপর তারা একমত হবে, তা-ই হবে আল্লাহ্‌র হুকুম।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى -

ওরা তোমাদের কখনই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে দেহে-প্রাণে পীড়ন করতে পারে।

এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে নবী করীম (স)-এর নবুয়ত সহীহ্‌ হওয়ার। কেননা তাতে খবর দেয়া হয়েছে সেসব ইয়াহূদী সম্পর্কে যারা মুমিনদের শত্রু ছিল। তারা মদীনার উপকণ্ঠের অধিবাসী ছিল, বনী নজীর, বনী কুরায়জা ও বনী কাউনকা এবং যযবরের ইয়াহূদী। আল্লাহ্‌ জানিয়েছেন যে, এরা কেউ-ই তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদিও কথা-বার্তার দ্বারা কষ্ট দিতে পারে। আর ওরা যখনই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তখনই তারা পশ্চাদপসরণে ও পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে বাধ্য হবে। এই যা খবর দেয়াও হয়েছিল, বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল। এ খবর দান গায়বী ইলম পর্যায়ের।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوْاۤ اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ -

তোমাদের উপর লাঞ্ছনা নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেখানেই তারা থাকুক। তবে রক্ষা পবে আল্লাহ্‌র রজ্জু ও মানুষের রজ্জু ধারণ করে।

এ কথা ইয়াহূদীদের সম্পর্কে— পূর্বে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথায়ও নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে। কেননা ওসব ইয়াহুদী লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য নিগৃহীত হয়েছে চিরকাল। তবে মুসলমানরা যখন তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব করেছেন, কেবল তখনই তা থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখানে الحبل শব্দের অর্থ চুক্তি ও নিরাপত্তা দান।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَيْسُوْا سَوَآءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ -

ওরা সব সমান নয়। আহলি কিতাবের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা সক্রিয়, ইবাদতে নিরত, রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করে ও সিজদায় পড়ে থাকে।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও ইবনে জুরাইয বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁর সঙ্গে আরও বহু সংখ্যক লোক, তখন ইয়াহুদীরা বলল ঃ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছে আমাদের মধ্যে থেকে খারাপ লোকেরা। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। হাসান বলেছেন ঃ قَائِمَةٌ অর্থঃ عَادِلَةٌ ন্যায়বাদী। ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র বিধানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আর সুদ্দী বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর কাজে দৃঢ়, কার্যকর। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ পর্যায়ে বলা

হয়েছে ঃ সিজদা নামাযে যা দেয়া হয়, তা-ই পরিচিত। কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন, তারা নামায কায়েম করে— নামায পড়ে। কেননা সিজদায় কুরআন পাঠ করা হয় না, রুকূতেও নয়। শুরুর واو (ওয়াও) অক্ষরটি অবস্থা বোঝায়। এটা ফররার কথা। প্রাথমিক লোকেরা বলেছেন, واو এখানে একত্রকারী, যেন বলা হয়েছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করে, সে সঙ্গে তারা সিজদাও করে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং 'আমর বিল মারূফ' ও 'নাহী আনিল মুন্‌কার' করে। এটা তাদের গুণের বর্ণনা, যারা আহলি কিতাবের মধ্যে থেকে ঈমান এনেছে। কেননা তারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছে নবী করীম (স)-কে সত্য নবী মেনে নিতে ও তাঁর বিরোধীদের অমান্য ও অস্বীকার করতে। ফলে তারা সেই লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন, যাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'তোমরাই সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী, যাদেরকে মানবতার কল্যাণের জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে।' পূর্ববর্তী আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে। আর কুরআন যে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' কর্তব্য হওয়ার কথা বলেছে, তা পূর্বেই আমরা ব্যাখ্যা করেছি।

যদি পশ্ন করা হয়, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেসব বাতিল ধর্মীয় মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে ও তাতে যে 'মুনকার' রয়েছে, তা দূর করা কি ওয়াজিব, যেমন সমস্ত মুন্‌কার কাজের প্রতিবাদ করা কর্তব্য ?

জবাবে বলা যাবে, এর দুটি দিক রয়েছে। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ভুল মতবাদের প্রতি লোকদেরকে দাওয়াত দেয় ও লোকদের মনে শোবাহ-সন্দেহের সৃষ্টি করে গুমরাহ করে, তার প্রতিবাদ ও বিদূরণ অবশ্যই কর্তব্য, যতটা সম্ভব করতে হবে। আর যারা শুধু নিজেরা মনে আকীদা পোষণ করে, তা গ্রহণের জন্যে লোকদেরকে আহ্বান জানায় না, তাদের সম্মুখে সত্য কথা যুক্তি প্রমাণ সহকারে পেশ করে সত্য দ্বীন ও আকীদা কুবলের আহ্বান জানাতে হবে। তাদের আকীদার ও শোবাহ্-সন্দেহের ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট করে তুলতে হবে। যদি তারা সত্য দ্বীন পন্থীদের তরবারী নিয়ে আক্রমণ করতে না আসে এবং তাদের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে রাষ্ট্র— সরকার প্রধানের আনুগত্য থেকে বিরত না থাকে। তারা যদি তাদের আকীদা প্রচারে ও সেজন্য যুদ্ধংদেহী বের হয়, তাহলে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আল্লাহ্‌ই আদেশ দিয়েছেন। সে যুদ্ধ চালাতে হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র বিধানের নিকট নতি স্বীকার করছে। হযরত আলী কাররামাল্লাহ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কূফা নগরের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন খারিজীরা মসজিদের এক কোণ থেকে বলে উঠল ঃ

لَاحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ -

হুকুম আল্লাহ ছাড়া আর কারোর চলতে পারে না।

তখন তিনি তাঁর খুতবা বন্ধ করে বললেন ঃ

كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ -

হ্যাঁ, কথাটি সত্য, তবে ভুল উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হচ্ছে (ভুল অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে)।

এরূপ অবস্থায় আমাদের নিকট তাদের জন্যে তিনটি পন্থা আছে। তাদের হাত যতক্ষণ আমাদের হাতে মিলিত থাকবে, 'ফাই' সম্পদ থেকে তাদের হক দেয়া বন্ধ করব না। আর তাদেরকে আমাদের মসজিদসমূহে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতেও নিষেধ করব না। এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব না, যতক্ষণ তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছে।

এ কথার দ্বারা তিনি জানালেন যে, ওরা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব নয়। আর ওরা যখন 'হারুরা'য় অবতরণ করল, তখন হযরত আলী (রা) ওদেরকে ডাকা শুরু করলেন এবং ওদের মতের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করলেন। ফলে তাদের কিছু লোক ফিরে এলো। বিভিন্ন বাতিল মতবাদ সম্পন্ন লোকদের ব্যাখ্যাগত ভিত্তি হচ্ছে এ ঘটনা যে, ওরা যতক্ষণ নিজেদের মত প্রচার করে সে দিক লোকদেরকে দাওয়াত দিতে শুরু না করবে ততক্ষণ ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না এবং ওদের মত যতক্ষণ কুফর না হবে, ততক্ষণ তার উপর ওদেরকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয়া হবে। কেননা কুফরি মতের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া দিতে হবে। আর ব্যাখ্যার ভুলের দরুন কুফর স্বীকারকারীকে জিযিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখাও জায়েয নয়। কেননা তওহীদ ও রাসূলের প্রতি ঈমান ত্যাগকারী বলে তারা মুরতাদের মতো। অনেকে তাদেরকে আহলি কিতাবের মতো মনে করেছেন। আবুল হাসান তা-ই বলতেন। তাঁর মতে ওদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন জায়েয। তবে তাদের নিকট মুসলিম মেয়ে বিয়ে দেয়া জায়েয নয়। ওদের যবেহ্ কৃত জন্তু খাওয়া যাবে। কেননা ওরা কুরআনের হুকুম মানার দাবি করে, যদিও তা ধারণকারী তারা নয়। যেমন খ্রীস্টান ও ইয়াহুদী মত গ্রহণকারী লোক। তাই এদের সাথে যে রূপ ব্যবহার ওদের সাথেও সেইরূপ ব্যবহারই করতে হবে, যদিও তারা তাদের সমগ্র শরীয়াতের ধারক, অনুসারী নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ -

আর ওদেরকে যে লোক বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে সে ওদেরই একজন হবে।

(সূরা মায়িদা ঃ ৫১)

ইমাম মুহাম্মাদ الزيادات গ্রন্থে লিখেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন চিন্তা-বিশ্বাস গ্রহণ করে, যার প্রতি বিশ্বাসী কাফির হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের ওসী হতে পারে, মুসলমানদের ওসী'দের ব্যাপারে যা যা জায়েয, তাদের ব্যাপারেও তা জায়েয হবে। যা বাতিল, তা ওদের ব্যাপারেও বাতিল হবে। একথা আবুল হাসান প্রচারিত মতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। অনেকে আবার ওদেরকে মুনাফিক পর্যায়ে মনে করেছেন, সেই মুনাফিক যারা রাসূল (স)-এর সময়ে ছিল। তাদেরকে মুনাফিকীর উপর থাকতে দেয়া হয়েছে, যদিও তাদের কুফরি ও মুনাফিকী সম্পর্কে জানা ছিল। অনেকে তাদেরকে যিম্মীর ন্যায় মনে করেছেন। তারা অস্বীকার করেছে, তারা ওদের ও এদের মধ্যে পার্থক্য করেছে এই বলে যে, মুনাফিকদিগকে— যদি তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে জানতে পারি, তাহলে তাদেরকে তার উপর স্থির থাকতে দেব না, আর ইসলাম ছাড়া তাদের নিকট থেকে আর কিছুই গ্রহণ করব না। নতুবা তাদের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য হবে। যিম্মীদেরকে তাদের আকীদা নিয়ে থাকতে দেয়া হয় জিযিয়া দেয়ার কারণে।

আর ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী ও ব্যাখ্যার কারণে কুফরি মত গ্রহণকারীদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা জায়েয নয়। অথচ এদেরকে তাদের মতে স্থির থাকতে দেয়া জিযিয়া গ্রহণ ব্যতিরেকে জায়েয নয়। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তাদের কুফরি আকীদাকে একটি ধর্মমতরূপে জানতে পারলে তার উপর তাদেরকে স্থির থাকতে দেয়া জায়েয হবে না। তাদেরকে মুরতাদ বলেই মনে করতে হবে। শুধু শাব্দিকভাবে তাদেরকে কাফির বলাই যথেষ্ট নয়। তাদের ভুলটা আকীদাগত না-ও হতে পারে, তাদের অন্তর থেকে প্রকাশিত না-ও হতে পারে। তাদের আকীদায় এমন জিনিস থাকাও অসম্ভব নয়, যার দরুন তাদেরকে কাফির বলা যেতে পারে। সেই সময় মুরতাদ হয়ে যাওয়া লোকদের মতই তাদেরকে মনে করতে হবে। তাদেরকে তওবা করতে বলতে হবে। তওবা করলে ভাল-ই। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত।

যিম্মীদের নিকট সাহায্য চাওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোন লোককে আন্তরিক ও গোপন তথ্যের অবহিত বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে না।

আবূ বকর আল-জাস্‌সাস বলেছেন ঃ এক ব্যক্তির بطانة হচ্ছে তার বিশেষ লোকগণ, যারা তার ব্যাপারাদিকে গোপন করে রাখে এবং সে তার ব্যাপারে তাদের প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করে। এ কারণে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গোপন প্রীতি স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। তাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কাফিররা মুমিনদের প্রতি যে ক্ষতিকর মনোভাব পোষণ করে, তা-ও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا 'তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদি বিনষ্ট করে দিতে যে-কোন উপায় অবলম্বন করতে একটুও ত্রুটি করবে না। আয়াতের خَبَالًا শব্দের অর্থ, বিপর্যয়, বিনষ্টকরণ ও ক্ষতি সাধন। এরপর বলেছেন ঃ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ 'যা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে, তা-ই তারা অন্তর দিয়ে কামনা করে।' সুদ্দী বলেছেন, ওরা তোমাদের দ্বীন থেকে তোমাদের গুমরাহ্ হওয়াকে অন্তর দিয়ে চায়। ইবনে জুরাইয বলেছেন ঃ ওরা চায়, তোমরা তোমাদের দ্বীন পালনে বিব্রত হও, বিপদে জড়িয়ে পড়, পরিণামে কঠিন কষ্টের মধ্যে পড়ে যাও। কেননা العنت -এর আসল অর্থ হল, কষ্ট। এ আয়াতে যেন জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওরা ভালোবাসে— পছন্দ করে যে, তোমরা খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে যাও।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ -

আল্লাহ্ চাইলে তিনি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই কষ্টের মধ্যে ফেলতন। (সূরা বাকারা ঃ ২২০)

এ আয়াতাংশ প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের সরকারী কার্যক্রম— আমলা-লেখক-কেরানী পর্যায়ের কাজে যিম্মীদের সাহায্য গ্রহণ জায়েয নয়। হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর নিয়োজিত গভর্নর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) একজন যিম্মী ব্যক্তিকে লেখক— কেরানী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তখন তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করে তীব্র ভাষায় চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি কুরআনের আলোচ্য আয়াতাংশ লিখে বললেন ঃ 'মুসলমানদের ছাড়া তোমাদের গোপন বিষয়ে অন্য কাউকে বিশ্বাসভাজনরূপে গ্রহণ করবে না। আর আল্লাহ তাদেরকে হীন করেছেন যখন, তখন তুমি তাকে ইযযতের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে পার না।' আবূ হায়ান আত্-তায়মী ফরকাদ ইবনে সালিহ্ আবূ দহ্কানাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, এখানে একজন 'হীরা' অধিবাসী লোক রয়েছে। সে খুবই সংরক্ষক। তার চাইতে অধিক সংরক্ষক কাউকে দেখিনি— সবই তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে। তা আমি লিখেও রাখতে পারি না, যা তার মুখস্থ থাকে। আপনি মঞ্জুর করলে আমি তাকে কেরানী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারি। জবাবে তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি মুমিন ছাড়া অন্য এক ব্যক্তিকে তোমার গোপনীয়তার সংরক্ষক বানাবে' ? হিলাল আত-তায়ী অস্ক রুমী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি উমর (রা)-এর দাস ছিলাম। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন ঃ 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলমানদের গোপনীয় আমানতের সংরক্ষণ কাজে তোমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। কেননা মুসলমানদের আমানতের ব্যাপারে তাদের ছাড়া অন্য কারোর সাহায্য গ্রহণ আমার জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়।' আমি তখন ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ 'লা-ইকরাহা ফিদ্দীন' দ্বীন কবুলের জন্যে কোন জবরদস্তির অবকাশ নেই। তিনি মুমূর্ষাবস্থায় আমাকে মুক্ত করে দিলেন। বললেন ঃ তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً -

তোমরা সূদ খেয়ো না চক্রবৃদ্ধি হারে।

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً-এর অর্থে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি, الْمُضَاعَفَةُ একটি মিয়াদের পর আর একটি মিয়াদ বিলম্বিত করে নির্ধারণ করে সূদ খাওয়া। প্রত্যেক মিয়াদে মূলধনে এক-একটি কিস্তি বৃদ্ধি করা। আর দ্বিতীয় মূলধনের উপর যা-ই বাড়িয়ে চড়িয়ে ধরা হবে, তা। একথা প্রমাণ করে যে, উল্লেখ বিশেষীকরণ প্রমাণ করে না যে, এর বিপরীত যা তা এর পরিপন্থী। কেননা তা যদি হতো, তা হলে 'রিবা' চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ, হারামকরণের উল্লেখ তার মুবাহ হওয়া প্রমাণিত হতো আবশ্যিকভাবে— যখন তা চক্রবৃদ্ধি হারে হতো না। অথচ মূলতই 'রিবা' হারাম, তা চক্রবৃদ্ধি হারে হোক, আর না-ই হোক। এ বিষয়ে যারা মত প্রকাশ করেছে, তাদের মত ঠিক নয়, তা উক্ত কথা-ই প্রমাণ করে। আল্লাহ্ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'রিবা' হারাম করেছেন'। কথাটিই অকাট্য ও নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করে যে, তাদের সে মতটি মনঃপূত। এক্ষণে উক্ত কথার ব্যবহারিক প্রমাণিত কথা অবশিষ্ট নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ -

এবং জান্নাত— যার প্রস্থ আসমান-জমিন সমান।

এর অর্থে বলা হয়েছে, অপর আয়াতে আছে ঃ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -

এবং জান্নাত, যার প্রস্থ আসমান-জমিনের প্রস্থের সমান। (সূরা হাদীদ ঃ ২১)

এ কথাটি ঠিক এ কথাটির মতই ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ -

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও তোমাদের সকলের পুনরুত্থান কর্ম একটি মাত্র প্রাণীর মত। (সূরা লুকমান ঃ ২৮)

অর্থাৎ একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থান যেমন সহজ, সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানও তেমনি সহজ ও সম্ভব। বলা হয়, উক্ত আয়াতে عَرْضُ শব্দটির বিশেষ উল্লেখ এবং দৈর্ঘ্যের উল্লেখ না করার কারণ হল এ কথা বোঝানো যে, দৈর্ঘ্য অতিশয় বিরাট ও বিশাল। তার উল্লেখ করা হলে তাতে তার ঠিক বোঝানোর জন্যে কোন দৃষ্টান্ত দেয়া সম্ভব হতো না।

হাদীসে এরূপ কথার দৃষ্টান্ত হল নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ -

ভ্রূণের যবেহ তার মার যবেহ। এর অর্থ, মাকে যবেহ করার মত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ -

যারা সচ্ছল ও কষ্ট— উভয় অবস্থায় (আল্লাহ্‌র জন্যে অর্থ) ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ দমনকারী এবং যারা জনগণের ক্ষমাদানকারী .....।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ -

এর অর্থ, কষ্ট ও সুবিধা সচ্ছলতার অবস্থা

অর্থাৎ অর্থ ব্যয় সম্পদের স্বল্পতা ও বিপুলতার অবস্থা। কেউ বলেছেন এর অর্থ, আনন্দ ও দুঃখ-কষ্টের সময়। আল্লাহ্‌র পথে করণীয় সর্বোচ্চ নেক কাজে অর্থ খরচ করা থেকে উক্ত দুইটি অবস্থার কোন একটিও মুমিনদেরকে বিরত রাখতে পারে না। এ উভয় অবস্থায় যারা আল্লাহ্‌র জন্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এ আয়াতে। পরে তার সাথে একত্র করা হয়েছে ক্রোধ দমনকারীদের এবং লোকদেরকে ক্ষমদানকারীদের প্রশংসা। যে লোক নিজের

ক্রোধ হজম করে, সে প্রশংসনীয় কাজ করে। যে লোকের সাথে কোন অপরাধমূলক আচরণ কেউ করল, আর সে তাকে ক্ষমা করে দিল, সে-ও প্রশংসনীয় কাজ করে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ

مَنْ خَافَ اللّٰهَ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ وَمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ لَمْ يَصْنَعْ مَايُرِيْدُ وَلَوْلَا يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لَكَانَ غَيْرُ مَاتَرَوْنَ -

যে লোক আল্লাহ্কে ভয় করেছে, তার ক্রোধ প্রকাশ পাবে না। যে লোক আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে, সে যা-ই ইচ্ছা হয় তা করে না। যদি কিয়ামতের দিন না হতো তাহলে যা দেখছ, তার বিপরীত।

বস্তুত ক্রোধ দমন ও ক্ষমাদান দুটোই পছন্দনীয়, প্রশংসনীয়। দুটো কাজেরই সওয়াব হওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا -

কোন প্রাণী-ই আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত মরতে পারে না। প্রত্যেকের জীবনের মিয়াদ লিখিত— সুনির্দিষ্ট।

এ আয়াতে জিহাদে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ মরতে পারে না। নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালে মানসিক কষ্ট পাওয়া লোকদের জন্যে এ আয়াতে সান্ত্বনা রয়েছে। কেননা তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই সঙ্ঘটিত হয়েছে। আর মুহাম্মাদ (স)-ও যে মরবেন, তা আগেই এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -

মুহাম্মাদ একজন রাসূল, তার পূর্বেও বহু সংখ্যক রাসূল এসে চলে গেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا -

যে লোক দুনিয়ার সওয়াব পেতে চায়, আমরা তাকে তা-ই দিই।

এর তাৎপর্য বলা হয়েছে, যে লোক দুনিয়ার স্বার্থ-সুখ লাভের লক্ষ্যে কাজ করবে, তার জন্যে ভাগ করা দুনিয়ার অংশটুকুই সে পেতে পারবে; কিন্তু পরকালে তার প্রাপ্য কিছুই থাকবে না। এ তাৎপর্য ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। এ-ও বলা হয়েছে যে, তার অর্থঃ যে লোক তার জিহাদ কার্যের দ্বারা দুনিয়ার সওয়াব লাভ করতে চাইবে, তাকে গনীমতের অংশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এ অর্থ-ও বলা হয়েছে যে, যে লোক তার নফল আমল দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে চাইবে এবং সে তার কুফরির কারণে পরকালে জান্নাত লাভের উপযোগী লোকদের মধ্যে গণ্য নয় অথবা তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সে তা পাওয়ার

অধিকারী হবে না, তার সে নফল আমলের প্রতিফল দুনিয়ায়ই তাকে দিয়ে দেয়া হবে, পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না। এ আয়াতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ আয়াত ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا -

যে লোক তার ক্ষণিক সুফল পেতে ইচ্ছা করবে, তাকে আমরা এ দুনিয়ায়ই তাৎক্ষণিক সওয়াব দেব যতটা চাইব এবং যতটা দিতে ইচ্ছা করব। পরে তার জন্যে জাহান্নামকে চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করে দেব। তাতে সে পৌঁছবে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৮)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ -

বহু সংখ্যক নবী-ই এমন এসেছে যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বহু সংখ্যক রিব্বী যুদ্ধ করেছে।

ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান প্রমুখ বলেছেন, 'রিব্বী' বলতে আলিম ও ফিকাহবিদদের বুঝিয়েছেন। আর মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ বহু সংখ্য জনগোষ্ঠী।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا -

তারা কিছু মাত্র নিঃসাহস হয়ে পড়েনি আল্লাহ্‌র পথে তাদের উপর আসা বিপদ মুসীবতের দরুন এবং কিছু মাত্র দুর্বল হয়ে পড়েনি ও অক্ষমতা দেখায়নি।

বলা হয়েছে ঃ الوهن। অর্থ দেহ ভেঙ্গে পড়া, দৈহিক ও অন্যান্য দিকের অক্ষমতা। আর الضعف। অর্থ শক্তিহীনতা। আর الْاِسْتِكَانَةُ অর্থ দুর্বলতা প্রদর্শন। এ-ও বলা হয়েছে যে, তার অর্থ বিনয়-নম্রতা, নরম পড়ে যাওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, তারা (রিব্বীগণ) ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েনি, শক্তিহীনতার কারণে তারা দুর্বলতাও দেখায়নি আর নরম হয়েও পড়েনি। ইবনে ইসহাক বলেছেন ঃ তাদের নবী নিহত হলেও তারা সাহস হারিয়ে ফেলেনি, শত্রুদের সম্মুখে তারা কিছু মাত্র দুর্বল হয়েও পড়েনি। এবং জিহাদে যত বিপদই তাদের উপর আসুক না-কেন, তারা তাতে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়নি। মূলত এ আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, নবীগণের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে যারা আলিম-মনীষী ছিলেন, তাঁদের জীবনাচরণ অবলম্বন ও অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে উক্ত কথা বলে এবং তাদের অনুসরণ করে জিহাদে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا -

তাদের কথা ছিল শুধু এতটুকু ঃ 'হে আমাদের রব্ব। তুমি আমাদের গুনাহ্‌র মায়াফী দান কর।

এ আয়াতাংশ আগেরকালের নবীগণের অনুসারী রিব্বীগণের দো'আ উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদেরকে শিক্ষাদান করা হয়েছে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমরা যেন তাদের মতই কথা বলি। তাই শত্রুর সম্মুখীন হলে মুসলমানদের উচিত অনুরূপ দো'আ করা। বিশেষ করে আল্লাহ্ যখন উক্ত কথা তাঁদের প্রশংসাস্বরূপ বলেছেন, তাদের উক্ত কথায় আল্লাহ্ খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন, আমরাও যেন তাঁদের মতই কাজ করি, তাঁদের মতই কথা বলি এবং তাঁরা যেমন প্রশংসা পেয়েছেন, আমরাও যেন তেমনি প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী হই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ -

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় সওয়াব দিলেন এবং দিলেন পরকালীন উত্তম সওয়াব।

কাতাদাহ, রবী ইবনে আনাস ও ইবনে জুরাইয বলেছেন ঃ দুনিয়ার সওয়াব হল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তা হল, তাদের শত্রুর উপর তাদের বিজয়, শেষ পর্যন্ত তারা শত্রুর উপর প্রবল পরাক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সাফল্য লাভ করেছিলেন। আর পরকালের সওয়াব হল জান্নাত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজনের জন্যে ইহকাল ও পরকাল একত্রিত ও সমন্বিত হতে পারে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ لِدُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ عَمِلَ لِاٰخِرَتِهِ، اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَقْوَامٍ -

যে লোক তার দুনিয়ার জন্যে কাজ করবে, সে তার পরকালের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে লোক তার পরকালের জন্যে আমল করবে, সে তার দুনিয়ার দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আল্লাহ্ বহু জাতির জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতকে একত্রিত ও সমন্বিত করে দেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا -

আমরা কুফরি নীতি অবলম্বনকারীদের অন্তরসমূহে ভয়-ভীতির উদ্রেক করে দেব এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করেছে, যার স্বপক্ষে তিনি কোন ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নাযিল করেন নি।

এ আয়াতটি তাক্‌লীদ— অন্য লোকের অন্ধ অনুসরণের শৃঙ্খল গলায় পরার নীতির বাতিল হওয়ার অকাট্য দলীল। আয়াতের سلطان শব্দের অর্থ অকাট্য দলীল। কাফিরদের আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কথা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। দলীলবিহীন কথা মেনে নেয়াকেই তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ বলা হয়। কথায় বলা হয়, শাসকের শক্তিই সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। আর বাদশাহ্‌র আধিপত্যের উৎস-ই হচ্ছে শক্তি। আর অকাট্য যুক্তি-প্রমাণকেও 'সুলতান' বলা হয়। কেননা তা বাতিলের

মুলোৎপাটনে সক্ষম। বাতিল পন্থী, তার দ্বারাই পরাজিত হয়। কোন কিছুর উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়াকে তার উপর শক্তি কার্যকর হওয়া বলা হয়। সেই সাথে থাকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দান। এর দ্বারাই নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা আয়াতে মুশরিকদের অন্তরসমূহে ভীতির সঞ্চার করার কথা বলা হয়েছে। এ আগাম দেয়া সংবাদ বাস্তবায়িত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ حَتَّى اِنَّ الْعَدُوَّ لَيَرْعَبُ مِنِّيْ وَهُوَ عَلَى مَسِيْرَةِ شَهْرٍ -

ভয়-ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্যদান করা হয়েছে। এমনকি শত্রু আমার কারণে খুবই ভয় পায়। এক মাসের অতিক্রম্য দূরত্বে থেকেও।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِه -

আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তোমরা যখন ওদেরকে হত্যা কর, তখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেন।

আল্লাহ্র মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুর উপর সাহায্য ও বিজয় দানের আগাম খবর দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। অথচ তখনও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়নি ও মতদ্বৈততা প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। ওহুদ যুদ্ধের যেমন আগম খবর দেয়া হয়েছিল, তাদের পরাজিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং তাদের মধ্য থেকে অনেককে হত্যা করা হয়েছিল, এ-ও তেমনি আগাম সংবাদদান। এমন কি এক স্থানে নবী করীম (স) তীরন্দাজ বাহিনী দাঁড় করিয়েছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা সেখান থেকে কোনক্রমেই যেন হটে না যায়। কিন্তু তারা সে কথা অমান্য করে, দাঁড়ানোর স্থান থেকে তারা সরে যায় যখন তারা মুশরিকদের পরাজয় প্রত্যক্ষ করে এবং ধারণা করে যে, তাদের সব নিঃশেষ হয়ে গেছে, কেউই বেঁচে নেই। তখন এ সরে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক দ্বন্দে লিপ্ত হয়। এ সময় পেছনের দিক দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের বহু লোককে হত্যা করে। এর একমাত্র কারণ ছিল, তারা রাসূল (স)-এর নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। তাঁর নাফরমানী হয়েছিল।

এ ঘটনাও রাসূল (স)-এর নবুয়ত সহীহ্ হওয়ার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। কেননা তারা নবীর মাধ্যমে করা ওয়াদার বাস্তবতা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। নাফরমানীর ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ার আগেই তিনি একথা বলে দিয়েছিলেন; কার্যত নাফরমানী তারা যখন করেই বসলেন, তখন তাদের রক্ষার দায়িত্ব তাদের উপরই ছেড়ে দেয়া হল। দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে আল্লাহ্র নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার এটা একটা দলীল। রাসূলের আক্ষরিক মান্যতা ও অনুসরণের কথাও এর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্র ও রাসূলের আনুগত্যে কঠোরভাবে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হওয়ার কথাও এখানে বলা হয়েছে। মুসলমানদিগকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দানের ব্যাপারে আল্লাহ্র যে নিয়মটা কার্যকর, তার কথা এখানে বলে দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানরা

দ্বীন-ইসলামের জন্যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে আশাবাদী থাকতেন। তা তাঁদের সংখ্যাধিক্যের কারণে নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا -

দুই সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখী হওয়ার দিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে যাবে, তাদের নিজেদেরই কোন কোন উপার্জনের দরুন শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করেছে।

আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের এ পরাজয় বরণ রাসূল (স)-এর আদেশ অমান্য করার কারণে হয়েছিল, তিনি যেখানে তাদেরকে দাঁড় করিয়েছিলেন, সেখান থেকে হটে যাওয়াই ছিল রাসূলের নাফরমানী।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ -

তোমাদের মধ্যের কিছু লোক দুনিয়া চায়, আবার কিছু লোক পরকাল চায়। অথচ পূর্বেই দিয়ে দেয়া হয়েছে সে লোকদেরকে যারা দুনিয়া পেতে চেয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ নবী করীম (স)-এর সঙ্গী হয়ে যাঁরা যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যের কোন লোক দুনিয়া চায় বলে আমি মনে করতে পারি না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর কালামে বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা দুনিয়া চায়।'

এ তাৎপর্যের দৃষ্টিতেই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ জনের উপর ফরয করেছিলেন যে, তারা দু'শ কাফিরের মুকাবিলা থেকেও পালিয়ে যাবে না। তিনি বলেছিলেন ঃ

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ -

তোমাদের মধ্যের পরম ধৈর্যশীল বিশজন দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে।

(সূরা আনফাল ঃ ৬৫)

কেননা ইসলামের সূচনা পর্বে রাসূল (স)-এর সঙ্গী-সাথীরা আল্লাহ্র জন্যে জিহাদের নিয়তে অত্যন্ত মুখলিস ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুনিয়া চাওয়ার লোক ছিল না। বদর যুদ্ধে তিনশত দশ জনের অধিক লোক ছিলেন, অস্ত্র-শস্ত্র ও সংখ্যার দিক দিয়ে অত্যন্ত লঘিষ্ঠ। আর তাদের শত্রুদের মধ্যে এক হাজার লোক ছিল অশ্বারোহী এবং অস্ত্র পরিচালনে সক্ষম। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁদেরকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেছিলেন। তারা শত্রুদেরকে ইচ্ছামত হত্যা করেছিলেন, তাঁরা যেমন চেয়েছিলেন। তেমনই ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের সাথে এমন লোক সংমিশ্রিত হয়, যারা তাঁদের মত দৃষ্টি ও নিষ্ঠাবান ছিল না। এজন্যে তাদের বিজয়ের ব্যাপারে সংখ্যাগত চাপ হালকা করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্‌র বলেছেন ঃ

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

এক্ষণে আল্লাহ্ তোমাদের উপর সংখ্যাগত চাপ হালকা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। কাজেই এক্ষণে তোমাদের মধ্যে পরম ধৈর্যশীল একশজন হলে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হতে পারবে, আর এক হাজার জন হলে আল্লাহ্‌র অনুমতিতে দুই হাজার জনকে পরাজিত করতে পারবে।

(সূরা আনফাল ঃ ৬৬)

জানা-ই আছে, আয়াতে যে দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে, তা দৈহিক দুর্বলতা নয়, অস্ত্র-শস্ত্র না থাকার কথাও নয়। কেননা তাদের দৈহিক শক্তি তো যথাযথ অক্ষুণ্ন ছিল। তাদের সংখ্যাও বিপুল ছিল, অস্ত্র-শস্ত্রও প্রচুর ছিল। কথাটির তাৎপর্য হল, তাদের সাথে এমন লোক সংমিশ্রিত হয়েছে, যাদের বিবেক-শক্তি আগের লোকদের মত ছিল না। তাই 'দুর্বলতা' বলতে এখানে নিয়ত— মন-মানসিকতার দুর্বলতার কথাই বলা হয়েছে এবং সংখ্যাগত চাপ হালকাকরণে সকলকে একই পর্যায়ে ধরে নেয়া হয়েছে, কেননা তাদের মধ্যে যারা বিবেকবান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা ও দুর্বল মন-মানসিক শক্তির লোকদের ও দূরদৃষ্টির স্বল্পতা সম্পন্নদের নাম বলে দেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করা হয়নি। এ কারণে ইয়ামামার যুদ্ধে লোকেরা যখন পরাজয় বরণ করল, তখন রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ বললেন ঃ اَخْلِصُوْنَا اَخْلِصُوْنَا 'আমাদেরকে খালিস কর, আমাদেরকে খালিস কর।' এ কথা বলে তারা মুহাজির ও আনসারদেরকেই বুঝিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ -

পরে দুঃখ-কষ্টের পর তোমাদের উপর তন্দ্রার শান্তি নাযিল করলেন, যা তোমাদের কিছু লোককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তাল্‌হা, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) এবং কাতাদাহ ও রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, এ কথাটি ওহুদ যুদ্ধের দিন সম্পর্কে বলা। তাতে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার পর এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। মুশরিকরা চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল। তখন মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা দৃঢ় ও অটল ছিলেন, তাঁরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে মশগুল ছিলেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের উপর তন্দ্রা চাপিয়ে দেন। তাঁরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েন। তাদের মধ্যের মুশরিকদের অবস্থা ছিল এ থেকে ভিন্নতর। তারা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কেননা তাদের মন-মানসিকতা ও ধারণা বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত খারাপ। নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ বলেছেন, অতঃপর আমরা খুব করে ঘুমালাম। এমনকি নিদ্রাচ্ছন্নতার নাসাধ্বনি উচ্চ হয়ে উঠেছিল। মুনাফিকরা কিন্তু এ অবস্থা পায়নি বরং

তারা নিজেদের হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। জনৈক সাহাবী বলেছেন ঃ আমি নিদ্রা-জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। তখন শুনতে পেলাম, মুতব ইবনে কুশায়র ও কয়েক জন মুনাফিক পরস্পরে বলছিল, মূল ব্যাপারে আমাদের কোন অংশ হবে কি? এটা মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্‌র একটি বড় অনুগ্রহের ব্যাপার ছিল। এ অবস্থার মধ্যে দিয়ে নবুয়তের নির্দশন প্রকাশমান হয়ে পড়েছিল, যখন শত্রু তাদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গী-সহকারীদের অনেকে সাহস-হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিল। মুসলমানদেরও অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন। তারপরই তাঁরা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় থেকে, আর এ সময়ই নিদ্রা-তন্দ্রা উড়ে গিয়েছিল অনেকের। তারা অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলেন। অনেকে তো যুদ্ধ থেকে বিরত ছিল। যাঁরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, তা বর্ণনাতীত। এ সময় শত্রুরা এক বছর পর আবার তাদের উপর আক্রমন চালাবার ঘোষণা দিয়েছিল। তাদেরকে হত্যা করার ও তাদের মূলোৎপাটনের জন্যে এ সময়ে তারা তাদের তরবারি শানিত করেছিল।

এ ঘটনায় রাসূলে করীম (স) যে সত্য নবী ছিলেন, তা কয়েকটি দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছিল। একটি— শত্রুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মনে পরম প্রশান্তি বিরাজ করছিল। শত্রুদের কোন অগ্রগতি ছিল না। তাদের থেকে অন্য দিকে তারা মুখ ফিরিয়েও নেয়নি, তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। এ সময় আল্লাহ্ তাদের অন্তরে পরম প্রশান্তি আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন। এ অবস্থা বিশেষভাবে দৃঢ় ঈমানের অধিকারী লোকদের ছিল।

দ্বিতীয় হচ্ছে, সেই ধরনের অবস্থার মধ্যে তাদের উপর তন্দ্রা চেপে বসা— যে ধরনের অবস্থায় নিদ্রা-তন্দ্রা সবই উড়ে যাওয়ার কথা— যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর, যারা তা প্রত্যক্ষ করেছে তাদের থেকে আলাদাভাবে তাহলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তাদেরকে উচ্ছেদ করার ও হত্যা করার উদ্দেশ্যে শত্রুদের সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করার অবস্থায় কি পরিণতি দাঁড়াতে পারে! তৃতীয়, মুমিনদিগকে মুনাফিকদের থেকে পৃথকীকরণ, সে প্রশান্তির বিশেষভাবে মুসলমানদের উপর আসা, কেবল তাদেরই নিদ্রা কাতর হওয়া— মুনাফিকদের তা স্পর্শ-ও না করা। ফলে মুসলমান চরম পর্যায়ের শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে ছিলেন, আর মুনাফিকরা ছিল ভয় সন্ত্রাস ও অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত। এতএব মহান সেই আল্লাহ্ যিনি সর্ববিজয়ী, সর্ব শক্তির অধিকারী সর্বজ্ঞ, যিনি নেক আমলকারীদের আমল কখনই নিষ্ফল করে দেন না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ -

আল্লাহ্‌র অতি বড় রহমত যে, তুমি— হে নবী লোকদের জন্যে বড়ই নম্র।

বলা হয়েছে, আয়াতের ما একটি صلة অর্থ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে। এ কথা কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। যেমন বলেছেন ঃ

عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِيْنَ -

সে সময় নিকটে, যখন এরা নিজেদের কৃতকর্মের দরুন অনুতপ্ত হবে। (সূরা মুমিনুন ঃ ৪০)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ -

তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে .... ভাষা-ভাষী সকলেই এ বিষয়ে একমত। (সূরা নিসা ঃ ১৫৫)

তাঁরা বলেছেন ঃ এর অর্থ, তাগিদ করা ও সুন্দর শৃঙ্খলা স্থাপন করা। এ আয়াত দলীল হয়ে প্রমাণ করেছে যে, যে লোক বলে যে, কুরআনে مجاز পরোক্ষ বর্ণনা নেই, তাদের কথা বাতিল। কেননা উক্ত আয়াতাংশে বলা কথা পরোক্ষ তাৎপর্যপূর্ণ। তা বাদ দিলেও প্রকৃত অর্থ বদলে যায় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ -

তুমি যদি কঠোর-নির্মম হৃদয়ের লোক হতে, তাহলে লোকেরা তোমার চারপাশ থেকে সরে পালিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

এতে বলা হয়েছে যে, নম্রতা দয়া অবলম্বন এবং কঠোরতা-নির্মমতা, রুঢ়ভাষিতা এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান জানানোর কড়াকড়ি বা কর্কশতা পরিহার করা একান্তই কর্তব্য। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

أُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ -

তুমি তোমার রব্ব-এর পথের দিকে বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম মর্মস্পর্শী উপদেশ-নসীহতের সাহায্যে আহ্‌বান জানাও এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক-ও কর। (সূরা নহল ঃ ১২৫)

যেমন আল্লাহ্ মূসা ও হারুন (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشٰى -

ফিরাউনের নিকট গিয়ে তোমরা দুজন তাকে নম্র কথা বলবে ; সে হয়ত উপদেশ কবুল করবে অথবা ভয় পেয়ে যাবে। (সূরা ত্ব-হা ঃ ৪৪)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِىْ الْأَمْرِ -

তুমি লোকদের সাথে সামষ্টিক-রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শ কর।

এ আয়াতে الامر শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে— যে বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ তাঁর নিকট ওহী নাযিল হতো বলে সঠিক মত সাহাবীদের নিকট থেকে জেনে নেয়ার মুখাপেক্ষিতা আদৌ ছিল না। এ পর্যায়ে

কাতাদাহ্ রুবাই ইবনে আনাস ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেছেন ঃ আল্লাহ রাসূল (স)-কে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের হৃদয়কে সন্তুষ্ট পবিত্রকরণ এবং তাদের প্রতি উচ্চতর মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে। কেননা তাঁরা রাসূলের কথাকে শক্ত করে ধারণ করতেন। তাঁর মতকেই মেনে নিতেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাতা বলেছেন ঃ তাঁদের সাথে পারস্পরিক পরামর্শ করার এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এজন্যে, যেন তাঁর উম্মত এ নীতির অনুসরণ করে। এ কাজকে ক্ষতিকর বা মানহানিকর মনে করে না যেন। অপর আয়াতে আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন এই বলে ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ –

তাদের ব্যাপারাদির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে।

আল-হাসান ও দহাক বলেছেন ঃ পরামর্শ করার এ নির্দেশে এক সাথে দুটি দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে, একদিকে তাতে সাহাবাদের মান-মর্যাদা বড় ও বিরাট হয়। অপর দিকে মুসলিম উম্মত যেন পরামর্শ করার রাসূলে (স)-এর এ নীতি অনুসরণ করে। কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ পরামর্শ করার এ আদেশ সেক্ষেত্রে কার্যকর হবে, যে বিষয়ে কোন 'নস' অকাট্য দলীল নেই, যার দ্বারা সুনির্দিষ্ট জিনিস সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এ মতের লোকেরাই বলেছেনঃ পরামর্শ গ্রহণের এ আদেশ বৈষয়িক বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ। কেননা দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে নবী করীম (স) নিছক ইজতিহাদের ভিত্তিতে কথা বলবেন ও মত প্রকাশ করবেন, তা তারা মানতে রাজী নয়। এজন্যে বলতে হবে, পরামর্শ করার এ নির্দেশ কেবলমাত্র বৈষয়িক বিষয়াদিতেই হতে পারে। এক্ষেত্রে নবী করীম (স) সাহাবীগণের মতের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন, তা খুবই সঙ্গত। বাস্তব ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের বিষয়াদিতে তিনি এ পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পারস্পরিক পরামর্শ, ইশারা-ইঙ্গিত লাভ এবং সাহাবীগণের মত না নিয়ে সে ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ জায়েয না-ও হতে পারে। বদর যুদ্ধের দিন হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির (রা) নবী করীম (স)-কে পানির নিকট অবস্থান নেয়ার কথা বললে তা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ ও তদানুযায়ী কাজ করা হয়। আর খন্দক যুদ্ধের দিন হযরত সাদ ইবনে মুয়ায ও সাদ ইবনে উবাদা (রা) মদীনার কিছু ফল-ফসলের ভিত্তিতে গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধি না করার ইঙ্গিত করলে তা-ও গৃহীত হয় এবং সন্ধিপত্র ছিড়ে ফেলা হয়। এ ধরনের বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণের দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য রয়েছে। অন্যান্য মনীষীরা বলেছেন, দ্বীনি বিষয়াদি ও যেসব ঘটনায় আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন 'তওকীফ' থাকে না, সেই সব বিষয়েও সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার জন্যে নবী করীম (স) আর্দিষ্ট ছিলেন। আর বৈষয়িক ব্যাপারাদি যা সাধারণত চিন্তা ও প্রধান ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাতেও পরামর্শ করতে তাঁকে বলা হয়েছে। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বিষয়ে কি করা যাবে, সে ব্যাপারও রাসূল (স) সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ চেয়েছিলেন। তাতে সাহাবীগণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছিলেন বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের পক্ষে। পরে তিনি তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করেছিলেন। আর তাতে কয়েক প্রকারের ফায়দা লাভ হয়েছিল। একটি, লোকদের জানিয়ে দেয়া হল যে, যেসব ঘটনা ও ব্যাপারাদি সম্পর্কে অকাট্য দলীল পাওয়া না যাবে সেসব বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ ও সর্বাধিক

মাত্রার ধারণা। দ্বিতীয়, সাহাবীগণকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাঁরা ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন। তাঁদের রায় মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা সঙ্গত। কেননা আল্লাহ্ তাঁদের মর্যাদাকে অনেক উন্নত করে দিয়েছেন। নবী করীম (স) নিজে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন, তাঁদের ইজতিহাদ তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতেন। আল্লাহ্র হুকুম জানার জন্যে তাঁরা যে 'নস্'-এর আনুকূল্য করতেন, তালাস-অনুসন্ধান করতেন তা-ও সন্তুষ্টির বিষয়। তৃতীয়, সাহাবীদের গোপন মন-মানসিকতাও আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় ছিল। তা না হলে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিতেন না। এ সবই সাহাবীগণের দৃঢ় প্রত্যয় ও ঈমানী সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। তাঁদের উচ্চতর মর্যাদার ব্যাপারেও কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। আর সেই সাথে তাঁদের ইলম এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীতে যে অকাট্য 'নস্' থাকে না, তাতে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অনস্বীকার্য। গোটা জাতি নবী করীম (স)-এর পর তাঁদেরই অনুসরণ করবে স্বাভাবিকভাবেই। তাঁদের মানসিক সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যেই তাঁদের সাথে পরামর্শ করার আদেশ করা হয়েছে, এটা আল্লাহ সম্পর্কে অকল্পনীয়। কেবল এজন্যেই তাঁদের মর্যাদা উচ্চ করা হয়েছে এবং গোটা উম্মতকে তাঁদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, তা বলার-ও কোন ভিত্তি নেই। কেননা তাঁরা যদি জানতে পারতেন যে, তাঁদের নিকট পরামর্শ চাওয়া হলে, সে বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম জানাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা-সাধনা করা হলে এবং যথার্থ নির্ভুল মত দেয়া হলেও তদনুযায়ী আমল করা হবে না, তা কবুলও করা হবে না, তাহলে তাতে তাঁদের মন সন্তুষ্ট হতে পারত না। তাতে তাঁদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেত না। বরং তার ফলে তাঁদের মনকে বিদ্রোহী বানিয়ে দেয়া হতো, জানিয়ে দেয়া হতো যে, তাঁদের মত যতই নির্ভুল হোক, তদনুযায়ী আমল করা হবে না, তা গৃহীতও হবে না। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ অযোগ্য। এর কোন অর্থ হয় না। এ মত প্রকাশকারী যেমন বলেছেন, তাঁদের দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হবে না, তা কোন ফায়দাও দেবে না, একথা জানা সত্ত্বেও উম্মত কি করে তাঁদের অনুসরণ করতে পারে? তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে উম্মতকে যদি তাঁদের অনুসরণ করতেই হয়, তাহলে উম্মতের লোকদেরও এ পদ্ধতিতে পরামর্শ করা এবং তা সহীহ্ হলেও তা কোন শুভ ফল দেবে না, তদনুযায়ী কাজ-ও করা হবে না। কেননা এ মত প্রকাশকারীদের দৃষ্টিতে তাদের সাথে পরামর্শ শুধু এজন্যেই করা হতো। কিন্তু উম্মতের লোকদের পারস্পরিক পরামর্শ যদি সহীহ্ রায় ও কার্যোপযোগী কথা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাতে নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের সাথে তাঁর পরামর্শ করার মত হবে না। কেননা তা বাতিল হয়ে গেছে। তাই রাসূল (স) যে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন, তার একটা কার্যকর ফায়দা অবশ্যই হতে হবে, তাঁদের সাথে নবী করীম (স)-এর একটা নীতিগত সম্পর্ক ছিল বলে এবং তাদের ইজতিহাদ কার্যকর ও গ্রহণীয় বলে মেনে নিতে হবে। আর তখন তাঁদের মত নবী করীম (স)-এর মতের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন হবে এবং সাহাবীদের পারস্পরিক মতের মধ্যেও সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য হবে, এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য নবী করীম (স) নিজে তাঁদের সকলের মতের বিরুদ্ধতাও করতে পারেন এবং তখন কেবল নিজের মত অনুযায়ী কাজ করার-ও তাঁর অধিকার রয়েছে, তা-ও অনস্বীকার্য। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা তাঁদের ইজতিহাদের নিজেদের গর্দান বেঁধে ফেলবেন না, বরং তাঁদেরকে যা করতে বলা হয়েছে তা তাঁরা করেছেন বলে তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট থেকে সওয়াবের অধিকারী হবেন। এ সময় তাদের নিজেদের মতকে পরিহার

করতে হবে এবং নবী করীম (স)-এর মতেরই অনুসরণ করতে হবে। নবী করীম (স)-এর তাঁদের সাথে পরামর্শ হবে কেবল মাত্র সেই বিষয়ে, যে বিষয়ে কোন 'নস' বা অকাট্য দলীল নেই। কেননা 'নস' পাওয়া যায় যে যে বিষয়ে, সেসব বিষয়ে পরামর্শ করার কোন অবকাশ নেই। তাই যুহর ও আসর-এর নামায এবং যাকাত, রমযানের সিয়াম প্রভৃতি বিষয়ে তোমাদের মত কি, তা কখনই বলা চলবে না। নবী করীম (স)-এর পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্র হিসেবে দুনিয়ার ব্যাপারাদি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দ্বীনি ব্যাপারকেই চিহ্নিত করা হয়নি, আল্লাহ্ তা করেন নি, তাই এ উভয় ব্যাপারেই তিনি পরামর্শ চাইতে পারেন। এ কথা তো জানা-ই আছে যে, নবী করীম (স) প্রধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ও শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বৈষয়ীক ব্যাপারেই সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেছেন। নবী করীম (স)-এর বৈষয়ীক ও জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কারোর সাথে পরামর্শ করার কিছুই ছিল না, কেননা শুধু খাদ্য-খোরাক ও বাড়াবাড়িহীন জীবন ছাড়া তাঁর তো দুনিয়ার কোন ব্যাপারও ছিল না। আর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করাই ছিল সাহাবীগণের সাথে তাঁর পরামর্শ করার প্রধান বিষয়, আর তা তো দ্বীনি ব্যাপার, কোন নিছক বৈষয়িক ব্যাপার তো তা নয়। কাজেই এ বিষয়ে ইজতিহাদ করে কোন মত ঠিক করা ও 'নস' আসে নি এমন সব ঘটনার হুকুম জানতে চাওয়ার ইজতিহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীতে ইজতিহাদের সাহায্যে শরীয়তী মত নির্ধারণ সম্পূর্ণ সহীহ্ কাজ এবং প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক (كل مجتهد مصيب)। নবী করীম (স) নিজেও ইজতিহাদ করে বিভিন্ন বিষয়ে রায় ঠিক করতেন যে সব বিষয়ে 'নস' নেই সেই বিষয়ে।

তা থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) সাহাবীদের সাথে একত্রিত হয়েও ইজতিহাদ করতেন। যে মতটিকে অধিক বলিষ্ঠ ও প্রবল পেতেন, সেই অনুযায়ী-ই কাজ করতেন। অবশ্য যে বিষয়ে 'নস' নেই সেই বিষয়ে। পরামর্শ কর আদেশ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ নবী করীম (স)-কে বলেছেন ঃ

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

পরামর্শের আলোকে তুমি যে মতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ও সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে (কাজ করতে শুরু কর)।

যে বিষয়ে তিনি পরামর্শ করেছেন তাতে 'নস্' থাকত এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে 'তাওফীক' এসে থাকত, তাহলে উপরোক্ত আয়াতে পরামর্শের পূর্বেই সংকল্প গ্রহণের উল্লেখ করা হতো। কেননা 'নস' থাকাটাই তদনুযায়ী আমল করার সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণ সহীহ্ হতো। পরামর্শ করার প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু পরামর্শ করার আদেশের পর সংকল্প গ্রহণের কথা বলার দরুন বোঝাই যায় যে, এ সংকল্পটা পরামর্শের ভিত্তিতে হতে হবে। কেননা পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন 'নস' ছিল না, আগে পাওয়া যায়নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ -

গনীমতের মালে কোনরূপ খিয়ানত করা নবীর কাজ নয়।

শব্দটি يُغَلَّ -ও পড়া হয়। তার অর্থ খিয়ানতকৃত হওয়া। একথা বিশেষভাবে নবী করীম (স) সম্পর্কে বলা। যদিও সমস্ত মানুষের বেলায়ই খিয়ানত নিষিদ্ধ। তবে অন্যের আমানতে খিয়ানত করা তো অতিশয় বড় কঠিন গুনাহ। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ -

অতএব মূর্তিসমূহের মলিনতা তোমরা পরিহার কর, পরিহার কর মিথ্যা কথা।

(সূরা হজ্জ ঃ ৩০)

যদিও رجس বা মলিনতা সবই নিষিদ্ধ এবং আমরা তা পরিহার করতে আদিষ্ট, হাসান থেকে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যুবায়র يُغَلَّ -এর অর্থ বলেছেন, খিয়ানত করার অপরাধ আরোপিত হওয়া। বলেছেন, আয়াতটি কুতায়ফা হামরা লাল মখমল প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল, যা বদর যুদ্ধের দিন হারিয়ে গিয়েছিল। তখন কোন কোন লোক বলে উঠল, হয়ত নবী করীম (স) নিজেই তা নিয়ে নিয়েছেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

আর যে يَغُلُّ পড়েছে, সে এর অর্থ করেছে ঃ খিয়ানত করে। الغلول। অর্থ সর্বপ্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা— খিয়ানত। তবে এখানে তা বিশেষভাবে গনীমতের মালে খিয়ানত বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী করীম (স) এ খিয়ানতের ব্যাপারটি খুব কঠিনভাবে ধরেছিলেন এবং এটাকে কবীরা গুনাহ্ বলেছেন। কাতাদাহ্ মালিক ইবনে আবুল যায়দ, মাদান ইবনে আবূ তালহা, সওবান, রাসূল (স)-এর মুক্ত দাস এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলতেন ঃ

مَنْ فَارَقَتْ الرُّوْحُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكِبَرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ -

যে লোকের রূহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তিনটি জিনিস থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল— জান্নাতে দাখিল হওয়ার, অহংকার, ধোঁকা-বিশ্বাসঘাতকতা ও ঋণ।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স)-এর সময় এক ব্যক্তি ছিল, তাকে করকরা বলে ডাকা হতো। সে মরে গেলে নবী করীম (স) বললেন ঃ هُوَفِيْ النَّارِ সে জাহান্নামী। এ কথা শুনে লোকেরা গিয়ে দেখলেন ঃ তার উপর চাদর ও আবাবড় কোর্তা, যা সে কেড়ে নিয়েছে। নবী করীম (স) বললেন ঃ সুতা ও সুঁচ দিয়ে দাও। কেননা এটা লজ্জা, আগুন ও অপমান কিয়ামতের দিন। ধোঁকা-খিয়ানত যে অতি বড় গুনাহ্, তা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীসে বলা হয়েছে। সর্বপ্রকারের খাদ্য মুবাহ হওয়া এবং এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর ঘাস গ্রহণের কথাও বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (স) থেকে। সাহাবা ও তাবেয়ীন থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় বহু প্রসিদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা (রা) বলেছেন ঃ খায়বর যুদ্ধকালে আমাদের খাদ্যাভাব ঘটে; তখন আমাদের এক ব্যক্তি এসে তার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ নিয়ে নিত ও ফিরে যেত। সুলায়মান থেকে বর্ণিত, মাদায়েন যুদ্ধে খাদ্যাভাব দেখা দিলে রুটি, পনির ও চাকু পাওয়া গেলে এক-একজন পনিরের টুকরা কেটে

নিত এবং বলতঃ বিসমিল্লাহ্ বলে খাও। রুয়াইফা ইবনে সাবিতুল আনসারী (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন ব্যক্তির জন্যে মুসলিম জনগণের অধিকারের 'ফাই' সম্পদের কোন জন্তুর পিঠে সওয়ার হওয়া হালাল নয়। এমনিভাবে যে তার উপর সওয়ার হয়ে হয়ে সেটিকে দুর্বল করে ফিরিয়ে দেবে। আবার যে লোক আল্লাহ্‌র ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, মুসলমানদের সামষ্টিক 'ফাই' সম্পদ থেকে কাপড় নিয়ে পরিধান করা তার জন্যে হালাল নয় যে, পরে পুরাতন করে ফিরিয়ে দেবে। এসব কথা সেই অবস্থায় ও সেই ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য যে লোক 'ফাই' সম্পদের প্রতি অ-মুখাপেক্ষী। তবে যদি তার মুখাপেক্ষী হয় তাহলে ফিকাহবিদদের মতে তাতে কোন দোষ নেই। বরা ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত— তিনি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন এক মুশরিক ব্যক্তিকে আঘাত হানলেন। আঘাতটা লোকটি ঘাড়ের পেছনের দিকে লেগেছিল। পরে তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِادْفَعُوْا -

যারা মুনাফিকী করেছে তাদের জেনে রাখা উচিত, তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা আস, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর, অথবা দফা কর।

সুদ্দী ও ইবনে জুরাইয اوادفعوا সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হল, তোমরা আমাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ না করলেও আমাদের সাথে মিলিত থেকে আমাদের বাহিনীকে বিরাট করে তোল। আবূ আওনুল আনসারী বলেছেন, তার অর্থ ঃ তোমরা যুদ্ধ না করলেও ঘোড়ার উপর আরোহী হয়ে থেকে পাহারাদারী কর। আবূ বকর বলেছেন ঃ যার উপস্থিতিতে ফায়দা আছে, যার দরুন বাহিনীর বিপুলতা হয় তার উপস্থিত থাকাটা ফরয, একথাই এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়। দফা ও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দাড়িয়ে থাকা যখন জরুরী হবে, তখন তা-ই করতে হবে ফরয হিসেবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ -

ওরা মুখে কথা বলে যা ওদের অন্তরে নেই।

বলা হয়েছে ঃ এ কথার দুইটি তাৎপর্য আছে। তার একটি হল— এতে তাগিদ রয়েছে কথাটি তাদের হওয়ার উপর। কেননা অনেক সময় এমন হয় যে, কাজ যে করেনি কাজটি তার বলে প্রচার করা হয় যদি সে তাতে রাজী থাকে ও সমর্থন করে। এটা প্রত্যক্ষভাবে করা হয় না, করা হয় পরোক্ষভাবে। যেমন আল্লাহ্ কুরআন নাযিল হওয়াকালীন ইয়াহুদীদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ (বাকারা ঃ ৯১) তাহলে তোমরা পূর্বে আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করতে কেন ? (তখনকার ইয়াহুদীরা এ কাজ না করলেও এবং তাদের পূর্বপুরুষরা তা করলে এরা তাতে রাজী ছিল এবং তা সমর্থন করত) ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় হল, মুখ কথাটি বলে মুখের কথাও কিতাবের কথার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, তাদের রব্ব-এর নিকট তারা রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে!

অনেক লোক মনে করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পথে মৃত লোকেরা জান্নাতে জীবিত হবে। তারা বলেছে, কেননা তাদের মৃত্যুর পর তাদের রূহ তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া যদি সঙ্গত হয়, তাহলে সেটা তো পুনর্জন্ম গ্রহণের আকীদা হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, জমহুর আলিমগণের কথা হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মৃত্যু ও জান কবজের পর তাদেরকে জীবিত করবেন এবং তাদের পাওনা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ তাদেরকে দেবেন। শেষ পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির ধ্বংসের সময়ে তাদেরকেও আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন। পরে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে তাদেরকে নিয়ে আসবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন। কেননা আল্লাহ্ তো তাদেরকে জীবিত বলেছেন। তার অর্থ তো এই হয় যে, তারা এ সময় এ দুনিয়ায়ই জীবিত হবে। কেননা তারা জান্নাতে জীবিত হবে— এ ব্যাখ্যা করা হলে এ কথাটি বলার কোন তাৎপর্যই থাকে না। যেহেতু সমস্ত জান্নাতী লোকদের সঙ্গে তারাও জীবিত হবে একথা তো সব মুসলমানই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে। কেননা জান্নাতে তো কোন মৃত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারা নিজেদের অবস্থার দরুন উৎফুল্ল ও আনন্দিত হবে। বলেছেন ঃ

فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

আল্লাহ্ তার যে অনুগ্রহ তাঁদেরকে দেবেন, তা পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবে।

এ আয়াতটি থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয় ঃ

وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ -

তারা খুশীতে ফেটে পড়বে তাদের সাথে যারা তাদের পেছন থেকে তাদের সাথে মিলিত হয়নি।

পরকালে তারা এসে তাদের সাথে মিলিত হবে। ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন তোমাদের ভাইদের উপর যখন বিপদ ঘনীভূত হল— তারা শহীদ হল— আল্লাহ্ তাদের 'রূহ'গুলোকে আরশের নীচে সবুজ পাখির পাকস্থলীর মধ্যে ভরে দিলেন। তা জান্নাতের ঝর্ণাধারার তীরে বসঁতে ও তার ফলমূল খেতে শুরু করল এবং আরশের নীচে ঝোলানো ঝাড়বাতিসমূহের আশ্রয় নিতে লাগল। হাসান, আমর ইবনে উবায়দ, আবূ হুযায়ফা ও ওয়াসিল ইবনে আতা এ মত প্রকাশ করেছেন। আর এ মত পুনর্জন্মে বিশ্বাসীদের মতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়, এ দুয়ের

মধ্যে কোন মিল নেই। কেননা পুনর্জন্ম ধারণার মূল কথা হল— মৃত্যুর পর এ দুনিয়ায়ই বিভিন্ন সৃষ্টির রূপ ধারণ করে ফিরে আসা। আর আল্লাহ্ তো অনেক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে মেরেছেন এবং পুনরায় জীবিত-ও করেছেন। যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ -

তুমি কি তাদের দিকে তাকাওনি, যারা হাজারে হাজারে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে মৃত্যুর ভয়ে বের হয়ে পড়েছিল? তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা মর। পরে তিনি নিজেই তাদেরকে জীবিত করলেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৩)

কিন্তু এ তো পুনর্জন্ম নয়। আল্লাহ্ এ-ও জানিয়েছেন যে, মৃতকে জীবিত করা ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর একটি মুজিযা। অনুরূপভাবেই আল্লাহ মৃত্যুর পর শহীদদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি যেখানে চান রেখে দেবেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

তারা তোমাদের রব্ব-এর নিকট রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছে।

এর অর্থ, তারা এমন অবস্থায় থাকবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ-ই তাদের একবিন্দু ক্ষতিও কেউ করতে পারবে না, পারবে না একবিন্দু ফায়দা দিতে। 'আল্লাহ্‌র নিকট' কথাটি স্থানগত নৈকট্য ও অবস্থানের দূরত্বহীনতা বোঝায় না। কেননা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে স্থানগত নৈকট্য বা দূরত্ব কল্পনা করা জায়েয নয়। কেননা এ কথা দেহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'তাদের রব্ব-এর নিকট'-এর অর্থ, আল্লাহ্‌র জানা মত, তারা কোথায় আছে, তা কোন মানুষ জানতে পারে না, জানেন একমাত্র আল্লাহ্।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ -

তারা— যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের জন্যে বহু লোক একত্রিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ ও ইবনে ইসহাক বলেছেন ঃ সে সব লোক যারা বলেছে, তারা আরোহী অবস্থায় ছিল, তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান-ও ছিল। ওহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তাদেরকে আটক করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছিল— যখন তারা তাদের দিকে ফিরে আসছিল। সুদ্দী বলেছেন, আসলে সে ছিল জনৈক মরুচারী, তাকে কেন্দ্র করেই উক্ত কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর কালামে এক ব্যক্তিকে 'লোকগণ' বলে অভিহিত করেছেন। একথা তার ব্যাখ্যানুযায়ী বলা হল, যিনি বলেছেন যে, মূলত লোক একজন ছিল। এটা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ বলে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করার নীতি অনুযায়ী বলা হয়েছে। আবূ বকর বলেছেন ঃ 'লোকগণ' কথাটি

জাতিগত। একথা জানা ছিল যে, সমস্ত মানুষই একাত্রিত হয়ে উক্ত কথা বলেনি। তাই তার সর্বাধিক কম সংখ্যাটি ধরতে হবে। আর তা হল এক। কেননা الناس। 'মানব জাতি' বোঝায়। এর ভিত্তিতে আমাদের হানাফী মাযহাবের লোকেরা বলেছেন, কেউ যদি বলে ঃ 'আমি যদি লোকদের সাথে কথা বলি, তাহলে আমাদের দাস মুক্ত হবে', তাহলে একজনের সাথে কথা বললেও তা হয়ে যাবে। কেননা 'লোকগণ' কথাটি জাতি পর্যায়ের। আর একথা জানা-ই আছে যে, গোটা 'জাতি'কে শামিল করাই এর উদ্দেশ্য নয়। তাই তার মধ্য থেকে অন্তত একজনকে ধরতে হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا -

অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর।

এ কথায় তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

এ কথা প্রমাণ করে যে, ভয় ও শ্রম বৃদ্ধির ফলে তাদের ঈমানী প্রত্যয়ও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কেননা তখন তারা প্রথমাবস্থায় পড়ে থাকে না, বরং তখন ইয়াকীন এবং দ্বীনের দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কথাটি তেমনই যেমন সূরা আল-আহযাব-এ বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا -

আর মুমিনরা যখন শত্রুবাহিনী দেখতে পেল, তখন তারা বলল ঃ এ তো তাই যার ওয়াদা আমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও রাসূল সে ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছেন। ফলে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ ভাবধারা অধিক বৃদ্ধি পেয়ে গেল। (সূরা ঃ আহযাব ঃ ২২)

অর্থাৎ শত্রুকে প্রত্যক্ষ করার ফলে ঈমান ও আল্লাহ্‌র আইন-বিধান মেনে নেয়া এবং জিহাদে ধৈর্য ধারণের মাত্রা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেল। এ কথায় সাহাবীগণের পূর্ণ মাত্রার গুণ বর্ণনা সম্পাদিত হয়েছে, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ ফযীলতের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। আর আমাদের জন্যে এতে এই শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, আমরা যেন সর্বাবস্থায় তাঁদের অনুসরণ করি এবং আল্লাহ্‌র দিকে বারবার ফিরে যাই। বিপদে যেন আমরা ধৈর্য ধারণ করি, ভরসা নির্ভরতা যেন আমরা আল্লাহ্‌র উপরই করি। আর আমরা যেন বলি ঃ 'আল্লাহ-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, তিনি-ই উত্তম দায়িত্বশীল। আমরা এ কাজ যখন করব, তখন তার ফলে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা অবশ্যই লাভ করব। তিনি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবেন, তাদের দুষ্কৃতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন। সেই সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও শুভ ফল আমরা লাভ করতে পারব। যেমন আল্লাহ্ নিজে বলেছেন ঃ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ -

তারা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে ফিরে গেল, কোন মন্দ তাদের স্পর্শ করল না, তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অনুসরণ করে চলল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَخَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَشَرٌّلَّهُمْ - سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْابِهٖ -

আল্লাহ্র দেয়া তার অনুগ্রহের ধন-সম্পদ নিয়ে যারা কৃপণতা করবে, তারা যেন ধারণা না করে যে, ... অবশ্যই যা নিয়ে তারা কার্পণ্য করে তা তাদের গলার বেষ্টনী হয়ে ঝুলবে।

সুদ্দী বলেছেন ঃ ওরা কৃপণতা করেছে, ওরা আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করেনি এবং যাকাতও দেয়নি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ওরা আহলি কিতাব লোক, ওরা তার কথা বলতে কৃপণতা করেছে। বিশেষ করে যাকাত দেয়ার ফরজিয়াতের কথা। যেমন তাঁর কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ -

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে। ..... (সূরা তওবা ঃ ৩৪)

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ -

যে দিন তার উপর তাপ দেয়া হবে জাহান্নামে, পরে তা দিয়ে তাদের দেহের পার্শ্বস্থলে ও মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া হবে। .... (সূরা তওবা ঃ ৩৫)

আর 'তারা যা নিয়ে বখিলী করেছে তা তাদের গলায় বেষ্টনী হয়ে দাঁড়াবে' কথাটিও তাই বোঝায়। সহল ইবনে আবূ সালিহ তাঁর পিতা হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّىْ زَكَاةَ كَنْزِهٖ اِلَّا جِىْءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَبِكَنْزِهٖ فَيُحْمٰى بِهَا جَبِيْنُهُ وَجُبْهَتُهُ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهٖ -

যে ধন-সম্পদ স্তুপের মালিক তার সঞ্চিত সম্পদের যাকাত দেয় না, তাকে ও তার সঞ্চিত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। পরে তা গরম করে তার দ্বারা তার কপাল ও মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া হবে। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের বিচার চূড়ান্ত করবেন।

মসরূক বলেছেন, সে যার হক দেয়নি সেই হককে একটা অজগর বানানো হবে, সেই সর্প গলায় বেষ্টন করবে। সে বলবে, এই আমার মাল ও তোমার মাল। সাপ বলবে, 'আমি-ই তোমার মাল।' আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ সে অজগরটি তার গলায় বেষ্টন করে থাকবে। তার দুইটি বিষাক্ত দাত থাকবে, বলবে ঃ আমি তোমার সেই মাল, যা তুমি কৃপণতা করে জমা করেছিলে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِذَا أَخَذَا اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ -

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ্ সে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যে, তোমরা অবশ্যই এই কিতাবকে লোকদের নিকট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে, তা স্মরণ কর।

সূরা আল-বাকারায়ও এ ধরনের আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াতে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। অন্যরা বলেছেন, এ আয়াতে ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান— উভয়ের কথা বলা হয়েছে। আল-হাসান ও কাতাদাহ বলেছেন, এ আয়াতে সেই সব লোকের কথাই বলা হয়েছে, যাদের আল্লাহ্র নিকট থেকে ইলম দেয়া হয়েছে কিন্তু তারা সে ইলম গোপন করে রেখেছে, প্রকাশ করেনি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ কুরআনে যদি ইলম গোপন করতে নিষেধ করার আয়াত না আসত, তাহলে আমি কক্ষণই তোমাদেরকে এ হাদীস বলতাম না। এরপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। তাই বলতে হবে যে, لَتُبَيِّنُنَّهُ বলে প্রথমকালীন মুফাস্সিরদের কথানুযায়ী নবী করীম (স)-কেই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তারা তাঁর গুণ সিফাত— যা আগের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে— তা গোপন করেছিল, তাঁর কথা প্রকাশ করেনি।

অন্যান্য মনীষীর কথানুযায়ী উক্ত আয়াতে নবী করীম (স) সম্পর্কিত কথা এবং আল্লাহ্র যা কিছুই আছে, সব কিছু বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ –

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পার্থক্য একটার পর আর এক আসায় বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে বিরাট-বিপুল নিদর্শন রয়েছে।

এতে যে 'আয়াত'— নিদর্শন রয়েছে, তার কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি— বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী জিনিসের একটার পর একটা আসা। এ সবের এক সাথে অস্তিত্ব থাকাই অসম্ভব ব্যাপার। এ জিনিসগুলো নতুন সৃষ্ট। নতুন সৃষ্ট তা-ই যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। আয়াতটি একথাও প্রমাণ করে যে, দেহসত্তা সম্পন্ন জিনিসসমূহের স্রষ্টা সে সবের সদৃশ হতে পারে না। কেননা কর্তা ও ক্রিয়া একই জিনিস নয়। তাতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, সৃষ্টির স্রষ্টা মহাশক্তিধর। কোন সৃষ্টই স্রষ্টাকে অক্ষম করতে পারে না। কেননা এসব জিনিসের স্রষ্টা এবং সে সবের মধ্যে নিহিত জিনিসের স্রষ্টা সেসবের বিপরীত জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেননা যে ক্ষমতাবান শক্তিধর নয়, তারা দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভব নয়। একথাও প্রমাণিত হয় যে, সর্ব সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাচীন— সবকিছুর পূর্বে অবস্থিত। সে চিরন্তন, শাশ্বত। কেননা সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব সংশ্লিষ্ট হচ্ছে সর্বাধিক প্রাচীন স্রষ্টার সাথে। অন্যথায় কর্তা আর এক কর্তার মুখাপেক্ষী হবে। আর এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে, যার শেষ কিছু নেই। আর তা এক অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টির নির্মাতা অশেষ জ্ঞানের অধিকারী। কেননা কোন সূক্ষ্ম সুদৃঢ় কাজ ঘটতে পারে কেবলমাত্র তার দ্বারা, যার ইলম সেই নির্মাণ কাজের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। স্রষ্টা-নির্মাতা মহাবিজ্ঞানী, একথাও প্রমাণিত হয়। তিনি ন্যায়পর, সুবিচারক, তাও প্রমাণিত। কেননা তিনি যে জিনিসের মন্দত্ব সম্পর্কে অবহিত, তিনি মন্দ জিনিসের সৃষ্টিকর্মে

আগ্রহী নন, তিনি অ-মুখাপেক্ষী। ফলে তার কার্যাবলী অবশ্যই ন্যায়পরতাপূর্ণ হবে। হবে নির্ভুল, তা তার সদৃশ হবে না— একথাও প্রমাণিত হয়। কেননা সদৃশ হলে সে সাদৃশ্য সব জিনিসের সাথে হওয়া সম্ভব । হওয়া সম্ভব তার কতক জিনিসের সদৃশ হওয়া। যদি সর্বদিক দিয়ে তার সদৃশ হয়, তাহলে স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির মতই নতুন। আর কতক জিনিসের সদৃশ হলে, তাহলে স্রষ্টাকেও তদ্রূপই হতে হবে। কেননা দুই সদৃশ এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে— যে দিক দিয়েই এ সাদৃশ্য হোক-না কেন। তাই নতুনত্বে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সমান হওয়া অনিবার্য। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্তম্ভ বা খুঁটিবিহীন অবস্থায় থাকাটা প্রমাণ করে যে, তা কেউ ধারণ করে আছে এবং সেই ধারক ও আকশ-পৃথিবী পরস্পর সদৃশ নয়। কেননা কোন খুঁটি ছাড়াই তার স্থিতি তারই মত একটা দেহ দ্বারা হতে পারে না। .... উক্ত আয়াতে এ সব দলীল প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

রাত ও দিন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। তা এভাবে যে, রাত ও দিন নব সৃষ্ট। এর কোনটিই ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর একথা জানা-ই আছে যে, কোন দেহসত্তা নিজেকে অস্তিত্ব দিতে পারে না। বাড়াতেও পারে না, কমাতেও পারে না। তাই এ দুটি নতুন অস্তিত্ব পাওয়া জিনিসের অস্তিত্ব দানকারী সত্তা থাকা অপরিহার্য। কেননা নতুন অস্তিত্ব পাওয়া জিনিসকে অস্তিত্ব দানকারী না থাকা অসম্ভব। অতএব এ দুটির অস্তিত্ব দানকারী কোন দেহ হবে না, দেহসমূহের সদৃশও হবে না। তার দুটি কারণ। একটি— দেহসমূহ তার মত দেহ বানাতে সক্ষম হতে পারে না। দ্বিতীয়, দেহের সদৃশ যা, তার সম্পর্কেও এ নীতি অবশ্যম্ভাবী যে, তা-ও নতুন। 'অতএব তার কর্তা যদি 'নতুন' অস্তিত্ব লাভকারী হয়, তাহলে তাকে অস্তিত্ব দানকারী— নতুন সৃষ্টিকারী একজন হতে হবে। পরে আর একজন নতুন সৃষ্টিকারী হতে হবে। পরে তৃতীয় একজন অস্তিত্ব দানকারী হতে হবে, এভাবে চলতে থাকবে, যার কোন শেষই নেই। আর এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব নির্মাতা বা স্রষ্টাকে চিরন্তন ও শাশ্বত হতে হবে অবশ্যম্ভাবী রূপে, যার সাথে কোন জিনিসেরই একবিন্দু সাদৃশ্য থাকবে না।

আল্লাহ্‌র পথে পাহারাদারীর ফযীলত

আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্য ধারণে অবিচল থাক এবং তোমরা পাহারাদারী ও পর্যাবেক্ষণে রত থাক।

আল-হাসান, কাতাদাহ, ইবনে জুরাইয ও দহাক বলেছেন ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করে থাক আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে এবং অবিচল হয়ে থাক তোমাদের দ্বীনের উপর এবং আল্লাহ্‌র দুশমনদের মুকাবিলায় অবিচল থাক ও আল্লাহ্‌র পথে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে থাক। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাতী বলেছেন ঃ ধৈর্য ধারণ কর তোমাদের দ্বীন পালনে, অবিচল থাক আমার ওয়াদার উপর যা বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমাদের শত্রুদের উপর অতন্দ্র প্রহরী পর্যাবেক্ষক হয়ে থাক। যায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন ঃ জিহাদে অবিচল হয়ে থাক। শত্রুদের মুকাবিলা কর অবিচল ধৈর্য সহকারে এবং সে কাজে অশ্ব ও যানবাহন প্রস্তুত করে

রাখ। আবূ মুসলিমা ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন ঃ এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্যে অপেক্ষমান থাক।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

فِىْ انْتِظَارِ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطِ -

কুরআনের যে অতন্দ্র প্রহরী ও পর্যাবেক্ষক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এক নামাযের পর আর এ নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

এবং অশ্ব ও যানবাহন প্রস্তুত রাখার কাজ, যদ্দারা তোমরা আল্লাহ্‌র দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে। (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

সুলায়মান নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন ঃ

رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَمِنْ قِيَامِهٖ وَمَنْ مَاتَ فِيْهِ وُقِىَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنَمَا لَهُ عَمَلُهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

আল্লাহ্‌র পথে একদিনের পাহারাদারী-পর্যবেক্ষণের কাজ এক মাসকাল ধরে রোযা রাখা ও রাত্রে নফল নামাযে দাঁড়ানো অপেক্ষা অতীব উত্তম। যে লোক এ কাজে করবে, সে কবরের আযাব ও কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

হযরত উসমান (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

حَرْسُ لَيْلَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ قِيَامَ لَيْلِهَا وَصِيَامٌ نَهَارُهَا -

আল্লাহ্‌র পথে একরাত্রি পাহারাদারীর কাজ করা এক হাজার রাত্রির রাত্রকালীন ইবাদত করা ও দিবসকালীন রোযা রাখা অপেক্ষাও অতীব উত্তম কাজ।

সূরা আন-নিসা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -

এবং তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহ্‌কে, যাঁর নাম করে তোমরা পরস্পরের নিকট কিছু চাও এবং (ভয় কর) রিহ্‌মকে।

আল-হাসান, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন ঃ পারস্পরিক জিনিসাদি চাওয়ায় আল্লাহ্‌র নাম করা হয় এভাবে যেমন একজন বলে আমি তোমার নিকট আল্লাহ্‌র ও রিহম-এর নামে প্রার্থনা করছি। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, সুদ্দী ও দহাক বলেছেন ঃ তোমরা রিহ্‌মকে ভয় কর, যেন তা ছিন্ন না কর। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র নাম করে পরস্পরের নিকট কিছু চাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয। লায়স মুজাহিদ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَالَكُمْ بِاللّٰهِ فَاعْطُوْهُ -

আল্লাহ্‌র নাম করে কিছু চাইলে তোমরা তাকে অবশ্যই তা দেবে।

এবং মুআবিয়া ইবনে সুয়াইদ ইবনে মকরান বরা ইবনে আজিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কিরা-কসমকে পবিত্র-পরিচ্ছন্নকরণ। এ কথাটি যা প্রমাণ করে, তা এই কথাটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়— রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে লোক তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নামে চাইবে, তাকে তোমরা অবশ্যই দেবে।

আল্লাহ্‌র কথা وَالْاَرْحَامَ এতে 'রিহম' বা রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে যে হক ধার্য হয়, তাকে অতি বড় করে পেশ করা হয়েছে, তা ছিন্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْآ اَرْحَامَكُمْ -

তোমরা যদি ফিরে যাও, তাহলে তোমরা কি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের রিহম সম্পর্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবে? (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২২)

এ আয়াত 'রিহম' সম্পর্ক ছিন্নকরণকে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে ও কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَايَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَاذِمَّةً -

কোন ঈমানদার ব্যক্তির এরা না নিকটাত্মীয়তার কোন কোন খেয়াল করে, না কোন ওয়াদা-চুক্তির দায়িত্ব পালন করে। (সূরা তওবা ঃ ১০)

আয়াতে ﻻ। শব্দের অর্থ বলা হয়েছে নিকটাত্মীয়তা। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -

এবং পিতা-মাতার সাথে দয়াপূর্ণ ভালো ব্যবহার করতে হবে, করতে হবে নিকটাত্মীয়দের ইয়াতীমদের, মিসকীনদের ও নিকটাত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

'রিহম' সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা ও তা ছিন্ন করা হারাম হওয়ার এবং তার বড় গুনাহ্ হওয়ার পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার পরিমাণ কুরআনে বলা আয়াতের কিছুমাত্র কম হবে না।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা জুহরী— আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ : اَنَا رَحْمٰنٌ وَهِىَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنِ اسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ -

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমিই রহমান— পরম ব্যাপক দয়াবান, তা থেকে 'রিহম'। আমি আমার নাম থেকে তার জন্যে একটা নাম বের করেছি। কাজেই যে লোক 'রিহম' সম্পর্ক রক্ষা করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব। আর যে লোক তা ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।

আবদুল বাকী ইবনে কানে বশর ইবনে মূসা তার মামা হায়ান ইবনে বশর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আবূ হানীফা নাসেহ, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর আবূ সালমাতা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَا مِنْ شَىْءٍ اُطِيْعَ اللّٰهُ فِيْهِ اَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَمَا مِنْ عَمَلٍ عُصِىَ اللّٰهُ بِهِ اَعْجَلُ عُقُوْبَةً مِنَ الْبَغْىِ وَالْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ -

যে কাজেই আল্লাহ্র আনুগত্য করা হবে ও তাতে খুব শীঘ্র সওয়াব পাওয়া যাবে এমন কাজ সেলায়ে রিহমী ছাড়া আর কিছু নয়। যে কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী হয় ও অবিলম্বে আযাব আসে, তা আল্লাহ্দ্রোহিতা ও পাপপূর্ণ কিরা-কসম ছাড়া আর কিছু নয়।

আবদুল বাকী বশর ইবনে মূসা, খালিদ ইবনে খদাশ, সালিহুলমরী, ইয়াযীদুর রাকাশী, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيْدُ اللّٰهُ بِهِمَا فِي الْعُمُرِ وَيَدْفَعُ بِهِمَا مِيْتَةَ السُّوْءِ وَيَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِمَا الْمَحْذُوْرَ وَالْمَكْرُوْهَ -

সাদকা-দান-খয়রাত ও সেলায়ে রিহ্‌মী— এ দুটির কারণে আল্লাহ আয়ু বৃদ্ধি করেন, এ দুটি দ্বারা খারাপ মৃত্যু প্রতিরোধ করেন এবং ভয়পূর্ণ ও অপছন্দনীয়— ঘৃণ্য অবস্থা থেকে এ দুটির কারণে আল্লাহ্ রক্ষা করেন।

আবদুল বাকী বশর ইবনে মূসা, আল হুমায়দী, সুফিয়ান, জুহরী, হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, তাঁর মা উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ -

রিহ্‌ম সম্পর্ক সম্পন্ন শত্রুর প্রতি দান-সাদকা করা অতীব উত্তম।

এ হাদীসটি সুফিয়ান ও জুহ্‌রী, আইয়ুব ইবনে বশীর, হাকীম ইবনে হাজাম সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'সবচেয়ে উত্তম দান-খয়রাত হচ্ছে নিকটাত্মীয় শত্রুর প্রতি। হাফসা বিনতে শীরীন রবাব, সালমান ইবনে আমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ -

সাধারণ মুসলমানদেরকে দান একটা দান বটে; তবে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি সাদ্‌কা এক সাথে দুটি— একটি দান এবং আর একটি রক্ত সম্পর্ক রক্ষা।

আবূ বকর বলেছেন ঃ উপরোদ্ধৃত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, সেলায়ে রিহ্‌মী রক্ষা করা ও তার দরুন সওয়াব পাওয়ার অধিকার হওয়া নিশ্চিত, অনিবার্য এবং নবী করীম (স) রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি দান-সাদকাকে এক সাথে সাদকা ও রক্ত সম্পর্ক রক্ষা বলে ঘোষণা করেছেন। এ রক্ত সম্পর্কের দরুন সওয়াবের অধিকার হওয়ার কথাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, দানের ফলে পাওয়া সওয়াব থেকে তা আলাদা। এতে প্রমাণিত হল যে, রক্ত সম্পর্ক সম্পন্ন মুহরম আত্মীয়কে কোন কিছু 'হিবা' করা হলে তা ফিরিয়ে নেয়া সহীহ্ কজ নয়। সেই হিবা-চুক্তি ভঙ্গ করাও জায়েয নয়। হিবাকারী পিতা হোক কিংবা অন্য কেউ। কেননা তা তো সাদকা পর্যায়ে পড়ে গেছে এ দিক দিয়ে যে, নিকটাত্মীয়তাই তার লক্ষ্য। আর তার দরুন সওয়াব পাওয়ার অধিকার হওয়া সাদকার মতই অনিবার্য। কেননা তার লক্ষ্য নিকটাত্মীয়তা রক্ষা। আর সওয়াব পেতে চাওয়া থেকে ফিরে যাওয়া কখনই সহীহ্ কাজ হতে পারে না। 'হিবা'ও ঠিক তেমনি যদি তা রক্ত সম্পর্কের মুহ্‌রম আত্মীয়ের জন্যে করা হয়। এ দলীলের কারণেই পিতার জন্যে সহীহ্ নয় পুত্রের জন্যে করা 'হিবা' ফিরিয়ে নেয়া। পুত্র ছাড়া রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য মুহরম আত্মীয়ের জন্যে করা 'হিবা' ফিরিয়ে নেয়াও অনুরূপভাবে সহীহ্ নয়।

কেননা এ 'হিবা'ও সাদকার মতই। তবে 'হিবা'কারী পিতা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্যে তা নিয়ে নেয়া জায়েয, ঠিক যেমন পুত্রের সব ধন-মাল।

যদি বলা হয়, কুরআন ও সুন্নাহ সেলায়ে রিহমী ওয়াজিব করে মুহ্‌রম রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় ও অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি। তাই রক্ত সম্পর্কের সকল আত্মীয়ের জন্যে করা 'হিবা' ফিরিয়ে নেয়া জায়েয না হওয়া উচিত, এ রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় মুহ্‌রম না হলেও। যেমন চাচার পুত্রও রক্ত সম্পর্কের দূরবর্তী আত্মীয়।

জবাবে বলা যাবে, 'হিবা'কারী ও যার জন্যে 'হিবা'— এদের মধ্যে যদি বংশীয় সম্পর্কের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ করে ধরা হয়, তাহলে তাতে আদম (আ)-এর সব সন্তানই শরীক মনে করা বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা তারা বংশের দিক দিয়ে তো অভিন্ন, সব একই বংশোদ্ভূত লোক, হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর পূর্বে আদম (আ) তাদের সকলকে একই বংশোদ্ভূত করেছে। তাই উক্ত কথা ঠিক নয়। অতএব যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের ব্যাপারে এ হুকুমটা প্রযোজ্য তা হল, যে দুজনার মধ্যে বিবাহ হারাম, তাদের মধ্যে, অবশ্য যদি দুজনার একজন পুরুষ ও অপর জন মেয়ে হয়। কেননা তাদের ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে মুহ্‌রম হওয়ার শর্ত খাটে না। তখন তারা অনাত্মীয় লোক বিশেষ। জিয়াদ ইবনে আলাফাতা উসামা ইবনে শরীক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি 'মিনা'য় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ 'তোমর মা, তোমার পিতা, তোমার বোন, তোমার ভাই, এরপর যারা নিকটবর্তী, তারপর যারা নিকটবর্তী তোমার নিকট। এ ভাষণে তিনি রক্ত সম্পর্কের মুহ্‌রম আত্মীয়দের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই বলতে হবে, আমাদের কথাই সহীহ্‌। তা সত্ত্বেও রক্ত সম্পর্কের দূরবর্তী আত্মীয়ের সাথেও সিলায়ে রিহমী রক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে যে তাগিদ এসেছে, তা প্রতিবেশীর প্রতি ভাল আচারণ করতে বলার মতই হুকুম। তার সাথে মুহ্‌রম আত্মীয় সংক্রান্ত হুকুমের কোন সম্পর্ক নেই। 'হিবা' ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারেও তাই। যে সব রক্ত সম্পর্কে আত্মীয় মুহ্‌রম নয়, তাদের প্রতি ভালো আচরণ গ্রহণ অবশ্যই পছন্দনীয় মুস্তাহাব। কিন্তু তাদের সাথে মুহ্‌রম সংক্রান্ত হুকুম নেই। তারা তো অনাত্মীয় ও সম্পর্কহীন লোকদের মতই।

ইয়াতীমের মাল-সম্পদ তাদের নিকট ফেরত দান

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ -

এবং তোমরা ইয়াতীমদিগকে তাদের ধন-মাল ফিরিয়ে দাও এবং ভালো মালের পরিবর্তে খারাপ মাল দিও না।

আল-হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল ইয়াতীমদের ধন-মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ নিয়ে, তখন মুসলমান অভিভাবকরা ইয়াতীমদের মালের সাথে নিজেদের মাল মিশ্রিত করা অপছন্দ করতে লাগলেন, ইয়াতীমের অভিভাবক তার

নিজের মাল থেকে ইয়াতীমের মাল আলাদা করে ফেলতে শুরু করলেন। পরে এজন্যে নবী করীম (স)-এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَّاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ -

লোকেরা— হে নবী! তোমাকে ইয়াতীমদের মাল কিভাবে রাখতে হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করে। তুমি বলে দাও, তাদের সঠিক কল্যাণ করাই মঙ্গলময়। তোমরা যদি তাদের মালের সাথে তোমাদের মাল মিলিয়ে রাখ, তাহলে ওরা তো তোমাদেরই দ্বীনি ভাই।

(সূরা বাকারা ঃ ২০)

আবূ বকর আল জাসসাস বলেছেন, আমি মনে করি, উক্ত কথাটি বর্ণনাকারীর একটা ভুল। কেননা উক্ত আয়াতটির তাৎপর্য ইয়াতীমদের পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর তাদের মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। কেননা ইয়াতীমদের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে তার মাল তার নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব নয়, এ বিষয়ে শরীয়াতের ইলমধারীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। হাদীসের বর্ণনাকারী,অপর একটি আয়াত সম্পর্কে ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। তা হল, মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, জরীর, আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন —

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া অন্য কোনভাবে ইয়াতীমের মালের নিকটেও যাবে না।

(সূরা আন'আম ঃ ১৫২)

আয়াতটি এবং —

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا -

যারা ইয়াতীমদের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করে .... (সূরা নিসা ঃ ২০)

এ আয়াতটি নাযিল করলেন তখন যার যার নিকট ইয়াতীমের মাল ছিল, তারা ঘরে গিয়ে ইয়াতীমের পানাহার নিজেদের পানাহার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিলেন। তখন তার খাবার বাড়তি হতে লাগল এবং তা তার জন্যে রেখে দিত, সে তা খেত কিংবা নষ্ট হয়ে যেত। ফলে এ ব্যাপারটি তার জন্যে খুবই কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। তখন তারা রাসূল (স)-এর নিকট ব্যাপাটির উল্লেখ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ হে নবী! লোকেরা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তাদের সার্বিক কল্যাণই সর্বোত্তম। তোমরা যদি তাদের মালের সাথে তোমাদের মাল সংমিশ্রিত কর, তবে তারা তো তোমাদের-ই ভাই। তখন তারা তাদের ও ইয়াতীমদের পানাহার সংমিশ্রিত করে। এ পর্যায়ে এ বর্ণনাটিই সহীহ।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ -

এবং দিয়ে দাও ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল।

এ কথাটি সে পর্যায়ের নয়। কেননা এ কথা জানা-ই আছে যে, এ আয়াতে ইয়াতীমদেরকে ইয়াতীম থাকা অবস্থায় তাদের মাল ফিরিয়ে দিতে বলা হয়নি, তাদের পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর-ই তা প্রত্যর্পণ করা ওয়াজিব, তার পূর্বে নয়। শুধু তা-ই নয়, তাদের পূর্ণবয়স্কতা লাভে সঙ্গে তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধির উদয় হওয়াও আবশ্যক। তা সত্ত্বেও এ অবস্থায় কুরআনে তাদেরকে 'ইয়াতীম' বলা হয়েছে এ জন্যে যে, তাদের ইয়াতিমী অবস্থা এইমাত্র— পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর-ই নিঃশেষ হয়েছে মাত্র। যেমন মেয়েদের ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময় হলেও মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ্র এ কথাটিতে ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

ইদ্দত পালনরতা মেয়েরা তাদের মিয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তখন তাদেরকে প্রচলিত নিয়মে আটকে রাখ। (সূরা তালাক ঃ ২)

তাহলে তাদের পূর্ণবয়স্কতা নিকটবর্তী হওয়াটাই লক্ষ্য। আয়াতের ধারাবাহিকতায় বলা পরবর্তী কথাই তার প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ -

তোমরা যখন তাদের মাল তাদের নিকট ফেরত দেবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রাখ।

ইয়াতীমের উপর সাক্ষী রাখা পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে সহীহ্ হয় না। তাই এ থেকে জানা গেল যে, তা তাদের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পরই করণীয়। এ অবস্থায়ও তাদেরকে 'ইয়াতীম' বলা হয়েছে দুটির যে-কোন একটি কারণে। হয় তাদের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির সময় নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অথবা তাদের পিতা থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে— এ সত্ত্বেও যে, এ সময় তাদের ধন-মাল নিজেদের জন্যে ব্যয়-ব্যবহার করায় এবং তাদের কার্যাবলী ও ব্যবস্থাপনাসমূহ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে— সাংসারিক দায়িত্ব পালনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের ন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপক্কতা না হওয়া।

ইয়াযীদ ইবনে হরমুজ বর্ণনা করেছেন, নাজদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছিলেন, ইয়াতীমের ইয়াতিমী কখন শেষ হয়? তিনি জবাবে লিখেছিলেন ঃ যখন তার বুদ্ধিসুদ্ধির পরিপক্কতা লাভের নিদর্শন পাওয়া যাবে, তখন তার ইয়াতিমী শেষ হয়ে যাবে। কোন কোন কথায় এরূপও এসেছে, যে 'ব্যক্তির একমুঠি শ্মশ্রু হয়ে গেছে; কিন্তু তার ইয়াতিমী এখনও যায়নি।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'ইয়াতীম' নামটা পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর-ও ব্যবহৃত হয়, যদি তার বুদ্ধি-বিবেচনা দৃঢ় না হয় এবং তার বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার পরিচয় পাওয়া না যায়। মত নির্ধারণের দুর্বলতা থাকলেই তার ইয়াতিমীও

থাকে, তাকে 'ইয়াতীম' বলা যায়। পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেই 'ইয়াতীম' বলা যেতে পারে। স্বামী বিচ্ছিন্না মেয়েলোককেও তা বলা যায়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِيْ نَفْسِهَا -

স্বামীহীনা নারীর নিকট তার নিজের ব্যাপারে আদেশ চাওয়া হবে।

অথচ পূর্ণবয়স্কা না হলে নারীর নিকট তার নিজের ব্যাপারে আদেশ চাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, এ কথা জানা-ই আছে যে, কোন বৃদ্ধ বা থুরথুরে বুড়োকে কখনই ইয়াতীম বলা যাবে না। সে বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে যতই দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ মতের অধিকারী হোক-না কেন। অতএব বালকত্বের কাছাকাছি সময়টাই গণ্য করতে হবে। আর বেশি বয়সের মেয়েলোককে 'ইয়াতীম' বলা যায় যদি সে স্বামী বিচ্ছিন্না হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন পুরুষ তার পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার একাকীত্বের কারণে তাকে ইয়াতীম বলা যাবে না। তা এজন্যে যে, পিতা তো বালক পুত্রের অভিভাবক হয়। সে তার বিষয়াদির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এ সময় বালক তার পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তাকে 'ইয়াতীম' বলা হয়। কাজেই সেই বালক বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতা ও পরিপক্ক মতের অভাব হলেই তাকে 'ইয়াতীম' বলা যাবে পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পর-ও। তবে নারীকে 'ইয়াতীম' বলা হয় এ জন্যে যে, তার জন্যে স্বামীই হচ্ছে আশ্রয়। সে স্বামীর বন্ধনে ও আশ্রয়ে নিরাপদে থাকে, সে এই স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তখন তাকে 'ইয়াতীম' বলা হয়। কেননা নারীর জন্যে স্বামী সেরূপ, অল্প বয়স্ক বালকের জন্যে যেমন পিতা। তখন পিতাই তার অভিভাবক, তার সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বশীল, তার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পিতাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারী যখন এরূপ স্বামী হারায় তখন তাকে ইয়াতীম বলা হয়, এরূপ বালক যখন তার পিতা হারায় তখনও তাকে ইয়াতীম বলা হয়। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -

পুরুষরা হচ্ছে মেয়েলোকদের ব্যবস্থাপক— পরিচালক— কর্মাধ্যক্ষ। (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

যেমন বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ -

অভিভাবকরা, তোমরা ইয়াতীমদের জন্যে সর্বক্ষণ ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে কর্ম সম্পাদনে যত্নবান থাক। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

প্রথমোক্ত আয়াতাংশে পুরুষদেরকে মেয়েদের কর্মাধ্যক্ষ বানানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়োক্ত আয়াতাংশে অভিভাবককে ইয়াতীমের কর্মাধ্যক্ষ বানানো হয়েছে। আলী ইবনে আবূ তালিব ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ -

পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর কেউ ইয়াতীম হয় না।

পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর কাউকে ইয়াতীম বলা হলেও তা পরোক্ষ অর্থে বলা হয়। তার কারণ পূর্বেই আমরা বলে এসেছি। দুর্বলকে 'ইয়াতীম' বলা হয় একটি বর্ণনার ভিত্তিতে। বর্ণনাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এসেছে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কেউ 'অমুক বংশের ইয়াতীমদের জন্যে' বলে কোন অসিয়ত করে, তাহলে তা সাধারণ ইয়াতীম দরিদ্রদের জন্যে জায়েয হবে না বলে আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ যে ফতোয়া দিয়েছেন, তা সহীহ্‌। তার প্রমাণ এ হাদীস, যা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইস্‌হাক আল-হাসান আবুর রবী-আবদুর রাযযাক, মামার আল হাসান সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এ আয়াত প্রসঙ্গে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا -

তোমাদের যে ধন-মালকে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে স্থিতি স্থাপন করেছেন তা নির্বোধ লোকদেরকে দিও না।

এ পর্যায়ে বলেছেন, سُفَهَاءَ 'নির্বোধ' বলতে তোমার নির্বোধ পুত্র ও বুদ্ধিহীনা স্ত্রী বুঝিয়েছেন। আর তাঁর কথা قِيَامًا -এর অর্থ, তোমার জীবনের পরিপোষক— স্থিতিস্থাপক উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمُ وَالْمَرْأَةِ -

ইয়াতীম ও নারী— এ দুটি দুর্বল শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

এ হাদীসে 'ইয়াতীমকে' দুর্বল বলা হয়েছে। মাল-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে ইয়াতীমের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হওয়ার কোন শর্ত এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। এর বাহ্যিক তাৎপর্য দাবি করে যে, তার পূর্ণবয়স্কতা অর্জিত হলেই তার ধন-মাল তার নিকটই ফিরিয়ে দিতে হবে। তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটুক আর না-ই ঘটুক। তবে সে শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতঃ

حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ -

তারা যখন পূর্ণবয়স্কতা লাভ করবে, তার পরে যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ লক্ষ্য কর, তাহলে তাদের ধন-মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও।

ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে এ আয়াত অনুযায়ীই কাজ করতে হবে এবং তা বয়সের দিক দিয়ে পঁচিশ বছর হলে তার পরও তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ লক্ষ্য করা না গেলেও তার ধনমাল তাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ 'ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-মাল দিয়ে দাও।' এ আয়াত অনুযায়ী ইয়াতীমের পঁচিশ বছর বয়স হলেই প্রত্যর্পণের কাজ করতে হবে। এ আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ লক্ষ্য করা না গেলে তার মাল তাকে দেয়া যাবে না। কেননা শরীয়াত বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এ বয়সে পৌছার পূর্বে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ লক্ষ্যভূত হওয়া ধন-মাল ফেরত দেয়ার জন্যে জরুরী শর্ত। উদ্ধৃত আয়াত দুটির প্রত্যেকটিকে সে দুটির বাহ্যিক ফায়দার দাবি অনুযায়ী ব্যবহার করার দিক দিয়ে একটি হচ্ছে সমর্থনযোগ্য কারণ। সর্বাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষকেই একমাত্র ভিত্তি গণনা করা হলে অপর আয়াতটি অনুযায়ী আদৌ আমল করা হয় না। তাতে বলা হয়েছে ঃ

'ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-মাল দিয়ে দাও'। এতে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হওয়ার কোন শর্ত আরোপিত হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ ভাবে ও নিঃশর্তেই বলেছেন মাল দিয়ে দিতে, তা ওয়াজিব কোন নিদর্শন পাওয়া ছাড়া-ই। আর কোন বিষয়ে পাশাপাশি দুটি আয়াত এলে তার একটি বিশষভাবে লক্ষণ সমন্বিত হলে আদেশটি পালন ওয়াজিব হয়ে যায়, আর অপরটি যদি হয় সাধারণ কোন লক্ষণবিহীন, তখন এ দুটিরই কার্যকরতা যদি এক সাথে সম্ভব হয়, তাহলে তার একটির নির্দেশ পালন ও অপরটির নির্দেশ উপেক্ষাকরণ আমাদের জন্যে জায়েয নয়।

এখানে যা কিছু বলা হল, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, 'এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল দিয়ে দাও'— আল্লাহ্‌র এ কথানুযায়ী ইয়াতীমের মাল প্রত্যর্পণ করাই ওয়াজিব। এ আয়াতের ধারাবাহিকতায়ই বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ -

তোমরা যখন তাদের ধন-মাল তাদের নিকট প্রত্যর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী বানাও।

বোঝা গেল, ধন-মাল ফেরত পাওয়ার পর তারা স্বীকারোক্তি করবে যে, আমাদের ধন-মাল আমাদের হস্তগত হয়েছে, কেননা আল্লাহ্ তাদের উপর সাক্ষী বানাতে বলেছেন। একথা প্রমাণ করে যে, তারা ধন-মাল ফেরত পেয়ে যে প্রাপ্তি স্বীকার করবে তার উপর সাক্ষী বানাতে হবে। আর এতে দলীল রয়েছে এ কথার যে, প্রতিবন্ধকতা চাপানো যাবে না, তাদের ধন-মালে কর্তৃত্ব করা সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা যার উপর এ কাজের প্রতিবন্ধকতা চাপানো হয় তার তা প্রাপ্তির স্বীকৃতি দেয়া জায়েয নয়। আর যার উপর সাক্ষী রাখা জায়েয, তার স্বীকারোক্তিও জায়েয।

তবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ -

তোমরা ভালো ও উত্তমের বদলে খারাপ ও নিকৃষ্ট দেবে না।

এ পর্যায়ে মুজাহিদ ও আবূ সালিহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ হালাল মালের বদলে হারাম মাল দিও না। অর্থাৎ তোমার হালাল রিযিকের বদলকে হারাম বানিও না। তা এভাবে যে, তুমি ইয়াতীমের মাল ব্যয়-ব্যবহারে খুব তাড়াহুড়া করবে, তা খরচ করে ফেলবে অথবা তা দিয়ে তোমার নিজের ব্যবসায় চালাবে। অথবা তুমি তা আটকে রাখবে এবং তাকে অন্যটা দেবে। তাতে তুমি ইয়াতীমের যে মাল নিয়ে নেবে, তা হবে 'খবীস' ও 'হারাম'। আর তাকে তুমি দিয়ে দেবে সেই হালাল মাল যা আল্লাহ্ তোমাকে রিযিক হিসাবে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে তাদের আসল দেবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াতীমের অভিভাবকের পক্ষে ইয়াতীমের মাল নিজ থেকেই করয লওয়া জায়েয নয়। তা অদল-বদলও করতে পারবে না, নিজের জন্যে তা আটকে রেখে অন্যটা তাকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। তবে ইয়াতীমের ধন-মাল তারই স্বার্থে ক্রয়-বিক্রয় করা অভিভাবকের জন্যে জায়েয নয়, একথা কোন ক্রমেই প্রমাণিত হয় না। শুধু নিজের জন্যে গ্রহণ করা ও অন্যটা তাকে দিয়ে দেয়াই নিষিদ্ধ। অবশ্য এ থেকে একথা প্রমাণিত

হয় যে, ইয়াতীমের মাল সমপরিমাণ মূল্য দিয়েও নিজের জন্যে ক্রয় করা জায়েয নয়। কেননা ইয়াতীমের মাল নিজের জন্যে বদল করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তা সর্বপ্রকারের অদল-বদলেই প্রযোজ্য। তবে যে কাজের দলীল পাওয়া যায়, তা হল, যা গ্রহণ করবে, তার মূল্য বাবদ সমমানের তুলনায় অধিক দিয়ে দেবে। এটা ইমাম আবূ হানীফার মত। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তোমরা ইয়াতীমের মালের নিকটেও যাবে না। তবে উত্তম পন্থায় (যেতে পার)। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, জুহরী, সুদ্দী ও দহাক 'খারাপকে ভালোর সাথে অদল-বদল করো না' আল্লাহ্ এ কথার পর্যায়ে বলেছেন ঃ নিকৃষ্ট পচা জিনিস দিয়ে ভালো উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিস নিয়ে নেবে না। অতিশয় কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিস দিয়ে মোটা-তাজা জিনিস নেবে না।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ -

তোমরা তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে খেয়ে ফেলো না।

এ পর্যায়ে মুজাহিদ ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তোমরা তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে তোমাদের মালের পরিমাণ তাদের মাল দিয়ে বৃদ্ধি সাধন করে খেয়ো না। ফলে ঋণ বাবদ গ্রহণ উপায়ে তাদের মাল সংমিশ্রিতকরণকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এর ফলে ইয়াতীমের নামে ঋণ চেপে বসবে, তখন তাদের জন্যে তা খাওয়া ও তার মুনাফা খাওয়া জায়েয হয়ে পড়বে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا -

নিশ্চয়ই তা অতি বড় গুনাহ।

ইবনে আব্বাস (রা), আল-হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ বড় গুনাহ। এ আয়াতে একথার দলীল রয়েছে যে, ইয়াতীমের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তি ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের লক্ষণ দেখতে পাওয়ার পর তার মাল তার নিকট ফেরত দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। তারা নিজে থেকে দাবি না করলেও তা দিয়ে দিতে হবে। কেননা তা ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ নিঃশর্ত। ইয়াতীমদের দাবি হওয়া শর্ত ছাড়াই তা তরক করা কর্তব্য, অন্যথায় তাতে বড় গুনাহ হওয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, যার অন্যদের নিকট মাল বা টাকা-পয়সা রয়েছে, সে যদি তাকে তা দিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে কাজের সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব; কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা যখন তাদের নিকট তাদের ধন-মাল প্রত্যর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রাখবে।'

অল্প বয়স্কদের বিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ -

তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে যদি ভয় পাও, তাহলে তোমরা দুজন দুজন, তিনজন তিনজন, চারজন চারজন করে যা খুশি বিয়ে কর।

জুহ্রী উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) কে বললাম ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ 'ইয়াতীমদের প্রতি তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারব না, এই ভয় যদি তোমরা পাও' .... এর তাৎপর্য কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ হে বোন পুত্র! আয়াতে সেই ইয়াতীমের কথা বলা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে লালিত হয়। তখন সে তার ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্যে তার প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়ে পড়ে এবং খুব সামান্য মহরানার বিনিময়ে তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক ও চেষ্টিত হয়। আল্লাহ এ আয়াতে অভিভাবককে নিষেধ করেছেন এভাবে ইয়াতীম মেয়ে বিয়ে করতে। তাকে যদি বিয়েই করতে হয়, তাহলে তা সুবিচার ও ন্যায়পরতা সহকারেই করতে হবে। বরং তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে অন্যান্য মেয়েলোক বিয়ে করতে। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, এ আয়াতের পর-ও মেয়েদের ব্যাপারে রাসূল (স)-এর নিকট লোকেরা ফতোয়া চেয়েছে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ .... وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ -

হে নবী! লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমার নিকট ফতোয়া চায়। তুমি বল হ্যাঁ, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দেন আর কিতাবে যা তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয় .... এবং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হও। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, 'কিতাবে তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়' বলে সেই প্রথমোক্ত আয়াতটি বোঝানো হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করতে পারবে না বলে যদি ভয় পাও' ..... আর শেষোক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে ঃ 'এবং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হও' বলে সেই আগ্রহের কথা বলা হয়েছে, যা তোমাদের কেউ তোমাদের ক্রোড়ে লালিত ইয়াতীম কন্যার প্রতি পোষণ করে থাক। কিন্তু সে কন্যার ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্য সামান্য হলে তা তোমরা পোষণ করো না। ইয়াতীম মেয়ের ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্যে আগ্রহীদেরকে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং তাদের প্রতি আগ্রহ না হওয়ার ন্যায়পরতা ও সুবিচার করতে পার না। যদি তা করতে পার, তাহলে তাদের বিয়ে করায় দোষ নেই।

আবূ বকর আল জাস্সাস বলেছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) 'তোমরা ইয়াতীম কন্যাদের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়পরতা করতে পারবে না বলে যদি ভয় পাও' আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র, দহাক ও রুবাই থেকে তা থেকে ভিন্নতর ব্যাখ্যার বর্ণনা এসেছে। তা সেই হাদীসে বর্ণিত, যা আবদুল্লাহ ইবনে

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-হাসান ইবনে আবুর-রুবাই আল-জুরজানী আবদুর রায্‌যাক, মামার, আইয়ুব, সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে— 'তোমরা যদি ভয় পাও যে, তোমরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে সুবিচার-ন্যায়পরতা করতে পারবে না, তাহলে অন্যান্য মেয়েদের থেকে যা মন চায় তোমরা বিয়ে কর'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ 'যে সব মেয়েলোক তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার' এবং ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে তারা যেমন ভয় পেয়েছে, তেমনি অন্যান্য মেয়েদের ব্যাপারেও তাদের প্রতি সুবিচার, ন্যায়পরতা করতে পারবে না বলে ভয় পেয়েছে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এর তাৎপর্য হল, 'তোমরা যদি সুবিচার ন্যায়পরতা করতে পারবে না বলে ভয় পাও এবং তাদের ধন-মাল আহার করতে দ্বিধাবোধ কর।' এবং অনুরূপভাবে তোমরা যিনায় লিপ্ত হতেও ভয় পাও, তাহলে তোমরা অন্যান্য মেয়েলোকদের বিয়ে করে, মনের খুশীর সাথে দুইজন, তিনজন, চারজন করে। এ পর্যায়ে তৃতীয় একটি কথাও বর্ণিত হয়েছে। তা শুবা সামাক-ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, কুরায়শদের এক ব্যক্তির নিকট বহু সংখ্যক মেয়েলোক থাকত। তার নিকট ইয়াতীম মেয়েও ছিল। তখন তার মাল খরচ হতো। ফলে সে ইয়াতীমদের মালের প্রতি আকৃষ্ট হতো। তখন নাযিল হল ঃ 'তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার-ন্যায়পরতা করতে পারবে না বলে যদি ভীত হয়ে পড়।'

দুই নাবালেগ ছেলেমেয়েকে বাপ-দাদা ছাড়া অন্যদের বিয়ে দেয়া সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন ঃ মীরাসের অংশ পায় এমন প্রত্যেক নিকটাত্মীয়ের পক্ষেই নিকটবর্তী ও তারপর নিকটবর্তীকে বিয়ে দেয়ার অধিকার ব্যবহার করা জায়েয। বিবাহদাতা যদি পিতা বা দাদা হয়, তাহলে পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর তাদের সে বিয়ে রাখা-না রাখার ইখতিয়ার থাকবে না, তা মেনে নিতেই হবে। যদি পিতা বা দাদা ছাড়া বিয়েদাতা অন্য কেউ হয়, তাহলে পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর সে বিয়ে রক্ষা করা না-করার ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, নাবালেগ ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে কেবল নিকটবর্তী বংশীয় লোকেরা। তাতে যে অধিক নিকটবর্তী সে আগে তারপরে অন্য অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি পারবে। আবূ ইউসুফ এ-ও বলেছেন, এরূপ বিয়ে হয়ে গেলে পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর তা রাখা না-রাখার কোন ইখতিয়ার তাদের থাকবে না। ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, পিতা ও দাদা ছাড়া আর যে-ই বিয়ে দিক, এই ইখতিয়ার তাদের অবশ্যই থাকবে। ইবনে অহব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি তার নিকট পালিত ইয়াতীম ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে যদি সে সেই বিয়েতে তার কল্যাণ ও মঙ্গল মনে করে। নির্ভুল সুষ্ঠু বিবেচনায় তা হতে হবে। তবেই তা জায়েয হবে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার ছোট বয়সের বোনকে বিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না। অভিভাবক বিয়ে দিতে পারে, অভিভাবকরা বিয়ে দিতে জোরও প্রয়োগ করতে পারে। কেননা অভিভাবক ভিন্ন অভিভাবকের তুলনায় অধিক অধিকার সম্পন্ন। তা সত্ত্বেও পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা মেয়েলোকের সম্মতি ছাড়া তাকে কেউ বিয়ে দিতে পারে না। আর আল্লাহ্ তাকে তার নিজের ব্যাপারে যে ইখতিয়ার দিয়েছেন, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করাও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। অসী তার ছোট বয়সের ছেলে-মেয়ে বিয়ে দিতে পারে, কিন্তু বড় বয়সের মেয়েকে

তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম লায়স ইমাম মালিকের মতই গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ ও রবীআ বলেছেন, অসী অধিক অধিকার সম্পন্ন। সওরী বলেছেন, চাচা বা ভাই ছোট বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেবে না। অসীদের নিকট মাল এবং অভিভাবকের নিকট বিয়ে সোপর্দ হবে না। ইমাম আওয়াজী বলেছেন, ছোট বয়সের মেয়েকে পিতা ছাড়া আর কেউ বিয়ে দেবে না। হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, অসী অভিভাবক না হলে বিয়ে দেয়ার কাজ করবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ছোট বয়সের ছেলে বা মেয়েকে কেবল পিতা কিংবা দাদাই বিয়ে দিতে পারে, যদি পিতা না থাকে। ছোট বয়সের মেয়ের উপর অসীর কোন অভিভাবকত্ব নেই।

আবূ বকর আল-জাস্‌সাস বলেছেন, জরীর মুগীরা, ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ যার ক্রোড়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে, তার উপর ঋণ থাকলে সে তা দিয়ে ঋণ শোধ করবে। তার নিকট বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকলে তাকে অন্যের নিকট বিয়ে দেয়া তার কর্তব্য। আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, জায়দ ইবনে সাবিত ও উম্মে সালমাতা (রা) এবং আল-হাসান, তায়ূস, আতা সর্বশেষ কথা হিসেবে বলেছেন ঃ ছোট বয়সের মেয়েকে বাপ-দাদা ছাড়া অন্যদের পক্ষে বিয়ে দেয়া জায়েয। হযরত ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বর্ণিত হয়েছে, তা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কেও এ কথা। যদি কোন ইয়াতীম মেয়ে তার অভিভাবকের ক্রোড়ে থাকে এবং সে তার ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্য দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার মহরানা দেয়ায় সুবিচার না করে, তাহলে এ মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন অথবা মহরানার ব্যাপারে তাদের প্রচলনে পৌঁছতে বাধ্য হতে বলেছেন। তাঁদের দুজনের নিকট আয়াতের ব্যাখ্যা যখন এই, তাহলে তাঁদের দুজনের মত অনুযায়ী সে কাজ জায়েয হওয়াই প্রমাণিত হয়। আগেকালের কোন মনীষী তা করতে নিষেধ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আয়াতটি থেকেই প্রমাণিত হয়। কেননা তাঁরা দুজন বলেছেন, এ আয়াত ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে, যে তার অভিভাবকের আশ্রয়ে লালিতা-পালিতা হয়। পরে সে অভিভাবকই সে মেয়ের ধন-মাল ও রূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু তাকে মহরানা দেয়ার ব্যাপারে সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করে না। তাই তাদেরকে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর বিয়ে করলে তাকে মহরানা দেয়ায় সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যে অভিভাবকের আশ্রয়ে ইয়াতীম মেয়ে লালিতা-পালিতা হয়, সেই হচ্ছে তার অধিক নিকটবর্তী অভিভাবক। চাচাতো ভাই-ও তাকে বিয়ে করতে পারে— তা জায়েয। তাহলে আয়াতে এ কথা শামিল রয়েছে যে, চাচাতো ভাইর আশ্রয়ে যে ইয়াতীম মেয়ে লালিতা-পালিতা হয়, সেই ভাইর পক্ষে সে মেয়েকে (চাচাতো বোনকে) বিয়ে করা জায়েয।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, আয়াতের এ ব্যাখ্যাকে সাঈদ ইবনে যুবায়র প্রমুখের ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম মনে করা হল কেন? অথচ আয়াতটির বহু কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে সেটিও একটি ব্যাখ্যা।

জবাবে বলা যাবে, দুটি ব্যাখ্যা একসাথে গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক কিছু নেই। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ দুটিরই ধারক হতে পারে। এ ব্যাখ্যা দুটি পরস্পর বিরোধীও নয়। দুটি

এক বিন্দুতে একত্রিত হতে পারে। তা সত্ত্বেও হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আয়াতটি এ বিষয়েই নাযিল হয়েছে। একথা শুধু চিন্তা করে মত নির্ধারণ করে বলা যায় না। তা বলা যায় 'তওকীফ'— শরীয়াতের নাযিল হওয়া পন্থায়। অতএব এ ব্যাপারটি সর্বোত্তম। কেননা তাঁরা দুজন আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণও বলেছেন। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা নাযিল হয়েছিল, তা-ও তাঁরা বলেছেন। অতএব তাঁদের ব্যাখ্যাই উত্তম হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

যদি বলা হয়, হতে পারে, এখানে দাদার কথা বলা হয়েছে, তাহলে জবাবে বলা হবে, তাঁরা দুজন বলেছেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে অভিভাবকের ক্রোড়ে লালিতা ইয়াতীম কন্যা সম্পর্কে, যাকে বিয়ে করার আগ্রহ অভিভাবকের মনে জেগেছে। আর দাদা সম্পর্কে একথা চিন্তাও করা যায় না। দাদা কি করে নাতনীকে বিয়ে করতে বা তার চিন্তা করতে পারে? ফলে আমরা জানতে বাধ্য হলাম যে, এ আয়াতে চাচার পুত্র— চাচাতো ভাই সম্পর্কেই বলা হয়েছে, সমস্ত অভিভাবকের মধ্যে যে অধিক দূরবর্তী, তার সম্পর্কে।

যদি বলা হয়, আয়াতটি বেশি বয়সের মেয়েলোক সম্পর্কে কথা বলছে। কেননা হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ লোকেরা এসে রাসূল (স)-এর নিকট ফতোয়া চেয়েছিল তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর। সেই ফতোয়া চাওয়ার জবাবে আল্লাহ্‌র তা'আলা নাযিল করলেন ঃ 'হে নবী! লোকেরা তোমার নিকট মেয়েলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জানতে চায়। তুমি বল, হ্যাঁ, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ফতোয়া দিচ্ছেন, আর যা ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাবে পাঠ করা হয় .....।' অর্থাৎ 'তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়পরতা সুবিচার করতে পারবে না বলে ভীত হয়ে থাক ....' বলেছেন, যখন বলা হল ঃ 'মেয়ে ইয়াতীমদের ব্যাপারে' তখনই বোঝা গেল যে, এখানে বড় বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, ছোট বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে নয়। কেননা ছোট বয়সের বাচ্চা মেয়েদেরকে النساء 'মেয়েলোক' বলা হয় না।

জবাবে বলা যাবে, এরূপ বলা দুটি কারণে ভুল। একটি এই যে,, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ইয়াতীমদের প্রতি তোমরা সুবিচার ন্যায়পরতা রক্ষা করতে পারবে না মনে করে যদি ভীত হয়ে থাক'— এর নিগূঢ় ও আসল তাৎপর্য দাবি করে সেই সব মেয়ে, যারা এখনও পূর্ণবয়স্কতা পায়নি। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পর কেউ ইয়াতীম থাকে না। কাজেই এ আসল ও প্রত্যেক্ষ তাৎপর্য বাদ দিয়ে পরোক্ষ তাৎপর্য গ্রহণ সঙ্গত হতে পারে না। অবশ্য তা করার কোন দলীল পাওয়া গেলে তা করা যেতে পারে, অন্যায় নয়। আর বেশি বয়সের মেয়েকে ইয়াতীম বলা হলে তা প্রকৃত ও আসল অর্থে নয় পরোক্ষ অর্থেই বলা চলে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ -

মেয়েলোক ইয়াতীমদের সম্পর্কে।

আয়াতে বড় বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, তার কোন দলীল এ আয়াতাংশে

নেই। কেননা ইয়াতীম মেয়ে জাতির লোক হয়, তাহলে 'মেয়েলোক ইয়াতীম' সহজেই বলা যেতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ـ

তাহলে তোমরা বিয়ে কর যত সংখ্যক মেয়ে বিয়ে করতে তোমাদের মন ইচ্ছা করে। এতে ছোট বয়সের ও বড় বয়সের সব বয়সের মেয়েই শামিল।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -

তোমাদের পিতারা যেসব মেয়েলোক বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।
(সূরা নিসা ঃ ২২)

এখানেও ছোট বয়সের বা বড় বয়সের মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সবই সমানভাবে এর মধ্যে শামিল।

বলেছেন ঃ

وَاُمَّهَاتُ نِسَاۤئِكُمْ -

এবং তোমাদের স্ত্রীদের মারা। (সূরা নিসা ঃ ২৩)

এখানেও তাই। যদি ছোট বয়সের মেয়ে কেউ বিয়ে করে, তাহলে তার মা-ও বিয়ে করা চিরদিনের জন্যে হারাম হবে। কাজেই কোন আয়াতে যদি 'মেয়েলোকদের ইয়াতীম' বলা হয়ে থাকে, তাহলে তাতে এ প্রমাণ পাওয়া যাবে না যে, উক্ত আয়াতে কেবল বড় বয়সের ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ছোট বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়নি।

আর দ্বিতীয় কারণ হল— হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) আয়াতটির যে ব্যাখ্যা বলেছেন, তা বড় বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে প্রয়োগযোগ্য নয়। কেননা বড় বয়সের মেয়েলোক যদি সমপরিমাণ মহারানার কম পরিমাণের মহারানায় বিয়ে করতে রাজী হয়, তাহলে সে বিয়ে সম্পূর্ণ জায়েয হবে। তার এ বিয়ের উপর কারোর আপত্তি করার বা বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই। অতএব মানতেই হবে যে, আলোচ্য আয়াতে ছোট বয়সের ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। কেননা যার আশ্রয়ে সে লালিতা পালিতা সে তার বিয়েতেই হস্তক্ষেপ করতে পারে। একথা হাদীস থেকে প্রমাণিত, যা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর ইবনে হজম, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূল (স) উম্মে সালমা (রা)-এর পুত্র সালমার নিকট হামযা (রা)-এর কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন, দুজনই ছোট বয়সের বালক-বালিকা ছিল। কিন্তু এ দুজন সারা জীবনেও একত্রিত হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দুজনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'আমি কি সালমার মাকে বিয়ে করে সালমার প্রতিকার করতে পারলাম?

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে এ ঘটনায় দুটি দিক দিয়ে কারণ রয়েছে। একটি এই যে, নবী করীম (স) সে দুই বালক-বালিকাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ দুজনের কারোর পিতাও ছিলেন না, দাদাও ছিলেন না। বোঝা গেল, বাপ বা দাদা ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে ছোট বালক বালিকাকে বিয়ে দেয়ার কাজ করা সম্পূর্ণ জায়েয। আর দ্বিতীয় এই যে, নবী করীম (স) এই কাজ যখন করেছিলেন, অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اتَّبِعُوْهُ। 'তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর।' অতএব তাঁর অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিচার কর্তার পক্ষে ছোট বয়সের ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। আর কাযী— বিচার কর্তার পক্ষে তা যখন জায়েয, তখন সব অভিভাবকের পক্ষেও তা জায়েয। কেননা অভিভাবকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করার বা থাকার কথা কেউ-ই বলেন নি। নবী করীম (স)-এর কথা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِىٍّ —'অভিভাবক ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হয় না।' তাই বিয়ে যদি 'ওলী'— অভিভাবকের মাধ্যমে হয় তাহলে বিয়ে প্রমাণিত— প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ভাই ও চাচার পুত্র— চাচাতো ভাই-ও অভিভাবক। তার দলীল এই যে, মেয়ে যদি বেশি বয়সের হয় তাহলে বিয়েতে এরা অবশ্যই অভিভাবক হতে পারে। চিন্তা-বিবেচনার দিক দিয়েও তা ঠিক মনে হয়। কেননা সব শরীয়াতবিদ-ই এ ব্যাপারে একমত যে, পিতা ও দাদা যদি মীরাস প্রাপক না হয় কিংবা দুজনই কাফির বা ক্রীতদাস হয়, তাহলে তারা কেউ বিয়ে দেয়ার অভিভাবক হতে পারে না। বোঝা গেল— এ অীভভাবকত্ব মীরাস পাওয়ার অধিকারের ভিত্তিতে অর্জিত হয়। অতএব যে-ই মীরাস পাওয়ার অধিকারী, সে-ই বিয়ে দেয়ারও অধিকারী। তবে তাতে সর্বাধিক নিকটবর্তী তারমত্য হবে। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেনঃ মা ও সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন মনিব (مولى الموالاة) বিয়ে দিতে পারে, যদি তাদের অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী অভিভাবক কেউ না থাকে। কেননা ওরাও মীরাস পায়।

যদি বলা হয়, বিয়েতে তো ধন-মালের ব্যাপার রয়েছে। তখন ধন-মালে যে লোক হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তার বিয়ের আকদ করানো জায়েয হয় না।

জবাবে বলা যাবে, বিয়েতে মহরানার কথা না বললেও তার পরিমাণ নির্দিষ্ট না হলেও তা স্বতঃই নির্ধারিত হয়ে যায়। কাজেই ধন-মালেও হস্তক্ষেপ করার অধিকারের ভিত্তিতে বিয়ে দেয়ার অভিভাবকত্ব প্রমাণিত হতে পারে না। দেখ না, যাঁর মত হলো অভিভাবক ছাড়া বিয়ে জায়েয হয় না, সেখানেও অভিভাবকদের জন্যেই বিয়ে দেয়া জায়েয— এর অধিকার তাদের আছে। কিন্তু বড় বয়সের মেয়ের ধন-মালে তাদের কোন কর্তৃত্ব (ولاية) থাকে না। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর জন্যে কর্তব্য হয় যে, তাঁরা দুজন বড় বয়সের কুমারী কন্যাকে পিতার বিয়ে দেয়াকে জায়েয মনে করবেন না। কেননা সে মেয়ের ধন-মালে তার কোন অভিভাবকত্ব চলে না। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর মতেও যখন পিতার পক্ষে তার বড় বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেয়া জায়েয, তার সম্মতি বা অনুমতি ছাড়াই অথচ ধন-মালের দিক দিয়ে তার উপর পিতার অভিভাবকত্ব মোটেই চলে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, বিয়ে অনুষ্ঠানের অভিভাবকত্ব লাভে ধন-মালে হস্তক্ষেপের জায়েয হওয়ার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাস্তব।

আমরা এখানে যা বললাম আয়াতের প্রমাণ হিসেবে যে, ছোট বয়সের মেয়েকে নিজ থেকেই বিয়ে দেয়া অভিভাবকের পক্ষে জায়েয, তা প্রমাণ করে যে, বড় বয়সের মেয়ের অভিভাবকের

জন্যে সে মেয়ের সম্মতি অনুমতিতে নিজ থেকে বিয়ে দেয়া অবশ্যই জায়েয হবে। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, স্বামী ও স্ত্রীর বিয়ের আকদকারী এক ব্যক্তিও হতে পারে। পারে এ ভাবে যে, সেই এক ব্যক্তি উভয়ের উকীল হবে, যেমন ছোট বয়সের মেয়ের অভিভাবক নিজ থেকেই তাকে বিয়ে দেবে— সে হবে বিয়ের প্রস্তাবক, পরে সে নিজেই ছেলের উকীল হিসেবে তা কবুল করে নেবে বা সেই একজনই প্রস্তাবক ও প্রস্তাব গ্রহণকারী হবে। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, দুইজন ছোট বয়সের ছেলে-মেয়ের অভিভাবক নিজেই উভয়কে পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে। আলোচ্য আয়াতটি এই সব দিক দিয়েই প্রমাণ করে যে, ইমাম শাফেয়ীর এ মত বাতিল যে, ছোট বয়সের মেয়েকে তার বাবা বা দাদা-ই বিয়ে দেবে, তাদের ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে দিতে পারে না। তিনি যে বলেছেন, বড় বয়সের মেয়ের অভিভাবক মেয়ের সম্মতিক্রমে তার অনুপস্থিতিতে বিয়ে দিতে পারে না, একথাও সহীহ্ নয়। একই ব্যক্তি উভয়ের উকীল হয়ে উভয়ের পারস্পরিক বিয়ে সম্পন্ন করবে, তা জায়েয নয় বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, তাও বাতিল।

আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, ছোট বয়সের মেয়েকে 'অসী'র বিয়ে দেয়া জায়েয নয়, তা রাসূল (স)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত। কেননা তিনি বলেছেন ঃ অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয় না। আর 'অসী' অভিভাবক (ওলী) নয়।

আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنًا -

যে লোক জুলুমে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে আমরা কর্তৃত্ব বানিয়ে দিয়েছি।
(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)

এখন এ হত্যার বদলে যদি শাস্তি প্রদান করারই সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে 'অসী' তার অভিভাবক হতে পারবে না। সে অভিভাবকত্ব পাওয়ার অধিকারীও হবে না। বোঝা গেল—'অসী' কে অভিভাবক কখনই বলা যাবে না। অতএব 'অসী'র পক্ষে ছোট বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেয়া জায়েয নয়। কেননা সে তার অভিভাবক নয়।

যদি বলা হয়, এরূপ অবস্থায় ভাই বা চাচার পুত্রের-ও ছোট বয়সের মেয়ের অভিভাবক হওয়ার অধিকারী হওয়া উচিত নয়। কেননা তারা দুজন কিসাসের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব পায় না।

জবাবে বলা যাবে, কিসাসে অভিভাবকত্ব না পাওয়াকে আমরা 'ইল্লাত' বা কারণ বানাই নাই। ফলে উক্ত কথা আমাদের ব্যাপারে খাটে না। আমরা বলেছি, 'অভিভাবক' নামটি 'অসী'র জন্যে ব্যবহার করা যায় না। তার উপর তা খাটেও না। এ কারণে সে ধনমালে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী হয়। তবে ভাই ও চাচার পুত্র— তারা দুজন অভিভাবক। কেননা তারা আসাবা— বংশীয় লোক হিসেবে এক। তার আসাবার ক্ষেত্রে 'অভিভাবক' শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِيْ -

আমার পরে আমার ভাই-বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় আমি করি। (সূরা মারিয়াম ঃ ৫)

জবাবে বলা যাবে, কথাটি বলে তাঁর চাচার বংশ ও 'আসাবা' গণকে বুঝিয়েছেন। বোঝা গেল, 'আসাবাদের প্রসঙ্গে 'অভিভাবক' নামটি ব্যবহার করা চলে। কিন্তু 'অসী'র জন্যে তা ব্যবহার করা যায় না। তাই নবী করীম (স) যখন বললেন ঃ 'অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয় না,' তখন এই কথার দ্বারাই অসীর পক্ষে ছোট বয়সের মেয়ে বিয়ে দেয়া না-জায়েয ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা সে অভিভাবক নয়।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا (وفِيْ لفظ اخر) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَا لِيْهَا فَنِكَا حُهَا بَاطِلٌ -

যে মেয়েলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত (অপর হাদীসের ভাষায়) তার মাওয়ালীর অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে।

ফলে পাগলিনী ও বড় বয়সের কুমারী কন্যাকে যদি 'অসী' বিয়ে দেয় কিংবা তার অসীর অনুমতিক্রমে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত— বিয়ে করে, তাহলে তার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা নবী করীম (স) অভিভাবকের অভিমত ব্যতীত বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন।

তাছাড়া বিয়েতে এই অভিভাবকত্ব লাভের অধিকারী হয় মীরাসের কারণে। এর দলীল আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর অসী তো মীরাস পায় না। তাই তার অভিভাবকত্ব হতে পারে না।

উপরন্তু যে কারণে বিয়েতে অভিভাবকত্ব পাওয়া যায়, তা হল বংশীয় সম্পর্ক। তাতে তো কোন হস্তান্তর যোগ্যতা নেই। অসী তা পেতে পারে না। কেননা যে কারণে অভিভাবকত্ব পাওয়া যায়, তা এখানে অনুপস্থিত। মৃত্যুর পর ধন-মালে হস্তক্ষেপ বিয়েতে হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতা চালানোর মত নয়। কেননা ধন-মালে হস্তান্তর স্বাভাবিক ও সহীহ্, কিন্তু বিয়েতে স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্য কারুর দিকে হস্তান্তর সহীহ্ নয়। এই কারণেও অসী বিয়েতে অভিভাবকত্ব পেতে পারে না। অসী পিতার জীবদ্দশায় উকীলের মতও নয়। কেননা উকীল হস্তক্ষেপ করে মুয়াক্কিলের আদেশে। আর তার আদেশ তো অবশিষ্ট থাকে। কেননা তার হস্তক্ষেপ বৈধ। আর যাতে হস্তান্তর সহীহ্ নয়, মৃতের আদেশ তাতে নিঃশেষ হয়ে যায়। হস্তান্তর সহীহ্ হয় না বিবাহে। তাই উকীল ও 'অসী' এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন।

যদি বলা হয়, তোমাদের মতে শাসকও দুই অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়ার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। অথচ সে মীরাস পায় না। আর অভিভাবকত্ব পাওয়া যায় বংশীয় নৈকট্যের কারণে।

জবাবে বলা যাবে, শাসক মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী, যাতে সে হস্তক্ষেপ করতে পারে। আর মুসলিম সমাজ তো এই ছোট বয়সের ছেলেমেয়ের মীরাসের অধিকারী। আর তা অবশিষ্ট থেকেই যায়। অতএব তা অভিভাবকত্ব পেতে পারে, যেন তা তাদের জন্যে উকীল। আর তারা তার মীরাস পাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতে কেউ মরে গেলে এবং বংশের দিক দিয়ে তার উত্তরাধিকারী কেউ না থাকলে মুসলমানরাই তার মীরাস পাবে।

আলোচ্য আয়াতে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, পিতার জন্যে তার ছোট বয়সের কন্যাকে বিয়ে দেয়ার অধিকার আছে এ হিসেবে যে, সমস্ত অভিভাবকের জন্যেই তা জায়েয। আর পিতা তাদের সকলের তুলনায় অতি নিকটবর্তী অভিভাবক। আর বিভিন্ন দেশের আগের ও পরবর্তীকালের ফিকাহবিদদের মধ্যে তার জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। তবে বশর ইবনুল অলীদ শিবরামাতা থেকে বর্ণনা প্রচার করেছেন যে, ছোট বয়সের ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়া পিতার জন্যেও জায়েয নয়। এটা আল-আস্‌সাম-এর মাযহাব। এ মাযহাব যে বাতিল, তা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি। তাছাড়া এ আয়াতটিও এ মাযহাবের বাতুলতা প্রমাণ করে ঃ

وَالّٰئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآءِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ
وَالّٰئِى لَمْ يَحِضْنَ -

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান হয়ে পড়লে, তাহলে তাদের ইদ্দত তিন মাসকাল ধরবে। এ নিয়ম তাদের জন্যেও, যাদের এখনও হায়য আসতে শুরু করেনি। (সূরা তালাক ঃ ৪)

অতএব হায়য হয়নি— এমন অল্প বয়সী মেয়েকে তালাক দেয়া সহীহ্ হবে। আর তালাক তো সহীহ্ বিয়ের ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাই আয়াতের এ তাৎপর্য রয়েছে যে, অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। তাছাড়া বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-ই তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনার দুটি তাৎপর্য। একটি, ছোট বয়সের মেয়েকে তার পিতা বিয়ে দিতে পারে— সম্পূর্ণ জায়েয। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এই ছোট বয়সের মেয়ে পূর্ণবয়স্কা হয়ে সে বিয়ে রাখা-না-রাখার অধিকারিণী হবে না। তা বাধ্যতামূলক। কেননা নবী করীম (স) পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর তাঁকে সে ইখতিয়ার দেন নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ -

যত সংখ্যক মেয়ে তোমাদের ইচ্ছা হয় .....

মুজাহিদ এর অর্থ বলেছেন ঃ তোমরা বিয়ে কর পবিত্র-পরিশুদ্ধ বিয়ে। আর হযরত আয়েশা (রা), আল-হাসান ও আবূ মালিক এর অর্থ বলেছেন ঃ যা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। ফরা বলেছেন ঃ مَاطَابَ বলে আল্লাহ যেন বলেছেন ঃ তোমরা পবিত্র পরিশুদ্ধ অর্থাৎ

হালাল মেয়েলোক বিয়ে কর। বলেছেন, এ কারণেই এখানে ما 'যা' বলা হয়েছে مَنْ 'যাকে' বলা হয়নি।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ مَثْنَى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ দুই দুই, তিন তিন, চার চার। অর্থাৎ দুইজনকে বা তিনজনকে অথবা চারজনকে— যা-ই চাও এক সঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পার। যে এ সংখ্যক স্ত্রী একসাথে রাখতে চাইবে, সে তা রাখতে পারবে। বলেছেন, যদি সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করতে না-পারার আশংকা হয়, তাহলে চারজনের কম তিনজন, তবু ভয় হলে দুইজন আর তা-ও একসঙ্গে রাখতে ও ন্যায়বিচার না করার ভয় পেলে একজনেই সীমিত রাখবে।

বলা হয়েছে, আয়াতে واو 'ওয়াও' অক্ষরটি او বা অর্থ দিচ্ছে। যেন বলা হয়েছে ঃ হয় দুজন, না হয় তিনজন আর না হয় চারজন। অবশ্য এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'ওয়াও' অক্ষরটি এখানে তার আসল অর্থ 'এবং'ই দিচ্ছে; কিন্তু তা বিকল্প হিসেবে। যেন বলা হয়েছে ঃ তিনজন দুজনের বদলে, চারজন তিনজনের বদলে। এ সংখ্যাগুলোর যোগফল— অর্থাৎ নয়জন— এর অর্থ নয়। যার এই মত তিনি বলেছেন, এখানে যদি واو -এর পরিবর্তে او "আও' বলা হতো, তাহলে দুজন স্ত্রীর স্বামীর জন্যে তিনজন এবং চারজন বিয়ে করা নাজায়েয হতো। তাই واو ওয়াও ব্যবহারে একজন স্বামীর পক্ষে চারজন স্ত্রী গ্রহণ জায়েয হয়ে গেল। এরা তারাই, যাদের লক্ষ্য করে এই কথাটি বলা হয়েছে। উপরন্তু দুই তিনের এবং তিন চারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফলে এ অর্থ হতে পারল না যে, প্রত্যেকের জন্যে এ সংখ্যা সমষ্টি একত্রিত করা জায়েয। কেননা তাহলে স্ত্রীদের জায়েয মোট সংখ্যা হয়ে দাঁড়াত নয়। কথার এই ধরনটি ঠিক এরূপ, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا .... وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ -

বল তোমরা কি এ মনোভাব পোষণ কর যে, তোমরা কুফরী করবে সেই মহান সত্তার প্রতি, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আর তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দী বানাবে? অথচ সারেজাহানের রব্ব তো তিনি-ই আর তিনিই পৃথিবীর উপরিভাগে উচুঁ উচুঁ পর্বতমালা দাঁড় করে দিয়েছেন এবং তিনিই পৃথিবীতে চারদিনে তার খাদ্য খোরাক পরিমিত করে রেখেছেন? (সূরা হা-মীম-সাজদাহ ঃ ৯-১০)

আয়াত শেষে যে চারদিনের উল্লেখ করা হয়েছে তারই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শুরুতে উল্লেখ করা দুই দিন। পরে বলেছেন ঃ

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ -

পরে তা পূর্ণ পরিণত করেছেন সপ্ত আকাশে দুই দিন সময়ে।(সূরা হা-মীম-সাজদাহ ঃ ১২)

এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা না হলেও আলাদা আলাদাভাবে দিন গুণলে মোট আট দিন হয়ে যায়। কিন্তু এ তো জানা কথা যে, মোট আট দিন নয়; বরং মাত্র ছয় দিন। যেমন আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَلْأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ -

আল্লাহ্ আসমান ও জমিনকে মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা 'আরাফ ঃ ৫৪)

অনুরূপভাবে مثنى দুই ثلث তিনের মধ্যে এবং ثُلاث তিন رباع চার-এর মধ্যে গণ্য। ফলে এ আয়াত মাত্র চারজন স্ত্রী একসাথে মুবাহ্ করেছেন, এর অধিক নয়। এ সংখ্যার স্ত্রী কেবল মুক্ত-স্বাধীন লোকদের জন্যে একসাথে মুবাহ্, ক্রীতদাসদের জন্যে নয়। হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদ এবং সওরী, লায়স ও ইমাম শাফেয়ীর এ মত। ইমাম মালিক বলেছেন— ক্রীতদাস ও চারজন স্ত্রী এক সাথে রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের মতের দলীল হল, আলোচ্য আয়াত স্বাধীন মুক্ত মানুষের জন্যে নাযিল হয়েছে, ক্রীতদাসদের জন্যে নয়। কেননা শুরুতে রয়েছে ঃ فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ 'অতএব তোমরা বিয়ে কর তোমাদের মনে খুশি অনুযায়ী। এ কথা তো বিশেষভাবে স্বাধীন-মুক্ত মানুষদের জন্যেই হতে পারে— ক্রীতদাসদের জন্যে নয়। তারা নিজেরা বিয়ের আকদ করতে পারে না— এ ব্যাপারে সব ফিকাহ্‌বিদ-ই সম্পূর্ণ একমত। ক্রীতদাসরা মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়েই করতে পারে না, মনিব-ই তাদের বিয়ের আক্‌দ করার মালিক হতে পারে নিজ থেকেই। কেননা মনিব যদি তাদেরকে বিয়ে দেয়, তাতে তারা রাজী না হলেও বিয়ে জায়েয হয়ে যাবে। আর তারা মানিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করলে সে বিয়ে জায়েয হবে না।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ -

যে ক্রীতদাস-ই তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে, সে হবে ব্যভিচারী।

আর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ -

আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন এ কথা যে, একজন ক্রীতদাস, সে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা নহল ঃ ৭৫)

কাজেই ক্রীতদাস যখন বিয়ে করার নিজেই অধিকারী নয়, তখন উক্ত আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করেও তাদের জন্যে কথা বলা হয়নি, তা নিঃসন্দেহ। অতএব আয়াতটি কেবলমাত্র স্বাধীন-মুক্ত লোকদের জন্যেই প্রয়োগীয়। ক্রীতদাসদের বিয়ে করার অধিকার ক্রটিপূর্ণ। যেমন তালাক ও ইদ্দতও ক্রটিপূর্ণ। বিয়ে করার তাদের অধিকার অর্ধেক, তখন স্বাধীন লোকদের জন্যে জায়েয সংখ্যার অর্ধেক তাদের জন্যে জায়েয হতে পারে— ছয়জন সাহাবী থেকে এ কথা বর্ণিত যে, ক্রীতদাস খুব বেশির পক্ষে মাত্র দুইজন স্ত্রী একসঙ্গে রাখতে পারে, তার অধিক নয়। তাঁদের মত লোকদের কারুর দিক থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়নি— যতটা আমরা

জানি। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ

يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ اثْنَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ -

ক্রীতদাস দুজন স্ত্রী একসঙ্গে রাখতে পারে, তালাক দিতে পারে মাত্র দুইবার এবং ইদ্দত পালন করবে মাত্র দুই হায়য কাল। যদি হায়য না হয়, তাহলে তার ইদ্দতের মিয়াদ মাত্র দেড় মাস।

আল-হাসান ও ইবনে সিরীন উমর ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ক্রীতদাসের জন্যে একসাথে দুজনের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয নয়। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ 'ক্রীতদাসের পক্ষে দুজনের অধিক স্ত্রী একসাথে রাখা জায়েয নয়।' হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর ও আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ 'ক্রীতদাস একসাথে দুজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করবে না।' শুবা আল-হিকাম, আল-ফযল ইবনে আব্বাস সূত্রে বলেছেন ঃ ক্রীতদাস মাত্র দুজন স্ত্রী রাখবে। ইবনে সীরীন বলেছেন— হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে জানে ক্রীতদাসের জন্যে কয়জন স্ত্রী একসাথে রাখা জায়েয ? আনসার বংশের একজন বললেন ঃ 'আমি জানি'। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কয়জন ?' লোকটি বলল ঃ দুজন। এ কথা শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। উমর (রা) যার সাথে পরামর্শ করতেন, তার কথা শুনে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। বাহ্যিকভাবে মনে হয়— তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। লায়স আল-হিকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ এ বিষয়ে একমত যে, ক্রীতদাস দুজনের বেশি স্ত্রী একত্র করবে না। ফলে আমাদের মতের সত্যতা সাহাবী-ইমামগণের ঐকমত্যে প্রমাণিত হল। কাজেই এর বিপরীত মত যিনিই গ্রহণ করবেন, তিনি সাহাবীদের ইজমার বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন বলে আখ্যায়িত হবেন। আল হাসান, ইবরাহীম, ইবনে সীরীন, আতা, শবী প্রমুখ প্রখ্যাত ফিকাহবিদও আমাদের সিদ্ধান্তই বর্ণনা ও গ্রহণ করেছেন।

যদি বলা হয়, ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামজাহ্ আবূ অহব আবূদ দারদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ক্রীতদাস চারজন স্ত্রী এক সময়ে রাখতে পারে। মুজাহিদ, আল-কাসিম, সালিম, রবীআতা-আররায়ও এই মতই প্রকাশ করেছেন।

এর জবাবে বলা যাবে, আবুদ্দারদা বর্ণিত হাদীসের সনদে অজ্ঞাত পরিচয় একজন ব্যক্তি রয়েছে, সে হল আবূ অহব। এ হাদীস যদি সহীহ্ প্রমাণিত হয়ও, তা সত্ত্বেও বলব, কিফাহ্র যে ইমামগণের নাম আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, তাদের বিপরীত মত গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়। তাঁদের সে মত সর্বজনজ্ঞাত ও সর্বপরিচিত। তাবেয়ী ফিকাহবিদদের মধ্যের অতীব সম্মানার্হ আল-হিকাম রাসূলের সাহাবিগণের ইজমা হওয়ার কথার উল্লেখ করেছেন এই মতের উপর যে, ক্রীতদাস দুজনের অধিক স্ত্রী এক সময়ে রাখতে পারবে না।

আল্লাহ্ কথা ঃ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً —'আর তোমরা যদি ভীত হও এজন্যে যে, তোমরা সুবিচার, ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে।' এর অর্থ হল জীবনোপকরণ ও দিন-সময় বন্টনে তাদের মধ্যে যদি নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে না পার। কেননা অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ -

তোমরা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়পরতা নিরপেক্ষতা বহাল রাখতে পারবে না সে জন্যে খুব আগ্রহী হলেও। তাই নির্দেশ হল, কোন একজনের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় ঝুঁকে পড়বে না।

'ঝুঁকে পড়া' বলতে মনে ঝুঁকে পড়া বুঝিয়েছেন। আর ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতা বলতে তা যতটা সম্ভব— যতটা সাধ্যে কুলায়, ততটাই বোঝানো হয়েছে। আর যে ভয়ের কথা বলা হয়েছে, তা হল— কার্যত ঝোঁক প্রকাশ। এ কারণে আল্লাহ্ একজন স্ত্রী গ্রহণে সীমিত থাকতে আদেশ করেছেন, যখন ভয় হবে ঝোঁক প্রকাশের ও পক্ষপাতিত্বের জুলুম করার এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারার।

পূর্বে বিয়ের আকদ্ করার মুবাহ সংখ্যার উল্লেখের পর বলা হয়েছে ঃ

اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ -

অথবা যার তোমাদের দক্ষিণ হস্ত মালিক হয়েছে .....

এখানে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ কথা বলা হয়েছে। তার বাহ্যিক তাৎপর্য হল, চার জনের দেয়া ইখতিয়ারকে স্বাধীনা নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ। এ ছাড়াও চারজন দাসী বিয়ে করা। তাতে স্বাধীনা ও দাসী বিয়ে করার মধ্যে ইখতিয়ারকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। কেনন আল্লাহ্র কথা اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ কথাটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য নয়; বরং তা পূর্ব কথার জের। তাতে যে উপমা (ضمير) রয়েছে, তা গুরুত্বহীন নয়, মূল বাণীর সম্বোধনের মধ্যেই তা শামিল। স্বতন্ত্রভাবে কোন দলীল না পাওয়া গেলে পূর্বের দিকে ইঙ্গিতবহ কোন উপনাম আছে বলে ধরে নিতে পারি না। তাহলে এ আয়াতাংশের অর্থ আমরা এই করতে পারি না যে, চারজন বিয়ে করার পর দাসীদের যৌন সম্ভোগের কথা বলা হয়েছে শুধু। তাই এর তাৎপর্য এ ধরা যাবে না যে, তোমাদের জন্যে ক্রীতদাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। বরং সেখানে বিয়ের আক্দ করার কথা বলা আছে। যেহেতু 'তোমরা বিয়ে কর যা তোমাদের মন চায়' আয়াতের শুরুর এ কথার অর্থ যে বিয়ের আকদ করা, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। অতএব 'অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিক হয়েছে' এর পূর্ব কথার সাথে ধারাবাহিকতাপূর্ণ অর্থ হল ঃ 'অথবা তোমরা বিয়ে কর যা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত মালিক হয়েছে'— অর্থাৎ দাসী। এ বিয়েও আকদ-এর মাধ্যমে হবে। উপনামও সেই আকদ-এর দিকে ইঙ্গিতকারী, যৌন সম্ভোগ নয়।

যদি বলা হয় 'নিকাহ' শব্দের অর্থ 'যৌন-সম্ভোগ' যখন সহীহ্ হতে পারে, এর পর বলা 'অথবা যার তোমাদের দক্ষিণ হস্ত মালিক হয়েছে'-এর অর্থ দাঁড়াবে ঃ 'পরন্তু তোমরা বিয়ে কর

যার মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত'। এখানেই তার অর্থ যৌন সম্ভোগ হতে পারে, যদিও আয়াতের শুরুতে তার অর্থ 'বিয়ের আকদ'।

এর জবাবে বলা যাবে, একথা সঙ্গত নয়। কেননা আয়াতের প্রাথমিক সম্বোধনে উপনামের উল্লেখ রয়েছে, তাই তা-ই এখানেও হওয়া আবশ্যক। এর অর্থ হবে, পূর্বে উল্লিখিত বিয়ে বলতে যদি আকদ ধরা হয়, তাহলে যেন বলা হয়েছে ঃ অতএব তোমরা বিয়ের আক্দ কর, যা তোমাদের মন চায় .... দক্ষিণ হস্তের মালিকানায় উপনাম ধরা হলে তার ইঙ্গিত হবে আক্দ-এর দিকে। কেননা এখানে তাৎপর্যের দিক দিয়ে যৌন-সম্ভোগ মনে করা সঙ্গত হবে না। শব্দের দিক দিয়েও নয়। অতএব এখানে যৌন-সম্ভোগ উহ্য মনে করার কোন বৈধতা নেই, যদিও 'নিকাহ্' কথাটির মধ্যেই তা রয়েছে। অপর দিক দিয়ে বলা যায়, শুরুতে 'নিকাহ্' শব্দের উল্লেখের পর আর তার উল্লেখ নেই, আর এটাও প্রমাণিত যে, এর অর্থ 'আকদ', তাই সে শব্দের ইঙ্গিত সরাসরি হওয়া উচিত নয় যৌন সম্ভোগের দিকে। কেননা একটি শব্দের প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে পরোক্ষ অর্থ-ও। দুটির যে কোন একটি অর্থকে শব্দ অবশ্যই ধারণ করবে, একটি পরোক্ষ আর অপরটি প্রকৃত। আর একটি শব্দ এই দুটিকেই ধারণ করেব— তা সঙ্গত নয়। তাই আয়াতের শুরুতে যে আক্দে নিকাহর কথা বলা হয়েছে, তা-ই লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।

যদি বলা হয়, আয়াতে যাদের প্রতি সম্বোধন, তাদের সাথে দক্ষিণ হস্তের মালিকানা যুক্ত করা ও আক্দ ছাড়া শুধু যৌন-সম্ভোগ বোঝানো, যখন জানাই আছে যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদের সাথে বিয়ে সম্পাদন অসম্ভব, তখন আমরা জানতে পারি, এখানে যৌন সম্ভোগের কথাই বলা হয়েছে, বিয়ের আক্দ-এর কথা নয়।

জবাবে বলা যাবে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাকে সমষ্টির সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তখন তার অর্থ হবে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদেরকে অন্যের নিকট বিয়ে দেয়ার কথা বলাই লক্ষ্য।

যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ -

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার— সংরক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য অর্জনের অসমর্থ হবে, তাহলে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত ঈমানদার যুবতীদের মধ্যে থেকে (বিয়ে করবে) (সূরা নিসা ঃ ২৫)

এ আয়াতে দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদের সাথে বিয়ের আকদ করার কথা বলা হয়েছে। আয়াতের সম্বোধন সকলের দিকে, অপরের মালিকানাভুক্তকে বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র এই কথা ঃ অথবা যার মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্তটিও তেমনি উক্ত অর্থেরই ধারক। তাই মূল সম্বোধনে যার উল্লেখ নেই,তা মনে করানোর দলীল যখন নেই, তাই পূর্বে যার উল্লেখ রয়েছে, তা-ই মনে করতে হবে পরবর্তীতেও। আর তা হচ্ছে বিয়ের 'আকদ'। আমরা এই যা বললাম, তাতে স্বাধীনা নারী ও ক্রীতদাসী বিয়ে করার ইখতিয়ার দেয়ার

দলীলই স্পষ্ট হয়ে উঠে— তার জন্যে, যে স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী নয়। কেননা ইখতিয়ার তো দেয়া হয় দুটি সম্ভাব্য কাজের মধ্যে কোন একটি গ্রহণের। তাই আলোচ্য আয়াত স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্রীতদাসী বিয়ে করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল দুটি দিক দিয়ে। একটি সাধারণভাবে বলা ঃ 'যে মেয়েলোকই তোমাদের মন চায় তাই বিয়ে কর, এ কথা স্বাধীন ও ক্রীতদাসী সবাইকে শামিল করে। কেননা এখানে النساء মেয়েলোক বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'অথবা যার মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত'। এ কথায় ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, স্বাধীনা নারী ও ক্রীতদাসী বিয়ে করার মধ্যে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَـةٌ خَيْـرٌ مِّنْ مُـشْرِكَةٍ -

এবং নিশ্চয়ই ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক মেয়ে অপেক্ষা অতীব কল্যাণবহ।
(সূরা বাকারাহ ঃ ২২১)

এর তাৎপর্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সূরা আল-বাকারার ব্যাখ্যায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكَ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ -

তাদের বাইরে যারা আছে, তোমরা তোমাদের ধন-মাল দিয়ে তাদের পেতে চাইবে, তা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। (সূরা নিসা ঃ ২৪)

এ কথাও তা-ই প্রমাণ করে। এ উভয় আয়াতই স্বাধীনা ও ক্রীতদাসী সবাইকেই শামিল করে সাধারণভাবে। এসব কথাকে বিশেষ অর্থে কারোর জন্যে নির্দিষ্ট করা জায়েয হতে পারে না— যতক্ষণ না তার কোন দলীল পাওয়া যায়।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُولُوْا -

তোমরা কোন একদিকে ঝুঁকে পড়বে না, এটা তার অতীব নিকটবর্তী।

ইবনে আব্বাস, আল-হাসান, মুজাহিদ, আবূ রুজাইন, শবী, আবূ মালিক, ইসমাঈল, ইকরামা ও কাতাদা প্রমুখ বলেছেন ঃ এর অর্থ তোমরা প্রকৃত সত্য থেকে এক দিকে ঝুকে পড়বে না। ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ আবূ মালিকিল গিফারী থেকে বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ ঃ তোমরা 'ঘায়েল' হয়ে পড়ো না— একদিকে ঝুঁকে পড়ো না। এরপর ইকরামা আবূ তালিবের কবিতার একটা ছত্র আবৃত্তি করেছেন ঃ

بِمِـيزَانِ صِدقٍ لَايَخسُ شَعِيرَةً - ووزَانٍ قِسْطٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلٍ -

সত্যের মানদণ্ডে একটি দানাও কম হয় না। ন্যায়পরতার ওজনদাতার ওজন এক দিকে ঝুঁকে পড়ে না।

ভাষাবিদগণ বলেছেন ঃ العول অর্থ সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। বন্টনে عول অর্থ নির্দিষ্ট চিহ্নিত অংশের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। আর العـول অর্থ الـمـيل ঝুঁকে পড়া। তা ন্যায়পরতা-সুবিচারের বিপরীত। কেননা তা ন্যায়পরতা সুবিচারের সীমা লঙ্ঘন করে বাইরে চলে যায়। আর عال يعـيل বলা হয় যখন জুলুম করা হয়। আর عال يعـيل বলা হয় যখন অহংকারে ফেটে পড়ে। আর عال يعـيل বলা হয় যখন মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে। আবূ উমর গোলাম সালাব আমাকে এ কথা বলেছেন। 'তা খুব নিকটবর্তী যে, তোমরা ঝুকে পড়বে না।' এর অর্থ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ তোমরা যারা ঝুকে পড়, তারা সংখ্যায় বেশি হবে না। বলেছেন, এ কথা প্রমাণ করে যে, স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খরচাদি স্বামীকেই বহন করতে হবে। এ কথাটিকে লোকেরা তিনটি দিক দিয়ে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। একটি দিক— আগেরকালের মনীষী এবং এ আয়াতে তাফসীর যার যার নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'তোমরা কোন দিকে ঝুঁকে পড়বে না। তোমরা জুলুম-পীড়ন চালাবে না।'এই ঝোঁকাটা 'ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতার পরিপন্থী। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে যে ইনসাফপূর্ণ বণ্টন নীতি কার্যকর করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন, এই ঝুঁকে পড়াটা তার পরপন্থী। দ্বিতীয় ভুলটা ভাষাগত। কেননা সন্তান ও পরিবারের লোকদের সংখ্যা বেশি হলে عال يعول যে বলা হয় না, এ বিষয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এ কথা মুবরাদ প্রমুখ ভাষাবিদ উল্লেখ করেছেন। আবূ উবায়দা মামার ইবনুল মুসান্না বলেছেন ঃ ان لاتعولوا অর্থ لاتـجور তোমরা জুলুম-পীড়ন করো না। বলা হয় علت على অর্থাৎ আমার উপর জুলুম করেছে। আর তৃতীয় আয়াতে একজন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, অথবা দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন দাসীর কথা। পরিবারে ক্রীতদাসীরা নারীর মর্যাদাভিষিক্ত। তাই যদি কেউ দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদেরকে মোট সংখ্যার মধ্যে একত্রিত করে তাহলে করা যায়, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। এ থেকে আমরা জানলাম যে, উক্ত আয়াতে সংসারের লোকদের বিপুলতা বোঝায় না; বরং জুলুম-পীড়ন না করা একজন স্ত্রী গ্রহণ করেও। কেননা একজন স্ত্রীর সাথে বণ্টন নীতি কার্যকর করার কোন প্রশ্ন উঠে না। দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েরা স্ত্রী হিসেবে থাকলেও তাদের জন্যে বণ্টন নীতির কোন অংশ নেই।

স্ত্রীর মহরানা স্বামীকে হিবা করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْـًٔا مَّرِيْـًٔا -

এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা খালিস দিলে ও সাগ্রহে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশী মনে তোমাদেরকে তা থেকে কিছু পরিমাণ কম করে দেয়, তাহলে তোমরা তা সুস্বাদু সুপেয় হিসেবে ভক্ষণ কর।

কাতাদাহ্ ও ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'এবং তোমরা তাদের মহরানা খালিস দিলে সাগ্রহে দিয়ে দাও' কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ ফরয মনে করে মহরানা আদায় করে দাও। তাঁরা দুজন যেন ঋণের সন্তুষ্টচিত্ততার দিকে গেছেন। কেননা ঋণের বেলায় তা ফরয। আবূ সালিহ্ থেকে এ আয়াতাংশের অর্থ বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি যখন তার মুক্তি দেয়া দাসীকে বিয়ে করে তখন সে তার মহরানা নিয়ে নেয়। এ আয়াতে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্বোধনটা যেন অভিভাবকদের প্রতি নিবদ্ধ অর্থাৎ তারা যখন মহরানা হস্তগত করবে তখন তা যেন নিজের সম্পদ মনে না করে। তবে نِحْلَةً শব্দের অর্থ কাতাদাহ্ যা বলেছেন আসলে তা-ই— অর্থাৎ তা ফরয। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মীরাস বণ্টন নীতির ঘোষণার পর বলা কথার আলোকে এর তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে।

কোন কোন মনীষী বলেছেন— মহরানাকে نِحْلَةً বলা হয়েছে। আর نِحْلَةً -এর আসল অর্থ দান, হিবা— কোন কোন দিক দিয়ে। কেননা স্বামী তার বদলে কিছুই পায় না। কেননা বিয়ের পর স্ত্রী-অঙ্গ স্বীয় মালিকানায় থাকে যেমন পূর্বে ছিল। যেমন কোন মেয়েলোকের সাথে স্ত্রী সন্দেহে যৌন সম্ভোগ ঘটলে মহরানা তার প্রাপ্য হবে, স্বামীর নয়। মহরানাকে نِحْلَةً নাম দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তার বিনিময়ে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এমন কিছু দেয়া হয়নি, স্বামী যার মালিক হবে। তাই যে نِحْلَةً -এর কোন বিনিময় নেই, সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মনে করতে হবে। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে যা পায়, তা শুধু স্ত্রী অঙ্গের মুবাহ্ নয়। আবূ উবায়দা, মামার ইবনুল মুসান্না বলেছেন ঃ نِحْلَةً অর্থ সন্তুষ্টচিত্তে। যেমন বলা হয় ঃ তোমরা স্ত্রীদের মহরানা এরূপ মানসিকতা নিয়ে দিও না যে, তোমরা তা দিতে অনিচ্ছুক; বরং তা তাদেরকে দাও এমন অবস্থায় যে, তোমাদের মন সন্তুষ্ট, যদিও মহরানা তাদের প্রাপ্য, তোমাদের নয়।"

আবূ বকর বলেছেন ঃ এ তাৎপর্যের আলোকে এটা সঙ্গত যে, তার নাম রাখা হয়েছে نِحْلَةً কেননা نِحْلَةً অর্থ দান। আর দাতা তা দেয় মনের সন্তুষ্টি ও পূণ্য কাজ করার উৎসাহ নিয়ে। এ কারণে তা স্ত্রীদেরকে দিতে আদেশ করা হয়েছে মনের আনন্দ ও সন্তুষ্টি সহকারে। যেমন দানশীল ব্যক্তি মনের খুশীতে দান কার্য সম্পাদন করে।

'এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও' আল্লাহ্‌র এ কথাকে দলীল বানিয়ে বলা হয়েছে ঃ যে স্ত্রীর সাথে নিবিড় নিভৃতে অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে তাকে পূর্ণ মহরানা দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। বাহ্যত তা-ই কর্তব্য হয়ে পড়ে। 'তারা তোমাদের জন্যে সন্তুষ্টচিত্তে কিছু কম করে দিলে তোমরা তা সুস্বাদু-সুপেয়রূপ ভক্ষণ কর'— আল্লাহ্‌র এ কথাটির মহরানা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহরানা দিয়ে দেবার আদেশের পর-ই বলা হয়েছে, স্ত্রীর হিবা ও কম করে দেয়া জায়েয হওয়ার কথা, যেন এ ধারণা না হয় যে, স্ত্রীরা সন্তুষ্টচিত্তে তা পরিহার করলেও স্বামীকে বুঝি তা অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে।

কাতাদাহ্ এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ছাড়া-ই তাদের নিজেদের থেকে সন্তুষ্টচিত্তে কম বা মাফ করে দেয়াই এর অর্থ। তাহলে তা নিয়ে নেয়া হালাল। আল-কামা তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ আমাকে সুস্বাদু-সুপেয় খাওয়াও। এতে বোঝা গেল, আয়াতটির কয়েকটি অর্থ। একটি— মহরানা স্ত্রীর সম্পদ। সে তা স্বামীর নিকট থেকে পাওয়ার

অধিকারী। তাতে অভিভাবকের কোন অধিকার বা অংশ নেই। দ্বিতীয়— স্বামীর কর্তব্য তা সন্তুষ্টচিত্তে সাগ্রহে স্ত্রীকে আদায় করে দেয়া। তৃতীয়— স্ত্রীর জন্যে জায়েয মহরানা স্বামীকে 'হিবা' করে দেয়া এবং স্বামীর পক্ষে তা গ্রহণ করা মুবাহ। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা তা খাও সুস্বাদু পবিত্র সুখকর মনে করে।' চতুর্থ— স্ত্রী মহরানা নিজের হাতে নিয়ে থাকুক কি তা না-ই হস্তগত করে থাকুক— উভয় অবস্থায়ই সে মহরানা স্বামীকে 'হিবা' করতে পারে— এ উভয় অবস্থাই তার জন্যে সমান। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'অতএব তোমরা তা খাও সুখকর পবিত্র সুস্বাদু মনে করে'— উভয় অবস্থাকেই বোঝায়। এও বোঝায় যে, স্ত্রী তা নিজের হাতে পাওয়ার পূর্বেও সে তা 'হিবা' করতে পারে। কেননা আল্লাহ্ তাঁর উক্ত কথায় নিজ হাতে পাওয়া ও না-পাওয়া— এ অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি।

যদি বলা হয়, 'অতএব তোমরা তা খাও সুখকর পবিত্র সুস্বাদু মনে করে' আল্লাহ্র একথা বোঝায় যে, মহরানা নির্দিষ্ট হওয়ার পরই তা করা যাবে। হয় তা নির্দিষ্টভাবে স্ত্রীর হস্তগত হবে অথবা হবে না। হয় তা নগদ অর্থ হবে, যা সে নিজের হাতে পেয়ে গেছে অথবা কারোর যিম্মায় ঋণ হিসেবে নেয়া হয়েছে, তাহলে তা হিবা করা জায়েয হওয়ার কোন প্রমাণ তো এ আয়াতে নেই। কেননা যা কেউ নিজ যিম্মায় নিয়েছে, সে সম্পর্কে তো বলা যায় না যে, তা সুস্বাদু পবিত্র সুখকর হিসেবে খাও।

জবাবে বলা যাবে, এখানে যা খাদ্য হিসেবে আসে কেবল মাত্র তার কথা-ই এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না বাদ দিয়ে। কেননা তা-ই যদি হতো, তাহলে কোন খাদ্যদ্রব্যই কেবল মহরানা হিসেবে দেয়া ওয়াজিব হতো। কথার ধরন থেকে বোঝা-ই যায় যে, মহরানা কেবল খাদ্যদ্রব্যই হয় না, যা খাদ্যদ্রব্য নয়, তা-ও মহরানা হতে পারে। কেননা আল্লাহ্র আদেশ ঃ 'এবং স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা খালিস আন্তরিকভাবে দিয়ে দাও' সর্ব প্রকারের মহরানাকেই শামিল করে— তা খাদ্য জিনিস হোক, অথবা হোক অন্য কোন জিনিস। আর 'অতএব তোমরা তা খাও সুখকর পবিত্র সুস্বাদু মনে করে' সর্ব প্রকারের মহরানাকে শামিল করে— যা দেওয়ার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। তবে বোঝা গেল যে, এখানে 'খাও' কথাটির বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। কথার উদ্দেশ্য হল— অন্তরের সন্তুষ্টি সহকারে স্ত্রী হৃদয়ে তা অন্তরের সেই সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করা মুবাহ, একথা বোঝানো।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا -

যেসব লোক জুলুম করে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১০)

বলেছেন ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -

এবং তোমরা তোমাদের ধন-মাল বাতিল পন্থায় পারস্পরিক ভক্ষণ করো না।
(সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৮)

এসব কথায় ইয়াতীমের মালে সর্বপ্রকারের হস্তক্ষেপ— তা ঋণের ব্যাপার হোক, খাদ্য জিনিস হোক, কি অ-খাদ্য জিনিস— এ সব-ই নিষেধের আওতার্ভুক্ত এবং লোকদের ধন-মাল গ্রহণও তার অন্তর্ভুক্ত। শুধু একটি পন্থায় গ্রহণ এ নিষেধের আওতাবহির্ভূত। তা হল সন্তুষ্টি-সম্মতি সহকারে ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয়। তা আয়াতের তাৎপর্যের দৃষ্টিতে কেবল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তা সত্ত্বেও সর্বত্র 'খাওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শুধু এ কথাটি বোঝাবার জন্যে যে, মানুষ মানুষের ধন-মাল যে জন্যে নেয়, খাওয়া তার মধ্যে সর্বাধিক লক্ষ্য। কেননা খাওয়া দ্বারাই দেহ রক্ষা পায়, সুস্থ থাকে, বলশালী হয়। এ শব্দ খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও অন্য জিনিস বোঝায়। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

اذَا نُودِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ -

জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্যে আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকির এর দিকে দৌড়াও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিহার কর। (সূরা জুম'আ ঃ ৯)

আয়াতে 'ক্রয়-বিক্রয়' বিশেষ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও তার-ই মত অন্যান্য সর্বপ্রকারের ব্যস্ততাই পরিহার করার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলার উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো যে, মানুষ যত প্রকারের কাজে ব্যস্ত থাকে, ক্রয়-বিক্রয় তার মধ্যে অধিক ব্যস্তকারী কাজ। কেনড়া জীবিকার সন্ধানে নগরবাসী মানুষ এ ক্রয়-বিক্রয় কাজে ঢ়র্বাধিক ব্যস্ততার মধ্যে মশগুল হয়ে পড়ে। তাই বোঝা যায় যে, এই শব্দটি বলে কেবল সেই কাজ-ই বোঝায় না, তাছাড়া অন্যান্য কাজও বোঝায়। বরং তা-ও নিষিদ্ধ হওয়া অড়রও অধিক মাত্রায় আবশ্যক। কেননা যে যে কাজ অধিক জরুরী ও যে যে কাজের প্রয়োজন অধিকতর তীব্র, তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ -

তোমাদের প্রতি মৃত, রক্ত ও শুকর মাংস হারাম করা হয়েছে। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

কি কি হারাম করা হয়েছে, সেই পর্যায়ে গোশতের এবং তা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত অংশের উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষভাবে। কেননা এসব জিনিসের মধ্যে গোশত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তা থেকেই বেশি উপকৃত হয়ে থাকে। তা অন্যান্য জিনিস-ও বোঝায়। এমনিভাবে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তাই তা খাও সুস্বাদু পবিত্র সুখকর মনে করে' কথাটিও অনুরূপ। তা থেকে মহরানা হিবা করা জায়েয প্রমাণিত হয়, তা যে-কোন জাতীয় জিনিস হোক, তা কোন বস্তু হোক, কি ঋণ হোক, করজ করা হোক, আর না-ই হোক, কোন পার্থক্য নেই।

অন্যদিক দিয়ে বলা যায়, মহরানা হিবা করা যখন জায়েয তখন তা নির্দিষ্টভাবে স্ত্রীর দখলে থাকবে, তেমনি তা ঋণ হলেও তা থেকে হিবা করা জায়েয। কেননা স্ত্রী নিজের ধন-মালে তার হস্তক্ষেপ করা তার জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয। তাই তা জিনিস হোক বা হোক ঋণ— এর মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। কেউ-ই এসবের মধ্যে পার্থক্য করেনি। আলোচ্য আয়াত ঋণ হিবা করা ও তা থেকে পরিত্রাণ দেয়া স্ত্রীর জন্যে জায়েয ঘোষণা করেছে, যেমন মহরানা 'হিবা' করা তার

জন্যে জায়েয, তা ঋণ হলেও। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি কারোর ঋণ 'হিবা' করে যা তার নিকট পাওনা ছিল, তাহলে তা মূলত 'হিবা'ই গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ্ সে কাজকে সহীহ্ বলেছেন এবং তা তার যিম্মা থেকে হ্রাস করে দিয়েছেন। এ-ও বোঝা যায় যে, কেউ যদি অন্য কাউকে কোন মাল দেয় এবং সে তা হস্তগত করে ও হাতে হস্তক্ষেপ করে, তবে তা তার জন্যে জায়েয হবে মুখে তা না বললেও যে, আমি তা কবুল করলাম। কেননা আল্লাহ্ স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনা শর্তে সে যা-ই হিবা করবে তা খাওয়া স্বামীর জন্যে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। তার হিবা করার পর তার উপস্থিতিতে তাতে হস্তক্ষেপ করা হলেই তা কবুল করা হয়েছে বলে মনে করা হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে ঃ আমি নিজে মনে খুশি সহকারে আমার প্রাপ্য মহরানা থেকে একটা কমিয়ে দিলাম কিংবা হিবা করা ও নিষ্কৃতি দেয়ার ইচ্ছা করে, তবে তা জায়েয হবে। কেননা আল্লাহ্ তো বলেই দিয়েছেন ঃ 'স্ত্রীরা যদি নিজেদের খুশিমনে মহরানা থেকে কমিয়ে দেয়, তাহলে তোমরা তা সুখকর সুখাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর।'

স্ত্রী নিজ থেকে স্বামীর নিকট প্রাপ্য মহরানা হিবা করা পর্যায়ে ফিকাহবিদগণের ভিন্ন মত উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে যিয়াদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি পূর্ণবয়স্ক হয় এবং তার বুদ্ধি-বিবেচনা সুসংহত হয়, তাহলে তার নিজের ধন-মালে তার হিবা ও অন্যান্যভাবে হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ জায়েয। সে কুমারী ছিল কি পূর্বে স্বামীপ্রাপ্ত, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। ইমাম মালিক (র) বলেছেন, কুমারী স্ত্রীর তার মালে হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়। স্বামীর নিকট থেকে পাওয়া মহরানায়ও তার পরিমাণ হ্রাস করার ইখতিয়ার নেই। তা ক্ষমা করা বা কমানোর ইখতিয়ার তার পিতার থাকবে। পিতা ছাড়া অপর কোন অভিভাবকের জন্যেই তা করা জায়েয হবে না। স্বামীওয়ালী স্ত্রীর তার নিজের ঘর-বাড়ি ও নিজের দাস-খাদেম বিক্রয় করা অবশ্য জায়েয বলেছেন। বিক্রয়ের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে স্বামীর অরাজীতেও তা সে করতে পারবে। তা যদি পক্ষপাতিত্বমূলকও হয়, তবে তা তার ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে যাবে। এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণে সাদকা বা হিবা করলে তা জায়েয হবে না, তার পরিমাণ কম হোক কি বেশি। ইমাম মালিক (র) বলেছেন ঃ স্ত্রীর স্বামী না থাকলে তার ধন-মালে তার অবস্থানটা ব্যক্তির নিজের ধন-মালের যে অবস্থান ঠিক তেমনি— সম্পূর্ণ সমান। ইমাম আওজায়ী বলেন, স্ত্রীর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তার দান করা জায়েয নয়— যদি সে তার স্বামীর ঘরে এক বছরকাল অবস্থান করে। লায়স বলেছেন, স্বামীওয়ালী স্ত্রীর নিজের দাস মুক্ত করা জায়েয নয়। তবে ছোট-খাটো ও সামান্য জিনিস— যা সেলায়ে রেহমী কিংবা অন্যভাবে করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে— তা করা তার জন্যে অবশ্যই জায়েয। কেননা এসব কাজ করে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হওয়ার আশা করা হয়।

আবূ বকর আল-জাসসাস বলেছেন— এসব কথা যে ঠিক নয়, আলোচ্য আয়াতটিই সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছে। বরং আয়াতটি থেকে হানাফী মাযহাবের মতে সত্যতাই প্রমাণিত হয়। হানাফী মাযহাবের মত তো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেননা আল্লাহ্র কথাঃ 'স্ত্রীরা যদি খুশি মনে কোন জিনিস তোমাদেরকে দেয় নিজের ইচ্ছানুক্রমে, তবে তোমরা তা খাও সুখকর সুস্বাদু-খাদ্য হিসেবে'— এতে কুমারী-অকুমারী, স্বামীর ঘরে এক বছর অবস্থান করেছে কি করেনি বা তার সন্তান হয়েছে কি হয়নি— তার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যই

করা হয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে কুমারী অ-কুমারীর মধ্যে পার্থক্য করাই জায়েয নয়। তবে সেই পার্থক্য করা কোন দলীল পাওয়া গেলে এবং আলোচ্য আয়াতে কুমারীদের সম্পর্কে নয়, কেবল অ-কুমারী স্ত্রীদের সম্পর্কে হুকুম বলা হয়েছে, তা থেকে তা প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। ইমাম মালিক স্ত্রীর পিতার তার কন্যার মহরানা থেকে হিবা করা জায়েয বলেছেন। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে সমস্ত মহরানা স্ত্রীকে দিয়ে দেয়ার আদেশ করেছেন, তবে স্ত্রী নিজে তা থেকে কিছু পরিমাণ স্বামীকে হিবা করলে তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয। ফলে পিতার হিবা করার ব্যাপারটি এ আয়াতটিই নাকচ করে দিয়েছে। কেননা স্বামী সম্পূর্ণ মহরানা প্রত্যর্পণ করার জন্য আদিষ্ট। তবে স্ত্রী খুশিমনে নিজ থেকে কিছু কম করলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ এ আয়াতে পিতার খুশিমনে পরিমাণ হ্রাস বা হিবা করার কথা বলেন নি। কাজেই আল্লাহ স্ত্রীর খুশিমনে তার মহরানার কোন অংশ কম করা যে মুবাহ করেছেন তা নিষিদ্ধ করা এবং পিতার পক্ষে নিজ কন্যার মহরানা সেই কন্যার সন্তুষ্টচিত্তে হিবা করার পরিবর্তে হ্রাস করা আল্লাহ্-ই নিষিদ্ধ করেছেন, তা করা কখনই বৈধ হতে পারে না। তা করা হলে দুটি দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের বিরোধিতা করা হবে কোন দলীল ছাড়া-ই। একটি দিক— স্ত্রীকে হিবা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা। আয়াতটি তার বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়েই স্ত্রীকে এ অধিকার দেয়। আর দ্বিতীয়, কন্যার মহরানা তার পিতার হিবা করার অধিকার স্বীকার করে নেয়া। অথচ আল্লাহ্ স্বামীকে সম্পূর্ণ মহরানা স্ত্রীকে দিয়ে দেয়ার আদেশ করেছেন, শুধু স্ত্রীর খুশিমনে কিছু হ্রাস করার কথা বাদ দিয়ে। অপর একটি আয়াত একথার সত্যতা প্রমাণ করে। তাতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ -

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা দিয়ে দিয়েছ, তা থেকে একবিন্দু জিনিস ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে হালাল হবে না। তবে স্বামী ও স্ত্রী— দুজনই যদি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না— এ ভয়ে ভীত হয়, তাহলে ফিরিয়ে নেয়া যায়। তাই তোমরা যদি ভীত হও এ কথা মনে করে যে, তারা দুজন আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা কায়েম রাখবে না, তা হলে স্ত্রী যা নিজের মুক্তির জন্যে ফেরত দেবে তা গ্রহণ করায় সে দুজনার কোন দোষ হবে না। (সূরা বাকারাহ ঃ ২২৯)

এ আয়াতে স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা থেকে একবিন্দু পরিমাণ ফেরত নিষেধ করা হয়েছে। তবে স্ত্রী নিজের মুক্তির বিনিময় হিসেবে যা দেবে, তা নিতে নিষেধ করা হয়নি। তাতে স্ত্রীর সম্মত থাকা শর্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কুমারী অ-কুমারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী জয়নব বর্ণিত হাদীসও এই কথা-ই বলে। হাদীসটি হল নবী করীম (স) মেয়েলোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ -

তোমরা দান-সাদকা কর, তা তোমাদের অলংকারাদি থেকে হলেও।

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসেও তাই বলা হয়েছে। নবী করীম (স) ঈদুল ফিতর-এর দিন নামাযের জন্যে বের হলেন। তিনি নামায আদায়ের পর ভাষণ দিয়েছেন। পরে মেয়েলোকদের সমাবেশ স্থানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে দান-সাদকা করতে আদেশ করলেন। এ ভাষণে তিনি কুমারী অ-কুমারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তা ছাড়া এটা একটা প্রতিবন্ধকতা বিশেষ। আর যার পরিচিত এরূপ তার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা সহীহ্ নয়।

বোকা লোকদের হাতে ধন-মাল দেয়া

আল্লাহ্র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا -

এবং তোমাদের ধন-মাল বোকা লোকদেরকে দিও না, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থিতিস্থাপক বানিয়েছেন।

আবূ বকর আল-জাসসাস বলেছেন ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ব্যক্তি যেন তার ধন-মাল তার সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে না দেয়। দিলে সে তাদের উপর বোঝা হয়ে পড়বে— তারা তার উপর বোঝা থাকার পর। আর মেয়েলোক হচ্ছে বোকাদের মধ্যে অধিক বোকা। এ ভাবে ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন তার বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে। আয়াতটির নিগূঢ় তাৎপর্যও তাই। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ امولكم। তোমাদের ধন-মাল। এর দাবি হচ্ছে বোকাদের হাতে ধন-মাল ছেড়ে দেয়া প্রত্যেকের জন্যেই এ নিষেধাজ্ঞা। কেননা তাতে ধন-মাল বিনষ্ট হওয়ার— তারা তা বিনষ্ট করে দেবে এবং তারা তার সংরক্ষণে অক্ষমতার পরিচয় দেবে, তার দ্বারা কোন সুফল ফলাতে পারবে না, এ আশংকা তীব্র হয়ে আছে। এই 'বোকা লোক' বলতে বালক ও মেয়েলোক বোঝানো হয়েছে। কেননা তারা ধন-মাল সংরক্ষণ ও যথার্থ প্রয়োজনে ব্যয় বিনিয়োগ করতে পূর্ণভাবে দক্ষ নয়। এ কথা থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, ধন-মালের মালিকের উচিত নয় তাদেরকে তার জীবনকালে তার ধন-মালের ভারপ্রাপ্ত বানানো। এ পরিচিতির লোকের হাতে ধন-মাল অসিয়ত করা সমীচীন নয়। এও প্রমাণিত হয় যে, তার উত্তরাধিকারী যদি অল্পবয়স্কা হয়, তবে তাদের জন্যে কোন ধন-মাল অসিয়ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং তার অসিয়ত করা উচিত একজন বিশ্বস্ত আমানতদার ও রক্ষণাবেক্ষণে সজাগ ও সতর্ক ব্যক্তির নামে।

ধন-মাল কোনরূপ বিনষ্ট করাও এ আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে। তার পূর্ণ সংরক্ষণ, হিফাজত, যথার্থ ব্যবস্থাপনা এবং তার দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের আদেশও এ আয়াতে নিহিত রয়েছে।

কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا -

যে ধন-মালকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থিতিস্থাপক ও সংরক্ষক বানিয়েছেন।

এতে আমাদের দেহ-সত্তার সংরক্ষণ যে ধন-মাল দ্বারা সম্ভব হয়, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাই আল্লাহ যাকে তা রিযিক হিসেবে দিয়েছেন, তার কর্তব্য হল তা থেকে আল্লাহ্র হক আদায় করা, তাঁর নির্দিষ্ট অংশ তা থেকে বের করা। পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তার পূর্ণ সংরক্ষণ করা। তা বিনষ্টকরণকে সর্ব প্রযত্নে এড়িয়ে যাওয়া, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে সুষ্ঠু জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করার উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কিতাবের বিভিন্ন আয়াতে এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দিয়েছেন। একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنَ -

তোমরা সাংঘাতিকভাবে বেহুদা খরচ করবে না। যারা বেহুদা খরচ করে, তারা শয়তানের ভাই। (সূরা বনী-ইসরাইল ঃ ২৬-২৭)

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا -

এবং তোমাদের হাত তোমার গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় রাখবে না এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে খুলেও দেবে না। তা যদি কর, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও অনুতপ্ত দুঃখিত অবস্থায় বসে থাকতে বাধ্য হবে। (সূরা বনী-ইসরাইল ঃ ২৯)

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا -

আর যারা যখন ব্যয় করে তখন বেহুদা খরচ করে না, কৃপণতাও করে না। (তারাই আল্লাহ্র নেক বান্দা) (সূরা ফুরক্বান ঃ ৬৭)

এভাবে বহু আয়াতে ধন-মাল সংরক্ষণ ও ঋণসমূহের যথাযথ সাক্ষ্যের ব্যবস্থাকরণ, দলীল লিপিবদ্ধকরণ ও রিহন রাখার ব্যবস্থা কার্যকর করার তাগিদ করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। এ বিষয়ে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا -

যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থিতিস্থাপক বানিয়েছেন।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হল আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার উপর সংরক্ষক বানিয়েছেন। অতএব তোমরা তা এমন লোকের হাতে কখনই দেবে না, যে তা ধ্বংস ও বিনষ্ট করবে।

আর ব্যাখ্যার দ্বিতীয় দিক হল, সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা বোকা লোকদের হাতে তাদের ধন-মাল ছেড়ে দিও না। এ ধন-মাল সেই বোকা লোকদের বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ -

এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। (সূরা নিসা ঃ ২৯)

এর অর্থ, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ -

অতএব তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর। (সূরা বাকারা ঃ ৫৪)

এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ -

তোমরা যখন ঘরসমূহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা নিজেদের প্রতি সালাম কর।
(সূরা নূর ঃ ৬১)

এর অর্থ, যারা ঘরে আছে তাদের প্রতি 'আসসালামু আলাইকুম' বলা। এরূপ ব্যাখ্যার আলোকেই বোকা লোকদের উপর ধন-মাল ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে হবে। তখন তাদের এ বোকামী দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধন-মাল ব্যয়-ব্যাবহারের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হবে।

এখানকার سُفَهَاءَ -এর বিভিন্ন অর্থ বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ السفيه বলতে 'তোমার সন্তান ও পরিবারের লোকদেরকে' বোঝানো হয়েছে। বলেছেন ঃ মেয়েলোক হচ্ছে সবচাইতে বেশি মাত্রায় সফীহ্— নির্বোধ। সাঈদ ইবনে যুবায়র, আল-হাসান, আস-সুদ্দী, আদ-দহাক ও কাতাদাহ বলেছেন ঃ মেয়েলোক ও বালক-বালিকারা সফীহ। কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ এখানে তাদের সকলের কথা বলা হয়েছে, যারা ধন-মাল ব্যয়-ব্যবহার বিনিয়োগে মূর্খতার পরিচয় দেয়। তাদের ধন-মাল ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে হবে। শবী, আবূ বুরদাতা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তিনি জন আছে, যারা আল্লাহ্কে ডাকে, কিন্তু তাদের জবাব দেয়া হয় না (দো'আ কবুল হয় না)। এক ব্যক্তি, যার স্ত্রী খারাপ চরিত্রের মেয়েলোক হওয়া সত্ত্বেও সে তাকে তালাক দেয় না। আর এক ব্যক্তি, যে তার ধন-মাল নির্বোধ-বোকা লোককে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল বোকা লোকদের দিও না'। আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে অন্য এক ব্যক্তিকে ঋণ দেয়; কিন্তু সেজন্যে সাক্ষী রাখে না।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, 'সুফাহা' হচ্ছে মেয়েলোকেরা। এ-ও বলা হয়েছে যে, السفه -এর আসল অর্থ হল বুদ্ধির স্বল্পতা, হালকাপনা। এ কারণে ফাসিক ব্যক্তিকে 'সফীহ' বলা হয়েছে। কেননা দ্বীনদার ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের নিকট তার কোন মূল্য নেই। কম বুদ্ধির লোককেও 'সফীহ' বলা হয় তার বুদ্ধি-বিবেচনার স্বল্পতা ও হালকাপনার কারণে। তবে এদের নির্বুদ্ধিতা বা কম বুদ্ধির এ পরিচিতি নিন্দাসূচক নয়। এটা আল্লাহ্‌র নাফরমানীরও কোন ব্যাপার নয়। তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার স্বল্পতা ও হালকাপনার জন্যেই তাদেরকে 'সফীহ' বলা হয়েছে। ধন-মাল রক্ষায় ভালো মন্দ বিচার করতে তারা অক্ষম, কেবল এ কারণেই তাদেরকে 'সফীহ' বলা হয়েছে।

যদি বলা হয়, মেয়েলোক ও বালকদেরকে ধন-মাল 'হিবা' করা যে নিষিদ্ধ নয়, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈততা নেই। বশীর তার পুত্র নুমানকে তার মাল হিবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী করীম (স) তাঁকে তা করতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর সব কয়জন ছেলেকে সমান পরিমাণে 'হিবা' করেন নি, কেবল মাত্র এ কারণে নিষেধ করেছিলেন। তাহলে এ আয়াতে আমাদের ধন-মাল 'সফীহ'দের দিতে নিষেধ করা হয়েছে, একথা কি করে বলা যেতে পারে?

জবাবে বলা যাবে, এ আয়াতে মালিক করে দেয়ার ও ধন-মাল 'হিবা' করার ব্যাপরে কিছু বলা হয়নি। এ আয়াতের আসল বক্তব্য হল— যারা ধন-মাল সংরক্ষণ করতে অপারগ, তার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাদের হাতে ধন-মাল সঁপে দেয়া আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ। তাই ছোট বয়সের লোকের ও মেয়েদের নামে ধন-সম্পদ হিবা করা নিষিদ্ধ নয়, তা জায়েয। যেমন বেশি বয়সের বুদ্ধিমান লোক হিবা করে। কিন্তু তা তার পক্ষ হয়ে হস্তগত করে বড় বয়সের লোক— ছোট বয়সের লোক ও মেয়েলোকদের পক্ষ থেকে এবং তার সে মাল সংরক্ষণ করে তা নষ্ট করে না, নষ্ট হতে দেয় না। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল সে সব ছোট বয়সের ও মেয়েলোকদের হাতে দিতে নিষেধ করেছেন, যারা সে ধন-মাল সংরক্ষণ করতে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ -

এবং তা থেকে তাদের রিযিক ও পোশাক-আশাক দেয়ার ব্যবস্থা কর।

অর্থাৎ তাদেরকেই সেই ধন-মাল থেকে রিযিক দাও। আয়াতে فيها এর অর্থ منها তা থেকে। কেননা গুণবাচক অক্ষর একটার পর একটা আসে এবং তার কোন কোনটি অপর কোনটির স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ -

এবং তোমরা তাদের ধন-মাল তোমাদের ধন-মালের সাথে মিশিয়ে খেয়ো না।

এ আয়াতে الى -এর অর্থ مَعَ ।

আলোচ্য আয়াতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ধন-মাল সে সব লোককে দিতে, যারা তার সংরক্ষণ করতে সক্ষম নয়। সেই সাথে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে সে ধন-মাল থেকে তাদেরকে রিযিক দিতে, পোশাক পরিচ্ছদ দিতে।

আয়াতটির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, আমাদের মাল তাদেরকে দিতে নিষেধ করা হয়েছে— যেমন বাহ্যত— তো থেকে বোঝা যায়, তাহলে তাতেই নির্বোধ সন্তান ও স্ত্রীদের প্রয়োজনীয় খরচাদি বহনে ওয়াজিব হওয়ার দলীলও তাতেই রয়েছে। কেননা আমাদেরকে সেজন্য ধন সম্পদ ব্যয় করার আদেশ করা হয়েছে। আর তার অর্থ যদি এই হয় যে, নির্বোধ লোকদের ধন-মাল তাদের হাতে আমরা সঁপে দেব না— যেমন অনেক ব্যাখ্যাকারই তাই বলেছেন, তাহলে তাতেই তাদের মাল থেকে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ব্যয় করার আদেশও দেয়া হয়েছে। আর এ কথাই দুটি দিক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করার দলীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি হল, তাদের ধন-মাল থেকে তাদেরকে বিরত রাখা, তাদেরকে না দেয়া। আর দ্বিতীয় তাদের জন্যে সেই ধন-মাল থেকে ব্যয় করার জন্যে আমাদেরকে অনুমতি দান। তাদের খোরাক-পোশাক তা থেকে ক্রয়করণ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا -

এবং তাদেরকে ভালো ভালো কথা বল।

মুজাহিদ ও ইবনে জুরাইন বলেছেন ঃ قَوْلٌ مَّعْرُوفًا জায়েয পন্থায় তাদের কল্যাণ সাধন, সেলায়ে রিহমীকরণ ও তাদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুতকরণ ও তাদের প্রতি দয়া করা। তাদেরকে ভালো-ভালো ও সন্দুর সুন্দর কথা শেখানো, তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথাবার্তা বলা। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ -

আর ইয়াতীমকে রুঢ় কর্কশ কথা বল না ও ব্যবহার করো না। (সূরা দোহা ঃ ৯)

যেমন বলেছেন ঃ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا -

আর তুমি যদি তাদের (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের) থেকে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এ কারণে যে, তুমি তোমার রব্ব-এর যে রহমত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী তা কামনা এখানো পোষণ করছ, তাহলে তুমি তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৮)

বলা হয়েছে, এখানে 'ভালো কথা বলা'র অর্থ তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদব-কায়দা শিক্ষাদান, তাদের বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ সাধন ও উন্নত উত্তম চরিত্র শিক্ষাদান। এ-ও সম্ভব যে বলা হয়েছে, তোমরা যখন তাদেরকে রিযিক ও পোশাক দেবে তোমাদের ধন-মাল থেকে তখন

তাদের সাথে ভালো দরদপূর্ণ কথা বলবে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া দেখিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেবে না, তাদের অপমান করবে না। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا -

মীরাস বণ্টনের সময়ে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনরা— যারা মীরাস পাবে না— উপস্থিত হলে তা থেকে তাদেরকে রিযিক দাও এবং তাদের জন্যে ভালো কথা বল।

'আল্লাহই ভালো জানেন'— এর অর্থ হল কথার শব্দ সুন্দর ও মিষ্ট করবে, হুমকি ধমকি করবে না, তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى -

তোমরা তোমাদের দানসমূহকে অনুগ্রহ দেখিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিষ্ফল করে দেবে না।
(সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

হতে পারে এ সব অর্থই একসাথে এখানে গ্রহণীয়। আর তার সারকথা হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ তাদেরকে ভালো-সুন্দর-নম্র-নির্দোষ কথা বল।

ইয়াতীমের মাল তাকে দেয়া

আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ -

ইয়াতীমদের পরীক্ষা ও যাচাই করতে থাক। শেষ পর্যন্ত যখন তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ লক্ষ্য করবে, তখন তাদের নিকট ধন-মাল ফিরিয়ে দাও।

আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও আস-সুদ্দী বলেছেন ঃ অর্থাৎ তাদের বিবেক-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও তাদের দ্বীনদারীর পরীক্ষা নিতে থাক, যাচাই করতে থাক।

আবূ বকর বলেছেন, তাদের পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পূর্বে তাদের নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্যে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। কেননা বলা হয়েছে ঃ বিয়ের বয়স পর্যন্ত তাদের পরীক্ষা ও যাচাই করতে থাক। অর্থাৎ তাঁদের ইয়াতীম থাকা অবস্থায় তাদের পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। তার পরে বলেছেন ঃ 'যতক্ষণ না তারা বিয়ের (বয়স) পর্যন্ত পৌঁছে যায়'। এতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছা হবে পরীক্ষা যাচাইর পড়। কেননা حتى শব্দটি শেষ সময় বোঝায়, যা পরীক্ষার পর উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে আয়াতটি দুটি দিক দিয়ে একথা বোঝাচ্ছে যে, এ পরীক্ষাটা পূর্ণ বয়স্কতা লাভের আগে হতে হবে। আর তাতেই দলীল

রয়েছে এ কথার যে, যে ছোট বয়সের ছেলেমেয়ে সম্পত্তির মালিক, ব্যবসায় বুঝে— ব্যবসায়ের কাজে তার অনুমতি লাওয়া জায়েয। কেননা তার পরীক্ষা সম্পন্ন হতে পারে ধন-সম্পদের বিলি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপারাদি সম্পর্কে সুস্থ নির্ভুল জ্ঞান দ্বারা, ধন-মালের সংরক্ষণ দ্বারা। যখন সে সেই বিষয়ে আদেশ করবে, তখন ব্যবসায়ে অনুমতি পাওয়া গেল— বুঝতে হবে।

ব্যবসায়ের কাজে বালকের অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে যিয়াদ ও হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, পিতা তার ছোট বয়সের পুত্রকে ব্যবসায়ের অনুমতি দিতে পারে— তা জায়েয। তবে তা তখন, যখন সে ক্রয়-বিক্রয় বুঝতে সক্ষম হবে। পিতা বা দাদার অসীও— পিতার অসী না থাকলে দাদার অসী তা দিতে পারে। তখন তার অবস্থা হবে অনুমতি প্রাপ্ত ক্রীতদাসের ন্যায়। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক থেকে বলেছেন ঃ ব্যবসায়ে পিতা এবং অসীর অনুমতি দান সঙ্গত মনে করি না। তাতে যদি কোন ঋণ চেপে পড়ার ব্যাপার ঘটে। তবে তার কোন কিছুই সে বালকের উপর বাধ্যতামূলক হবে না। রুবাই ইমাম শাফেয়ী থেকে তাঁর الاقرار গ্রন্থে বলেছেন ঃ যে বালক আল্লাহ্‌র হক বা কোন লোকের বা অপর কারোর হক অন্য কারোর মালে আছে স্বীকারোক্তি করে, তা হলে তার এই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহৃত হবে, সে বালক ব্যবসায়ে অনুমতি প্রাপ্ত হোক, তার পিতা বা তাঁর অভিভাবক— যে-ই হোক, কিংবা শাসকের কাছ থেকেই হোক। শাসকের জন্যে তাকে অনুমতি দেয়া জায়েয নয়। যদি দেয়, তাহলে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহৃত হবে তার উপর থেকে। সে বালকের ক্রয় ও বিক্রয়ও ভেঙ্গে দেয়া হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, ব্যবসায়ে বালকদের অনুমতি দান জায়েয। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ইয়াতীমদের পরীক্ষা কর। তাদের বিবেক-বুদ্ধি, ধর্ম পালন এবং যে সব ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করে, তাতে তাদের বিচক্ষণতা, সতর্কতা ইত্যাদির পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। এ আদেশ এ সব ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত। কাজেই কোন এক ব্যাপারে পরীক্ষা করা যাবে, অন্য ব্যাপারে পরীক্ষা করা যাবে না— এরূপ বলার কারোর অধিকার নেই। কেননা ব্যবহৃত শব্দ এসবকেই ধারণ করে। এই পরীক্ষা করা যাবে না— এরূপ বলার কারোর অধিকার নেই। কেননা ব্যবহৃত শব্দ এসবকেই ধারণ করে। এই পরীক্ষা করা হবে ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাপারাদি নিয়ন্ত্রণ আয়ত্তকরণ ও তার ধন-মাল সংরক্ষণে তার অযোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতার। আর সে কাজ ব্যবসায়ে বা সাংসারিক কাজ-কর্মে তাতে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি না দিলে তো সম্ভব হতে পারে না। যদি কেউ মনে করে— কথার দ্বারা শুধু তার বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা করা হবে, ব্যবসায়ের— সংসারের কাজে হস্তক্ষেপ ও বাস্তব ভাবে ধান-মাল সংরক্ষণ করতে পারার পরীক্ষা হবে না, তাহলে সে একটা কোন দলীল ছাড়া সাধারণ অর্থবোধক শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করার কাজ করল।

যদি বলা হয়, আয়াতটি বলে যে, ছোট বয়সে ধন-মালে কার্যত হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয়ার কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কথাটি তো এ ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে ঃ 'যদি তোমরা তাদের থেকে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ পাও, তাহলে তাদের মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও।' পূর্ণবয়স্কতা লাভ ও বুদ্ধির লক্ষণ পাওয়ার পর তাদের হাতে ধন-মাল ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ হয়েছে মাত্র। তার ছোট বয়সে তাকে ব্যবসায় ইত্যাদিতে অনুমতি দান যদি জায়েযই হত,

তাহলে ধন-মাল দিয়ে দেয়ারই আদেশ করা হত, পরীক্ষার প্রশ্ন থাকত না। আর আল্লাহ্ তো পূর্ণবয়স্কতা লাভ ও বুদ্ধির লক্ষণ দেখার পর ধন-মাল তাকে দিয়ে দিতে বলেছেন।

জবাবে বলা যাবে, ব্যবসায়ের— সংসারের কাজের— অনুমতিদান আর ধন-মাল তার হাতে দিয়ে দেয়া এক কথা নয়। কেননা অনুমতিটা হল— ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন করার আদেশ দেয়া। আর তা তাদের মাল দেয়া ছাড়াও হতে পারে। যেমন ক্রীতদাসকে মাল তাকে না দিয়েই ব্যবসায় বা সংসারে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। তাই আমরা বলব, আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, তার পরীক্ষা করার আদেশ করা। আর এ পরীক্ষা কাজের জন্যেই ব্যবসায়ে— সাংসারিক কাজে— তাকে অনুমতি দান অপরিহার্য। যদিও ধন-মাল তার হাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। তার পরে যখন সে পূর্ণবয়স্কতা পাবে ও তার বুদ্ধি-বিচক্ষণতারও লক্ষণ দেখা যাবে, তখন তার নিকট ধন-মাল হস্তান্তর করা হবে। যাচাই ও পরীক্ষা যদি— তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিয়ে— করা না হয়, তাহলে তা হবে শুধু তার বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা, কার্যত কায়কারবারে হস্তক্ষেপ, সে বিষয়ে জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাস্তব পরীক্ষা লওয়া সম্ভব হবে না। আর তাহলে পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পূর্বে তার পরীক্ষার কোন কারণ বা তাৎপর্য থাকে না। তাই পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বেই যখন তা করার আদেশ করা হয়েছে, তখন আমরা জানলাম যে, কার্যত হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই তার পরীক্ষার কাজটি করতে হবে। তাছাড়া তার বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা যাচাই করা হলে কার্যত ব্যাপারাদি সম্পাদন ও ধন-মাল সংরক্ষণে তার যোগ্যতা কতখানি হয়েছে— তা জানা যাবে না। সে ক্রয়-বিক্রয়ে সক্ষম ও বিচক্ষণ কিনা— তাও বোঝা যাবে না। আর এক কথা তো জানা-ই আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ধন-মাল সংরক্ষণ ও কায়-কারবার পরিচালনের দক্ষতা যাচাই করারই আদেশ করেছেন। তাই পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে যে পরীক্ষা করার আদেশ, তা তার শুধু বুদ্ধি বিবেচনারই পরীক্ষা নয়। উপরন্তু পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে যদি কায়-কারবার করতে তাকে অনুমতি দেয়া জায়েয না হয় তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হওয়ার কারণে, তাহলে এদিকের পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তার পরে একটা কাজ-ই শুধু থাকবে এবং তা পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর যখন তার বুদ্ধিমত্তার উন্মেষের লক্ষণ পাওয়ার জন্যে তাকে কায়-কারবার করবার অনুমতি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করা হবে। অথবা তাকে আদৌ যাচাই-ই করা হবে না। আর পরীক্ষা ওয়াজিব হলে তাকে কায়-কারবারে হস্তক্ষেপেরও অনুমতি দিতে হবে অপরিহার্যভাবে। অথচ তা-ই তার উপর বুদ্ধি উন্মেষের লক্ষণ পাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে আছে তোমার মতো। আর পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পরও তার প্রতিবন্ধকতা আরোপিত থাকা অবস্থায় তাকে কায়-কারবার করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে তার উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে নেয়া হয়েছে, বলতে হবে। অথচ সে সময়ে তার উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা সরানো যেতে পারে না। তার পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর-ও সে তার ধন-মাল ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। অথচ— এ সময় তার অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ারই কথা। ..... তাহলে পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে কেন কায়-কারবারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি তাকে দেবে না? .... তার অবস্থার নির্ভুলতা প্রমাণের জন্যে? যেমন পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকা সত্ত্বেও তাকে কায়-কারবারে হস্তক্ষেপের অনুমতি দিয়ে তার অবস্থার নির্ভুলতা প্রমাণ করা হবে।

আর পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পরও তার অবস্থার নির্ভুলতা প্রমাণিত হবে না। তা হলে তার বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার কথা কিভাবে জানা যাবে?

এই প্রেক্ষিতেই বলা যায়, বিপরীত লোকের কথা মানলে হয় পরীক্ষা করাই ত্যাগ করতে হবে, না হয় বুদ্ধির উন্মেষের লক্ষণ পাওয়ার আগেই তার ধন-মাল তার নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

ব্যবসায় ও কায়-কারবারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি ছোট বয়সের লোককে দেয়া যে জায়েয, তা কয়েকটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। তা হল নবী করীম (স) উমর ইবনে আবূ সালমাকে— যখন তিনি ছোট বয়সের ছিলেন— উম্মে সালমা (রা)-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেয়ার আদেশ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত— তিনি সালমা ইবনে আবূ সালমাকে সেই কাজের জন্যে আদেশ করেছিলেন, অথচ তিনি তখন ছোট বয়সের ছিলেন। এতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়ের যে কাজ অন্যরা করেছে তাকে সেরূপ কায়-কারবারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। পিতা তার ছোট বয়সের পুত্রকে উকীল বানায় ক্রীতদাস ক্রয়ের বা তাকে বিক্রয় করার জন্যে। এটাই তো অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়ে ও কায়-কারবারে তাকে অনুমতি দানের। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ইয়াতীমদের যাচাই করতে থাক' এর অর্থ যারা গ্রহণ করেছে শুধু তাদের বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের দিকটির যাচাই করা, তাদের এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে কথা হচ্ছে মালিকের নিকট তার ধন-মাল প্রত্যর্পণে দ্বীন পালনের ব্যাপারটির পরীক্ষা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা ওয়াজিব-ও নয়। কেননা কোনব্যক্তি যদি ফাসিক হয়, তবুও সে তার ব্যাপারাদির নিয়ন্ত্রণক্ষম ও ব্যবসায়— কায়-কারবারে হস্তক্ষেপ করতে জ্ঞানবান হয়, তাহলে শুধু তার ফাসিকীর কারণে তার ধন-মাল ব্যবহার তাকে নিষেধ করা বা তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা কোনক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এ ব্যাপারে দ্বীন-পালনের ব্যাপারটির গুরুত্ব স্বীকার করা কর্তব্য নয়। ব্যক্তি যদি দ্বীনদার হয়, নেক আমলকারী হয়; কিন্তু তার ধন-মাল সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণে হয় অক্ষম, সে যদি তার এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপে ধোঁকাবাজির আশ্রয় লয়, তাহলে তার ধন-মাল তার নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হবে, তাতে তাকে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হবে না। বিশেষ করে তাদের মত অনুযায়ী যারা বলে যে, বুদ্ধির দুর্বলতা ও ধন-মাল সংরক্ষণে অক্ষমতা থাকলে তার উপর প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আরোপ করতে হবে। কিন্তু আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে পারলাম যে, দ্বীন পালনের দিকটি এক্ষেত্রে বিবেচ্য হওয়ার কোন দলীল নেই— কোন অর্থ নেই।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ -

শেষ পর্যন্ত যখন তারা বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ......

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও আস্-সুদ্দী বলেছেন, এ আয়াতাংশে পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির কথা— অর্থাৎ বিয়ে করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছার কথা বলা হয়েছে। শব্দটি থেকে احتلام। শব্দ গঠিত, যার অর্থ স্বপ্নে বীর্যস্খলন।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -

যদি তোমরা তার বুদ্ধিমত্তা বিচেনার লক্ষণ দেখ .....

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তোমরা যদি জানতে পার যে, তারা এ বুদ্ধিমত্তা লাভ করেছে— তাদের মধ্যে বুদ্ধি-ব্যবস্থার যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটেছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, الايناس শব্দের অর্থ— অনুভব করতে পারা, বুঝতে পারা। খলীল থেকে একথা বর্ণিত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اِنِّیْ اٰنَسْتُ نَارًا —আমি আগুন লক্ষ্য করতে পেরেছি। অর্থাৎ আমি আগুন অনুভব করেছি ও তা দেখেছি, এখানে ব্যবহৃত رشد শব্দের তাৎপর্যে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও আস্-সুদ্দী বলেছেন ঃ জ্ঞান-বুদ্ধির সুস্থতা-পরিপক্কতা। ধন-মাল সংরক্ষণের যোগ্যতা। আল-হাসান ও কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের সুস্থতা পরিপক্কতা। ইবরাহীম নখয়ী মুজাহিদ বলেছেন— জ্ঞান-বুদ্ধি। সামাক ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ 'যদি তোমরা তাদের থেকে বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় পাও'-এর অর্থ, তাদের পূর্ণবয়স্কতা, বিবেক-বুদ্ধি ও মান-মর্যাদাবোধ লক্ষ্য কর।

আবূ বকর বলেছেন ঃ الرشد। নামটি বিবেক-বুদ্ধি পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়— যেমন এরূপ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাদাতা দিয়েছেন, আর জানা-ই আছে যে, আল্লাহ্ এই رشد-এর শর্ত আরোপ করেছেন— অবশ্য সর্বপ্রকারের رشد-এর শর্ত করেন নি, তখন এর বাহ্যিক অর্থের দাবি হল, তাকে এই গুণের অধিকারী হতে হবে বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে, তাহলে তা তার নিকট তার ধন-মাল প্রত্যর্পণের কারণ হবে এবং তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপের নিরোধ হবে। এদিক দিয়েই পূর্ণ বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উপর তার ধন-মাল ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হওয়ার মত বাতিল হওয়া প্রমাণিত হবে। আর এ মত হচ্ছে ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন ও আবূ হানীফার। সূরা আল-বাকারায় আমরা এ পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলে এসেছি।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ -

তখন তাদের ধন-মাল তাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর।

এ কথার দাবি হচ্ছে, পূর্ণবয়স্কতা লাভ ও তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার স্ফুরণ হওয়ার পর তাদের ধন-মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব— যেমন পূর্বে বলে এসেছি।

এ কথার দৃষ্টান্ত এ আয়াতটি ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ -

এবং ইয়াতীমদের মাল তাদের দিয়ে দাও।

এখানেও উপরোক্ত শর্ত মনে রাখতে হবে। এর তাৎপর্য হল ঃ 'এবং ইয়াতীমদিগকে তাদের ধন-মাল দিয়ে দাও যখন তারা পূর্ণবয়স্কতা পাবে ও তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ লক্ষ্য করবে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَّكْبَرُوْا -

এবং তারা বড় হয়ে পড়বে— এ ভয়ে বেহুদা খরচ ও তাড়াহুড়া করে তা তোমরা খেয়ে ফেলো না।

আয়াতের اسراف বা سرف অর্থ মুবাহ্‌র সীমালঙ্ঘন করে নিষিদ্ধের আওতায় চলে যাওয়া। তাই কখনও তা হয় কমের দিকে সীমালঙ্ঘন, আবার কখনও হয় বেশির দিকে সীমালঙ্ঘন। উভয় অবস্থায়ই বৈধ সীমালঙ্ঘন করা হয়।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وبدارا ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, আল হাসান ও আস-সুদ্দী বলেছেনঃ তাড়াহুড়া করা, কোন ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করা। আয়াতের কথা হল, ওরা বড় হয়ে ওদের ধন-মাল ওরা ফেরত চাইবে, এই ভয়ে তাদের ধন-মাল তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে। এতেই এ দলীল রয়েছে যে, ওরা যখন বড়ত্বের সীমায় পৌছে যাবে, তখন ওরা ওদের ধন-মাল ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে যখন তারা বিবেক-বুদ্ধিমান হবে, ওদের মধ্যে সৎবুদ্ধির উন্মেষের লক্ষণ দেখার শর্ত ছাড়াই। কেননা বুদ্ধির উন্মেষের শর্ত করা হয়েছে পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর। আর 'ওরা বড় হবে— এ ভয়ে ওদের ধন-মাল বেহুদা খরচ করে ও তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলো না' আল্লাহ্‌র একথা দ্বারা বোঝা গেল যে, ওরা বড়ত্বের সীমায় পৌঁছে গেলে তখন ওদের ধন-মাল আটকে রাখা জায়েয নয়। অন্যথায় এখানে বড় হওয়ার কথাটি বলার কোন মানে হয় না। কেননা তার অভিভাবকই তার বড় হওয়ার আগে ও পরে ধন-মাল পাওয়ার অধিকারী। এ কথা থেকে প্রমাণিত হল যে, সে যখন বড়ত্বের সীমায় পৌঁছে যাবে, তখন তার মাল ফেরত পাওয়ার সে অধিকারী হবে। ইমাম আবূ হানীফা এ বড়ত্ব লাভের সীমা নির্দিষ্ট করেছেন পঁচিশ বছর। কেননা এ বয়সেই সে পরিপক্ক হতে পারে। আর পরিপক্ক হবে অথচ সে বড়ত্বের সীমায় পৌছবে না— তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ইয়াতীমের মাল থেকে তার অভিভাবকের খোরাক-পোশাক দান

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

যে লোক ধনী— সচ্ছল হবে, সে পবিত্রতার নীতি অবলম্বন করবে। আর যে হবে দরিদ্র, সে প্রচলিত শুভ নিয়মে আহার করবে।

আবূ বকর আল-জাস্‌সাস বলেছেন— এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আগেরকালের মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। মামার জুহরী আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন— এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট এলো, বলল— আমার ক্রোড়ে কয়েকজন ইয়াতীম লালিত হচ্ছে, তাদের ধন-মাল আছে। লোকটি সেই ধন-মাল থেকে কিছু গ্রহণের অনুমতি তাঁর নিকট চাচ্ছিল। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তুমি না তাদের অভাব মোচন কর ? বলল, হ্যাঁ। বললেন, তুমি না তাদের হারিয়ে যাওয়া পশু খোঁজ কর ? বলল হ্যাঁ। বললেন ঃ তুমি না

ওদের শূন্য পাত্র ভরপুর কর ? বলল— হ্যাঁ। বললেন ঃ তার ফিরে আসার দিন তুমি না সন্তুষ্ট হও ? বলল ঃ হ্যাঁ। তখন বললেন ঃ তুমি তার দুগ্ধ পানি কর দুধ দোহনে বাড়াবড়ি না করে এবং বংশধারার ক্ষতিকারী না হয়।

শায়বানী ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

الوصى اذا احتاج وَضَعَ يده مع أيديهم ولا يكتسى عمامة -

অসী যখন ঠেকে যাবে, তখন তাদের হাতসমূহের সাথে তার নিজের হাতও রাখবে। তবে পাগড়ী পড়বে না।

প্রথমোক্ত হাদীসে ইয়াতীমের মাল-সম্পদ নিয়ে কাজ করাকে শর্ত করা হয়েছে তা থেকে খাদ্য গ্রহণ মুবাহ হওয়ার। অবশ্য ইকরামা বর্ণিত হাদীসে সে শর্তের উল্লেখ হয়নি।

ইবনে লাহ্‌ইয়াতা ইয়াযীদ ইবনে আবূ হাবীব আবুল খায়ের মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইয়াজানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন— রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবী কিছু সংখ্যক আনসার লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ্‌র "যে ধনী সচ্ছল হবে, সে যেন পবিত্রতা গ্রহণ করে আর যে ফকীর হবে সে প্রচলিত নিয়মে খাবার খায়" কথাটির তাৎপর্য কি ? জবাবে তাঁরা বললেন— আয়াতটি আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে অসী যদি ইয়াতীমের বাগানে কাজ করে, তাহলে তার হাত তাদের হাতের সাথে মিলিত হবে।

এই হাদীসটির সনদে ক্রটি আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হাদীসটির সনদ এদিক দিয়েও নষ্ট যে, অসীর শ্রমের বদলে ইয়াতীমের মাল থেকে খাওয়া যদি মুবাহ হয় তাহলে সেদিক দিয়ে ধনী ও গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। এ থেকে বুঝলাম যে, উক্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাহারযোগ্য। ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী খাওয়া মুবাহ, তা থেকে পাগড়ী ব্যবহার করা ছাড়া। খাওয়ার অধিকার যদি শ্রমের কারণে হয়ে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে খাদ্য ও পরিধেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হতো না। আলোচ্য আয়াতটির এ হচ্ছে এক ধরনের ব্যাখ্যা। তা হল তা থেকে কেবল খাদ্য গ্রহণ করবে যদি সে ইয়াতীমের জন্যে কাজ করে। অন্যরা বলেছেন— ইয়াতীমের মাল থেকে করয নেবে, পরে তা শোধ করে দেবে।

শরীফ আবূ ইসহাক হারিসা ইবনে মদরার উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন— তিনি বলেছেন ঃ

اِنِّىْ اَنْزَلْتُ مَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنِّىْ بِمُنْزِلَةِ مَالَ الْيَتِيْمِ اِنِ اسْتَغْنَيْتُ اِسْتَعْفَفْتُ وَاِنْ افْتَقَرْتُ اَكَلْتُ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَضَيْتُ -

আমি আল্লাহ্‌র ধন-মালকে আমার দিক থেকে ইয়াতীমের পর্যায়ে ধরে নিয়েছি। আমি যদি সচ্ছল হই, তাহলে তা থেকে কিছু গ্রহণ করা থেকে আমি পবিত্র থাকব। আর যদি দরিদ্র হই, তাহলে শুভ প্রচলন অনুযায়ী খাব।

উবায়দাতুস সালমানী সাঈদ ইবনে যুবাইর আবুল আলীয়া আবূ অয়েল ও মুজাহিদও অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা) করয নিতেন পরে তা শোধ করে দিতেন যখন

পারতেন আর তৃতীয় কথা আল-হাসান ইবরাহীম আতা ইবনে আবূ রিবাহ ও মকহুল থেকে বর্ণিত। তিনি বায়তুলমাল থেকে সেই পরিমাণ গ্রহণ করতেন, যার দ্বারা ক্ষুধা মিটে এবং লজ্জাস্থান আবৃত করা যায়। পরে সামর্থ্য পেলে তিনি তা ফেরত দিতেন না। আর চতুর্থ কথা শবী থেকে বর্ণিত। তা হল তা মরা লাশের পর্যায়ে গণ্য। কঠিনভাবে ঠেকে গেলে তা থেকে গ্রহণ করতেন। পরে যখন সম্ভব হতো ফিরিয়ে দিতেন। আর সচ্ছলতা না হলে সে গ্রহণ হালালের মধ্যে। পঞ্চম কথা মাকসাম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত ঃ فَلْيَسْتَعْفِفْ অর্থ بغنا، । সচ্ছলতা। আর যে দরিদ্র হতো, সে যেন শুভ প্রচলিত নিয়মে আহার করে— এর অর্থ বলেছেন সে যেন নিজের জন্যে সে ধন-মাল থেকে খরচ করে এমনভাবে যে ইয়াতীমের মাল কিছুই না পৌঁছে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে আবূ সাইবাতা মিনজাব ইবনুল হারিস আবূ আমিরুল আসাদী সুফিয়ান আমাশ আল-হিকাম মাকসাম ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ অর্থের কথা বর্ণনা করেছেন। ইকরাম তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি পরে শোধ করে দিতেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াত মনসূখ হয়ে গেছে। মুজাহিদ অপর একটি বর্ণনায় বলেছেন, এর অর্থ সে যেন নিজের ধন-মাল থেকেই আহার করে শুভ প্রচলিত নিয়মে। ইয়াতীমের মাল থেকে কিছু নেয়ার সুযোগ নেই— এ কথাটি আল-হিকাম বলেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, আগেরকালের মনীষীদের এ পর্যায়ে এ সব-ই হচ্ছে বিভিন্ন মত। ইবনে আব্বাস থেকে চারটি বর্ণনা এসেছে— যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। একটি— সে যদি ইয়াতীমের পশু পালনে কাজ করে তাহলে তার দুধ সে সেবন করবে। দ্বিতীয়— যা নেবে তা সে পরে ফিরিয়ে দেবে। তৃতীয়— ইয়াতীমের ধন-মাল থেকে সে কিছুই নিজের জন্য ব্যয় করবে না। তবে তার নিজের মাল থেকে সে খাবার খাবে, যতক্ষণ না ইয়াতীমের মাল থেকে খাওয়ার মুহতাজ হয়ে পড়ে; আর চতুর্থ কথা হচ্ছে— আয়াতটি মনসূখ। হানাফী ফিকাহবিদদের যে মত আমরা জানি, তা হল, তা থেকে করয বাবদ কিছুই গ্রহণ করবে না, অন্যভাবেও নয়, সে ধনী হোক, কি গরীব। তা থেকে অন্য কেউ ঋণ দেবে না।

ইসমাঈল ইবনে সালিম মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তবে অসী ইয়াতীমের মাল থেকে ঋণ বা অন্যভাবে কিছু গ্রহণ করুক, তা আমরা একটুও পছন্দ করি না। তিনি এ পর্যায়ে কোন মতপার্থক্য থাকার কথা উল্লেখ করেন নি।

ইমাম মুহাম্মাদ কিতাবুল আ-সার-এ আবূ হানীফা— এক ব্যক্তি— ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَا يَأْكُلُ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ قَرْضًا وَلَا غَيْرَهُ -

অসী ইয়াতীমের ধন-মাল থেকে ঋণ বা অন্য কোনভাবে কিছুই নেবে না।

ইমাম আবূ হানীফার-ও এ মত। তাহাভী উল্লেখ করেছেন, আবূ হানীফার মাযহাব হল, ঠেকায় পড়লে ঋণ বাবদ নেয়া যাবে, তবে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। উমর (রা) ও তাঁর তাবেয়ী

থেকেও এরূপ মত-ই বর্ণিত হয়েছে। বশর ইবনুল অলীদ আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় ইয়াতীমের মাল থেকে কিছুই খাবে না। সেই ইয়াতীমদের ঋণ আদায়ের কাজে কিংবা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে তাদের এমন কোন কিছু রক্ষার জন্যে ঘরের বাইরে গেলে সে ইয়াতীমের মাল থেকে খরচাদি, পোশাক ও যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারে। বাহির থেকে ফিরে এসে তাকে পোশাক ও যানবাহন (যদি ক্রয় করা হয়) ইয়াতীমের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ সে যেন খায় শুভ প্রচলন অনুযায়ী— এ কথাটি মনসূখ হয়ে থাকতে পারে এ আয়াত দ্বারা ঃ

لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ -

আবূ বকর বলেছেন, এ অবস্থায় অসীকে ইমাম আবূ ইউসূফ অংশীদারিত্বের ব্যবসায়ীর মতো ধরে নিয়েছেন। সে সফরে মিলিত ব্যবসায়ের মাল থেকে খরচাদি নির্বাহ করতে পারে। ইবনে আবদুল হিকাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যার লালনাধীন ইয়াতীম রয়েছে, সে তার খরচাদি তার মাল দ্বারা সংমিশ্রিত করে চালায়। তাতে ইয়াতীম পায় তার খরচ থেকে তার অভিভাবক যা পায়, তার চাইতে বেশি। তাহলে তাতে দোষ হবে না। খরচ ইয়াতীমের বাড়তি হলে তা সংমিশ্রিত করবে না। এখানে ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

আল-মুয়াফী সওরী থেকে বলেছেন, ইয়াতীমের অভিভাবকের পক্ষে ইয়াতীমের খাবার খাওয়া জায়েয হবে। তবে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে তার ধন-মাল থেকে করয দিতে পারে। সওরী বলেছেন, অসী ইয়াতীমের মাল থেকে কোন্ জিনিসে উপকৃত হবে, তা আমার জন্যে আশ্চর্যের বিষয় নয়। অবশ্য যদি তাতে ইয়াতীমের কোন ক্ষতি না হয়। যেমন স্লেট— যাতে লেখা হয়। আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন ঃ ঠেকে গেলে অসী ইয়াতীমের মাল থেকে করয নিতে পারে। তবে পরে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। অবশ্য অসী ইয়াতীমের মাল থেকে তার কাজ ও শ্রম পরিমাণ খেতে পারে, যদি তাতে বালক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا -

এবং তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-মাল দিয়ে দাও, ভালোর বদলে খারাপ দিও না এবং তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে সংমিশ্রিত করে খেয়ে ফেলো না। এটা অত্যন্ত বড় গুনাহ।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا -

তোমরা যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ লক্ষ্য কর, তাহলে তাদের মাল তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। আর তা খুব বেশি বেহুদা খরচ করেও ওরা বড় হয়ে পড়বে— এ ভয়ে তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলো না।

এবং

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ -

তোমরা ইয়াতীমের মালের কাছেও যাবে না, তবে উত্তম পন্থায় যেতে পার। এই নীতি বহাল থাকবে যতক্ষণ না তারা পরিপক্কতায় পৌঁছায়। (সূরা আ'আম ঃ ১৫২)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا -

যারা ইয়াতীমের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করে ..... (সূরা নিসা ঃ ১০)

বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ -

এবং ইয়াতীমের জন্যে তোমরা ন্যায়পরতা সহকারে দাঁড়াবে। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

এবং

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের সম্মতিক্রমে যদি ব্যবসায় হয়, তবে ..... (সূরা নিসা ঃ ২৯)

এ সব কয়টি আয়াত 'মুহ্‌কাম'— সুদৃঢ়, প্রতিষ্ঠিত। এ সব কয়টি আয়াতে ইয়াতীমের মাল তার অভিভাবকের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সে ধনী হোক, কি গরীব।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

আর যে লোক গরীব হবে, সে যেন প্রচলিত শুভ নিয়মে ভক্ষণ করে।

এ আয়াতটি মুতাশাবিহ্, বহু ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতাপূর্ণ— যার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। কাজেই এ আয়াতটির ব্যাখ্যা মুহকাম আয়াতসমূহের আলোকে করাই উত্তম। আর তা হচ্ছে, যে লোক নিজের প্রচলিত শুভ নিয়মে খাবে, যেন ইয়াতীমের মালের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়,

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুতাশাবিহ্ আয়াতকে 'মুহকাম' আয়াতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার আদেশ করেছেন। এবং মুহকামের আলোকে ব্যাখ্যা না করে মুতাশাবিহ্‌র পেছনে দৌড়াতে নিষেধ করেছেন সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে বলেছেন ঃ তার শতক আয়াত মুহ্‌কাম— তাই কিতাবের মূল। আর অন্যান্য আয়াত মুতাশাবিহ। ফলে যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে ধাওয়া করে তার ব্যাখ্যা তালাস করে বেড়ায়।

যারা ইয়াতীমের মাল করয বা করয ছাড়া-ই গ্রহণ করা জায়েয বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাদের এ ব্যাখ্যা মুহ্‌কাম আয়াতের পরিপন্থী। আর যিনি ভিন্ন অর্থ বলেছেন, তিনি তার মুহকাম আয়াত ভিত্তিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন ও তার যথার্থ তাৎপর্য বলেছেন। বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সে যেন প্রচলিত শুভ নিয়মে আহার করে' এটুকু মনসূখ হয়ে গেছে। আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান ইবনে আতীয়াতা— আতীয়াতা— তাঁর পিতা— ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'যে লোক হবে দরিদ্র, সে যেন শুভ প্রচলন অনুযায়ী খায়' কথাটিকে মনসূখ করেছে তার পরবর্তী কথা ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا -

যারা ইয়াতীমের মাল জুলুম করে খায় ......

উসমান ইবনে আতা তাঁর পিতা— ইবনে আব্বাস সূত্রে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। ঈসা ইবনে উবায়দুল কুন্দী উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মুসলিম— দহাক ইবনে মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র 'যে দরিদ্র হবে, সে যেন শুভ প্রচলিত নিয়মে খায়' কথাটি মনসূখ হয়েছে 'যারা ইয়াতীমের মাল জুলুম করে খায়' দ্বারা।

যদি বলা হয়, আমর ইবনে শুয়ায়ব—তাঁর পিতা—তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন ঃ 'আমার তো ধন-মাল নেই, অথচ আমার নিকট একজন ইয়াতীম রয়েছে।' জবাবে তিনি বললেন ঃ

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَاَثِّلٍ مَالَكَ بِمَالِهِ -

তুমি তোমার লালিত ইয়াতীমের মাল থেকে আহার কর কোনরূপ বেহুদা ব্যয়কারী না হয়ে, তার মালের সাথে তোমার মাল মিশ্রণকারী না হয়ে।

আমর ইবনে দীনার আল-হাসানুল আওফী সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يَاْكُلُ وَلِيُّ الْيَتِيْمِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مِنْهُ مَالًا -

ইয়াতীমের অভিভাবক তার মাল থেকে প্রচলিত শুভ নিয়মে খাবে তার মালের সাথে সংমিশ্রণকারী না হয়ে।

জবাবে বলা যাবে, এ দুটি হাদীসের ভিত্তিতে উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা সঙ্গত হতে পারে। যেসব আয়াত ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে, তা পূর্বে আমরা উদ্ধৃত

করেছি। তা যদি সহীহ হয়, তাহলে তার ব্যাখ্যা সঙ্গতভাবেই করতে হবে। আর তা হচ্ছে, অভিভাবক ইয়াতীমের ধন-মালে অংশীদার ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করবে। পরে তার অংশের প্রাপ্য মুনাফা সে গ্রহণ করবে। আমাদের মতে এ পন্থা জায়েয। আগেরকালের মনীষীদের বহুসংখ্যক এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।

যদি বলা হয়, ইয়াতীমের মাল নিয়ে মুজারিবাতের নীতিতে ব্যবসায় করে যদি মুনাফা গ্রহণ জায়েয হয়, তাহলে ইয়াতীমের মালে—সংসারে কায়কারবারে কাজ করে তার মাল থেকে আহার করা জায়েয হবে না কেন ? যেমন ইবনে আব্বাস বর্ণিত বহু কয়টি বর্ণনার একটিতে বলা হয়েছে—তাতে বলা হয়েছে, সে যখন উটের পাল তাড়িয়ে নেয়, হারিয়ে যাওয়া উট খোঁজ করে আনে, তার জন্যে পানির পাত্র কানায় কানায় ভর্তি করে রাখে, তখন তার দুগ্ধ পান করা তার জন্যে জায়েয, তার বংশের কোনরূপ ক্ষতি না করে, দুধের ওলান নিঃশেষ ও শূন্য না করে। আরও যেমন হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, অসী যদি ইয়াতীমের খেজুর বাগানে কাজ করে, তাহলে তার হাত তাদের হাতের সাথে মিলিত হবে।

জবাবে বলা যাবে, যেহেতু অসী হয় ইয়াতীমের উট পালনে সাহায্য অথবা তার বাগানের কাজ— এ দুটির যে কোন একটি করবে, সেহেতু তখন হয় সে তার কাজের জন্য মজুরি বাবদ গ্রহণ করবে অথবা মজুরি হিসেব ছাড়াই গ্রহণ করবে— কাজের বিনিময়রূপে। যদি সে তা পারিশ্রমিক বা মজুরি হিসেবে নেয়, তাহলে তা চারটি কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। একটি— যাঁরা এ মজুরি গ্রহণ মুবাহ বলেছেন, তাঁরা মুবাহ বলেছেন অসী যদি দরিদ্র হয়, তাহলে। কেননা ধনীর জন্যে তা যে জায়েয নয়, তা সর্ববাদীসম্মত। আর কুরআনের অকাট্য দলীল থেকেও তা-ই প্রমাণিত। তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ 'যে লোক হবে ধনী-সচ্ছল, সে যেন পবিত্রতার নীতি গ্রহণ করে'— অর্থাৎ কিছুই গ্রহণ না করে। কিন্তু শ্রমের মজুরির ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। তাই মজুরি হিসেবে কিছু গ্রহণ করার প্রশ্ন অবান্তর। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে— অসী নিজে থেকে ইয়াতীমের কাজের মজুর হবে ও মজুরি নেবে, তা-ও জায়েয নয়। তৃতীয়— যারা মজুরি গ্রহণ মুবাহ বলেছেন তাঁরা তাতে কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণের শর্ত করেন নি। আর নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি ছাড়া ইজারা সহীহ হতে পারে না। আর চতুর্থ দিক হচ্ছে যাঁরা তা মুবাহ বলেছেন, তাঁরা তাকে মজুরি বলেন নি। তাই তার মজুরি হওয়া বাতিল। আর তা অংশীদারিত্বের 'মুজারিবা' ব্যবসায়ের মত কাজ-ও নয়। তাই ইয়াতীমের দায়িত্ব পালনে মুনাফার— যা ইয়াতীমের মাল থেকে পাওয়ার অধিকারী হবে— তা কখনই ইয়াতীমের মাল নয়। যেমন মূলধন— মালিক ব্যবসায়ের কাজ যে করে তার সাথে মুনাফা দেয়ার যে শর্ত করে, তা তো সেই মূলধন-মালিকের মাল নয়। মূলধন-মালিকের মাল দেয়া যদি মুজারিব ব্যবসায়ীর জন্যে শর্ত করা হয়, তার ব্যবসায় কাজ লব্ধ থেকে দেয়ার শর্ত না হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব তার উপর বর্তিবে, যেমন সেই মজুরি যা মুলধন-মালিকের মাল থেকে মজুরের কাজের বিনিময়ে দেয়া হয়, তা ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব মূলধন-মালিক— যে মজুর রাখে— এর উপর বর্তায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে মুজারিবের জন্যে যে মুনাফা দেয়া শর্ত, তার ক্ষতিপূরণ মূলধন-মালিকের দেয়, তখন প্রমাণিত হল যে, মুনাফাটা মূলধন-মালিকের মালিকানা নয়। তা মুজারিবের মালিকানায় বৃদ্ধি পাওয়া ও

উৎপন্ন সম্পদ মাত্র। এর আর একটা প্রমাণ হল, রোগী ব্যক্তি যদি তার মাল মুজারিবকে মূলধন দেয়, আর তার জন্যে মুনাফার দশ ভাগের নয় ভাগ দেয়ার শর্ত করে, তা সমপরিমাণ মুনাফার অনেক বেশি— তাহলে তা জায়েয হবে। মুজারিবকে যা দেয়ার শর্ত করা হয়েছে তা তো সেই মূলধন-মালিক রোগী ব্যক্তির মাল থেকে দেয়া হয় না, যদি সে তার এ রোগে মারা যায়। তা এ রকমেরও নয় যে, সমপরিমাণ মজুরির অনেক বেশী দেয়ার শর্তে তাকে মজুর নিয়োগ করা হয়েছে। তাহলে তা এক-তৃতীয়াংশ থেকে হবে। প্রমাণিত হল যে, তা ব্যবসায়ের মুনাফা গ্রহণ ইয়াতীমের মাল থেকে হল না।

যদি বলা হয়, অসী এ ব্যাপারে অন্যান্য সব কর্মচারীর মত হতে পারে না কেন? যেমন বিচার করা ? যারা কাজ করে ও মুসলামনদের জন্যে করা তাদের কাজের বিনিময়ে রিযিক—বেতন-ভাতা পেয়ে থাকে ? অসী-ও তেমনি ইয়াতীমের জন্য কাজ করবে ও তার কাজ অনুপাতে সে তার মাল থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবে? তা জায়েয হবে না কেন ?

জবাবে বলা যাবে, অসী যদি ধনী-সচ্ছল হল, তাহলে ইয়াতীমের জন্যে কাজ করে তার মাল থেকে কিছু গ্রহণ করা যে জায়েয নয়, এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত। এতে কোন মতদ্বৈততা নেই। কুরআনের আয়াতই তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ 'যে লোক ধনী— সচ্ছল হবে, সে কিছুই গ্রহণ করবে না।' তা সত্ত্বেও বিচারক ও কর্মচারীদের জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় রিযিক গ্রহণ— ধনী হওয়া সত্ত্বেও— জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা নেই। এক্ষণে ইয়াতীমের অভিভাবক যদি তার মাল থেকে যা গ্রহণ করবে তা বিচারক ও কর্মচারীদের রিযিক গ্রহণের মত হয়, তাহলে তা তার জন্যে গ্রহণ করা জায়েয, ধনী হলেও। এ থেকে প্রমাণিত হল— ইয়াতীমের অভিভাবক তার মাল থেকে কিছু পাওয়ার অধিকারী নয়, বিচারকের পক্ষেও ইয়াতীমের মাল থেকে কিছু গ্রহণ জায়েয নয়— অথচ ইয়াতীমের ব্যাপারাদির দায়িত্ব পালন তারই নিকট অর্পিত। এ থেকে প্রমাণিত হল, যে সব লোকের অভিভাবকত্ব রয়েছে ইয়াতীমের উপর, তাদের পক্ষে ইয়াতীমের মাল থেকে কিছু গ্রহণ জায়েয হবে না— না করয হিসেবে, না অন্যভাবে। যেমন বিচারক ধনী হোক বা গরীব— তা গ্রহণ করতে পারে না।

যদি বলা হয়, বিচারক ও কর্মচারীর রিযিক গ্রহণ এবং ইয়াতীমের অভিভাবকের ইয়াতীমের মাল থেকে যথেষ্ট হয়— এমন পরিমাণ গ্রহণের মধ্যে কি পার্থক্য হতে পারে ?

জবাবে বলা যাবে, রিযিক তো কোন মজুরি নয়। তা এমন জিনিস, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। মুসলমানদের সামষ্টিক কাজের দায়িত্ব যে-ই পালন করবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে এ রিযিক প্রাপ্তির অধিকার স্বীকার করেছেন। ফিকাহবিদগণের জন্যে রিযিক গ্রহণও জায়েয। মজুরি গ্রহণ জায়েয— এমন কোন কাজ-ই তাঁরা করেন নি। কেননা তাঁদের ফতোয়া দানে মশ্গুল থাকা ও লোকদেরকে ফিকাহ-অবহিত বানানো দ্বীনি ফরয। আর ফরয পালনের বিনিময়ে কোন মজুরি গ্রহণ করা কখনই জায়েয হতে পারে না। যোদ্ধারা এবং তাদের সন্তানরা যে রিযিক পায়, তা কোন মজুরি নয়। খলীফা— রাষ্ট্র পরিচালকের জন্যেও এ নিয়ম। [একটা হল কাজ অনুপাতে মজুরি। আর একটা হল Subsistance জীবিকা নির্বাহ বা

অস্তিত্ব রক্ষা ও বেঁচে থাকার উপকরণ— অনুবাদক] নবী করীম (স)-এর জন্য খুমুস ও ফাই থেকে এবং গনীমত থেকে— যখন যুদ্ধ হতো— অংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছিল। তিনি কোন কাজের মজুরি গ্রহণ করতেন— তিনি যে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করতেন তার বিনিময় নিতেন, এমন কথা বলা কারোর জন্যই জায়েয হতে পারে না। আর তা কি করেই বা জায়েয হতে পারে ? আল্লাহ্ তো বলে-ই দিয়েছেন ঃ

قُلْ مَآ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -

এ কাজের জন্যে আমি তোমাদের নিকট কোন মজুরির প্রার্থী নই। আর আমি তো কৃত্রিমতাকারী নই। (সূরা সায়াদ ঃ ৮৬)

وَقُلْ لَّآ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

আর বল, আমি তোমাদের নিকট এ কাজের জন্য কোন মজুরি দাবি করি না, আমি চাই শুধু নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা। (সূরা শুরা ঃ ২৩)

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, রিযিক কোনক্রমেই মজুরি নয় (Subsistance কখনও wages নয়) এ কথার আরও একটি প্রমাণ হল— ফকীর-মিসকীন ও ইয়াতীমের অধিকার রয়েছে বায়তুল মালে। কিন্তু তা তারা কোন কাজের— কোন কিছুরই বিনিময়ে— গ্রহণ করে না। কাজেই বিচারক ও সরকারী কর্মচারী এবং দ্বীনি ব্যাপারাদিতে কাজ করে মজুরি গ্রহণ আদৌ জায়েয নয়। শুধু তা-ই নয়, বিচারক— কাযী, সরকারী কর্মচারীদের হাদিয়া-তোহ্ফা গ্রহণও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-কে اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ 'ঘুষখোর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ওরা শুধু কি ঘুষখোর ? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ না, ওটা সম্পূর্ণ কুফরী। আর তা হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের হাদিয়া-তোহ্ফা গ্রহণ। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

هَدَايَا الْاُمَرَاءِ غُلُوْلٌ -

(সরকারী) কর্মচারীদের দেয়া হাদিয়া-তোহ্ফা সোজাসুজি বিশ্বাসঘাতকতা।

বস্তুত বিচারক বিচার কার্যের কোন কিছুর জন্যে কোন মজুরি গ্রহণ করতে পারবে না, তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হাদীয়া-তোহ্ফা গ্রহণও তার জন্যে সম্পূর্ণ হারাম। আগের মনীষীরা কুরআনের اَلسُّحْتَ বলতে এ জিনিসই বুঝেছেন। ইয়াতীমের অভিভাবক ইয়াতীমের ধন-মাল থেকে যা-ই গ্রহণ করবে, তা হয় মজুরি হবে অথবা তা হবে বিচারক ও কর্মচারীদের ন্যায় রিযিক (Subsistance) গ্রহণ করবে। আর জানা-ই আছে যে, মজুরি হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট কাজের নির্দিষ্ট মিয়াদের নির্দিষ্ট পরিমাণের। সে জন্যে পূর্ব থেকেই একটা চুক্তি ও কথা-বার্তা স্থিরীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে ধনী-গরীব সম্পূর্ণ সমান। আর ইয়াতীমের মাল থেকে করয হিসেবে গ্রহণ যে জায়েয বলে অথবা করয ছাড়া অন্য কোনভাবে, তা কখনই মজুরি হয় না। তার কারণ আমরা আগেই বলেছি। আর কুরআনের ঘোষণায় ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্যের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, তাদের নিকট সে কথাও স্পষ্ট। অতএব প্রমাণিত হল যে, তা

মজুরি নয়। আর বিচারক যেমন রিযিক গ্রহণ করে, সে রকম গ্রহণ করাও জায়েয নয়। কেননা বিচারকদের মধ্যেও ধনী গরীবের অবস্থা এক ও অভিন্ন। যে রিযিক তারা গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে। যারা তা গ্রহণ করা জায়েয বলে ইয়াতীমের মাল থেকে, তাতে ধনী-গরীবের পার্থক্য বিদ্যমান। আর রিযিক যেহেতু মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে দেয়া বাধ্যতামূলক, ঢ়নগণের মধ্যে থেকে কোন একজনের ধন-মাল থেকে তা দেয়া হয় না। তাই ইয়াতীমের অভিভাবক যা ইয়াতীমের মাল থেকে গ্রহণ করে তা বিচারক ও শ্রমিক-কর্মচারী যা গন্দহণ করে— এ দুটি যারা এক ও অভিন্ন মনে করে তারা খর্ত্তব্য সম্পর্কে অনবহিত।

খায়বরের যুদ্ধের গনীমতের মাল সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) যা বলেছিলেন, তা-ও আমাদের উপরোক্ত কথার একটা দলীল। তিনি বলেছিলেন ঃ

لَايُحِلُّ لِى مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هٰذِهٖ يَعْنِىْ وَبَرَةً اَخَذَهَا مِنْ بَعِيْرِهٖ اِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে 'ফাই' সম্পদ দেন— যেমন একটা উটের চুল যদি আমি এর উট থেকে নেই— আমার জন্য হালাল নয়। তবে এক-পঞ্চমাংশ। আর এক-পঞ্চমাংশ তোমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাই নবী করীম (স) যেমন মুসলমানদের নেতা ও ধন-মালের মুতাওয়াল্লী ছিলেন অসী— ইয়াতীমের অভিভাবকও ইয়াতীমের ধন-মালের মুতাওয়াল্লী, তাকেও সেরূপ হতে হবে আরও অধিকভাবে।

উপরন্তু অসী মৃতের অসীয়তে নেক কাজ হিসেবে কোনরূপ মজুরি ছাড়াই নিযুক্ত হয়, তাই তাকে কোন মজুরি দেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর করয হিসেবে কিছু নেয়া-ও তার জন্যে জায়েয নয়, অন্য কোনভাবেও নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ -

অতঃপর তোমরা যখন তাদের মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে, তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখ।

আবূ বকর বলেছেন, ইয়াতীমের পর্যায়ে যেসব আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই এক সাথে প্রমাণ করে যে, ইয়াতীমদের জন্যে এই ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক যে, অন্য কেউ তাদের মুতাওয়াল্লী বা অভিভাবক হবে তাদের ধন-মাল রক্ষণাবেক্ষণ ও তার ব্যবস্থাপনা পরিচালনের জন্যে, যার ফায়দা ও কল্যাণ তারা লাভ করবে। তারাই হচ্ছে মৃত পিতার অসী, অথবা পিতার না থাকা অবস্থায় দাদার অসী। কিংবা একজন আমানতদার, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও সুবিচারক। অসীগণকেও তা-ই হতে হবে— এ শর্ত আরোপিত হয়েছে। আর দাদা বা বাবা, আর অন্য যে-ই ছোট বয়সের লোকের ধন-মালের ব্যবস্থাপনা করবে, সে ন্যায়পরায়ণ সুবিচারক আমানতদার হবে, তার উপর অভিভাবকত্ব কেউ পেতে পারবে না এরূপ গুণের অধিকারী হওয়া ছাড়া। যারা ফাসিক, খারাপ কাজের দোষে দোষী, অভিযুক্ত, ঘুষখোর শাসক এবং অ-বিশ্বস্ত ও

অ-নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি— এদের কেউই ছোট বয়সের লোকের ধন-মালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল অসী বা মুতাওয়াল্লী অথবা অভিভাবক হতে পারে না। এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন বলে আমাদের জানা নেই। যেমন বিচারক যদি ফাসিক হয়, ঘুষখোর হয়, লালসার দাসানুদাস হয় এবং আইন-বিধান অমান্যকারী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই পদচ্যুত হতে হবে, তার বিচারকার্য করা একেবারেই নাজায়েয। অনুরূপভাবে যে বিচারক বা অসী কিংবা আমানতদার অথবা শাসক যে-ই ইয়াতীমদের ধন-মালের আমানতদার হবে তাঁর অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কেবলমাত্র এই শর্তের ভিত্তিতে যে, সে নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, সহীহ আমানতদার লোক। অন্যথায় তার অভিভাবকত্ব চলবে না, কার্যকরও হবে না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করেছেন পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর ইয়াতীমদের ধন-মাল তাদের হাতে ফেরত দেয়ার সময় সাক্ষী রাখতে। এ পর্যায়ে কয়েক ধরনের নির্দেশ রয়েছে। একটি হচ্ছে, ইয়াতীম ও তার অভিভাবক— প্রত্যেকেরই পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা সে মাল হস্তগত করেছে— এর অকাট্য প্রমাণ দাঁড়িয়ে থাকলে অতঃপর আর সে যা তার নয় তা পাওয়ার জন্য কোন দাবি করতে পারবে না— তা থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে বাধ্য হবে। আর অসীর নিরাপত্তাও তাতে নিহিত। কেননা সাক্ষী থাকলে সে ইয়াতীমের মাল ফেরত দেয়নি এরূপ দাবি তার উপর দায়ের হতে পারবে না। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে আল্লাহ সাক্ষী রাখতে আদেশ করেছেন, এ-ও তেমনি। তা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সন্দেহ নেই। সাক্ষী রাখতে বলার আর একটি কারণ হল, তা তার আমানতদারীর প্রমাণ হবে, সে ইয়াতীমদের মাল আত্মসাত করেনি— তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। যেমন নবী করীম (স) পড়ে পাওয়া মাল দেয়ার সময়ে তার সাক্ষী রাখতে বলেছেন আয়ায ইবনে হাম্মাদ আল-মুজাশেয়ী বর্ণিত হাদীসে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَىْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ -

যে লোক কোন পড়া মাল পাবে, সে যেন ন্যায়পর সাক্ষী রাখে এবং তা গোপনও না করে, গায়েব করেও না ফেলে।

এ সাক্ষী রাখতে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার নিজের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী প্রকাশ করার জন্যে এবং তার উপর কোনরূপ দোষারোপের সম্ভাবনাকে খতম করার উদ্দেশ্যে মাত্র।

ইয়াতীমের মাল তার নিকট ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অসীকে সত্য মানা

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও আল-হাসান ইবনে জিয়াদ বলেছেন ঃ অসী যদি ইয়াতীমদের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর দাবি করে যে, সে ইয়াতীমের ধন-মাল— যা তার হাতে ছিল— সব তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাহলে তাকে সত্য মানতে হবে, তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে হবে। অনুরূপভাবে অসী যদি বলে যে, আমি ইয়াতীমের ছোট বয়স কালে তার ধন-সম্পদ যা ছিল তা তার জন্যে ব্যয় করেছি, তাহলে এ ধরনের ব্যয়ের কথা সত্য বলেই মানতে হবে। তেমনি যদি বলে— ধন-মাল যা ছিল সব ধ্বংস হয়ে গেছে, তবুও

বিশ্বাস করতে হবে। সুফিয়ান সওরী বলেছেন— ইমাম মালিক বলেছেন, অসী ইয়াতীমের সব মাল তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে— তার এ কথা সত্য বলে মানা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীও এ মত দিয়েছেন।

এর কারণ স্বরূপ বলেছেন, কেননা যে লোক ধারণা করেছে যে, সে ইয়াতীমের মাল তাকে দিয়েছে, সে সেই ব্যক্তি নয় যার নিকট তা আমানত রাখা হয়েছিল। যেমন অন্য লোকের নিকট মাল দিয়ে দেয়ার জন্যে নিযুক্ত উকীল। তাই তার কথা অকাট্য প্রমাণ ছাড়া সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না, যেহেতু আল্লাহ্ আগেই বলে দিয়েছেন ঃ

فَاذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَا لَهُمْ فَاشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ -

তোমরা যখন তাদের নিকট তাদের মাল ফিরিয়ে দেবে, তখন তোমরা তাদের উপর সাক্ষী রাখ।

আবূ বকর বলেছেন, সাক্ষী রাখতে বলার অর্থ এই নয় যে, সে আমানতদার ও বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং সে যা বলছে তাতে সে সত্যবাদী নয়। কেননা আমানতের ব্যাপারটাই এমন যে, তার লেন-দেনে সাক্ষী রাখা খুবই পছন্দনীয় কাজ। ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারাদিতে যেমন সে। যে কোন ধরনের গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে আমানতের জিনিস ফেরত দেয়া কালে সাক্ষী রাখা খুবই সহীহ্ কাজ।

যদি বলা হয়— ধন-মাল ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অসীর কথাকে যদি সত্য মেনে নিতে হয়, তাহলে সাক্ষী রাখার প্রয়োজন থাকে কোথায়, যখন কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই তার কথাকে মেনে নিতে হবে ?

জবাবে বলা যাবে, আমরা পূর্বেই বলেছি, অসীর আমানতদারী প্রকাশ করা এবং তার উপর কোন দোষারোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সতর্কতাবলম্বন সম্ভব হয় সাক্ষী রাখার মাধ্যমে। সাক্ষী থাকলে তার উপর এ দাবি কখনই দায়ের হতে পারবে না যে, সে ইয়াতীমের ধন-মাল ফেরত দেয়নি। কেননা ফেরত দেয়ার পরও কোন দাবি বা অভিযোগ উঠলে সাক্ষী দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাবে যে, দাবি বা অভিযোগ ঠিক নয়। স্বয়ং ইয়াতীমের জন্যেও তাতে সতর্কতার কারণ ঘটবে, সে তেমন কোন দাবি উত্থাপন করতে কখনই দুঃসাহসী হবে না। তা ছাড়া কখনও তেমন দাবি উঠলে অসীর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে তাকে 'কসম' করতে হবে না, সে সহজেই সাক্ষী পেশ করে দিতে পারবে। যদি সাক্ষী রাখা না হয়, আর ইয়াতীম দাবি তুলল যে, তার মাল ফেরত দেয়া হয়নি, তখন অসীর কথা মেনে নেয়া হবে যদি সে 'কসম' করে বলে। কিন্তু সাক্ষী রাখা হলে তার সত্যতা প্রমাণের জন্যে 'কসম' খেতে হবে না তাকে। বস্তুত সাক্ষী রাখায় এ সব তাৎপর্যই নিহিত রয়েছে, যদি তার হাতে আমানত থেকেও থাকে।

সাক্ষী ছাড়াই অসীর কথা সত্য মানা হবে— তার প্রমাণ হল সকল ফিকাহবিদের ঐকমত্য। অসী যে তার নিকট রক্ষিত আমানত সংরক্ষণে আদিষ্ট, আমানত হিসেবেই সে তার সংরক্ষণ

করবে এবং শেষ কালে যথাসময়ে সে ইয়াতীমের নিকট ফিরিয়ে দেবে, এটাই তার দায়িত্ব। এই অবস্থা সাধারণ আমানতদারী ও অংশীদারী ব্যবসায়ের মতই। এগুলো যেভাবে সম্পাদিত হয়, এটাও তেমনি হবে।

এই কারণে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অসীর কথাকেই সত্য মানতে হবে— আমানত ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যেমন করে আমানতদারের কথাকেই সত্য মানা হয়। এটাও যে একটি আমানত, তার প্রমাণ এই যে, অসী যদি বলে যে, ইয়াতীমের সব ধন-মাল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং স্বয়ং ইয়াতীম তার সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে তাকে বাধ্য করা হবে না। যেমন আমানত রক্ষক আমানতের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বললে তা-ই মানতে হয় এবং তাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে বলা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী অবশ্য বলেছেন— ইয়াতীমরা তাদের নিকট আমানত রাখেনি বলে তাদের কথাকে সত্য মানা যাবে না। কিন্তু এই কথাটি বাহ্যতই বিপর্যয়কর। তার মধ্যে শরীয়াত বুঝের তাৎপর্য নিহিত নেই। বরং একথা ত্রুটিপূর্ণ— অসংলগ্ন। কেননা অসীকে সত্য না মানার যে কারণ বলা হয়েছে তা যদি বাস্তবিকই কারণ বলে ধরা হয়, তাহলে তো রিচারককেও সত্য মানা যায় না, যদি সে ইয়াতীমকে বলে যে— আমি তোমার মাল ফেরত দিয়েছি। কেননা তার নিকট তো আমানত রাখা হয়নি। এই রূপ কথা পিতা সম্পর্কেও বলা যেতে পারে যদি ছোট বয়সের পুত্রের পূর্নবয়স্ক হওয়ার পর পিতা তাকে বলে যে, তোমার মাল তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তখন পিতাকেও সত্য মানা যায় না। কেননা পুত্র তার নিকট আমানত রাখেনি। পুত্রের পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পর তার ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পিতা পুত্র উভয় পরস্পকে সত্য মানে, তবুও পিতাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে হয়। কেননা তার নিকট আমানত না রাখা সত্ত্বেও সে তার মালকে আটকে রেখেছে। অন্য কারুর নিকট মাল দেয়াকে উকীলের সাথে সাদৃশ্য দেখানো এখানে খাটে না। কেননা একটি অপরটি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

তবে আমরা যে দিক দিয়ে অসীকে সত্য মানি, সে দিক দিয়ে দুটি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেননা উকীলকে তার নিজের নির্দোষিতায় সত্য মানতে হয়। তার উপরও ক্ষতিপূরণ চাপানো যায় না। যে লোক ইয়াতীমের নিকট মাল ফিরিয়ে দিতে সরাসরি আদিষ্ট, তার নির্দোষিতার ব্যাপারে তার কথা কবুল করা হয় না। অথচ তাকে সত্য মানতে হয়। যেমন ইয়াতীমের পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পর তাকে মাল ফেরত দেয়া সম্পর্কে আমরা অসীকে সত্য মেনে নিয়েছি।

উপরন্তু অসী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে তার অনুমতিক্রমে তার উপর হস্তক্ষেপ ও কর্ম পরিচালনা করে। ক্রয়-বিক্রয়ে তার এ পরিচালনা কার্যকর হয়। যেমন তার পিতার হস্তক্ষেপ জায়েয হয়। পিতা তার নিকট ধন-মাল আমানত রাখার ফলে অসী তা আটক ও সংরক্ষণ করে। পিতার এ অনুমতি ছোট বয়সের পুত্রের উপর পুরোপুরি কার্যকর হবে। তা তার অনুমতিক্রমে পূর্ণবয়স্কতা লাভের পরও সে তার ধারক হয়ে থাকে। ফলে সাধারণ আমানত ও এ আমানতের কোন মৌলিক পার্থক্য থাকে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَالْأَقْرَبُونَ -

পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে সে সম্পদ-সম্পত্তিতে, যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র এ কথাটি সাধারণ নিয়ম ও মোটামুটি ধরনের। সাধারণ ও ব্যাপক এ দিক দিয়ে যে, পুরুষ ও নারী সব-ই এর মধ্যে শামিল— এ কথাটি সকলের জন্যে। আর আল্লাহ্‌র কথা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রাও সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। তা পুরুষ ও নারী সকলের জন্যে মীরাস ওয়াজিব করে দেয়। তা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয় সকলের সম্পত্তিতে কার্যকর। আর তা এদিক দিয়ে যবীল আরহাম— রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের মীরাস প্রমাণ করে। কেননা ফুফু, খালা, মামা ও কন্যাদের সন্তান— এরাও যে নিকটাত্মীয় তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না! ফলে বাহ্যত এ সকলের মীরাসের অংশে থাকার কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যখন বলা হল نَصِيبٌ অংশ এটা মোটামুটি অর্থ জ্ঞাপক শব্দ। কোন বিশেষ পরিমাণ বোঝায় না। বোঝা গেল আয়াতে মোটামুটিভাবে মীরাসের কথা বলা হয়েছে। এখন এ কথাটির কার্যকরতা এর বিস্তারিত বর্ণনা না আসা পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এর দ্বারা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে শুধু মীরাস প্রমাণিত হয়, যা যবীল আরহাম রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়দেরও শামিল করে। এ কথাটি এ রকমেরই একটি কথা যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً -

তাদের ধন-মাল থেকে সাদকা যাকাত গ্রহণ কর। (সূরা তওবা ১০৩)

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ -

তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন এবং আমরা যা জমিন থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেছি, তা থেকে ব্যয় কর। (সূরা বাহারাহ ঃ ২৬৭)

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ -

এবং তোমরা তার হক তা কাটাই-মাড়াইর দিনই আদায় করে দাও।

(সূরা আন'আম ঃ ১৪১)

পূর্ববর্তী আয়াতে যে ফল-ফসলের কথা বলা হয়েছে, তার সাথে যোগ করে এই কথাটি বলা হয়েছে। বস্তুত এ কতগুলো শব্দ, যা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ এবং সেই সাথে মোটামুটি ধরনের। কাজেই তাতে যে মোটামুটি ধরনের কথা আছে তা তার সাধারণ কথার দিক দিয়ে দলীল হওয়াকে নিষেধ করে না। যখন সাধারণ অর্থবোধক শব্দের ব্যাপকতা নিয়ে আমরা বিভিন্ন মত গ্রহণ করব। এ হল বিভিন্ন প্রকারের ধন-মাল। তা আবশ্যিকভাবে থাকে। অনিবার্য

পরিমাণে বিভিন্ন মত গ্রহণকালে মোটামুটি ধরনের কথাকে যুক্তি ও দলীল হিসেবে ধরা যদি সহীহ্ না-হয়। অনুরূপভাবে মীরাস পাওনাদার ওয়ারিসদের ব্যাপারে বিভিন্ন মত হলে পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যাবে তা থেকে— এই কথার সাধারণত্ব ও ব্যাপকতাকে প্রমাণ হিসেবে ধরা যাবে। আবার প্রত্যেকের জন্যে আবশ্যিক পরিমাণে যখন বিভিন্ন মত হবে, তখন তা প্রমাণের জন্যে আমরা ভিন্ন এক বিশ্লেষণকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করব।

যদি বলা হয়, যখন বলেছেন ঃ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا নির্দিষ্ট করা অংশ, অথচ যবীল আরহাম— রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট করা অংশ নেই, তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে কিছু বলারই উদ্দেশ্য ছিল না।

এর জবাবে বলা যাবে, তুমি যার উল্লেখ করেছ, তা তাদেরকে এর হুকুম ও কার্যকরতা থেকে বাইরে ঠেলে দেয় না এবং তাদের বিষয়েও যে বলা হয়েছে, তা মনে করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা 'যবীল আরহাম'কে মীরাস দেয়ার কারণ বা অবস্থা উপস্থিত হলে তাদেরকে যা দেয়া হবে, তা তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্যেই সুনির্দিষ্ট অংশ-ই বটে। এ যেমন জানা, তেমনি তার পরিমাণও নির্দিষ্ট অংশধারী লোকদের অংশের মতই। এ দিক দিয়ে তাদের দু-শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আসলে আল্লাহ্ উক্ত আয়াতে যে কথাটি স্পষ্ট করে বলেছেন, তা হল— পুরুষ ও নারী প্রত্যেকের জন্যে সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। অবশ্য আয়াতের সে অংশের পরিমাণ বলা হয়নি। কেননা তা একটি বর্ণনার দ্বারা অনুমতিপ্রাপ্ত এবং তার জন্যে একটি পরিমাণ-ও জানা, যা পরবর্তীতে বলা হয়েছে। তা পিতামাতা, সন্তান ও অংশীদারদের কতকের অংশ কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে, কতক বলা হয়েছে হাদীসে এবং আরও কতক বলা হয়েছে ইজমায়ে উম্মত দ্বারা, আরও কতক বলা হয়েছে কিয়াস ও শুভ বিবেচনার দ্বারা। এমনিভাবে যবীল-আরহামের অংশগুলোও কতক বলা হয়েছে সুন্নাত বা হাদীস দ্বারা, কতক কুরআনের মূল দলীল দ্বারা আর কতক উম্মতের ঐকমত্যের দ্বারা ঠিক যেমন 'যবীল আরহামে'র অংশ নির্দিষ্ট করেছে কুরআনের আয়াত। কাজেই এতে যে সাধারণত্ব আছে, তা প্রত্যাহার করা জায়েয হবে না, তা দ্বারাই তাদেরকে মীরাস দেয়া আবশ্যক হবে। পরে এর দ্বারা যখন তারা মীরাস পাওয়ার অধিকারী হল, তখন সুনির্দিষ্ট অংশ পাওয়ারও অধিকারী হল। তাদের মধ্যে 'যবীল আরহামে'র মীরাস পাওয়ার কথা যাঁরা বলেন, এটা তাঁদেরই মত। তাই তাঁরা কতকে ভিন্ন ভিন্ন হলেও আবার কতকে তাঁরা একত্রিত ও একমত সম্পন্ন। আর যে বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন মত গ্রহণ করেছেন, তাতেও দলীল পেশ করা হয়েছে, যদ্দারা সে বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুমটা জানা যায়।

যদি বলা হয়— কাতাদাহ্ ও ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি একটি কারণে নাযিল হয়েছিল। আর তা ছিল এই জাহিলিয়াতের সময়ের লোকেরা কেবল পুরুষদেরকে মীরাস দিত, মেয়েদেরকে দিত না। তখন সে প্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। অন্যরা বলেছেন— আরবদের মধ্যে এটাই প্রচলন ছিল যে, তারা মীরাস দিত কেবল সেই ব্যক্তিকেই যে তীর নিক্ষেপণে দক্ষতা দেখাতে ও বেশি বেশি সংগ্রহ করতে পারত। তখন

আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করে তাদের নীতিকে বাতিল করে দিলেন। কাজেই আয়াতে নিহিত সাধারণত্বকে যে বিষয়ে তা নাযিল হয়নি সেই বিষয়ে গণ্য করা সহীহ্ হবে না।

জবাবে বলা যাবে— এ কথাটি কয়েকটি দিক দিয়ে ভুল। একটি হল— তুমি যে কারণটির উল্লেখ করেছ, তা কেবল সন্তান ও আল্লাহ্ যেসব নিকটাত্মীয়ের কথা অন্যত্র বলেছেন তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আসল কারণ এই ছিল যে, তারা কেবল পুরুষ ছেলেদেরই মীরাস দিত, মেয়ে-নারীদের মীরাস দিত না। এ-ও হতে পারে যে, তারা কেবল পুরুষ 'যবীল-আরহাম'কে মীরাস দিত, মেয়ে 'যবীল-আরহাম'কে দিত না। অতএব তুমি যা বলেছ, তাতে এ কথার কোন দলীল নেই যে, কেবল সন্তানদের মীরাস দান এবং মীরাসের আয়াতের আর যে সব অংশীদারদের উল্লেখ করেছেন কেবল তাদেরকে মীরাস দান-ই আয়াতটির নাযিল হওয়ার একমাত্র কারণ।

অন্য একটি দিক দিয়েও বিবেচনা করা যায়। আয়াতটি যদি বিশেষ কোন কারণে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তদ্দরুন ব্যবহৃত শব্দের সাধারণত্বকে বিশেষীকরণ কর্তব্য করে দেয় না। বরং আমাদের মতে কোন কারণ ছাড়া-ই এর হুকুমটা সাধারণ ও ব্যাপক। তাই কোন্ কারণে আয়াতটির নাযিল হওয়া এবং কোন কারণ ছাড়াই তার নাযিল হওয়া সম্পূর্ণ সমান ব্যাপার। উপরন্তু আল্লাহ সন্তানদের সঙ্গে অন্যান্য নিকটাত্মীয়দেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন বলেছেন ঃ

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -

তা থেকে, যা রেখে গেছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়গণ।

এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এ আয়াতে নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে কেবল সন্তানদের মীরাসের কথাই বলা হয়নি। এ আয়াতের দলীল এ কথাও প্রমাণ করে যে, দাদার জীবিত থাকা অবস্থায় ভাই ও বোনেরাও অংশ পাবে। যেমন সেটি দলীল হয়ে প্রমাণ করে 'যবীল-আরহামে'র মীরাস পাওয়ার কথা।

আর আল্লাহ্‌র কথা نَصِيبًا مَفْرُوضًا 'সুনির্দিষ্ট অংশ'। অর্থাৎ (প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্ ভাল জানেন) জানা অংশ, যার পরিমাণ নির্দিষ্ট। বলা হয় فرض শব্দের অর্থ اَلْحَزُّ খাঁজ কাটা। তা বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করার চিহ্ন। الفرضة অর্থ পানি বন্টনের চিহ্ন দেয়া, যার দ্বারা প্রত্যেকেই তার পানীয় অংশ সুবিধামত লাভ করতে ও চিনতে পারে। فرض শব্দের এটাই যখন আসল অর্থ, তখন শরীয়াতে জানা কর্তব্যের পরিমাণ কিংবা যে সব ব্যাপার প্রমাণিত ও বাধ্যতামূলক, তা নির্ধারণ অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল।

এ-ও বলা হয়েছে যে, الفرض -এর আসল অর্থ হল প্রমাণিত হওয়া। এ কারণে দুই বন্ধনীর মাঝের টুকরাকে فرض বলা হয়, কেননা তা প্রমাণিত। শরীয়াতের দৃষ্টিতে 'ফরয' শব্দের অর্থ এ দুটি ভাগে বিভক্ত। তাই বলে যদি কর্তব্য ও বাধ্যতামূলক তা বোঝাতে চাওয়া হয়, তাহলে তা হবে উঁচু পর্যায়ে অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়াতে ব্যবহৃত 'ফরয' ও 'ওয়াজিব'-এ অর্থ সম্পর্কে কোন কোন দিক দিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে , যদিও 'ফরয' হিসেবে প্রত্যেকটি 'ফরয'-ই অবশ্য কর্তব্য, যা একজনের জন্যে অবশ্য করণীয় হয়ে যাবে। তবে

'ওয়াজিব' ঠিক সে রকমের নয়। কেননা তা কোন ওয়াজিবকারীর ওয়াজিব করা ছাড়াও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, আনুগত্যকারী লোকদেরকে সওয়াব দান আল্লাহ্‌র জন্যে কর্তব্য। এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ কৌশল। তাই বলে তা আল্লাহ্‌র জন্যে 'ফরয'— এ কথা বলা যাবে না। কেননা 'ফরয' করার জন্যে একজন 'ফরযকারীর প্রয়োজন। আর আল্লাহ্‌র জন্যে ফরযকারী কেউ হতে পারে না। অথচ ওয়াজিব হতে পারে কৌশলগতভাবে কোন ওয়াজিব ফয়সালাকারী ছাড়া-ই। 'ওয়াজিব' শব্দের আসল আভিধানিক অর্থ হল, পড়ে যাওয়া। যেমন সূর্য পড়ে গেলে বলা হয় ঃ وَجَبَتِ الشَّمْسُ প্রাচীর পড়ে গেলে বলা হয় ঃ وَجَبَتِ الْحَائِطُ আর سَمِعْتُ وَجْبَةً আমি একটা পতন শব্দ শুনলাম। আল্লাহ্‌র কালামে এসেছে ঃ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا 'যখন তার পার্শ্ব নিচে পড়ে যাবে'। 'ফরয' শব্দটি মূলত ওয়াজিব-এর তুলনায় অধিক প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন। শরীয়াতের হুকুমের দিক দিয়েও তা খুব শক্ত— যখন খাঁজ সজ্ঘটিত ও প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী হয়, 'ওয়াজিব' সে রকমের নয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى -

মীরাস বণ্টনকালে যখন নিকটাত্মীয় ও ইয়াতীমরা— যারা মীরাসে অংশ পায়নি— উপস্থিত হয় ....

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবূ মালিক ও আবূ সালিহ্ বলেছেন ঃ মীরাসের আয়াত দ্বারা এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে। ইবনে আব্বাস, আতা, আল-হাসান, শবী, ইবরাহীম, মুজাহিদ ও জুহরী বলেছেন—না, আয়াতটি মুহকাম, মনসূখ হয়নি। আর আতীয়াতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত আয়াতটির প্রয়োগ মীরাস বণ্টনকালে হবে। আর তা ছিল মীরাস সম্পর্কে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা। পরে আল্লাহ্ তা'আলা মীরাসী আইন-ফারায়েয— নাযিল করেন। তাতে হককারী প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক দিয়ে দেয়া হয়েছে, ঘোষণা করা হয়েছে নির্দিষ্টভাবে। অতঃপর আছে শুধু দান-সাদকা, যা মৃত ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে গেছে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এ বর্ণনাটিতে বলা হয়েছে যে, পূর্বে মীরাস বণ্টনকালের জন্যে এটা কর্তব্য ছিল। পরে মীরাসী আইন দ্বারা তা মন্‌সূখ হয়ে গেছে। অতঃপর তা মৃতের অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা সে এদের জন্যে বলে গেছে, তারা তাই পাবে। ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত মনসূখ হয়নি। তা মীরাস বণ্টনের সে সবের জন্যে অর্পিত। পরিত্যক্ত ধন-মালের স্বল্পতা থাকলে তাদের নিকট ওযরখাহী করতে হবে তাদের কিছু দেয়া গেল না বলে। এ আয়াতে সেই কথা-ই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقُوْلُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا -

এবং তাদেরকে ভালো শুভ পরিচিত কথা বল।

হাজ্জাজ আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ মূসা আল-আশ্'আরী ও আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর মীরাস বণ্টনকালে ওদের যারা উপস্থিত থাকত, তাদের কিছু না-কিছু দিতেন। কাতাদাহ আল-হাসান সূত্রে বলেছেন, এ আয়াতটি 'মুহকাম'। আশ্‌আস ইবনে সীরীন হুমায়দ

ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতা একটা মীরাসের অভিভাবকত্ব পেয়েছিলেন। তখন তিনি একটি ছাগী যবেহ্ করতে ও তাদেরকে খাওয়াতে আদেশ করেছিলেন। সে মীরাসটি যখন বণ্টন করা হল, তখন তাদেরকে খাওয়ানো হল। পরে তিনি এ আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى -

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন উবায়দা সূত্রেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ এই আয়াতটি না হলে এই ছাগীটি যবেহ্ করা হতো না। আমার ভাগে থেকে যেত।[১] তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তা এক ইয়াতীমের মাল ছিল, তিনি তার অভিভিবক হয়েছিলেন।

হুসায়ম আবূ বশর সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ এ আয়াতটিকে লোকেরা খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন— ওরা দুজন। একজন মীরাস পায় আর একজন মীরাস পায় না। যে মীরাস পেয়েছে, তাকে ঐ লোকদেরকে রিযিক ও দান দিতে আদেশ করা হয়েছে। আর যে মীরাস পায়নি, তাকে বলা হয়েছে— ওদেরকে ভালো মিষ্টি কথা বলে বিদায় দাও। সে বলে— এই মাল অনুপস্থিত লোকের প্রাপ্য কিংবা ছোট ছোট ইয়াতীমের। তাতে তোমাদের হক রয়েছে। আর আমরা নিজেরা তার মালিক নই বলে তা থেকে কোন কিছু দিতে পারি না। এটাই হচ্ছে قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ভাল-ভাল কথা। বলেছেন, এ আয়াতটি 'মুহকাম' মনসূখ নয়। আল্লাহ্র কথা فَارْزُقُوْهُمْ এর অর্থ সাঈদ ইবনে যুবায়র মনে করেছেন যে, তাদেরকে মীরাস থেকে তাদের অংশ দিতেন। আর অন্যদেরকে ভালো ভালো কথা বলতেন। তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতটির তাৎপর্য হল— কোন কোন ওয়ারিস যদি মীরাস বণ্টনকালে উপস্থিত থাকে আর তাদের কিছু লোক অনুপস্থিত, আর কিছু ওয়ারিস থাকে ছোট বয়সের, তাহলে উপস্থিতদের মীরাসের অংশ তাদের দিতে দেয়া হবে। আর অনুপস্থিত ও ছোটদের মীরাসের অংশ আলাদা করে আটকে রাখতে হবে।

এ ব্যাখ্যা যদি সহীহ্ হয়, তাহলে তা দলীল হবে তার জন্যে , যা দুই ব্যক্তির রাখা আমানত সম্পর্কে সে বলে যে, তাদের একজন অনুপস্থিত থাকলেও যে উপস্থিত থাকবে, সে তার অংশ নিয়ে নেবে। আর আমানতদার-ই অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশকে আটকে রেখে দেবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও আবূ হানীফাও এই মত দিয়েছেন যে, আমানতে দুজন শরীক থাকেল দুজন-ই এক সাথে উপস্থিত না হলে উপস্থিত একজনকে তার ভাগেরটা দেয়া হবে না। আতা সাঈদ ইবনে যুবায়রের এ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন যে, قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا جَمِيْلًا আয়াত অনুযায়ী উত্তরাধিকারীরা ছোট বয়সের হলে তাদের অভিভাবকরা সেই লোকদিগকে, যারা মৃতের নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন লোক মীরাস পাচ্ছে না, তাদেরকে বলবে যে, ওরা ওয়ারিস হলে বয়সে ওরা ছোট। ওরা বড় হলে ওদেরকে বল, যেন ওরা তোমাদের হক্ চিনে এবং তাদের রব্ব এ পর্যায়ে তাদেরকে যে অসিয়ত করতে বলেছেন, তা যেন তারা পালন করে।

---

১. এখানে 'আমার ভাগে' অর্থ ইয়াতীমের মাল হিসেবে আমার হাতে'। 'আমার ভাগে' কথাটি পরোক্ষ অর্থজ্ঞাপক, প্রত্যক্ষ বা প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক নয়। কেননা তিনি ইয়াতীমের অভিভাবক ছিলেন মাত্র, তার প্রকৃত মালিক ছিলেন না।

এ আলোচনা স্পষ্ট করে দিল যে, আলোচ্য বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহ্‌বিদদের চার প্রকারের মত রয়েছে। একটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবূ মালিক, আবূ সালিহ প্রমুখ বলেছেন— এ আয়াত মনসূখ। মীরাসের আয়াত দ্বারা তা মনসূখ হয়েছে। দ্বিতীয়, ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামার বর্ণনা এবং আতা, আল-হাসান, শবী, ইবরাহীম ও মুজাহিদের কথা ঃ আয়াতটি সুপ্রতিষ্ঠিত— এর হুকুম চিরন্তন, কার্যকর। তা মন্‌সূখ হয়নি, এবং তা মীরাস পর্যায়ে গণ্য। তৃতীয়— ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তৃতীয় কথা। তা হল— এ আয়াতটি মৃতের অসিয়তে কার্যকর হবে। মীরাস থেকে তাদেরকে দেয়া হবে না বলে সে দিক দিয়ে আয়াতটি মনসূখ। জায়দ ইবনে আসলাম থেকে তা-ই বর্ণিত। জায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন ঃ এ এমন একটা জিনিস যা অসিয়তকারী যখন আসিয়ত করবে তখন তা করার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। এ কথার পক্ষে দলীল হিসেবে এ আয়াতটির উল্লেখ করা হয় ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا -

যারা পেছনে দুর্বল-অক্ষম সন্তান রেখে যায় তাদের এ ব্যাপারেও ভয় করা উচিত।

বলেছেন— যারা মীরাস বন্টনকালে উপস্থিত হবে, তাদের বলবে ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ওদের সাথে সেলায়ে রেহমী কর এবং তাদেরকেও কিছু দাও। আর চতুর্থ হচ্ছে সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে আবূ বশর-এর বর্ণনার কথা। তা হল— 'মীরাস থেকে ওদের রিযিক দাও' আল্লাহ্‌র এ কথায় মূল মীরাস থেকে দিতে বলা হয়েছে। আর 'ওদেরকে ভালো ভালো কথা বল'— যারা মীরাস পায়নি তাদেরকে বলার নির্দেশ। তাই যারা বলেছেন— আয়াতটি মনসূখ, তাঁদের মতে মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে উক্ত হুকুম অবশ্য পালনীয় ছিল। পরে যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হল, তাতে প্রত্যেক ওয়ারিসকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অংশ দেয়ার হুকুম হল, তখন উক্ত আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে।

আর যারা বলেছে— উক্ত আয়াত কখনই মনসূখ হয়নি, দৃঢ় কার্যকর হয়ে আছে— আমাদের মতে তাদের এ কথার তাৎপর্য হল— তাঁরা এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন, বাধ্যতামূলক নয়, তবে খুবই পছন্দনীয় কাজ, তা ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব হলে রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় বিপুলভাবে মীরাস বন্টনেরকাজ সম্পন্ন হওয়াকালে সাহাবী ও তাবেয়ীদের জমানায় তদনুযায়ী অবশ্যই আমল করা হতো এবং তা কর্তব্য বলে মত পাওয়া যেত। তা সেই লোকদের হক বলে প্রচারিত হত। যেমন সাধারণ প্রয়োজনেই মীরাসী আইনের ব্যাপক প্রচার ও কার্যকরতা সম্পন্ন হয়েছে। তাই নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে যখন তা প্রমাণিত হয়নি, তখন বুঝতে হবে, তা একটি মুস্তাহাব— অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ, ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক কর্তব্য নয়।

আর আবদুর রহমান, উবায়দাতা ও আবূ মূসা (রা) থেকে এ পর্যায়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ এই হতে পারে যে, ওয়ারিসগণ বড় বয়সের ছিল এবং তাদের সকলের অনুমতি নিয়ে ও সকলের পক্ষ থেকে সম্মিলিত মালিকানার কোন ছাগী যবেহ্ হয়ে থাকতে পারে। আর হাদীসে যে বলা হয়েছে যে, উবায়দাতা ইয়াতীমদের মীরাস বণ্টন করে একটি ছাগী যবেহ করেছেন, তা এভাবে হয়ে থাকতে পারে যে, প্রথমে তারা ইয়াতীম ছিল, পরে তারা বড় হয়ে এ কাজ করেছে

যখন তারা আর ইয়াতীম থাকেনি। কেননা তারা ছোট বয়সের হয়ে থাকলে তাদের অংশ পারস্পরিকভাবে বণ্টন হওয়া সহীহ্ হতো না। এ-ও বোঝা যায় যে, তা মুস্তাহাব মাত্র— সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে আতা বর্ণিত হাদীস থেকে। হাদীস হল, অসী নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা উপস্থিত তাদেরকে বলবে : ওরাই ওয়ারিস, কিন্তু ওরা ছোট বয়সের এবং সেই লোকদেরকে কিছু দিতে না পারার দরুন ওযরখাহী করবে। ওরা যদি আবশ্যিকভাবে প্রাপক হতো, তাহলে ওদেরকে দেয়া অবশ্যই কর্তব্য হতো— ওয়ারিসরা ছোট বয়সের হোক, কি বড় বয়সের। উপরন্তু আল্লাহ্ তো ওয়ারিসদের মধ্যেই মীরাস বণ্টন করে দিয়েছেন, প্রত্যেকের জন্যে অংশ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন মীরাসের আয়াতে। কিন্তু তাতে ওদের জন্যে তো কিছুই বলা হয়নি। আর যা অন্য লোকের মালিকানা, তা অন্যদেরকে দিয়ে দেয়া তো জায়েয হতে পারে না। হ্যাঁ, যেভাবে আল্লাহ্ দিতে বলেছেন, কেবল সেভাবেই দেয়া যেতে পারে। কেননা আল্লাহ্ মৌল নীতি হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছেন :

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে যদি তোমাদের সম্মতিক্রমে ব্যবসায় হয় ....। (সূরা নিসা : ২৯)

নবী করীম (স) বলেছেন :

دِمَاؤُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ -

তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-মাল তোমাদের পরস্পরের জন্যে হারাম।

বলেছেন :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ -

কোন মুসলমানের মাল তাঁর নিজের থেকে খুশী মনে না দিলে তা অন্য ব্যক্তির জন্যে হালাল হবে না।

এসব হাদীসই প্রমাণ করে যে, মীরাস বণ্টনকালে উপস্থিত নিকটাত্মীয় ও ইয়াতীমদেরকে কিছু দেয়া ওয়াজিব নয়। মুস্তাহাব মাত্র।

আল্লাহ্র কথা :

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -

এবং তাদেরকে ভালো ভালো কথা বল।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত— মীরাসের সম্পদে যখন স্বল্পতা থাকবে, তখন এই লোকদের নিকট ওযরখাহী করতে হবে। আর সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন : মীরাস ওয়ারিসদেরকেই দেয়া হবে। আর তাই হচ্ছে : 'তা থেকে ওদেরকে রিযিক দাও' আল্লাহ্র এ কথাটুকুর তাৎপর্য। যারা মীরাস পাচ্ছে না, তাদেরকে বলা হবে : এ মাল যাদের, তারা এখন অনুপস্থিত কিংবা ছোট ছোট ইয়াতীমদের, তাতে তোমাদের 'হক' রয়েছে, কিন্তু আমরা তা থেকে কোন জিনিস

দিতে পারি না। তার মতে এটা ওযরখাহী— অক্ষমতা প্রকাশ। কোন কোন মনীষী বলেছেন, মীরাস বন্টনের সময় তাদেরকে কিছু দেয়া হলে তাদের উপর যেন নিজেদের অনুগ্রহ দেখানো (Obligation) না হয়। তাদেরকে যেন ভর্ৎসনা করা না হয়। তাদের সাথে কথাবার্তা বলায় যেন অপমানকর, অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করা হয় না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى -

ভালো কথা বলা ও ক্ষমা করা এমন দানের তুলনায় অতীব উত্তম যার পর-পরই মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া হয়। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৬৩)

বলেছেন ঃ

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ -

তবে ইয়াতীমের প্রতি তোমরা কঠোর, রুঢ় ব্যবহার করবে না এবং প্রার্থনাকারীকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দেবে না। (সূরা দোহা ঃ ৯, ১০)

বরং হুঁশিয়ার করে বলেছেন ঃ 'যারা মৃত্যুকালে দুর্বল অক্ষম সন্তানাদি রেখে যাওয়ার সময় যেমন ভয় করে, এ ক্ষেত্রেও তাদের ভয় করা উচিত।

আগের কালের মনীষিগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ পর্যায়ে একটি বর্ণনা এসেছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র, আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, দহাক ও আস-সুদ্দী বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি মুমুর্ষাবস্থায় পড়েছে, তখন তার নিকট উপস্থিত লোকেরা যেন তাকে বলে ঃ তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি ওদেরকে কিছু দিয়ে যাও, ওদের সাথে সেলায়ে রেহমী রক্ষা কর। ওদের কল্যাণের ব্যবস্থা করে যাও। তারা যদি এরূপ অসিয়ত করার লোক হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই ওরা তাদের সন্তানদের জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে যাবে।

হুবায়ব ইবনে আবূ সাবিত বলেছেন, এ বিষয়ে আমি মাকসামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ না সে তো এক মুমূর্ষ ব্যক্তি, যার মৃত্যু উপস্থিত। তার নিকট উপস্থিত থাকা লোক তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমার ধন-মাল বিলিয়ে দিয়ে যেয়ো না। তার রক্ষা কর। তার বাস্তবিকই কেউ নিকটাত্মীয় হলে তাদের জন্যে তার কিছু অসিয়ত করে যাওয়া তারা অবশ্যই পছন্দ করবে। প্রথমোল্লেখিতরা আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন অসিয়ত করার উৎসাহ দান থেকে উপস্থিত লোকদিগকে নিষেধ করার অর্থে। আর মাকসাম তার ব্যাখ্যা করেছেন, যে লোক অসিয়ত না করতে বলবে তাকে সেই বলা থেকে বিরত রাখার অর্থে। আল-হাসান অপর একটি বর্ণনায় বলেছেন, এখানে সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে মৃতের নিকট উপস্থিত। এবং বলে ঃ তোমার ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক তুমি অসিয়ত করে যাও। আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অপর একটি বর্ণনায় তিনি ইয়াতীমের মালের অভিভাবকত্ব ও তার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাদের কর্তব্য হল, তারা তা নিয়ে কাজ করবে এবং যা করা পছন্দ করে তা করতে বলবে। তাদের ইয়াতীমদের ও দুর্বল-অক্ষম ছোট বাচ্চাদের ধন-মাল সম্পর্কে তাদের মৃত্যুর পর এ কথা বলবে। আগের কালের মনীষীরা এ আয়াতের তাৎপর্য বিশ্লেষণে যা যা বলেছেন, হতে পারে তা সব-ই এখানকার বক্তব্য ভুক্ত।

তবে অসিয়ত করার আদেশ করতে নিষেধ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এই বিষয়ের পরামর্শদাতা যদি ওয়ারিসদের ক্ষতি করতে কিংবা তাদের অসীকে বিভ্রান্ত করতে ইচ্ছা করে— যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে না— যদি সে ওদের স্থানে হয়, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। তা এ ভাবে যে, মৃত্যু পথযাত্রী খুব ধন-মালের মালিক, তার রয়েছে অক্ষম-দুর্বল বাচ্চা-কাচ্চা, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি পুরো এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করে যেতে বলবে। সে নিজে যদি এই অবস্থায় পড়ে, তাহলে সে তার উত্তরাধিকারীদের কথা মনে করে নিশ্চয়ই সে রূপ অসিয়ত করতে রাজী হবে না। এ কথা প্রমাণ করে যে, সে যদি কম সম্পদের মালিক হয় এবং তার দুর্বল-অক্ষম বাচ্চা-কাচ্চা থাকে তাহলে তার কোন অসিয়ত না করাই বরং ভালো, বরং সে সন্তানদের জন্যে সম্পত্তি রেখে যাবে, এটাই উত্তম। অথবা অসিয়ত করলেও এক-তৃতীয়াংশের কম পরিমাণের করবে। নবী করীম (স) সায়াদ (রা)-কে বলেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি আমার সমস্ত ধন-মালের উপর অসিয়ত করে যাচ্ছি, তখন রাসূল (স) বলেছিলেন, না, শেষ পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ঠেকালেন। বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশই বেশি। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে। তা তাদেরকে নিঃস্ব, অন্যদের দ্বারে ভিক্ষা চায়-এর তুলনায় অনেক উত্তম।

এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, উত্তরাধিকারীরা দরিদ্র হলে অসিয়ত না করা— যেন তারা উত্তরাধিকার নিয়ে সচ্ছল হয়ে যায়— তা করা অপেক্ষা অনেক গুণ ভাল ও উত্তম। আল-হাসান ইবনে জিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলছিলেন, যার বিপুল সম্পদ আছে তার যতটা ইচ্ছা অসিয়ত করা উত্তম। আর তা বেশির পক্ষে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের উপর হবে। আর যার বিপুল সম্পদ নেই, তার তা থেকে কোন অসিয়ত না করা এবং যা কিছু আছে, তা সবই উত্তরাধিকারীদের জন্যে যথাযথ রেখে যাওয়াই অতীব উত্তম। তাতে যে নিষেধ করার কথা আছে, তার প্রয়োগ হবে মৃতের নিকট উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে যে তাকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করতে আদেশ করবে তার প্রতি— যেমন আল-হাসান থেকে বর্ণনা এসেছে। কেননা তা করাই উচিত নয় নবী করীম (স)-এর এ কথানুযায়ী ঃ 'এক-তৃতীয়াংশই অধিক।' এবং হযরত সায়াদকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করা থেকে বিরত রাখার দলীলের ভিত্তিতে। মাকসাম যা বলেছেন, তার অর্থ এ হতে পারে যে, উপস্থিত লোকেরা বলবে ঃ না, তুমি কোন কিছুর অসিয়ত করবে না। অথচ সে যদি তার নিকটাত্মীয় কেউ হয়, তা হলে বরং তাকে অসিয়ত করতে বলবে। তার নিজের জন্যে সে যা পছন্দ করে না, সেদিকে ইশারা করবে।

নবী করীম (স) থেকে এ কথার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। আবদুল বাকী ইবনে কানে ইবরাহীম ইবনে হাশিম, হুদবাতা-হুম্মাম-কাতাদাতাহ্‌ আনাস (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ مِنَ الْخَيْرِ -

নিজের জন্যে মানুষ যে কল্যাণ পছন্দ করে, তা যতক্ষণ তার ভাইর জন্যেও পছন্দ না করবে, ততক্ষণ কোন বান্দা-ই ঈমানদার হতে পারবে না।

আবদুল বাকী, আল-হাসান ইবনুল আব্বাস, আর-রাযী, সহল ইবনে উসমান, যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ্ লায়স, তালহা, খায়সামাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর নবী করীম (স) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ -

যে লোক জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা ও জান্নাতে প্রবেশ করার আনন্দ লাভ করতে চায়, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যখন সে সাক্ষী দেবে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া মাবুদ কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তার নিকট যে জিনিসের আসা পছন্দ করে তা লোকদের নিকট-ও আসুক বলে যেন সে পছন্দ করে।

আবূ বকর বলেছেন, এ হাদীস-ই আল্লাহ্‌র কথা ঃ যারা অক্ষম-দুর্বল বাচ্চাদের রেখে যাওয়াকে ভয় পায়, তারা যেন এ অবস্থায় অবশ্যই ভয় পায়। অতএব তাদের উচিত আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং সহজ-সরল-সোজা কথা বলা।

মহান আল্লাহ্ অন্যদেরকে ইশারা করতে এবং নিজের জন্যে ও নিজের লোকদের জন্যে যা পছন্দ করে না তা করার আদেশ করতে উপরোক্ত আয়াতে নিষেধ করেছেন। বরং সরল-সোজা-ভালো কথা বলবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। তা হল ন্যায়পরতা, ইনসাফ ও নির্ভেজাল সত্য কথা। কোন উত্তরাধিকারীকে বাদ দেয়ার বা নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা যেন বলা না হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا -

যারা ইয়াতীমদের ধন-মাল জুলুম সহকারে ভক্ষণ করে।

ইবনে আব্বাস সাঈদ ইবনে যুবায়র ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল, তখন যাদের লালন-পালনাধীন ইয়াতীম ছিল, তার পানাহার সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল। শেষ পর্যন্ত একটা বিপর্যকর অবস্থার সৃষ্টি হল। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ -

তোমরা যদি ইয়াতীমদের খানা-পিনা সংমিশ্রিত কর, তাহলে করতে পার, ওরা তো তোমাদের ভাই-ই। আর আল্লাহ্ বিপর্যয়কর থেকে কল্যাণকরকে আলাদা করে জানেন। (সূরা বাকারাহ ঃ ২২০)

এ আয়াতের মাধ্যমে কল্যাণের লক্ষ্যে সংমিশ্রণের সুযোগ দিলেন।

আবূ বকর আল-জাস্‌সাস বলেছেন ঃ আয়াতে শুধু খাওয়ার কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। খাদ্য নয়— এমন সব জিনিসকেই ইয়াতীমদের মাল থেকে আলাদা রাখতে বলেছেন, তা ধ্বংস হতে দেয়া তা থেকে খাওয়ার মতই নিষিদ্ধ। তবু খাওয়ার ব্যাপারাটির উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন। কেননা যাবতীয় ধন-মালের আসল লক্ষ্যই তো খাওয়া। এ সম্পর্কে আমরা আগেই কথা বলেছি। পূর্বে এর দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا -

তারা তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে .....।

সুদ্দী থেকে বর্ণিত— কিয়ামতের দিন আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখ থেকে বের হবে, বের হবে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়, নাসারন্ধ্র ও দুই চোখ থেকে। যে-ই তাকে দেখবে, সে বুঝবে যে, এ লোক ইয়াতীমদের মাল খেয়েছে।

বলা হয়েছে, এটা রূপক কথা। কেননা আসলে তারা জাহান্নামের দিকে পরিণতি লাভ করবে। ফলে তাদের পেটসমূহ আগুনে ভর্তি হয়ে যাবে।

কিছু জাহিল ও হাদীসের দোহাই দেয়া লোক মনে করে যে, 'যারা ইয়াতীমের মাল জুলুম করে খায়' আল্লাহ্‌র এ কথাটি মনসূখ হয়েছে 'তোমরা যদি ওদের সাথে পারস্পরিক সংমিশ্রণ কর, তাহলে ওরা তো তোমাদেরই ভাই' আল্লাহ্‌র এ কথাটির দ্বারা। কেউ কেউ আবার এ পর্যায়ে আলোচনা 'নাসেখ-মনসূখের' মধ্যে শামিল করেছেন। কেননা উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর লোকেরা ইয়াতীমের খানাপিনা নিজেদের থেকে আলাদা করে দিল। তার পরে এ শেষোক্ত কথাটির আয়াত নাযিল হয়, তোমরা যদি ওদের সাথে পারস্পরিক (খানা-পিনা) সংমিশ্রিত কর, তাহলে ওরা তোমাদের ভাই-ই। উক্তরূপ কথা যে বলেছে তারা চরম মূর্খতারই প্রমাণিত করেছে। আয়াতে মনসূখ হওয়া সম্পর্কে তাদের প্রকৃত কোন জ্ঞান নেই। কোন্‌টা মনসূখ হওয়া জায়েয, কোন্‌টা নয়, তাও তাদের জানা নেই। ইয়াতীমের মাল জুলুম করে খাওয়া যে হারাম, এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। আয়াতে যে চরম পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তা-ও শাশ্বত। অবশ্যই এ খারাপ পরিণতির ধমক কালে অনিবার্য হবে, না ক্ষমাও পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। আর এ ধরনের কথার আয়াত কখনো মনসূখ হয় না। কোন বুদ্ধিমান লোক-ই তা মনসূখ হয়েছে বলে মেনে নেবে না। এই ব্যক্তির মূর্খতা অনস্বীকার্য। যা জুলুম, তা কোন অবস্থায়ই মুবাহ হতে পারে না। অতএব এ নিষেধের আয়াত মনসূখ হতে পারে না। যে সাহাবীর লালনাধীন ইয়াতীম ছিল, তিনি ইয়াতীমের খাবার-দাবার নিজের থেকে আলাদা করেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি ইয়াতীমের মাল খেয়ে ফেলেন নাকি তার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কেননা তা খাওয়ার কোন অধিকারই তাঁর নেই। অথচ তা খেলে তাঁর জুলুমের অপরাধ হয়ে পড়বে এবং পরিণতিতে জাহান্নাম অবধারিত হবে। এ কারণে তাঁরা এ জন্যে সাংঘাতিকভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেন। পরে যখন নাযিল হল ঃ তোমরা যদি তাদের সাথে খানাপিনা সংমিশ্রণ কর, তো তারা তো তোমাদের ভাই', তখন এ সংমিশ্রণের পরিণতি সম্পর্কিত ভয় দূর হয়ে যায়,

যখন তাঁরা তাদের কল্যাণই চেয়েছিলেন। ইয়াতীমের মাল খাওয়া কিছু মাত্র মুবাহ নয়, কেননা তা জুলুমের কাজ। বরং এ আয়াত দ্বারাই 'যারা জুলুম করে ইয়াতীমের মাল খায়' এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়। অর্থাৎ একত্রে পানাহার করা নিষিদ্ধ নয়।

ফারায়েয

আবূ বকর বলেছেন, জাহিলিয়াতের জামানার লোকেরা দুটি জিনিসের ভিত্তিতে পরস্পর মীরাস দেয়া-নেয়া করত। একটি হচ্ছে বংশ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কারণ। আর বংশের দিক দিয়ে যে মীরাস দেয়া-নেয়া হতো, তাতে ছোট বয়সের লোক ও মেয়েলোকদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। মীরাস দিত সে সব পুরুষ সন্তানকে, যারা অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে ও গনীমতের মাল লুট করেছে। একথা ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণিত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ -

হে নবী! লোকেরা তোমার নিকট মেয়েলোকদের ব্যাপারে ফতোয়া চায়। আপনি বলুন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন ....। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

শেষে

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ - (انساء : ١٢٧)

'সন্তানদের মধ্যে যারা দুর্বল অক্ষম'— পর্যন্ত।

এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই কথাটিও নাযিল করেন ঃ

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন ঃ একজন পুরুষের জন্যে দুজন মেয়ের অংশ প্রাপ্য।

জাহিলিয়াতের সময়ে তাদের বিবাহ, তালাক ও মীরাস বণ্টন হতো, রাসূলে করীম (স) প্রেরিত হওয়ার পর-ও সেই অবস্থা-ই অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ইসলামী শরীয়াতের দিকে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়। ইবনে জুরাইয বলেছেন— আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এ কথা জানেন যে, নবী করীম (স) রাসূল হওয়ার পর-ও লোকদের বিয়ে, তালাক ও মীরাসের কার্যাদি পূর্ববত-ই চলছিল ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এতটকু কথা তো আমারও জানা। হাম্মাদ ইবনে জায়দ ইবনে আওন— ইবনে সীরীন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ মুহাজির আনসাররা জাহিলিয়াতের সময়ের নিয়মে বংশের ভিত্তিতে মীরাস বণ্টন করতেন। ইবনে জুরাইয আমর ইবনে শুয়ায়ব সূত্রে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে বিবাহ কিংবা তালাক বলতে কিছু ছিল না। রাসূলে করীম (স)-ই তাদেরকে এসব জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য সুদের ব্যাপারটি ভিন্ন। ইসলাম কোন সুদ চালু রাখেনি। তখন যে সুদী

কারবারের কাজ বিস্তৃত ছিল, তা প্রত্যাখ্যান করেছি। লগ্নিকারীকে তার মূলধন ফিরিয়ে দিয়েছে সুদকে খতম করেছে।

হাম্মাদ ইবনে জায়দ আইয়ূব— সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যখন রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন, তখন জনগণ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি এসে তাদেরকে কিছু করতে আদেশ করলেন এবং কিছু করতে নিষেধ করলেন। এ ছাড়া তাদের সমস্ত ব্যাপারই জাহিলিয়াতের ধারায় চলমান ছিল। এ কথাটি ইবনে আব্বাস থেকে পাওয়া বর্ণনার উপর ভিত্তিশীল। তিনি বলেছেন ঃ

الْحَلاَلُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ -

আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হালাল, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে চুপ রয়েছেন, তা ক্ষমার্হ।

রাসূল (স)-এর প্রেরিত হওয়ার পর লোকেরা যে নীতিতে চলত, তাতে বিবেক-বুদ্ধি যে কাজ নিষিদ্ধ বুঝেনি, তা চালু ছিল। কেননা তদানীন্তন আরব ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর শরীয়াতের কোন কোন বিধান পালন করত। অবশ্য তারা নিজেরাও অনেক কিছু নতুনভাবে নিজেদের পক্ষ থেকে চালু করেছিল। তন্মধ্যে এমন জিনিসও ছিল, যা বিবেক-বুদ্ধি খারাপ মনে করত। যেমন শিরক, মূর্তিপূজা, কন্যা সন্তান জীবন্ত সমাধিস্থকরণ— এমনি আরও অনেক খারাপ কাজ, যা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিও অত্যন্ত খারাপ মনে করত। এতসব সত্ত্বেও তাদের কিছু কিছু ভালো নৈতিকতা ছিল। এমন কিছু-কিছু পারস্পরিক ভালো কাজ ছিল, যা বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতেও খারাপ বা অন্যায় ছিল না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ নবী করীম (স)-কে তওহীদের আকীদার প্রচারক-আহ্বায়ক করে পাঠালেন। মূর্তিপূজা, কন্যা জীবন্ত সমাধিস্ত করণ, সায়েবা, অসিলা ও আল-হামীও যে সব কাজ করে তারা তাদের দেবতাদের নৈকট্য লাভ করতে চাইত— যা বিবেক-বুদ্ধি অত্যন্ত খারাপ মনে করত, তা পরিহার করার জন্যে তিনি আহ্বান জানালেন। তাদের পারস্পরিক কাজ-কর্ম, ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি, বিবাহ্, তালাক, মীরাস বণ্টনের নীতি ও কার্যকলাপ বিবেক-বুদ্ধি খারাপ বিবেচনা করত না— তা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কেননা বিবেক-বুদ্ধির বিচারে তা খারাপ ছিল না, তার হারাম হওয়ার কথা কোনখান থেকে শোনাও যায়নি। এ সময় তাদের মীরাস বণ্টনের নিয়ম এই ছিল যে, তারা তাদের মধ্যে যোদ্ধা ধরনের যুবকদেরকে মীরাস দিত। ছোট বয়সের ছেলেমেয়ে ও মেয়েলোকদেরকে মীরাসের অংশ দিত না।

এই অবস্থায় আল্লাহ্ মীরাসের আয়াত নাযিল করলেন।

আর তাৎক্ষণিক কারণের দিক দিয়ে দুটি কারণে তারা পরস্পরকে মীরাসের অংশ দিত। একটি হচ্ছে শপথ ও পারস্পরিক চুক্তি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে পালকপুত্র গ্রহণ। এরপর ইসলামের আগমনের পর কালের স্রোতধারার সাথে সংযোগ রক্ষা করে তারা অনেক কিছুই ত্যাগ করেছে। অনেক কিছু মনসূখ ও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

অনেক লোক বলে যে, তারা কুরআনেরই বিধান অনুযায়ী শপথ ও পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে মীরাস দেয়া-নেয়া করত প্রথম দিকে। পরে তা বাতিল হয়ে গেছে। শায়বান কাদাতাহ্ থেকে—

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

যে সব লোক তোমাদের শপথ পরস্পর চুক্তিবদ্ধ করে নিয়েছে, তাদেরকে তাদের অংশ দান কর। (সূরা নিসা ঃ ৩৩)

জাহিলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতো। তখন বলত ঃ আমার রক্ত তোমার রক্ত ও আমার ধ্বংস তোমার ধ্বংস। তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার মীরাস পাব। তুমি আমার জন্যে দাবি তুলবে, আমি তোমার জন্যে দাবি তুলব। তারা সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ ইসলামেও নির্ধারিত হয়েছিল। পরে ওয়ারিসরাই তাদের মীরাস গ্রহণ করতে থাকল। পরে আল্লাহ্ এটাকে মনসূখ করে দিলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ -

যবীল আরহাম লোকেরা আল্লাহ্র কিতাবে পরস্পর থেকে পরস্পর উত্তম নিকটবর্তী। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৭৫)

আল-হাসান ইবনে আতীয়াতা তার পিতার— ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

এবং প্রত্যেকের জন্যেই 'আসাবা' বানিয়ে দিয়েছি, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যায় তা থেকে এবং তাদের শপথ যেসব চুক্তিতে আবদ্ধ করে তা থেকে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

অতএব তোমরা তাদের অংশ তাদেরকে দাও।

জাহিলিয়াতের জামানায় এক ব্যক্তির জন্যে আর এক ব্যক্তি শপথ করত। ফলে সে তার অধীন হয়ে যেত। সে যখন মরে যেত, তখন তার মীরাস তার পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে হতো। আর এমন অধীন লোকও থেকে যেত, যারা কিছুই পেতো না। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

আর তোমাদের শপথ যাদেরকে চুক্তিবদ্ধ করত। তাদের অংশও তাদেরকে দাও। তখন তাকে তার মীরাস থেকে দেয়া হতে থাকে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

আতা সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের শপথ যাদেরকে পারস্পরিক

চুক্তিবদ্ধ করেছে তাদেরকেও তাদের অংশ দিয়ে দাও। আর তা এভাবে হতো যে, এক ব্যক্তি জাহিলিয়াতে এবং ইসলামেও আর এক ব্যক্তির বন্ধুত্বের অভিলাষী হতো, তখন তারা দুজন পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতো। তখন একজন অপর জনকে বলত ঃ 'তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার ওয়ারিস হব। যে লোক-ই অপর জনের আগে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন জীবিত জনের জন্যে মৃত ব্যক্তির যে মাল দেয়ার শর্ত করা হতো, তাই তাকে দেয়া হতো। পরে যখন মীরাস বন্টনের আয়াত নাযিল হল, কিন্তু তাতে এই চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদেরকে কোন অংশ দেয়ার উল্লেখ দেখতে পেলো না, তখন এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্র নবী "মীরাস বন্টনের বিধান তো নাযিল হয়েছে ; কিন্তু তাতে চুক্তিবদ্ধ লোকদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। অথচ আমি এক ব্যক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছি। পরে সে মরে গেছে।" তখন এই আয়াতাংশ নাযিল হল, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'যে সব লোকের শপথ পরস্পরকে চুক্তিবদ্ধ করেছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপর প্রত্যক্ষদর্শী।'

আগে কালের সেই ফিকাহবিদগণ জানিয়েছেন যে, শপথকারীর মীরাস ইসলামের ঐতিহ্য অনুযায়ী চালু ছিল, জাহিলিয়াতের প্রথানুযায়ী তারা যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতো সে হিসেবে নয়। তাঁদের কিছু লোক এ-ও বলেছেন। এই প্রথা শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী চালু ছিল না; বরং তারা জাহিলিয়াতের প্রথানুযায়ী অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল, এ জন্যে। আর তা চলছিল মীরাস সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত। পরে সে প্রথা রদ হয়ে যায়।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান— আবূ উবায়দ, আবদুর রহমান, সুফিয়ান, মনসুর, মুজাহিদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র কথা ঃ 'যারা পারস্পরিক শপথে চুক্তিবদ্ধ, তোমরা তাদের অংশ দিয়ে দাও' ব্যাপারটি ছিল এই যে, জাহিলিয়াতের যুগে বহু লোক পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দিতে বলা হল পরামর্শ, বিবেচনা ও বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে। মীরাসের কোন অংশ তাদেরকে দেয়া হয়নি।

আবূ উবায়দ মুয়ায ইবনে আওন ঈসা ইবনুল হারিস, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ -

যবীল-আরহাম লোকেরা পরস্পর থেকে উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী - (সূরা আনফাল ঃ ৭৫)

এ আয়াতটি 'আসাবাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হতো। বলত ঃ 'তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার ওয়ারিস হব।' তারপরে নাযিল হল উপরোক্ত আয়াতাংশ।

আবূ উবায়দ আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ— মুয়াবিয়াতা ইবনে ইবরাহীম, আলী ইবনে আবূ তাল্হা— ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন ঃ 'তোমাদের শপথ কর্তৃক যারা পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও' আয়াতটির প্রেক্ষিতে

হল, একজন আর একজনকে বলত ঃ তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার ওয়ারিস হব। কিন্তু পরে 'যবীল আরহাম লোকেরা পরস্পর থেকে উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী' কথাটি দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে। এ পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি এই ঃ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى اَوْلِيَاءِكُمْ مَّعْرُوْفًا -

এবং রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রা আল্লাহ্‌র কিতাবে কতক থেকে অন্য কতক উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী মুমিন মুহাজির থেকে। তবে তোমরা যদি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক বন্ধুদের জন্যে কোন কল্যাণকর কিছু কর, তবে ....। (সূরা আনফাল ঃ ৭৫)

এর অর্থ, তবে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ লোকেরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের জন্যে কোন অসিয়ত করে ওদের জানিয়ে দেয়া হল, তাতে জাহিলিয়াতের নিয়মে যা করা হতো তা নাকচ হয়ে গেছে 'রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়রা' কথাটির দ্বারা। আর 'ওদেরকে ওদের অংশ দাও'— একথা বলে অসিয়ত বুঝিয়েছেন কিংবা পরামর্শ ও সাহায্যকরণ নীতিতে কিছু করা— তা আলাদা ব্যাপার কিন্তু তা মীরাস বহির্ভূত। আর اولى বলে আয়াতে শপথের দ্বারা মীরাস দান— অর্থ বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যাদের শপথ পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দাও' একটি নির্দিষ্ট অংশ বোঝায়, যা তাদের জন্যে চিহ্নিত হবে। কিন্তু পরামর্শ বিচার-বিবেচনা ও অসিয়ত কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠিত অংশ নয়। একথটি এ কথার মতই পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তি থেকে।

এর বাহ্যিক অর্থই হচ্ছে মীরাস থেকে অংশ নির্ধারণ করা। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও অনুরূপ ঃ 'যাদের শপথ পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধ করেছে তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও।' এ কথার-ও বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যে একটা অংশ নির্ধারণ করা, যার অধিকারী তারা হয়েছে পারস্পরিক চুক্তি ও পরামর্শের ভিত্তিতে। এতে সব মানুষই সমান। কিন্তু এক্ষণে কোন অংশ নির্দিষ্ট নেই। বিচার-বিবেচনায় শপথকারীদের জন্যে তা ওয়াজিব করে বটে, কিন্তু তা তার জন্যে কোন নির্দিষ্ট অংশ নয়। আর অসিয়ত যদি বাধ্যতামূলক কিছু না-ও হয়, তবু তা কোন অংশ নয়। অতএব আয়াতের ব্যাখ্যায় পারস্পরিক শপথের চুক্তির ভিত্তিতে কোন নির্দিষ্ট অংশ ঠিক করাই উত্তম, বক্তব্যের তাৎপর্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যান্য ফিকাহবিদদের এটাই বক্তব্য। আমাদের মতে এ আয়াত মনসূখ নয়। এর ফলে শুধু আর একজন ওয়ারিস পয়দা হল মাত্র, যে অন্যদের থেকে উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী। যেমন যার ভাই আছে তার একজন পুত্র জন্ম হওয়া, তা ভাইকে মীরাসধারী হওয়ার আওতা থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে না। অবশ্য এই পুত্র ভাই থেকে উত্তম, অধিক নিকটবর্তী। 'যবীল-আরহাম' আত্মীয়রাও এমনিভাবে শপথকারী অপেক্ষা উত্তম ও নিকটবর্তী। যখন যবীল আরহাম বা আসাবা কেউ থাকবে না, তখন এই চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিই ওয়ারিস হবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ সমস্ত মালের অসিয়ত করাকে জায়েয বলেছেন, যার কোন ওয়ারিস নেই সে তা-ই করবে, এটাই স্বাভাবিক।

মুখের দাবি ও পালক পুত্র গ্রহণের মাধ্যমে মীরাসের অংশ দেয়ার ব্যাপারটি এরূপ যে, সেকালে অন্য একজনের পুত্রকে নিজের পুত্র বানাত, তার জন্মদাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পালকের বাংশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত। নিজেকে সে বংশের অধঃস্তন প্রমাণ করত। আর সে-ই হতো তার উত্তরাধিকারী। ইসলামের আগমনের পরও তা চালু ছিল। নবী করীম (স) জায়দ ইবনে হারিসাকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। এজন্যে তাঁকে বলা হতো জায়দ ইবনে মুহাম্মাদ। পরে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ -

মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারোরই পিতা নয়। (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَايَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ -

যায়দ যখন জয়নব বিনতে জহশ থেকে যৌন প্রয়োজন পূরণ করে নিল, তখন তোমার নিকট তাকে বিয়ে দিলাম, যেন মুমিনদের জন্যে তাদের মুখ-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ে করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধক— দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবশিষ্ট না থাকে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৭)

বললেন ঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْآ اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ -

তোমরা তাদের জন্মদাতা পিতার পুত্র হিসেবে ডাক। আল্লাহ্‌র নিকট তা-ই ন্যায়পর নীতি। তোমরা তাদের পিতাকে, যদি না-জান, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই তো বটে এবং তোমাদের বন্ধু— পৃষ্ঠপোষক। (সূরা আহযাব ঃ ৫)

আবূ হুযায়ফা ইবনে উতবা সালিমকে পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। তাই তাকে বলা হতো সালিম ইবনে আবূ হুযায়ফা। পরে আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ 'ওদেরকে ওদের জন্মদাতা পিতাদের নামে ডাক।' জুহরী উরওয়া— আয়েশা (রা) সূত্রে একথা বর্ণনা করেছেন। এর ফলে পালক পুত্রকে পুত্র ডাকার নিয়ম বাতিল করে দিলেন। এ কারণে তাকে মীরাস দেয়ার যে রীতি চালু তা-ও বন্ধ করে দিলেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল্লাহ্ ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান আল-মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ্, লায়স, উকাইল ইবনে শিহাব সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সাঈদ ইবনে যুবায়র আমাকে বলেছেন ঃ 'তোমাদের শপথ পারস্পরিক চুক্তিতে যাদের আবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও'— এ আয়াতটি আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে নাযিল করেছেন, যারা লোকদেরকে পালক পুত্র বানাত এবং তাদেরকে

মীরাস দিত। তখন তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ এ ফরমান নাযিল করলেন যে, তাদের নামে অসিয়ত করে কিছু অংশ তাদেরকে দাও। আর মীরাসের অংশ যবীল আরহাম ও আসাবাদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। মুখ-ডাকা পুত্রদেরকে মীরাস দেয়াকে আল্লাহ্ অগ্রাহ্য করলেন। তবে অসিয়তের মাধ্যমে তাদেরকে কিছু দেয়ার সুযোগ রাখলেন। এভাবে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে যে মীরাস দেয়া হতো, তা রদ করা হল।

আবূ বকর আল-জাস্সাস বলেছেন ঃ 'তোমাদের শপথ যাদেরকে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দাও 'আল্লাহ্‌র এ কথা শপথ ও পালক পুত্র সকলকেই শামিল করে। কেননা এর প্রত্যেকটাই আসলে চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। চুক্তির ভিত্তিতেই কিছু একটা চালু হয়। এই যা কিছু বললাম, এটা ছিল জাহিলিয়াতের যুগের মীরাস বণ্টনরীতি। ইসলামে এর কিছুটা বা কোন-কোনটিকে চালু রাখা হয় এবং তা অঙ্গীকারের মাধ্যমে মাত্র। তার কিছুটা স্থানান্তরিত হয়, কোনটা অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে রদ করা হয়, কোনটা শরীয়াতের দলীল দ্বারাই চালু রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত যা চালু রাখার প্রয়োজন ছিল তা চালু রাখা হয়।

তবে ইসলামের মিরাসী আইন দুটি জিনিস দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। একটি বংশীয় সম্পর্ক আর দ্বিতীয়টি 'কারণ', বংশীয় সম্পর্ক নয়। বংশীয় সম্পর্কের দরুন যে মীরাস পাওনা হয়, তা শুধু তা-ই যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং যার কোন-কোনটা রাসূল (স) বলেছেন। কোন-কোনটির উপর উম্মতের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনটির পক্ষে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আর ইসলামে যে 'কারণ'-এর জন্যে মীরাস হয়, তার কতক প্রমাণিত, কতক মনসূখ হয়ে গেছে। ইসলামের যে কারণসমূহের দরুন মীরাস হয়, তার কিছুর উল্লেখ করেছি পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে ও মুখ-ডাকা লোকের মীরাস। এ পর্যায়ের হুকুম আমরা উল্লেখ করেছি। আর যার যার মনসূখ হয়ে যাওয়া বর্ণিত হয়েছে তা। অবশ্য আমাদের মতে তা মনসূখ নয়। কোন কোন ওয়ারিস অপর কোন কোন ওয়ারিসের তুলনায় উত্তম।

যেসব কারণে আল্লাহ মীরাসের ব্যবস্থা করেছিলেন, তন্মধ্যে 'হিজরত' একটি। জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা আল-খুরাসানী, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্ কথা ঃ

انَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْآ اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا -

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও নিজেদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক।

আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের কোন পৃষ্ঠপোষকতা একবিন্দু তোমাদের জন্যে নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে। (সূরা আনফাল ঃ ৭২)

বলেছেন, মুহাজিররা আরব-বেদুঈনদের পৃষ্ঠপোষকতা করত না, তাকে উত্তরাধিকারীও বানাতো না। অথচ সে মুমিন । আর মরুবাসী ও মুহাজিরকে ওয়ারিস বানাতো না। তাই সেই প্রথাটি মনসূখ হয়ে যায় এ আয়াত দ্বারা ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ - (النمل : ٧٥)

কেউ কেউ বলেছেন ঃ এ আয়াতটি সেটিকে মনসূখ করেছে ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -

তারা রাসূলে করীম (স)-এর কায়েম করা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেও মীরাস দেয়া নেয়া করতেন। (সূরা নিসা ঃ ৩৩)

হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) যুবায়র ইবনুল আওয়াম ও কাব ইবনে মালিক (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে কাব আহত হলেন। যুবায়র এসে তার বাহনের লাগাম ধরে চালাতে লাগলেন। কাব (রা) যদি বিপুল ধন-সম্পদ রেখে মরে থাকেন, তাহলে যুবায়র তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। ইতিমধ্যেই নাযিল হল ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ -

যবীল আরহাম পরস্পরের আসাবা। (সূরা আনফাল ঃ ৭৫)

ইবনে জুরাইয সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ মুহাজির ও আনসাররা রাসূলে করীম (স)-এর কায়েম করা ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পরস্পরের ওয়ারিস হতেন তাঁর আপন রক্তের ভাইয়ের পরিবর্তে। কিন্তু এ আয়াতাংশ যখন নাযিল হল ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -

এবং প্রত্যেকের জন্যে আসাবা বানালাম সেই ধন-সম্পদে, যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং তা আগের ব্যবস্থাকে মনসূখ করে দিল। (সূরা নিসা ঃ ৩৩)

তারপরে আল্লাহ্ বললেন ঃ

وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ -

এবং তোমাদের শপথ! তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে চুক্তিবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। (সূরা নিসা ঃ ৩৩)

এ পারস্পরিক চুক্তিটা সম্পন্ন হয়েছে সাহায্যের কারণে। হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদীসের মাধ্যমে উল্লেখ করলেন যে, 'তোমাদের শপথভিত্তিক পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধতা বলতে সেই ভ্রাতৃত্ব বোঝানো হয়েছে, যা নবী করীম (স) তাদের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন।

মামার কাতাদাতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের তাদের পৃষ্ঠপোষকতার একবিন্দুও নেই'- এর অর্থ, মুসলমানরা হিজরত ও ইসলামের কারণে পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতেন, তখন একজন ইসলাম কবুল করত, কিন্তু হিজরত করত না, সে তার দ্বীনি ভাইর মীরাস পেত না। তখন আল্লাহ সেই ব্যবস্থাকে মনসূখ করে দিলেন। বললেন ঃ 'যবীল আরহাম পরস্পর থেকে পরস্পর উত্তম আল্লাহ্‌র কিতাবে মুমনি মুহাজিরদের মধ্যে থেকে।'

জাফর ইবনে সুলায়মান আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ একজন মুসলিম আরব একজন মুহাজির থেকে একবিন্দু মীরাস পেত না। যদিও তাঁরা নিকটবর্তী ও নৈকট্য সম্পন্ন ছিলেন। তাদেরকে হিজরত করার জন্যে উৎসাহ দেয়াই ছিল তার কারণ। শেষে মুসলমানদের সংখ্যা যখন বিপুল হয়ে গেল, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ যবীল আরহাম মুমিন মুহাজিরদের মধ্য থেকে পরস্পরের তুলনায় উত্তম ও নিকটবর্তী। এই আয়াতটি পূর্ব ব্যবস্থাকে মনসূখ করে দিল। সেই সাথে বলে দিলেন ঃ

তবে তোমরা যদি তোমাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কোন কল্যাণ কর (তবে তা ভিন্ন কথা)।

এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম ব্যক্তিকে ইয়াহুদী, খৃস্টান, মজুসীদের মধ্য থেকে নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে অসিয়ত করার সুযোগ দিলেন। বলেছেন ঃ

كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا -

তা কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৬)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঠিক যে কয়টি কারণে মীরাস দেয়া-নেয়া হতো, তা হল পালক পুত্র গ্রহণ, শপথ, হিজরত, রাসূলের করীম (স)-এর কায়েম করা আনসার-মুহাজিরের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক। পরে পালিত পুত্রকে মীরাস দেয়া, হিজরতের কারণে মীরাস দেয়া ও ভ্রতৃ সম্পর্কের কারণে মীরাস দেয়ার রীতি মনসূখ হয়ে যায়। তার শপথের ব্যাপারে, এ বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি যে, নিকটাত্মীয়তাকে তার চাইতেও উত্তম ঘোষণা করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ মনসূখ করা হয়নি। তা কার্যকর হচ্ছিল, যখন নিকটাত্মীয়তা অনুপস্থিত হতো। তার জন্যে সমস্ত ধন-মাল কিংবা তার কিছুটা দিয়ে দেয়া জায়েয ছিল। ইসলামে আরও একটি কারণে পারস্পরিক মীরাস দেয়া নেয়া হতো। তা হল দাসত্ব মুক্তির চুক্তি, বৈবাহিক চুক্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তি। আমাদের মতে এগুলো শপথভিত্তিক মীরাস দান। যখন যবীল আরহাম বা আসাবা ওয়ারিস একজনও থাকবে না, তখন সেই হুকুমটি কার্যকর হবে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামের মীরাসের আইন কার্যকর হতো দুটি মৌলিক ভিত্তি উপর ঃ একটি বংশীয় সম্পর্ক, আর দ্বিতীয় সজ্ঘটিত কারণ। এই কারণ ছিল বিভিন্ন ধরনের ও প্রকারের। যথা শপথভিত্তিক চুক্তি, পালক পুত্র বানানো, ভ্রাতৃত্ব— যা রাসূল (স) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে কায়েম করেছিলেন; হিজরত, বৈবাহিক, মুক্তিদান চুক্তি, বন্ধুত্বের চুক্তি। শপথ, পালক পুত্র গ্রহণ ও রাসূল (স)-এর কায়েম করা ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক মনসূখ হয়ে গেল আসাবা, যবীল আরহাম, দাসমুক্তির চুক্তি, বন্ধুত্বের চুক্তি ও বৈবাহিক চুক্তির বর্তমানতায়— এইগুলো প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর থাকল, পরম্পরা শর্তানুযায়ী এগুলোর ভিত্তিতে মীরাস দেয়া-নেয়া চলতে থাকল।

আর বংশের ভিত্তিতে মীরাস দেয়া-নেয়া তিন ভাগে বিভক্ত। সুনির্দিষ্ট অংশীদারী, আসাবা ও যবীল আরহাম। এ কয়টি বিষয়ের বর্ণনা যথাস্থানে দেয়া হবে। বংশ সম্পর্কের দিক দিয়ে মীরাস দেয়া-নেয়া হয় নির্দিষ্ট অংশধারী— আসাবা ও যবীল-আ'রহামকে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَ قْرَبُوْنَ -

পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে এবং মেয়েদের জন্যেও নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِىْ الْكِتٰبِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَاتُؤْتُوْنَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ يَّنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ -

আর যা তোমাদের সম্মুখে কিতাবে পাঠ করা হয় মেয়েদের, ইয়াতীমদের সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা তা দাও না যা তাদের জন্যে লিখে দেয়া হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী আর দুর্বল অক্ষম সন্তানাদি .... (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৭)

এ দুটি আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে ইবনে আব্বাস ও আগের কালের অন্যান্য ফিকাহবিদদের থেকে পাওয়া বর্ণনা অনুযায়ী— আগে যে রেওয়াজ ছিল— যোদ্ধা ব্যক্তিদের মীরাস দেয়া এবং অন্যান্য পুরুষ, মেয়েলোক ও ছোটদের মীরাস না দেয়ায়, তা বাতিল হয়ে গেল।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন।

এতে সুনির্দিষ্ট অংশ দেয়ার বর্ণনা রয়েছে, যা বলা হয়েছে ঃ পুরুষের জন্যে অংশ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا সুনির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত। 'আর তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বিধান দিচ্ছেন' কথার মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট অংশের পরিমাণটা বলে দেয়া হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত— তিনি পড়লেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَلْاَقْرَبُوْنَ -

তোমাদের কারোর মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময় ধন-মাল রেখে যেতে থাকলে তোমাদের উপর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত করা ফরয করে দেয়া হয়েছে।

এর পর তিনি বললেন ঃ এ আয়াতটিকে মনসূখ করেছে এ আয়াত ঃ 'পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে'; মুজাহিদ বলেছেন, শুরুতে মীরাস দেয়া হতো সন্তানদেরকে। আর পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত করা হতো। পরে আল্লাহ্ তা মনসূখ করে যা তিনি পছন্দ করেছেন, তাই চালু করেছেন। তখন পুরুষ সন্তানকে দুই কন্যা সন্তানের অংশ দেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করলেন এবং পিতা ও মাতা দুজনের প্রত্যেকের জন্যে সন্তান থাকা অবস্থায় এক-ষষ্ঠাংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ অবস্থা এই ছিল যে, কেউ মরে গেলে এবং পেছনে তার স্ত্রী রেখে গেলে সেই স্ত্রী স্বামীর ঘরে পূর্ণ একটি বছর কাল 'ইদ্দত' পালন করত। তখন স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তি থেকেই তার ভরণ-ভোষণ চালানো হতো। এর কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ -

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীদের জন্যে এক বছরের জীবনোপকরণ দেয়ার অসিয়ত করতে হবে, ঘর থেকে বহিষ্কৃত করা ছাড়া।

(সূরা বাকারা ঃ ২৪০)

পরে এ হুকুমও মনসূখ হয়ে যায় এবং তদস্থলে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ দেয়ার ব্যবস্থা চালু হয়।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'যবীল আরহাম কতকের তুলনায় কতক উত্তম— অধিক নিকটবর্তী' এর দ্বারা শপথ, হিজরত ও পালক গ্রহণের ভিত্তিতে মীরাস পাওয়া দেয়া— যেমন পূর্বেই বলেছিল-রীতি মনসূখ হয়ে যায়।

এমনিভাবে আল্লাহ্র কথা ঃ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ 'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করছেন' আয়াত 'মুহকাম'। এটি মনসূখ হয়নি। এবং এটি কারণ হয়েছে মীরাসের কারণগত ভিত্তি— যা পূর্বে বলা হয়েছে— মনসূখ হওয়ার। কেননা এতে মীরাসটা কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। ফলে ওসব কারণের দরুন মীরাসের কিছু দেয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকল না। এরূপ অবস্থায় তাদের হক প্রত্যাহার করার কারণ ঘটে গেল।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উকায়ল জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আনসার বংশের একজন মহিলা তার দুই কন্যা সহ উপস্থিত হলেন। বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! সাবিত ইবনে কায়সের এ দুইটি কন্যা। সাবিত ওহোদ যুদ্ধে আপনার সাথে গিয়ে শহীদ হয়েছে। ওদের চাচা ওদের জন্যে রক্ষিত সব ধন-মালই নিয়ে নিয়েছে। এক্ষণে আপনি কি মনে করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ? এ অবস্থায় এ মেয়ে দুটির বিয়েও হবে না, কেননা ধন-মাল না থাকলে মেয়ে বিয়ে দেয়া যায় না।

তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ আল্লাহই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন। তখন সূরা আন-নিসার এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে ফায়সালা করে দিচ্ছেন ঃ একজন পুরুষ সন্তানের অংশ হবে দুই জন মেয়ে সন্তানের অংশ।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (স) বললেন ঃ মেয়েলোকটিকে এবং তার সঙ্গীকে আমার নিকট ডেকে আন। তারা উপস্থিত হলে তিনি মেয়ে দুটির চাচাকে বললেন ঃ

اَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ -

এ মেয়ে দুটিকে মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ দাও, তাদের মাকে দাও আট ভাগের এক ভাগ। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তোমার জন্যে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এ হাদীসটির তাৎপর্য ব্যাপক। এক-জাহিলিয়াতের জামানার নিয়মানুযায়ী মেয়ে দুটি কিছুই পায় না, সব মীরাস পায় চাচা। কেননা তখনকার নিয়ম ছিল যোদ্ধাকে মীরাস দেয়া, মেয়েলোককেও নয়, বালক-বালিকাদেরকেও নয়। তাই মেয়েলোকটি যখন নবী করীম (স)-কে অবস্থার বিবরণ দিয়েছিল ও জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তার কথাকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। প্রচলিত যে নিয়ম ছিল, তাকে তিনি অপরিবর্তিতই রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, এর ফায়সালা আল্লাহ্ই করবেন। পরে এ আয়াত নাযিল হলে চাচাকে মেয়ে দুটির ও তাদের মার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দিতে আদেশ করলেন।

এ কথা প্রমাণ করে যে, চাচা প্রথমেই মীরাস নিয়ে নিতে তওকীফ-এর দিক দিয়ে পারত না, সে সেদিক থেকে তা নেয়ওনি; বরং নিয়েছে জাহিলিয়াতের নিয়ম রীতি অনুযায়ী। তখন যে নিয়মে মীরাস বণ্টন হতো সেই নিয়মে। কেননা যদি তা-ই হতো, তাহলে আয়াতটির নাযিল হওয়ার পরই মীরাস নেয়ার কাজ হতো। পূর্ববর্তী আইনের হুকুমে যা হবার তাই হয়েছে। মনসূখ হওয়ার কথা বলে তার উপর আপত্তি জানানো যায় না। বোঝা গেল, চাচা জাহিলিয়াতের নিয়মানুযায়ীই সব মাল নিয়ে নিয়েছে, তা থেকে তারা সরে দাঁড়ায়নি।

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। তখন রাসূলে করীম (স) আমাকে দেখার জন্যে আসেন। তখন আমার বেহুঁশ অবস্থা। রাসূলে করীম (স) এসে অযূ করলেন, তাঁর অযূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমার হুঁশ হল। আমি বললাম, হে রাসূল! আমার ধন-মাল সম্পর্কে আমি কিভাবে ফায়সালা করব ? কিন্তু তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। এরপর মীরাসের আয়াত নাযিল হয়, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন, 'একজন পুরুষ সন্তানকে দুই মেয়ের সমান অংশ দিতে হবে।'

আবূ বকর বলেছেন ঃ প্রথমোক্ত হাদীসটিতে স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়ের কিস্সা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে, জাবির তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। এ-দুটি কথাই ঠিক

হতে পারে। মেয়েলোকটি রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে কোন জবাব দেননি, হয়ত তিনি ওহী নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। পরে যখন হযরত জাবির (রা) তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁকে ধন-মাল কি করা হবে, এই প্রশ্ন করেছিলেন। আর ঠিক তখন আয়াতটি নাযিল হয়। তাতে এ দুজনেরই জিজ্ঞাসার জবাব বিবৃত।

আয়াতটি প্রতিষ্ঠিত হুকুম কার্যকর, শাশ্বত। নির্দিষ্ট অংশ বলে দেয়, যার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এই বলে ঃ "পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যাবে, তা থেকে। মেয়েদের জন্যেও নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যাবে তা থেকে।" আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে "আল্লাহ্ হুকুম দিচ্ছেন" বলে নিজ ঔরসজাত সন্তানদেরকেই বোঝানো হয়েছে। সন্তানের সন্তান নিজ ঔরসজাত সন্তানের সঙ্গে একত্রে শামিল গণ্য হবে না। আর যখন নিজ ঔরসজাত সন্তান থাকবে না, তখন সন্তান বলতে বোঝাবে পুত্রদের সন্তান, কন্যাদের সন্তান নয়। বোঝা গেল, 'সন্তান' বলতে নিজ ঔরসজাত সন্তান, আর তা কেউ না থাকলে পুত্রদের সন্তানদের বোঝাবে ব্যবহৃত শব্দ থেকেই।

এ কথা থেকে হানাফী ফিকাহবিদদের মতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যদি কেউ অসিয়ত করে বলে, 'অমুকের সন্তানের জন্যে অসিয়ত' তাহলে তা নিজ ঔরসজাত সন্তানদেরকেই শামিল করবে। আর নিজ ঔরসজাত সন্তান না থাকলে তার নিজ ঔরসজাত পুত্রের ঔরসজাত সন্তান বোঝাবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

একজন পুরুষ সন্তানের জন্যে দুজন মেয়ের অংশের সমান পরিমাণ হবে।

অর্থাৎ একজন পুরুষ সন্তান যা পাবে, তার অর্ধেক পাবে একজন কন্যা সন্তান। অথবা একজন কন্যা সন্তান যা পাবে, তার দ্বিগুণ পাবে একজন পুরুষ সন্তান।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, কারোর যদি ছেলে ও মেয়ে— উভয় ধরনের সন্তান থাকে তাহলে পুরুষ ছেলে পাবে দুটি অংশ, আর মেয়ে পাবে একটি অংশ। এ-ও বোঝা যায় যে, সন্তান যদি ছেলেতে-মেয়েতে মিলে অনেক সংখ্যক হয়, তা হলে প্রত্যেক ছেলে-সন্তান দুইটি অংশ পাবে। আর প্রত্যেক কন্যা সন্তান একটি অংশ পাবে। এ থেকে একথাও জানা গেল যে, নির্দিষ্ট অংশ প্রাপকদের সাথে যদি সন্তান থাকে যেমন পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রী নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার অধিকারীরা তাদের নিজ নিজ অংশ নিয়ে নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা একজন পুরুষ সন্তানের জন্যে দুই জন কন্যার অংশ হিসেবে বণ্টন করা হবে। তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ একজন পুরুষ সন্তানের জন্যে দুই কন্যা সন্তানের অংশ কথাটি নীতিগত কম বা বেশি উভয় পরিমাণই তাতে শামিল। তাই নির্দিষ্ট অংশদারীদের অংশ নিয়ে নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ-মেয়ে সন্তানের মধ্যে উক্ত নীতির ভিত্তিতে ভাগ করে দেয়া হবে— যেন নির্দিষ্ট অংশের প্রাপক কেউ নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ -

মৃতের যদি কেবল মেয়ে সন্তানই থাকে এবং তারা দুই বা ততোধিক হয়, তাহলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর একজন হলে সে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

দুজনার বেশি কন্যা সন্তান হলে কিংবা মাত্র একজন হলে তারা কি পাবে, তা স্পষ্ট ভাষায় আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে; কিন্তু মাত্র দুজন হলে তারা কি পাবে, তা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়নি। তার কারণ, বলার ধরন থেকেই দুজনার অংশ কত তা বোঝা যায়। তা এজন্যে যে, একজন পুত্র সন্তানের সাথে একজন কন্যা সন্তান থাকলে সে এক-তৃতীয়াংশ পাবে। দুজনার অধিক থাকলে কি পাবে, তার দলীল তো আমরা কুরআনের ভাষায়ই পেয়েছি। এই কারণে দুজন সন্তানের প্রাপ্য অংশের কথা আপনা-আপনি জানা যায়।

উপরন্তু আল্লাহ্ যখন বললেন ঃ পুরুষ সন্তানের জন্যে দুই কন্যার অংশ, এর পর যদি একজন পুত্র ও একজন কন্যা থাকে, তাহলে পুত্র সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ থেকে দুইটি অংশ পারে। আর তাই-ই হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ। তাই এ থেকে বোঝা গেল যে, দুইজন কন্যা-সন্তান থাকলে তারা দুইজন মিলিত ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। কেননা আল্লাহ পুত্রের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন দুই কন্যার অংশের সমান। আর তা হচ্ছে দুই তৃতীয়াংশ। এ থেকে বোঝা যায়, দুই কন্যার জন্যেও দুই-তৃতীয়াংশ, এভাবে যে, আল্লাহ্ ভাই ও বোনদেরকে কন্যাদের পর্যায়ে ধরেছেন। আর একজন বোনকে একজন কন্যার পর্যায়ে। এ কথা বলেছেন এ আয়াতে ঃ

اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান না থাকে— থাকে একজন বোন, তা হলে সে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। (সূরা নিসা ঃ ১৭৬)

এরপর বলেছেন ঃ

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

বোন যদি দুজন হয় তাহলে তারা মিলিতভাবে রেখে যায়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর ভাই-বোন-পুরুষ, মেয়ে লোক উভয় থাকে, তাহলে একজন পুরুষের (ভাইর) জন্যে দুইজন মেয়ের অংশ হবে। (সূরা নিসা ঃ ১৭৬)

এ আয়াতে দুই বোনের অংশ বানানো হয়েছে দুই জনের অধিক সংখ্যকের অংশের সমান। আর তা হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ। যেমন এক বোনের অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে একজন কন্যার অংশের সমান এবং তাদের জন্যে এই বিধান দিয়েছেন যে, তারা পুরুষ ও মেয়েলোক উভয় হলে দুইজন মেয়ের অংশের সমান পাবে একজন পুরুষ। তাই দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তিতে দুই কন্যা দুই বোনের

সমান হয়ে দাঁড়াল। কেননা অন্য কেউ না থাকলে দুই মেয়ের অংশের সমান একজন পুরুষের অংশ— এই নিয়মানুযায়ী সম্পত্তি প্রাপ্তিতে তারা সমান। যেমন এক বোন এক কন্যার সমান— যখন তাদের সাথে অন্য কেউ হবে না— নির্দিষ্টভাবে অর্ধেক পাওয়ার অধিকারে। সেই সাথে দুই কন্যাতো আরো উত্তমভাবে তা পাবে, যখন তারা দুই বোনের তুলনায় মৃতের অধিক নিকটে। আর বোন যখন কন্যার মত, তাহলে দুই কন্যাও দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়ার ব্যাপারে সমান হবে। হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস-ও তা প্রমাণ করে। সেই মেয়েলোকটির কাহিনীতে নবী করীম (স) দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ দেয়ার হুকুম দিয়েছিলেন এবং সে স্ত্রী লোকটিকে এক-অষ্টমাংশ এবং চাচাকে অবশিষ্ট যা থাকবে তা সম্পূর্ণ।

এই ব্যাপারে বিপরীত মত কেউ প্রকাশ করেনি। তবে একটি বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এসেছে এই মর্মে যে, তিনি দুই কন্যাকে এক কন্যার মতই অর্ধেক সম্পত্তি দেয়ার কথা বলেছেন। এ পর্যায়ে দলীল হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন আল্লাহ্র এই কথা ঃ 'মেয়েরা দুজনের অধিক হলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।'

কিন্তু দুই কন্যার জন্যে অর্ধেক সম্পত্তি দেয়ার কোন দলীল একথায় নেই। তাতে আছে দুই কন্যার অধিক সংখ্যক হলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। এখন কেউ যদি বলেন যে, দুই কন্যার জন্যে দুই তৃতীয়াংশ, তাহলে আয়াতের বিপরীত মত গ্রহণ করা হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এক কন্যার জন্যে অর্ধেক ঘোষণা করেছেন— যখন সে একজন হবে। আর আপনি দুই কন্যার জন্যে দিলেন অর্ধেক। তা যে আয়াতের বিপরীত তা স্পষ্ট। দুই কন্যার জন্যে অর্ধেক সম্পত্তি দিলে যদি আয়াতে বিরোধিতা না হয়— যদিও আল্লাহ মাত্র একজন কন্যার জন্যে অর্ধেক নির্দিষ্ট করেছেন, তাহলে দুইজন কন্যার জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ ঘোষণা করা হলে তাতে আয়াতের বিরুদ্ধতা হবে না। কেননা 'তারা দুজনের অধিক হলে তারা মিলিতভাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে' আল্লাহ্র এই কথার দ্বারা দুই কন্যা থাকলে তাদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ দেয়াকে অস্বীকার করেন নি, তার বিরুদ্ধেও বলেন নি। স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে শুধু দুইজনের অধিক সংখ্যা সম্পর্কে। আর আমরা যেভাবে বিশ্লেষণ দিয়েছি, তাতে সে দুইজন সংক্রান্ত হুকুম স্বতই জানা যায় মূল কালাম থেকেই। আরও উল্লেখ করেছি, দুই বোন সংক্রান্ত হুকুম যে দলীল থেকে পাওা গেছে, সেই দলীল থেকেই দুই কন্যা সম্পর্কিত হুকুম সহজেই জানা যায়। একথাও বলা হয়েছে যে, 'তারা দুইজনের অধিক মেয়েলোক হলে' আল্লাহ্র এই কথায় فوق শব্দটি যদি কালামের صله হয়— যেমন فاضربوا فوق الاعناق ও وَلَا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ এবং পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ হবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে, যদি তার সন্তান থাকে বাহ্যত মনে হয় যে, এ কথার ফলে পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্যে এক ষষ্ঠাংশ হবে সন্তান থাকলে, তা পুরুষ হোক বা মেয়ে। কেননা الولد —সন্তান বলতে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই শামিল করে। তবে সন্তান যদি একজন কন্যা হয়, তাহলে সে কখনই অর্ধেক সম্পত্তির বেশি পাবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ -

মেয়ে যদি একজন হয় তবে সে অর্ধেক পাবে, তার বেশি নয়।

আর পিতামাতার প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। তা-ও আয়াতের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে। অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ পিতা পাবে 'আসাবা' হয়ে। এ ক্ষেত্রে পিতা অংশ নির্ধারণের আওতায় নির্দিষ্টভাবে অংশ পাওয়া এবং অনির্দিষ্টভাবে আসাবা হিসেবে পিতার ক্ষেত্রে এ দুটি একত্রিত হল। আর সন্তান যদি পুরুষ হয়, তাহলে পিতা-মাতা দুজনের জন্যে দুই এক-ষষ্ঠাংশ হবে কুরআনের ঘোষণানুযায়ী। আর অবশিষ্ট যা তাও পুত্র পাবে, কেননা পিতার দিক দিয়ে 'আসাবা' হিসেবে সে অতীব নিকটবর্তী।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ -

মৃতের যদি কোন সন্তান না থাকে, আর তার ওয়ারিস হয় শুধু তার পিতা-মাতা, তাহলে তা মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

এ আয়াতে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে পিতামাতার মীরাসের কথা বলা হল, পরে আলাদা করে মার অংশের কথা এবং তার পরিমাণ বলে দেয়া হয়েছে ঃ 'তার মার জন্যে এক-তৃতীয়াংশ' বলে। কিন্তু পিতার কোন নির্দিষ্ট অংশের কথা বলা হয়নি। বাহ্যত মনে হয়, পিতার জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ হবে। কেননা এখানে সে ছাড়া মীরাস পাওয়ার আর কেউ নেই। অথচ শুরুতেই পিতা-মাতার মীরাসের কথা বলে দেয়া হয়েছে। তাতে ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক দাবি হচ্ছে সমতার— সমান সমান পাওয়ার। যদি শুধু বলা হতো ঃ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ —'তার পিতা-মাতা-ই তার ওয়ারিস হবে', মার অংশের কথা আলাদাভাবে যদি বলা না হতো তাহলে তা-ই হতো। কিন্তু 'মার অংশ এক-তৃতীয়াংশ' বলে যখন নির্দিষ্ট করা হল, তখন জানা গেল যে, এখানে পিতার প্রাপ্য হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ -

মৃতের একাধিক ভাই থাকলে তার মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফ্ফান, জায়দ ইবনে সাবিত এবং অন্যান্য সব মনীষী বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি যদি দুই ভাই ও পিতা-মাতা রেখে যায়, তাহলে তার মা ষষ্ঠাংশ পাবে। আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে তার পিতা। মার অংশ তখন এক-তৃতীয়াংশ আড়াল-কৃত হয়ে তা এক-ষষ্ঠাংশে এসে দাঁড়াবে, যেমন তিন ভাই থাকার দরুন তারা মার অংশকে আড়ালবর্তী করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, মার মীরাস হচ্ছে এক-তৃতীয়াংশ । তাকে ভাই ও বোনদের তিন জন না হলে সে আড়ালবর্তী হয় না। মামার ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি যদি পিতা-মাতা ও তিন ভাই রেখে যায়, তাহলে মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ, আর ভাইরা পাবে সেই এক-ষষ্ঠাংশ যা থেকে মা আড়ালবর্তী হয়েছে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সব-ই পিতার। তাঁরই থেকে বর্ণিত। তার দিক দিয়ে যদি একাধিক ভাই থাকে, তাহলে বিশেষভাবে তাদের প্রাপ্য হবে এক-ষষ্ঠাংশ। আর তারা পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে হয় কিংবা হয় শুধু

পিতার দিক থেকে, তা হলে তারা কিছুই পাবে না। এক-ষষ্ঠাংশ বাদে যা থাকবে তা পিতা পাবে।

প্রথম কথাটির দলীল হল ঃ اخوة। 'ভাই গণ' বলতে দুইজন ভাই-ও বোঝায়।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمْ -

তোমরা দুইজন যদি আল্লাহ্র নিকট তওবা করে ফিরে যাও— তাহলে তোমাদের দুজনার হৃদয় তো ঝুঁকেই আছে। (সূরা তাহরীম ঃ ৪)

এখানে দুই জনের দুই হৃদয় বলা ও বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَهَلْ اَتَاكَ نَبَاُ الْخَصْمِ اِذْتَسَوَّرُوْا الْمِحْرَابِ -

এবং তোমার নিকট কি ঝগড়াকারী পক্ষের খবর পৌঁছেছে যখন তারা প্রাচীর টপকিয়ে মেহরাবে ঢুকে পড়ল ? (সূরা সোয়াদ ঃ ২১

পরে বলেছেন ঃ

خَصْمَانِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ -

দুই বিবদমান পক্ষ— আমাদের কতক অপর কতকের উপর বিদ্রোহ করল।
(সূরা সোয়াদ ঃ ২২)

এ আয়াতে দুইজন বোঝাবার জন্যে বহু বচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

আর তারা যদি ভাই পুরুষ ও নারী হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একজন পুরুষের দুই জন মেয়ের অংশ এই নীতিতে মীরাস বণ্টন করা হবে।

যদি এক ভাই ও এক বোন হয়, তাহলেও আয়াতের হুকুম কার্যকর হবে সেই দুজনের মধ্যেই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ -

দুইজন ও দুইজনের অধিক হলেই জামা'আত হয়।

আর দুই থেকে তিন পর্যন্ত জামা'আত গণ্য। দুইজন থেকে একজনের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী, কেননা 'বহুত্ব' ভাবটি দুজনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যেমন তুমি বললে ঃ 'তারা দুজন দাঁড়াল এবং তারা বসল ও দাঁড়াল— দুইজন সম্পর্কে এরূপ বলা সমীচীন, তিনজন সম্পর্কেও। কিন্তু একজন সম্পর্কে তা বলা যায় না। অতএব দুইজন যখন শব্দের হুকুমে তিনজনের অতি নিকটে— একজন অপেক্ষাও তাই দুইজনকে তিনজনের পর্যায়ে ধরা—

একজন অপেক্ষা— খুবই সমীচীন। আবদুর রহমান ইবনে আবুজজিনাদ— তাঁর পিতা— খারেজাতা ইবনে জায়দ— তার পিতা থেকে বর্ণিত, দুই ভাই থাকলে মা আড়ালে আবৃত হবে, তখন তাঁরা বললেন ঃ হে আবূ সাঈদ! আল্লাহ বলেছেন ঃ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ যদি তার একাধিক ভাই থাকে। (তাহলে তার মীরাস হবে); কিন্তু তুমি বলছ ঃ দুই ভাইর দ্বারা মা আড়ালবর্তী হয়ে যাবে ? তখন তিনি বললেন ঃ আরবরা দুই ভাই থাকলেও إخوة (ভাইগণ) বলে। এ কথা যখন প্রমাণিত যে, আরবরা দুই ভাই হলে إخوة (ভাইগণ) বলে, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, এখানে দুই ভাইকেও إخوة বলা হয়েছে। অতএব ব্যবহৃত শব্দ তাদের দুজনকেই শামিল করবে। উপরন্তু একথাও প্রমাণিত যে, দুই বোনের জন্যে যা বলা হয়েছে, তা দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে তিন বোনের জন্যেও প্রযোজ্য ঃ

কুরআনের আয়াত ঃ

وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ -

যদি তারা দুজন হয়, তাহলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। মার দিক থেকে দুই বোনও এক-তৃতীয়াংশ পাওয়ার অধিকারের দিক দিয়ে তিনজনার পর্যায়ভুক্ত— একজনের অপেক্ষা। তাই তাদের দুজনের অবস্থান তিনজনের সমান হবে মার অংশ এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশে নামিয়ে আনার ব্যাপারে। কেননা তার একজনের জন্যে বিধান সমস্তের সংক্রান্ত বিধান হয়ে যাবে। ফলে এতে দুইজন ও তিনজনের জন্যে নিয়ম সমান হবে।

কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ভাইগণ পিতার সঙ্গে থাকার কারণে ওয়ারিস না হয়েও মাকে আড়ালবর্তী করবে। কেননা তাদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা ও খায়-খরচা বহন করে পিতা, মা করে না। এই করণটাই সীমিতভাবে কার্যকর পিতা-মাতা— উভয় দিকের আপন ভাইদের মধ্যেও। কেবল পিতার দিকের ভাই হলেও তাই হবে। কিন্তু শুধু মার পেটের ভাই হলে তাদের কোন ব্যাপার পিতাকে প্রভাবিত করবে না। আর তারা নিজেরা আড়ালবর্তী হয়ে যাবে বাপ-মা উভয়ের দিকে ভাইদের দ্বারা। তিন ভাই ও পিতা-মাতার বর্তমান থাকায় মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ ও অবশিষ্ট যা থাকবে, তা পাবে পিতা, এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত একটা কথা সামান্য মত-পার্থক্যের সৃষ্টি করে। আর আবদুর রাযযাক মামার ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ মার জন্যে এক ষষ্ঠাংশ আর ভাইদের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ— যা থেকে ওরা মাকে আড়াল করেছে। আর অবশিষ্ঠ যা থাকবে, তা পিতার জন্যে। যে নিজে ওয়ারিস নয়, সে কাউকে আড়াল করতে পারে না। তাই মা ভাইদের দ্বারা আড়ালবর্তী হলে তখন তারা উত্তরাধিকারী হবে। এই মতটি অত্যন্ত বিরল। কুরআনের বাহ্যিক তাৎপর্য এর বিপরীত। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ -

এবং তার ওয়ারিস হবে তার পিতামাতা, আর তার মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

এরপর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ -

· যদি কয়েকজন ভাই থাকে তাহলে মৃতের মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ।

একথা বলেছেন ووركه ابواه এবং তার পিতা-মাতা তার ওয়ারিস হবে। এই কথা বলার পর, এ আয়াতের আসল তাৎপর্য হল ঃ আর তার উত্তরাধিকারী হবে তার পিতামাতা আর তার রয়েছে কয়জন ভাই। এরূপ অবস্থায় ভাইরা কিছু পেতে পারে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

مِنْ بَعْضِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا اَوْدَيْنٍ -

যে অসিয়ত করে তা এবং ঋণ থাকলে তা পূরণের পর।

ঋণের কথাটা শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে। কিন্তু মূলত ঋণ শোধ করার কাজ অসিয়ত পূরণের আগেই করতে হবে। কেননা কাজের একটা বিন্যাস ও পরম্পরা অনিবার্য। আর দুইটি জিনিসের যে-কোন একটির জন্যে। যেমন বলা হয়েছে ঃ এই দুইটির যে কোন একটির পর। হযরত আলী কাররামাল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ অসিয়তের ঋণের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। আসলে তা ঋণের পরে পূরণ করতে হয়। অন্য কথায় তা আগে হলেও কাজে ও অর্থের দিক দিয়ে তা পরে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ -

এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের জুড়ির রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক।

এ এক অকাট্য দলীল। এর ব্যাখ্যা সর্বসম্মত, যেমন সর্বসম্মত তার নাযিল হওয়ার ব্যাপারটি। আর পুরুষ সন্তান ও মেয়ে সন্তান এক্ষেত্রে সমান। সন্তান যদি মীরাসধারী হয় তাহলে স্বামীর অংশ অর্ধেক থেকে এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত নেমে যাবে, এবং স্ত্রীর অংশ এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-অষ্টমাংশে মেনে যাবে। এই বিষয়েও কোন মতপার্থক্য হয়নি যে, পুত্রের সন্তান ঔরসজাত-সন্তানের পর্যায়ে হবে স্বামী ও স্ত্রীকে আড়াল করার ক্ষেত্রে, তাদের অংশ বেশি থেকে কমে নিয়ে আসবে যখন মৃতের নিজ ঔরসজাত সন্তান থাকবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَبَاؤُكُمْ اَوْاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ -

তোমাদের পিতা-দাদা এবং তোমাদের পুত্র— পুত্রের পুত্র— এদের মধ্যে ফায়দার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তীকে তা তোমরা জান না— আল্লাহ্র নিকট থেকে ধার্য করা অংশ দানের ব্যাপারে!

বলা হয়েছে, এর অর্থ হল দ্বীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে এদের মধ্যে অধিকতর কল্যাণদায়ী কে— তা তোমরা জান না। কিন্তু আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ্ যে ভাবে অংশ বণ্টন করেছেন, সেইভাবেই অংশ দিয়ে দাও। কেননা প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই অবহিত।

বলা হয়েছে, এর অর্থ হল, তোমাদের বাপ-দাদা-চাচা ও তোমাদের পুত্রগণ ফায়দা ও কল্যাণের দিক দিয়ে পরস্পর খুবই কাছা-কাছি। ফায়দার দিক দিয়ে এদের মধ্যে অধিক নিকটবর্তী কে, তা তোমরা জান না। কেননা তোমরা ছোট বয়সের থাকাকালে তোমাদের পিতা-দাদার কাছ থেকেই অধিক ফায়দা লাভ করে থাকে। আর বার্ধক্যে তোমাদের পুত্ররাই হয় তোমাদের অধিক কল্যাণকারী। এই কারণেই তোমাদের ধন-মালে পিতা-দাদার জন্যে যেমন অংশ নির্ধারণ করেছে তেমনি তোমাদের পুত্ররাও তা থেকে পেয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ জানেন এই সকলেই কল্যাণ রয়েছে তোমাদের প্রতি।

এ-ও বলা হয়েছে, তোমাদের কাছাকাছি সময়ে কে মরবে এবং তার মৃত্যুর পর তার ধন-মাল দ্বারা তার সন্তানরা উপকৃত হবে, কিংবা সন্তান কাছাকাছি সময়ে মরবে, তার সম্পদ দ্বারা পিতা-মাত উপকৃত হবে, একথাও তোমাদের কারুরই জানা নেই। তাই আল্লাহ্ তোমাদের সকলের জন্যে মীরাস বণ্টনের যে বিধান করেছেন তা আল্লাহ জেনেশুনেই করেছেন ও স্পষ্ট হুকুম দিয়েছেন। যে লোক নিজে ওয়ারিস হয় না, সে অন্য কারুর মীরাস পাওয়ার প্রতিবন্ধক হতে পারে কিনা— এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে। তা এভাবে, যেমন একজন স্বাধীন মুসলিম পুত্র দুই মুসলিম-স্বাধীন পিতা-মাতার ও দুই কাফির ভাই কিংবা দুইজন ক্রীতদাস অথবা দুইজন হত্যাকারীর অধঃস্তন হবে। হযরত আলী, উমর ও জায়দ (রা) বলেছেন ঃ মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ আর অবশিষ্ট যা তা হবে পিতার। অনুরূপভাবে একজন মুসলিম মেয়ে যদি স্বামী ও এক কাফির পুত্র বা ক্রীতদাস অথবা হত্যাকারী রেখে মরে যায় অথবা কোন ব্যক্তি স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে যায়, তাহলে স্বামী ও মেয়েলোক কেউ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ বেশি থেকে কমের দিক থেকে আড়ালকৃত হবে না। এটা আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, মালিক, সওরী ও শাফেয়ীর মত। আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা) বলেছেন ঃ তারা নিজেরা ওয়ারিস না হলেও তারা আড়াল করবে। ইমাম আল-আওজায়ী আল-হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন ঃ ক্রীতদাস ও কাফির মীরাস পাবে না। অন্য কাউকে আড়ালকৃতও করবে না। হত্যাকারী নিজে ওয়ারিস হয় না কিন্তু অন্যকে আড়াল করে। আবূ বকর আল জাসসাস বলেছেন ঃ কাফির পিতা তার পুত্রকে তার দাদার মীরাস পাওয়া থেকে আড়াল করবে না। সে ঠিক মরে যাওয়া লোকের মত। মা স্বামী ও স্ত্রীকে আড়ালকৃত করার ব্যাপারেও সেই কথা। আল্লাহ্‌র কথা ঃ মৃতের সন্তান থাকলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পিতা ও মাতা দুজনের প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্টাংশ এর বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে আড়ালকৃত হয় বলে মত দিয়েছেন। তিনি কাফির ও মুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, তার দ্বারা মা কেন আড়ালকৃত হবে অথচ পিতা হবে না? আল্লাহ তো এ দুজনকেই আড়ালকৃত করেছেন সন্তান দ্বারা, এই কথার মাধ্যমে সন্তান থাকলে পিতামাতা প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে। পিতার আড়ালকৃত না হওয়া যদি জায়েয হয়,

আর তুমি আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তার সন্তান থাকে' সত্ত্বেও সন্তানের জন্যে মীরাস জায়েয করেছ ? মার ব্যাপারেও সেই হুকুম হওয়া উচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ —'এবং তাদের মেয়েদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে .... فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ —'তাদের মেয়েদের জন্যে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে এক-তৃতীয়াংশ হবে' এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তারা যদি চারজন হয়, তাহলেও তারা সেই এক-অষ্টমাংশের সমান অংশীদার হবে। এই বিষয়ে দ্বীনের মনীষীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

স্বামী বা স্ত্রী থাকা অবস্থায় পিতামাতা থাকলে তাদের মীরাস কত, তা নিয়েও আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী, উমর, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, উসমান ও জায়দ (রা) বলেছেন ঃ স্ত্রী পাবে এক-চতুর্থাংশ ও মা পাবে অবশিষ্টের এক-তৃতীয়াংশ। এরপর যা থাকবে তা পাবে পিতা। আর স্বামী পাবে অর্ধেক। আর মার জন্যে অবশিষ্টের এক-তৃতীয়াংশ। এরপর যা থাকবে, তা পাবে পিতা।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ স্বামী ও স্ত্রী যার যার মীরাস সে পেয়ে যাবে। আর মা পাবে পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ। এরপর যা থাকবে তা পিতা পাবে। তিনি এ-ও বলেছেন, 'অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ' কথাটি আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাচ্ছি না। ইবনে সীরীন ও ইবনে আব্বাসের মতই বলেছেন এবং বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি স্ত্রী ও পিতা-মাতার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের অনুসরণ করেছেন, একই মত গ্রহণ করেছেন, আর স্বামী ও পিতা-মাতার ব্যাপারে ভিন্নমত গ্রহণ করেছেন। কেননা তিনি মাকে পিতার উপর অগ্রাধিকার ও অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের পরে তাবেয়ীন এবং বিভিন্ন এলাকার ফিকাহবিদগণ প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন, তবে ইবনে আব্বাস ও ইবনে সীরীন সম্পর্কে যা বলেছি, তা ভিন্ন মত। কুরআনের বাহ্যিক অর্থ সে কথা প্রমাণ করে। কেননা তিনি বলেছেন ঃ

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ -

যদি মৃতের সন্তান না থাকে, পিতা-মাতাই তার ওয়ারিস হয়, তা হলে তার মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

এতে তাদের দুজনার মধ্যে মীরাস ভাগ করা হয়েছে এক-তৃতীয়াংশ করে, যেমন এক-তৃতীয়াংশ করে ভাগ করেছেন পুত্র ও কন্যার মধ্যে আল্লাহ্‌র এই কথায় ঃ প্রত্যেক পুরুষ পাবে দুজন মেয়ের প্রাপ্যের সমান। ভাই ও বোনের মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশ করে ভাগ করেছেন এই বলে ঃ

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

যদি ভাইরা পুরুষ ও নারী হয়, তাহলে প্রত্যেক পুরুষ পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান।

পরে যখন স্বামী স্ত্রীর জন্যে অংশ যা নির্ধারণ করার তা করেছেন এবং দুজনার অংশকেই বানিয়েছেন এক পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে বন্টনের পর অবশিষ্ট— তাদের দুজনের শামিল

হওয়ার পূর্বে যেমন ছিল। এমনিভাবে ভাই ও বোনের মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রী এ দুজনের অংশ গ্রহণ পিতা ও মাতার মধ্যে অবশিষ্ট— যেমন তাদের দুজনের শামিল হওয়ার পূর্বে পিতামাতা এক-তৃতীয়াংশ করে পাওয়ার অধিকারী হয়েছিল। তারা দুজন যেন পরস্পর দুই শরীক এদের মাঝে মাল-সম্পদ। একজন যখন তা থেকে অংশ পেয়ে যাবে, অবশিষ্ট যা থাকবে, তা দুজনের মধ্যে বন্টন হবে প্রথম পাওয়ার অধিকারী হিসেবে।

পুত্রের সন্তানদের মীরাস

হযরত আবূ বকর (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাযী থাকুন) বলেছেন , আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, আল্লাহ্র কথা ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছেন।

এই কথায় নিজ ঔরসজাত সন্তানদের এবং পুত্রের সন্তানদের— যদি নিজ ঔরসজাত সন্তান না থাকে— কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। কেননা যে লোক পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যাদের রেখে মরবে, তার সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন হবে— পুরুষের জন্যে দুই মেয়ের অংশের সমান— এই নীতির ভিত্তিতে, আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।

এমনিভাবে যদি পুত্রের কন্যা রেখে মারা যায়, তবে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। তারা বহু কয়জন হলে তাদের সকলের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট হবে নিজ ঔরসজাত সন্তানের মধ্যে মীরাস বন্টনের নিয়মে। এ থেকে প্রমাণিত হল, আয়াতে কেবল পুরুষ সন্তান-সন্ততিদের কথাই বলা হয়েছে। আর الولد 'সন্তান' বললে পুত্রের সব সন্তানই বোঝায়। যেমন নিজ ঔরসজাত সন্তান। আল্লাহ বলেছেন ঃ يابنى ادم হে আদম বংশধর! কিন্তু তাতে নবী-করীম (স)-এর বনী হাশিম— হাশিম বংশধর ও আবদুল মুত্তালিব বংশধর হওয়ার কোন বাঁধা আসতে পারে না। বোঝা গেল, 'আল-আওলাদ' নামটি পুত্রের সন্তান ও নিজের ঔরসজাত সন্তান উভয়কে শামিল করে। তবে নিজ ঔরসজাত সন্তান সম্পর্কে এই নামটি প্রত্যক্ষ ও প্রকৃতভাবে ব্যবহৃত হবে, আর পুত্রের সন্তানদের পর্যায়ে তার ব্যবহার পরোক্ষভাবে। এই জন্যে নিজ ঔরসজাত সন্তান বর্তমান থাকা অবস্থায় পুত্রের সন্তানদেরকে 'সন্তান' শব্দ শামিল করবে না এবং তারা তাদের (ঔরসজাত সন্তানদের) অংশ প্রাপ্তিতে শরীক গণ্য হবে না। তা পাওয়ার অধিকারী হবে দুটি অবস্থার যে কোন একটিতে। হয় নিজ ঔরসজাত সন্তান সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন পুত্রের সন্তানেরাই তার সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হবে অথবা ঔরসজাত সন্তান থাকা সত্ত্বেও কোন না কোন কারণে তারা মীরাস পেতে পারবে না, হয়ত তখন কোন বা সম্পূর্ণ অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী হবে। সন্তানের সন্তানরা ঔরসজাত সন্তানের সাথে শরীক হয়ে মীরাস পাওয়ার অধিকারী হবে, যেমন ঔরসজাত সন্তানরা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে তা পাওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে— সেরূপ নয়।

যদি বলা হয় 'সন্তান' বললে প্রকৃতভাবে ঔরসজাত সন্তান এবং পুত্রের সন্তানরা পরোক্ষভাবে শামিল হয়, তখন একটি শব্দ দ্বারা তাদের সকলকে বোঝানো সমীচীন নয়। কেননা একই শব্দ একই সময় প্রকৃত অর্থদাতা ও পরোক্ষ অর্থদাতা হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, একই অবস্থায় একই শব্দ দ্বারা তাদের সকলকে বোঝানো হচ্ছে তা নয়। নিজ ঔরসজাত সন্তান থাকা অবস্থায় পরোক্ষ অর্থের পুত্রের সন্তানদেরকে 'সন্তান' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয় না। কেননা ঔরসজাত সন্তান থাকলে পুত্রের সন্তানরা মীরাস পাবে না কুরআনের এ আয়াত অনুযায়ী । তাই সেই শব্দ দ্বারা ঔরসজাত সন্তানদের বোঝানো— তাদের বর্তমান থাকা অবস্থায় এবং তাদের বর্তমান না থাকা অবস্থায় পুত্রের সন্তানদের বোঝানো নিষিদ্ধ কিছু নয়। তাহলে একটি শব্দ 'সন্তান' দুই অবস্থায় দুই অর্থে ব্যবহৃত হওয়া— একটি প্রকৃত অর্থে, আর অপরটি পরোক্ষ অর্থে এটা কোন আপত্তির বিষয় নয়। কোন লোক যদি বলে ঃ 'আমি আমার মালের এক-তৃতীয়াংশ অমুক-অমুকের নামে অসিয়ত করেছি।' আর সে অমুক-অমুকের মধ্যে একজনের সন্তান হবে নিজ ঔরসজাত, আর অপরজনের সন্তান হবে পুত্রের সন্তান— আপন ঔরসজাত সন্তান কেউ থাকবে না, তাহলে যার ঔরসজাত সন্তান আছে, আর যার পুত্রের সন্তান আছে তাদের সকলের জন্যেই সে অসিয়ত কার্যকর হবে। সেই অসিয়তে এক জনের ঔরসজাত সন্তানের ও অপরজনের পুত্রের সন্তানের শরীক ও শামিল হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। তবে এই দুজনের দুই ধরনের সন্তান একত্রিতভাবে গণ্য হওয়া নিষিদ্ধ হবে। অপর দিক থেকে পুত্রের সন্তানদের পক্ষে অন্য জনের আপন ঔরসজাত সন্তানের সাথে শামিল হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছেন— আল্লাহ্র এই কথাটুকুর তাৎপর্য বুঝতে হবে। এই কথায় উপরোক্ত সন্তানের প্রত্যেকেরই ঔরসজাত সন্তান গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, যদি থাকে। পুত্রের সন্তানরা তার মধ্যে শামিল হবে না। আর যার ঔরসজাত সন্তান নেই, তার যদি পুত্রের সন্তান থেকে থাকে, তাহলে তার সেই সন্তানরা গণ্য হবে। তা সমীচীন এজন্য যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন— সব মানুষের জন্যেই বলা কথা। এই কথার সম্বোধন সকল মানুষের প্রতি, যার যা অবস্থা, সেই অনুপাতে। তাই যার নিজ ঔরসজাত সন্তান রয়েছে, এ শব্দটি তাদেরকে শামিল করবে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে। তাতে পুত্রের সন্তানরা শামিল হবে না। তবে যার নিজ ঔরসজাত সন্তান নেই, আছে পুত্রের সন্তান, তাকেও উক্ত কথা বলা হয়েছে তার অবস্থা অনুযায়ী। এরূপ অবস্থায় উক্ত শব্দ পুত্রের সন্তানকে শামিল করবে।

যদি বলা হয়, 'সন্তান' শব্দটি প্রত্যেকের নিজ ঔরসজাত সন্তান ও পুত্রের সন্তান সকলকেই প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থেই শামিল করে, তাহলে তা অসম্ভব বা অসমীচীন মনে করা যায় না। কেননা আসলে সকলেই তার থেকে উৎসারিত, তার সাথে-ই সম্পর্কিত। তার জন্মের ও বংশের দিক দিয়ে নিজ সন্তান ও পুত্রের সন্তান— সকলেই এই দিক দিয়ে তার সাথে মিলিত। সে কারণে 'সন্তান' শব্দ বললে সকলেরই শামিল হওয়া সম্ভব। যেমন— 'ভাই' শব্দটি দুইজনের বংশীয় সম্পর্ক এক হওয়ার কারণে হতে পারে, হতে পারে পিতা বা মা— এই দুইজনের কোন একজনের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে। আপন সহোদর ভাই, বৈমাত্রের ভাই, বৈপিত্রেয়

ভাই সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর সকলেই 'ভাই' সমানভাবে। আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ -

এবং তোমাদের সেই পুত্রদের স্ত্রীরা, যারা তোমাদের পৃষ্ঠপ্রসূত। (সূরা নিসা ঃ ২৩)

এতে পুত্রের পুত্রদের স্ত্রীদেরও শামিল হওয়া সুবিবেচিত, যেমন নিজ ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীর গণ্য হওয়া বোধগম্য। তাই কেউ যদি একটি কন্যা ও পুত্রের কন্যা রেখে মরে যায়, তাহলে নিজের কন্যা পাবে অর্ধেক নির্দিষ্টভাবে, আর পুত্রের কন্যা পাবে এক-ষষ্টাংশ। আর অবশিষ্ট যা তা পাবে আসাবারা। যদি দুইজন কন্যা রেখে যায়, সেই সাথে পুত্রের কন্যা ও পুত্রের পুত্র রেখে যায়, তাহলে দুইজন কন্যা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যা এদের মধ্যে বণ্টন হবে একজন পুরুষের জন্য দুইজন মেয়ের অংশের সমান'— এই নীতি অনুযায়ী। এমনিভাবে মৃতের যদি দুই কন্যা ও পুত্রের কয়েকজন কন্যা এবং পুত্রের পুত্র থাকে (নীচের দিকে) তাহলে নিজ কন্যারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুত্রের কন্যা ও তাদের মধ্যে নিম্নে যারা তাদের মধ্যে বণ্টন হবে সেই 'একজন পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়ের প্রাপ্য অংশের সমান' নিয়মে।

এই কথা সব সাহাবী ও তাবেয়ীনের মধ্যে যারা শরীয়াত পারদর্শী তাঁদের সকলের। তবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে ব্যতিক্রমধর্মী মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি অবশিষ্ট সম্পত্তি পুত্রের পুত্রকে— তা যত নিম্নেই হোক— দেয়ার পক্ষপাতী,পুত্রের কন্যাদেরকে কিছুই দেয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। যদি ঔরসজাত কন্যারা পূর্ণ দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেয়। তিনি পুত্রের কন্যাদেরকে অংশ দিতেন দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্যে মাত্র। যেমন— মৃত ব্যক্তি যদি তার এক কন্যা ও পুত্রের কয়েকজন কন্যা রেখে যায়, তাহলে নিজ কন্যা পাবে অর্ধেক আর পুত্রের কন্যারা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ— দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করণ স্বরূপ। তাদের সাথে যদি পুত্রের পুত্র থাকে তাহলে পুত্রের কন্যাদেরকে এক-ষষ্ঠাংশের অধিক দেবেন না। বৈমাত্রেয়ী বোন আপন সহোদর বোনদের সঙ্গে এক সময়ে থাকলেও তাঁর সেই কথা। এ ব্যাপারে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে, পুত্রের মেয়ে সন্তানেরা যদি একাকী থাকে, তাহলে মেয়েদের দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করে নেয়ার পর তারা কিছুই পাবেনা। অনুরূপ হবে যদি তাদের ভাই থাকে, তাহলে বোনরা কিছু পাবে না। তাদের কোন একজনের সাথে চাচার পুত্র থাকে, তাহলে মেয়েরা কিছু পাবে না।

কিন্তু আহলিস্ সুন্নাতুল জামা'আতের মতে ব্যাপারটি এরূপ নয়। কেননা পুত্রের কন্যারা একবার নির্দিষ্ট অংশ নেবে, আসাবা হয়েও নেবে, আর তাদের ভাইরা এবং তাদের নিম্নের দিকে যারা তারা হবে আসাবা— ঔরসজাত কন্যাদের মত একবার নির্দিষ্ট অংশ নেবে আর একবার আসাবা হয়ে নিবে, তা ভাবা যায় না। শুধু মেয়েরা যদি থাকে, তাহলে তারা দুই তৃতীয়াংশের অধিক নেবে না। তারা সংখ্যায় যতই বেশি হোক। আর তাদের সাথে যদি তাদের এক ভাই থাকে এবং তারা নিজেরা হয় দশজন, তাহলে তারা গোটা সম্পত্তির পাঁচ-ষষ্ঠাংশ-পাবে। তাদের সঙ্গে একজন ভাই থাকায় তারা নেবে আলাদাভাবে তাদের থাকা অবস্থায় যা নেবে তার চাইতে

বেশি। পুত্রের কন্যাদের সম্পর্কেও সেই হুকুম। যখন ঔরসজাত কন্যারা দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেবে, তখন তাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট থাকবে না। যদি তাদের সঙ্গে একজন ভাই থাকে, তাহলে তারা ভাইর সাথে 'আসাবা' হবে। আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ তাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে ভাগ করা হবে 'একজন পুরুষের জন্যে দুই মেয়ের অংশের সমান'— এই নীতি অনুযায়ী।

দুইজন কন্যা ও পুত্রের কন্যা এবং একজন বোন থাকলে দুই কন্যা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা বোন পেয়ে যাবে, পুত্রের কন্যা কিছুই পাবে না। কেননা এই অবস্থায় যখন তার সাথে কোন পুরুষ নেই— কিছু নেয়, তাহলে কন্যাদের অংশ থেকেই নেবে। আর কন্যারা তো দুই-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ নিয়ে নিয়েছে। কন্যাদের অংশ থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি যা সে গ্রহণ করতে পারে। তাহলে একজন বোন অবশ্যই পাবে। কেননা সে আসাবা কন্যাদের সঙ্গে। এরূপ অবস্থায় বোন কি পেতে পারে? সে তো পেতে পারে কেবল আসাবা হয়েই। পুত্রের কন্যার সাথে যদি সে কন্যার একজন ভাই-ও থাকে, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা 'একজন পুরুষের জন্যে দুই মেয়ের অংশ সমান' নীতি অনুযায়ী বন্টন হবে। বোন কিছুই পাবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে জরাতা, আলী ইবনে মস্‌হর, আমাস, আবূ কায়সুল আওয়াদী, হুজ্জাই ইবনে শারাহবীলুল আওয়াদী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী ও সালমান ইবনে রবীয়াতা (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দুজনকেই জিজ্ঞাসা করল ঃ কন্যা, পুত্রের কন্যা ও আপন সহোদরা বোন একসাথে থাকলে কে কত পাবে? তাঁরা দুজনই জবাবে বললেন ঃ কন্যা পাবে অর্ধেক, বোন পাবে অর্ধেক। তাদের দুজনের মতে পুত্রের কন্যা কিছুই পাবে না। পরে সেই লোক হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট এসে সে জনের মত তাঁকে বলল এবং এ বিষয়ে তাঁর মত জানতে চাইল। জবাবে তিনি বললেন ঃ এক্ষণে আমি বিভ্রান্ত, এখন আমি হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে নই। তবে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আমি সেই রায় দেব যা রাসূলে করীম (স) দিয়েছেন। তাহল, মৃত্যের কন্যা পাবে অর্ধেক আর পুত্রের কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ— দুই-তৃতীয়াংশের পূর্ণত্বের জন্যে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা আপন সহোদর— বাপ মা উভয় দিক দিয়ে— বোন পাবে।

তাই এক-ষষ্ঠাংশ পুত্রের কন্যা গ্রহণ করবে নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে, আসাবা হয়ে নয়। এ বিষয়ে মনীষিগণের কোন ভিন্নতর মত নেই। তবে যা বর্ণিত হয়েছে, আবূ মূসা আল-আশআরী ও সালমান ইবনে রবীয়াতা থেকে। পরবর্তীতে তিনিও ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, আবদুল্লাহ্‌ উপরোক্ত মনীষীদের বিপরীত মত প্রকাশ করেন নি। যদি সে কন্যার সাথে এক ভাই থাকে, তখন কন্যা অর্ধেক পাবে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পুত্রের কন্যা ও পুত্রের পুত্রের মধ্যে বন্টন হবে ' একজন পুরুষের জন্যে মেয়ের অংশ'— এই মৌল নীতি অনুযায়ী। এই পুত্রের— কন্যাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেয়া হবে না। যেমন তার সাথে একজন ভাই থাকলে দেয়া হয়।

এ বিশ্লেষণে এ বিষয়ের দলীল রয়েছে যে, পুত্রের কন্যা একবার পাবে নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে আর একবার পাবে আসাবা হয়ে— তার বোনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে। যেমন ঔরসজাত

কন্যাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর এ কথা ঃ নিজ কন্যা ও পুত্রের কন্যাগণ এবং পুত্রের পুত্র থাকলে নিজ কন্যা অর্ধেক পাবে। যা অবশিষ্ট থাকবে পুত্রের কন্যাদের ও পুত্রের পুত্রের মধ্যে একজন পুরুষের জন্যে দুই মেয়ের অংশের সমান এই নীতিতে বিভক্ত হবে— এই কথার কার্যকরতা তখন হবে যদি পুত্রের কন্যাদের অংশ এক-ষষ্ঠাংশের অধিক না হয়। অধিক হলে তাদেরকে এক-ষষ্ঠাংশের বেশী দেয়া যাবে না। এই অবস্থায় আলাদা করে কোন অংশ নির্ধারণ হয়নি। আলাদাভাবে সে আসাবাও হবে না। তবে এক-ষষ্ঠাংশের অধিক দেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নির্ধারণ অবশ্যই গণ্য হবে। আর কম হলে মুকাসিনা (পারস্পরিক বিভক্তি) গণ্য হবে। কিন্তু তা কিয়াসের বিপরীত।

কালালা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلَالَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ -

যদি কোন পুরুষ ব্যক্তি কালালার ওয়ারিস হয় কিংবা কোন মেয়েলোক ওয়ারিস হয় এবং মৃতের ভাই বা বোন-ও আছে তা হলে তাদের দুজনার প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ হবে।

আবূ বকর বলেছেন, মৃত ব্যক্তি নিজে 'কালালা' নামে অভিহিত এবং তার কোন কোন ওয়ারিসকেও কালালা বলা হয়।[১]

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلَالَةً বোঝায় যে, 'কালালা' বলতে এখানে মৃত ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে। 'কালালা' তার অবস্থার পরিচিতি। আস-সমীম ইবনে উমায়র বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ আমার উপর এমন একটা সময় এসেছে যখন 'কালালা' জানতাম না।

১. উর্দু লুগাতুল কুরআন 'কালালা' শব্দের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে ঃ রাসূলে করীম (স)-কে 'কালালা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ 'কালালা' সেই মৃত ব্যক্তি, যার কোন সন্তান নেই, বাপও নেই (রাগেব)। কোন কোন অভিধান লেখক লিখেছেন ঃ 'কালালা' সেই ওয়ারিসকে বলা হয়, যে মৃতের পিতাও নয় সন্তানও নয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ সন্তান ছাড়া আর যারা মৃতের সম্পত্তির অংশ পায় তাদেরকে 'কালালা' বলা হয়, ইমাম রাগেব বলেছেন ঃ হাদীস ও অভিধানের মধ্যে এ শব্দের ব্যাখ্যায় বাহ্যত পার্থক্য মনে হয় যদিও উভয়ের কথাই সহীহ্‌। কেননা যে মৃতের সরাসরি কোন ওয়রিস না থাকে অর্থাৎ পিতা না থাকে, সন্তান-ও না থাকে, অন্য লোকেরা তার ওয়ারিস হয়, তাহলে সেই অন্যদের সাথে মৃতের আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হবে। কেননা তারা কেউ প্রত্যক্ষ আত্মীয় নয়, পরোক্ষ আত্মীয়। অনুরূপভাবে মৃতের সাথে এ ওয়ারিসদের আত্মীয়তাও দুর্বল হবে এজন্যে যে, তারা কেউ মৃতের সন্তানদের মধ্যে থেকে নয়, পিতাও নয়। ইমাম রাগেবের বক্তব্য হল 'কালালা' শব্দের অর্থ দুর্বলতা ও পরোক্ষ আত্মীয়তা। আর তা সরাসরি আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল হয়। এ কারণে 'কালালা' শব্দটি মৃত ও ওয়ারিস উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে এ দিক দিয়ে। ব্যাপক ব্যবহারে প্রচলিত কথায় 'কালালা' বলে সেই লোকদের বোঝানো হয়, যারা উভয় দিক দিয়ে আত্মীয়হীন— না তাদের পিতা মাতা আছে, না নিজ ঔরসজাত সন্তান। (মুজিমুল কুরআন) ......'কালালা' সেই আসাবাদেরকেও বলা হয় যারা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়— মা এক, পিতা দুই— ভাই ও ওয়ারিস হয়ে পড়ে। অধ্যাপক আবদুর রউফ মজিমুল কুরআনে লিখেছেন আগেরকালের মনীষীদের ইজমায় রয়েছে এ কথায় যে, আলোচ্য আয়াতে সেই বৈপিত্রেয় ভাইদের বোঝনো হয়েছে। আল্লামা যমাখশারী ও সূরা নিসার উদ্ধৃত আয়াতের তফসীরে এ কথা-ই লিখেছেন। —অনুবাদক

'কালালা' হচ্ছে, সন্তান ও পিতা ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিস। আসেমুল আহওয়াল শবী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) বলেছেন ঃ সন্তান ও পিতাহীন ছাড়া অন্যান্য উত্তরাধিকারী। ফলে উমর (রা) যখন নিজে বুঝলেন তখন তিনি (উমর) বললেন ঃ আমি মনে করি 'কালালা' সে, যার সন্তান নেই, পিতা-ও নেই। আর আমি আল্লাহ্র নিকট লজ্জিত বোধ করছি এ জন্যে যে, আমি আবূ বকর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতাম। 'কালালা' পিতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিস।[১] তায়ূস ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ সময়ের দিক দিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাবের শেষ সঙ্গী আমরাই ছিলাম, তখন আমরা তাঁকে সে কথা বলতে শুনেছি যা আমরা বলতাম। তোমরা কি বলতে জিজ্ঞাসা করায় ইবনে আব্বাস বললেন ঃ 'কালালা' হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার (মৃত্যুকালে) সন্তান নেই। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাতা, আমর ইবনে দীনার, আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে 'কালালা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ 'যে মৃত ব্যক্তির সন্তান নেই, পিতাও নেই।' বললেন, আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি মরে গেল, তার সন্তান নেই, আছে তার এক বোন।' একথা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন ও আমাকে ধমকালেন।

আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ ও সাহাবীদের মধ্যে যাদের মত আমরা উল্লেখ করলাম, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি নিজেই 'কালালা' নামে অভিহিত। কেননা তাঁরা বলেছেন ঃ 'কালালা' সে ব্যক্তি, যার সন্তান নেই, পিতাও নেই। অন্যান্য কিছু লোক বলেছেন ঃ 'কালালা' সে যার সন্তান সেই। যে মৃত ব্যক্তির মীরাস বণ্টন হয়, 'কালালা' তারই পরিচিতি। কেননা একথা জানা আছে যে, তাঁরা একথা বলতে ইচ্ছা করেন নি যে, 'কালালা' সেই উত্তরাধিকারীকে বলা হয়, যার সন্তান নেই, পিতাও নেই। কেননা ওয়ারিসের সন্তান ও পিতার বর্তমান থাকায় যার মীরাস ভাগ হয় তার উত্তরাধিকারী সম্পর্কিত হুকুম পরিবর্তিত হয় না। মৃতের এ অবস্থা হলেই মীরাস সম্পর্কিত বিধানে পার্থক্য সূচিত হয়। আর যে বোঝা যায় যে, 'কালালা' নামটি কোন কোন ওয়ারিস সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়— যেমন শুবা মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাকে দেখতে এলেন, আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম। আমি বললাম, হে রাসূল! মীরাস কিরূপ হবে, আমার ওয়ারিস তো কালালা? তখন ফরায়েয সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল। শুবার মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের এ কথা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কথা। জাবির বলেছেন, 'কালালা' তাঁর ওয়ারিসরা। নবী করীম (স) তা অগ্রাহ্য করেন নি। ইবনে আওন, আমর ইবনে সাঈদ, হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান, বনু সাদের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ সায়াত মক্কায় রোগাক্রান্ত হলে বললেন ঃ হে রাসূল! 'কালালা' ছাড়া আমার কোন ওয়ারিস নেই। এ হাদীসেও ওয়ারিসদেরকেই 'কালালা' বলা হয়েছে। সাদ সংক্রান্ত হাদীস জাবির সংক্রান্ত হাদীসের আগের ব্যাপার। কেননা তিনি রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন মক্কায়। আর তাতে আয়াতের উল্লেখ নেই। কিছু লোক বলেছেন,

১. অর্থাৎ আবূ বকর (রা) মনে করেন 'কালালা' নাম হচ্ছে পিতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসের। আর উমর (রা) মনে করতেন, যে ব্যক্তি পিতা ও সন্তানহীন হয়ে মরে গেছে, সে ব্যক্তিকে 'কালালা' বলা হয়। পরে তিনি নিজের মত ত্যাগ করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত গ্রহণ করেন।

এ ব্যাপারটি বিদায় হজ্জকালীন। অপর কিছু লোক বলেছেন, এ ঘটনাটি মক্কা বিজয়কালীন। বলা যায়, তা মক্কা বিজয়ের বছরই হবে। আর জাবির সংক্রান্ত ঘটনা মদীনায় নবী করীম (স)-এর শেষ দিনগুলোতে সঙ্ঘটিত ঘটনা। তার শুবা আবূ ইসহাস, বরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ সর্বশেষ আয়াত যা নাযিল হয়েছে, তা হল ঃ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬) আর সর্বশেষ সূরা নাযিল হয়েছে সূরা তওবা। ইয়াহয়া ইবনে আদম বলেছেন, রাসূল (স) থেকে আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছে যে, তিনি 'কালালা' সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে বলেছেন ঃ يَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ —'সয়ফ সংক্রান্ত আয়াতই তোমার জন্যে যথেষ্ট। আর তা-ই হচ্ছে এ আয়াতটি। কেননা তা গ্রীষ্মকালে নাযিল হয়েছিল। রাসূলে করীম (স) তখন মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর প্রতি 'হজ্জ' সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ....

এবং আল্লাহ্র জন্যে লোকদের কর্তব্য হচ্ছে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা .....

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৭)

মদীনায় নাযিল হওয়া এটাই শেষ আয়াত। পরে তিনি মক্কায় উপনীত হলে আরাফাতে আরফার দিনে নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

আজকের দিন তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

পরদিন কুরবানীর দিন নাযিল হয় ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ -

এবং তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যে দিন তোমরা আল্লাহ্র নিকট ফিরে যাবে।

(সূরা বাকারাহ ঃ ২৮১)

এরপর রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর প্রতি আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান। আমরা এ কথাই শুনেছি। ইয়াহ্য়া বলেছেন, অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট 'কালালা' সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَاوَالِدٌ فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ -

যে লোক মরে গেল, তার সন্তান নেই, পিতাও নেই, কালালা তার ওয়ারিস হল।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এসব আয়াত ও হাদীসের উৎপত্তির তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। অথচ তারিখের পার্থক্যের ভিত্তিতে আয়াত ও হাদীসের হুকুমেও পার্থক্য ঘটে! কিন্তু আয়াতের ও হাদীসের উল্লেখ যখনই করা হবে, তার উৎপত্তি বা নাযিল হওয়ার তারিখ সেই দিনের সাথে জড়িত হয়ে গেছে। আমরা এ কথা দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছি, আমরা বর্ণনা করব যে, 'কালালা' নামটি কখনও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনও কোন কোন ওয়ারিস সম্পর্কে।

'কালালা' বলতে কি বোঝায়, এ বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। জরীর, আবূ ইস্‌হাক আশ-শায়বানী, আমর ইবনে মুররা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কালালা'র ওয়ারিস কি করে হয় ? জবাবে বললেন ঃ এ বিষয়ে কি আল্লাহ্ তা'আলা বলে দেন নি ? এরপর তিনি উক্ত আয়াতটি ঃ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ শেষ পর্যন্ত। বললেন ঃ কিন্তু উমর (রা) তবুও 'কালালা' বুঝলেন না। পরে তিনি হাফসা (রা)-কে বললেন ঃ তুমি যখন রাসূলে করীম (স)-কে হাসি-খুশি মনের দেখবে, তখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। তাই তিনি তাকে হাসি-খুশি মনের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা তোমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন? আমি দেখছি, তোমার পিতা এ বিষয়টি যেন বুঝতেই পারছেন না। এরপর থেকে হযরত উমর (রা) প্রায়ই বলতেন ঃ মনে করি, আমি এ বিষয়ে কখনই জানব না! অথচ রাসূলে করীম (স) তো এ বিষয়ে বলেই গেছেন যা বলার।

সুফিয়ান আমর ইবনে মুররা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ তিনটি কথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমার নিকট— কারোর বর্ণনা করা আমার নিকট— দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার অপক্ষো অধিক প্রিয়। তা হল— কালালা, খিলাফত ও সূদ। কাতাদাহ সালিম ইবনে আবুল জায়দ, মিদান ইবনে আবূ তালহা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন— হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে 'কালালা' বিষয়ে যত বেশি প্রশ্ন করেছি তার অধিক প্রশ্ন করা কোন বিষয়েই করিনি। এমনকি এত অধিক প্রশ্ন করায় তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে আমার বুকে তিনি খোঁচাও দিয়েছেন। পরে বলেছেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার জন্য গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতই যথেষ্ট। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মৃত্যুকালে বলেছেন ঃ 'তোমরা জেনে রাখো, আমি 'কালালা' সম্পর্কে কোন কথাই বলিনি।'

উল্লিখিত হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, তিনি নিজে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত কথা বলে যান নি। এর তাৎপর্য হল, বিষয়টি তাঁর নিকট অস্পষ্ট ছিল, তিনি কখনই সুস্পষ্টভাবে তা বলতে পারে নি।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, হযরত উমর (রা) 'কালালা' সম্পর্কে একখানা দলীল লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরে তাঁর মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হলে সেই লিখিত জিনিস মুছে ফেলেন এবং বলেন ঃ তোমরা এ বিষয়ে তোমাদের নিজেদের মত-ই পোষণ কর। উমর (রা) থেকে বর্ণিত এ-ও একটি বর্ণনা অন্যান্য বহু কয়টি বর্ণনা থেকে। তাঁর নিকট এ বর্ণনাটিও এসেছে, তিনি বলেছেন ঃ 'কালালা' সে— যার সন্তান নেই, পিতাও নেই। তাঁর থেকে এ বর্ণনাটিও এসেছে, কালালা সে যার সন্তান নেই। আবূ বকর সিদ্দীক, আলী, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে পাওয়া দুটি বর্ণনার একটিতে বলা হয়েছে ঃ 'কালালা' পিতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসান। মুহাম্মাদ ইবনে সালিম, শবী ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, পিতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসান হচ্ছে 'কালালা'। জায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

ইবনে আব্বাস থেকে পাওয়া অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ পিতা ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসান হচ্ছে কালালা।

আবূ বকর বলেছেন, সাহাবাগণ এ বিষয়ে এক মত যে, সন্তান 'কালালার' মধ্যে গণ্য নয়। পিতা শামিল কিনা, সে বিষয়ে তাঁদের মত বিভিন্ন। জমহুর ফিকাহবিদরা বলেছেন ঃ পিতা কালালা'র বাইরে। ইবনে আব্বাসও দুটি বর্ণনার একটিতে অনুরূপ কথা বলেছেন। অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, সন্তান ছাড়া অন্যান্যরা কালালা।

আগেরকালের মনীষীরাই যখন কালালা'র ব্যাপারে বিভিন্ন মতের ছিলেন বর্ণিতভাবে এবং উমর (রা) নবী (স)-কে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি তাঁকে আয়াতে বলা কথার উপর নির্ভর করতে বলেছেন। সে আয়াতের কথা হল লোকেরা তোমাকে কালালা সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ তোমাকে সেই ফতোয়া দিচ্ছেন ..... অথচ হযরত উমর (রা) একজন আরবী ভাষাভাষী বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তার তাৎপর্য জানার পন্থাও তার নিকট অস্পষ্ট ছিল না। এ থেকে বোঝা গেল যে, কেবল ভাষাতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারাই 'কালালা'র তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। মূলত এটি 'মুতাশাবিহ' আয়াতসমূহের একটি। তার তাৎপর্য বোঝার জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে 'মুহকাম' আয়াতের সাহায্য গ্রহণ করতে বলেছেন, তার-ই উপর নির্ভর করতে বলেছেন। এ কারণেই নবী করীম (স) হযরত উমরের কালালা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার সরাসরি কোন জবাব দেন নি। বরং তা আয়াত থেকে অনুধাবন, ইস্তিনবাত ও দলীল-প্রয়োগ করতে বলেছেন। এ কথায়ই কয়েক প্রকারের দলীল নিহিত রয়েছে, যা এর তাৎপর্য স্পষ্ট করে তোলে। একটি— এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেই অকাট্য দলীল নাযিল করে তওকীফী পদ্ধতিতে তার তাৎপর্য বলে দেয়া হবে— তা বাধ্যতামূলক নয়। কেননা তার তাৎপর্য 'তওকীফী' উপায়ে চূড়ান্তভাবে বলে দেয়াই যদি বাধ্যতামূলক হতো তা হলে নবী করীম (স) নিজে তার বর্ণনা দেয়া এড়িয়ে যেতেন না। আর তা এ জন্যে যে, 'কালালা'র ব্যাপারটি সম্পর্কে যে অবস্থার প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন এ বিষয়ে কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি, তাৎক্ষণিকভাবে তার হুকুম কার্যকর করার কোন প্রশ্ন ছিল না। অন্যাথায় তিনি নিজে এ বিষয়ে বলতে বাকী রাখতেন না। আসলে তিনি তাঁকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন, 'নস'-এর মাধ্যমে আয়াতের তাৎপর্য জানতে চেয়েছিলেন, আইন-বিধানের সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লোকদেরকে 'তাওকীফ' করার কোন দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর ছিল না। কেননা সে বিষয়টির নাম, পরিচিতির ব্যাপার রয়েছে। তাতে এমন জিনিস-ও আছে যা তত্ত্ব বোঝাবার দলীল হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কোন সংশয় নেই। তার একটি দিক ইজতিহাদ দ্বারা মীমাংসা করা জরুরী। এ জন্যে নবী করীম (স) হযরত উমর (রা)-কে ইজতিহাদ করার দিকেই আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি এ বিষয়টিকে ইজতিহাদী বিষয় মনে করতেন এবং হযরত উমর (রা)-কে ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ মনে করতেন। তাদের বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ –

তাঁদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা অবশ্যই জানবে ..... (সূরা নিসা ঃ ৮৩)

শরীয়াতের হুকুম-আহকামের ব্যাপারে ইজতিহাদী কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপের প্রমাণ-ও তাতে রয়েছে। তা একটি মৌলনীতি, তার মাধ্যমে শরীয়াতের অনেক হুকুম-আহকামই জানা যেতে পারে। নিত্য নব ঘটিত ঘটনাবলীতে পথ-নির্দেশ তার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। মুতাশাবিহ আয়াতের তাৎপর্য বোঝার জন্যে মুহকাম আয়াতের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ চালানো সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। 'কালালা'র তাৎপর্য জানবার জন্যে সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদী চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং ঐকমত্য নিঃসন্দেহে জানা যায়। পূর্বোদ্ধৃত বিস্তারিত আলোচনা থেকে তা অকাট্য ও নিঃসন্দেহভাবে জানা যায়। লক্ষ্যণীয়, কোন কোন সাহাবী বলেছেন ঃ 'কালালা' হল যার সন্তান ও পিতা নেই। কোন কোন লোক বলেছেন ঃ তার সন্তান নেই। হযরত উমর (রা) এ সংক্রান্ত প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। কোন কোন অবস্থায় তিনি জবাব দেন নি। যারা যারা এ বিষয়ে কথা বলেছেন, তারা পরস্পরের কথাকে অগ্রাহ্য করেন নি। কেননা প্রত্যেকে নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী কথা বলেছেন। আর তা থেকে বোঝা যায় যে, শরীয়াতের হুকুম-আহকাম ইজতিহাদ করার উপর তাঁরা সকলেই বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ-ও বোঝা যায় যে, আবূ ইমরান-আল জুয়ানী জুনদুব (রা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা হল, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ فِىْ الْقُرْاٰنِ بِرَايِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ -

যে লোক কুরআনে নিজ চিন্তা-বিবেচনার ভিত্তিতে কথা বলে, তা যদি যথার্থ-ও হয়, তবু সে মারাত্মক ভুল করে।

এ কথাটি নিশ্চয়ই সেই লোক সম্পর্কে, যে নিজের অমূলক ধারণা ও নিছক কল্পনার ভিত্তিতে— মৌলনীতির কোন দলীল ছাড়া-ই কুরআন সম্পর্কিত কোন কথা বলবে। তার থেকে নিজ ইচ্ছামত কোন হুকুম বের করবে ও তার তাৎপর্য উদ্ভাবন করবে। তাই প্রত্যেক বিষয়ে মুহ্‌কাম, তাৎপর্যে ঐকমত্য সম্পন্ন হলে তা অবশ্যই প্রশংসিত ও সে জন্যে আল্লাহ্ কর্তৃক সওয়াব প্রাপ্ত হবে। কেননা আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ -

তাদের মধ্যে যারা 'ইস্তিনবাত করে' তারা তা অবশ্যই জেনে যাবে।[১]

আরবী ভাষা পারদর্শিগণ الكلالة পর্যায়ে অনেক কথা বলেছেন। আবূ উবায়দাতা মামার ইবনুল মুসান্না বলেছেন ঃ 'কালালা' হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যার পিতা ও পুত্র তার ওয়ারিস হয়নি। আরবদের নিকট এমন ব্যক্তি 'কালালা'। শব্দটি مَنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ اَىْ تَعَطَّفَ النَّسَبُ عَلَيْهِ যার পর্যন্ত এসে বংশধারা থেমে গেছে, বাঁকা হয়ে পড়েছে— থেকে উদ্ভূত। আবূ উবায়দাতা বলেছেনঃ যে তা পড়বে يُوْرَثُ অর্থ হবে, সেই ব্যক্তি যার পুত্র ও পিতা নেই।

---

১. يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ - اِسْتِنْبَاطٌ। থ্যানুসন্ধান করা نبطة - نَبَطٌ বলা হয় খনন কূপে নির্গত প্রথম পানিকে। কূপ জমিন থেকে পানি বের হওয়া انبه। কূপ খননকারীর পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। পানি বের হওয়া, কোন জিনিসের উপর প্রভাব ফেলা, কূপ খননের পর পানি বের হওয়া, কোন জিনিস বহু পরিশ্রমের পর বের করা। ফকীহ ইস্তিনবাত' করেছে, এর অর্থ ঃ ইজতিহাদ করে কোম তত্ত্ব উদঘাটন ও উদ্ভাবন করা।— অনুবাদক।

আবূ বকর বলেছেন ঃ আল-হাসান ও আবূ রজা আল-আতাবিদী يُوْرَثُ পড়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ বলা হয়েছে যে, اَلْكَلَالَةُ -এর আসল আভিধানিক অর্থ হল الاحاطة। 'পরিবেষ্টন'। এ থেকে হয় اَلْاِكْلِيْلُ শব্দ। কেননা اِكْلِيْلُ টুপি মাথাকে পরিবেষ্টিত রাখে। তা থেকে الكل। যা তাতে প্রবেশ করে তা তাকে পরিবেষ্টিত করে ফেলে। অতএব বংশের দিক দিয়ে الكلالة হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে পরিবেষ্টিত হয়েছে সন্তান, পিতা ও ভাই-বোন দ্বারা। তাদের দুজনকে পরিবেষ্টিত করেছে। আর সন্তান ও পিতা 'কালালা' নয়। কেননা বংশের মূল ও তার মেরুদণ্ড সে পর্যন্ত এসে-ই শেষ হয়েছে। তারা হল সন্তান ও পিতা। এ দুজন ছাড়া আর যারা, তারা এ দুজনের বাইরে। তারা বংশে শামিল হয় জন্ম সূত্রের মাধ্যমে নয় অন্যভাবে। যেমন টুপি যা গোটা মাথাকে শামিল করে। এ বিশেষণ প্রমাণ করে যে, যিনি কালালা'র ব্যাখ্যা করেছেন সন্তান ও পিতা ছাড়া অন্যরা, তাঁর কথাই সহীহ্। সন্তান যদি 'কালালা' না হয়, তাহলে পিতা-ও নয়। কেননা এ দুজনের প্রত্যেকেই মৃতের সাথে সম্পর্ক জন্মসূত্রে। ভাই ও বোনেরা সেরূপ নয়। কেননা এদের কারোই সম্পর্ক মৃত ব্যক্তির সাথে জন্ম সূত্রের মাধ্যমে নয়। আর তিনি তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, পিতা ছাড়া অন্যরা কালালা এবং কেবল সন্তানকে কালালার বাইরে ধরেছেন, তাদের ব্যাখ্যাও অনুরূপ। কেননা সন্তান তো পিতা থেকেই। যেন তারই অংশ। কিন্তু পিতা— জন্মদাতা— সন্তান থেকে নয়। যেমন ভাই ও বোন— ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক যার সাথে, তার সাথে জন্মসূত্রের সম্পর্ক নেই। তাই তিনি বলেছেন, 'কালালা' সে যে তার থেকে আসেনি। তার অংশ সে নয়। মৃতের সাথে যার সম্পর্ক সেদিক থেকে, যেদিক থেকে এসেছে, সে-ও কালালা নয়। জাহিলিয়াতের যুগে 'কালালা' ব্যাপকভাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দ।

আরব কবিরাও দাদাকে 'কালালা'র মধ্যে গণ্য করেছে। সেই সাথে জানিয়েছে যে, তার প্রাধান্য বংশ সূত্রে নয়। বরং সে নিজেই প্রধান ও মাথা হয়ে বসেছে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ كلت الرحم بين فلاق অমুক অমুকের মধ্যে রেহম দূর হয়ে পড়েছে। একটি অপরটি থেকে দূরে সরে গেছে। একজন অপরজনের উপর আক্রমণ করেছে, পরে পরস্পর দূরত্বে সরে যায়। কবির কবিতা থেকে বোঝা যায়, লোকেরা পিতা, দাদা থেকে মীরাস পায়, ভ্রাতৃত্ব ও চাচাত্ব থেকে দূরে পড়ে থাকে।

কুরআনের দুটি আয়াতে আল্লাহ الكلالة শব্দটির উল্লেখ করেছেন। একটি আয়াতে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

বল, আল্লাহ্ কালালা সম্পর্কে তোমাদিগকে ফতোয়া দিচ্ছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি মরে যায়, তার সন্তান কেউ নেই, তবে আছে একটি বোন, তাহলে রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে বোন পাবে অর্ধেক। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)

সন্তান না থাকা অবস্থায় ভাই-বোন জীবিত থাকলে তাদের মীরাসের প্রাপ্য অংশের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে। এদেরকেই 'কালালা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য তাতে পিতা

জীবিত না থাকা জরুরী শর্ত হিসেবে রয়েছে, যদিও তা বলা হয়নি। কেননা সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে ঃ

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ -

এবং তার ওয়ারিস হবে তার পিতামাতা। তাহলে তার মার জন্যে এক-তৃতীয়াংশ আর তার কয়েকজন ভাই থাকলে তার মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ।

পিতা থাকলে ভাইরা মীরাস পাবে না। ফলে পিতা 'কালালা'র বাইরে পড়ে গেল, যেমন সন্তানরাও বাইরে রয়ে গেল। কেননা পিতা বর্তমান থাকলে ভাইরা মীরাস পাবে না। যেমন পুত্র ও কন্যা থাকলে তারা মীরাস পায় না। এ কন্যাও 'কালালা'র মধ্যে গণ্য নয়। যদি মৃত ব্যক্তি একজন বা দুইজন কন্যা রেখে যায়, ভাই ও বোনরাও থাকে আপন সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয়। তাহলে কন্যারা কালালা হবে না। আর এ দুজনরা সাথে মিলে যারা ওয়ারিস হবে, তারা 'কালালা'।

সূরার শুরুতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ - فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ -

যদি কোন ব্যক্তি কালালাকে বা কোন মেয়েলোককে ওয়ারিস বানায়, আর তার ভাই কিংবা বোন থাকে, তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ। আর তারা যদি তার চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়, তাহলে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশে শরীক হবে।

এ আয়াত অনুযায়ী কালালা হচ্ছে মার দিকের বোন ও ভাই। মৃতের পিতা ও সন্তান থাকলে তারা দুজন ওয়ারিস হবে না— তারা পুরুষ হোক, কি মেয়েলোক। বর্ণিত হয়েছে— হযরত সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) আয়াতটির পাঠ এভাবে করেছেন ঃ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ

কোন ব্যক্তি যদি কালালা বা কোন মেয়েলোককে ওয়ারিস বানায়, আর তার মার দিক দিয়ে ভাই ও বোন থাকে .....

এতদসত্ত্বেও এখানে ভাই ও বোন বলতে মায়ের দিক দিয়ে ভাই-বোন বোঝানো হয়েছে, সে দুজন ছাড়া যদি আপন সহোদর ভাই ও বোন কিংবা শুধু পিতার দিকের ভাই ও বোন হয় তবে..... তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কালালা হচ্ছে সন্তান ছাড়া অন্যরা— মার দিক ভাইরা ওয়ারিস হবে পিতা-মাতার বর্তমান থাকা অবস্থায়। তারা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এ সেই এক-ষষ্ঠাংশ যা পাওয়া থেকে মা আড়ালাচ্ছন্ন হয়েছে । এ কথাটি বিরল। এ পর্যায়ে আরও যে বর্ণনা এসেছে তার উল্লেখ আমরা করেছি। তা হল, পিতা ও সন্তান ছাড়া যারা ওয়ারিস হয়, তারা। মার দিকের ভাই ও বোনেরা যে এক-তৃতীয়াংশে শরীক হবে এবং তাতে

পুরুষ মেয়েদের থেকে কোন অগ্রাধিকার পাবে না— পরিমাণে বেশি পাবে না, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

দাদার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে, সে কি 'কালালা' হিসেবে মীরাস পাবে ? অনেকে বলেছেন ঃ দাদা 'কালালা'কে ওয়ারিস বানায় না। অন্যরা বলেছেন, সে নিজেই একজন 'কালালা'। দাদার সঙ্গে ভাই-বোনেরা মীরাস পায়— এ মত যাদের উক্ত মত তাদেরই। উত্তম কথা হল, দাদা 'কালালা'র বাইরে। তার তিনটি কারণ ঃ একটি— বিশেষজ্ঞরা সকলেই একমত হয়ে— কোন মতপার্থক্য না করেই বলেছেন, পুত্রের পুত্র 'কালালা'র বাইরে গণ্য, কেননা মৃতের সাথে তার সম্পর্ক জন্মসূত্রে। এ কারণে দাদার তার বাইরে থাকাই অনিবার্য। কেননা সে মৃতের দাদা, সে দাদা তার জন্মদাতা নয়। অন্য দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, দাদা-ই যেহেতু বংশের মূল, যেমন পিতা। তাই সে 'কালালা'র বাইরে নয়। অতএব দাদাকে কালালার বাইরেই ধরতে হবে। কেননা 'কালালা' হচ্ছে তা যা বংশের উপর বেষ্টক হয়ে আছে, যার সাথে বংশের মূল সম্পর্কিত নয়। তৃতীয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ -

যদি কোন ব্যক্তি মরে গিয়ে কালালাকে বা কোন মেয়েলোককে উত্তরাধিকারী বানায় এবং তার ভাই কিংবা বোন থাকে ......

এ আয়াত যে দাদাকে 'কালালা'র মধ্যে গণ্য করেনি, সে তার বাইরে, তার বর্তমান থাকা অবস্থায় মায়ের দিকের ভাইরা ওয়ারিস হতে পারে না, যেমন তারা ওয়ারিস হয় না নিজের পুত্র কন্যা থাকলে। এ বিষয়ে তাঁরা কোন মতপার্থ্যকে লিপ্ত নন।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, দাদা পিতার মতই 'কালালা'র বাইরে গণ্য। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, দাদা ঠিক পিতার পর্যায়ে গণ্য— তাদের বর্তমান থাকা অবস্থায় ভাই ও বোনদের মতের ওয়ারিস না হওয়ার মধ্যে সমান শরীক।

যদি বলা হয়, তুমি পূর্বে যে বলেছ, কন্যা 'কালালা' নয় এবং কন্যা থাকলে মায়ের দিকের ভাই ও বোনেরা ওয়ারিস হয় না, আপন সহোদর ভাই-বোনেরা ওয়ারিস হয়, তুমি যা বলেছ তার দ্বারা এ একথা প্রমাণিত হয় না। দাদাও তেমনি।

জবাবে বলা হবে, আমরা যা বলেছি, আমরা তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'ইল্লাত' বা কারণ বানাইনি। তাই তুমি যা বললে তা আমাদের উপর খাটে না। আমরা যা বলেছি তা হল, 'কালালা' নামটি যখন দাদাকে শামিল করে না— যেমন পিতা ও পুত্র, তখন আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দাবি করে যে, পিতা ও পুত্র বর্তমান না থাকলেই ভাই ও বোনদের মীরাস হবে। তবে এরূপ অবস্থায়ও তাদেরকে ওয়ারিস বানাবার কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা হবে। আর কন্যা 'কালালা' না হলেও তার বর্তমান থাকা অবস্থায় পিতার দিকের ভাই-বোনদের মীরাস পাওয়ার দলীল পাওয়া গেছে। এ কারণে আমরা আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্য থেকে আলাদা করেছি। আর তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে 'কালালা' নাম যাদেরকে শামিল করে তাদের সম্পর্কে আয়াতের বাহ্যিক বা শাব্দিক হুকুম অবশ্যই কার্যকর হবে।

আল-আওল

জুহরী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ ফরায়েযে সর্ব প্রথম 'আওল' করেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। ফরায়েয যখন তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে গেল, একাংশ অপর অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হল তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আমি জানি না— তোমাদের কোন্ লোক সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে, আর কোন্ লোক পরে। তিনি বড় তাক্‌ওয়া পরহেযগারীর লোক ছিলেন। বললেন, আমার জন্যে অধিক সহজ ও প্রশস্থ জিনিস এই পাচ্ছি যে, আমি তোমাদের মধ্যে ধন-মাল অংশ অংশ করে বন্টন করব এবং ফরায়েযের 'আওল' যা যার মধ্যে দাখিল করে, আমি তার মধ্যে তা দাখিল করে দেব।

আবূ ইসহাক আল-হারিস আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ দুই কন্যা, পিতামাতা ও স্ত্রী আছে। তাদের মোট অংশ হল নয়। আল-হিকাম ইবনে উতায়বাতাও তাঁর থেকে এ কথারই বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ ও জায়দ ইবনে সাবিতেরও এ মত। এ-ও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব-ই সর্বপ্রথম হযরত উমরকে 'আওল' সম্পর্কে ইঙ্গিত করেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফরায়েযে 'আওল' সর্বপ্রথম চালু করেন হযরত উমর (রা)। আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ যাকে অগ্রবর্তী করেছেন তাকেই যদি অগ্রবর্তী করা হতো, তাহলে ফরায়েযে কখনই 'আওল' আসতে পারত না। তখন তাঁকে বলা হল, আল্লাহ কাকে অগ্রবর্তী করেছেন, কাকে আল্লাহ্ পশ্চাদবর্তী করেছেন? জবাবে বললেন ঃ প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট অংশই রয়েছে। আল্লাহ্ তাকেই অগ্রবর্তী করেছেন। আর প্রত্যেকটি অংশ যদি তার অংশত্ব থেকে সরে যায়, তাহলে তার জন্যে শুধু তা-ই হয়, যা অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ তাকেই পশ্চাদবর্তী করেছেন। আল্লাহ যে অংশটিকে অগ্রবর্তী করেছেন, তা হল স্বামী স্ত্রী ও মার অংশ। কেননা তারা সব সময়ই নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী। আর কন্যা ও বোনরা নির্দিষ্ট অংশ না পেলে তারা আসাবা হয় দুই কন্যা ও কয়েক ভাই থাকলে। তখন তারা পুরুষদের সঙ্গে মিলে অবশিষ্ট যা থাকে, তা-ই পায়। তাই আমরা শুরু করি নির্দিষ্ট অংশধারীদের অংশ দেয়া। তখন অবশিষ্টদের উপর ক্ষতি চাপে। কেননা তারা আসাবা হয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই পায়।

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ আমরা তাঁকে বললাম ঃ এ বিষয়ে আপনি হযরত উমরকে জানান না কেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি তো এক ভয়াবহ ব্যক্তি এবং অত্যন্ত পরহেজগার। ইবনে আব্বাস বললেন ঃ আমি যদি এ বিষয়ে তাঁকে বলি, তাহলে তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন— তাঁর বর্তমান মত পরিত্যাগ করবেন। জুহরী বলেছেন ঃ ইবনে আব্বাস যদি নিরপেক্ষ বিচার ও ইনসাফের সম্মুখে না দাঁড়াতেন, ব্যাপারটি হতে দিতেন, তাহলে যা চলছিল, তা-ই চলতে থাকত। তিনি যেহেতু নেককার ব্যক্তি ছিলেন, তাই ইবনে আব্বাসের সাথে মত পার্থক্যে লিপ্ত হন নি।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ইবনে আবূ নুজাইহ্, আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসের নিকট শুনেছি, তিনি ফরায়েযের উল্লেখ করেছেন

এবং তাতে 'আওল' করেছেন। পরে বলেছেন ঃ তোমরা কি মনে কর, যে লোক বালুকণা গুণল, সে সংখ্যা সমস্যার সমাধান করল। কারোর ধন-মাল অর্ধেক অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশ করে ভাগ করল। এখানে অর্ধেক, ওখানে অর্ধেক। তাহলে এক-তৃতীয়াংশ আর থাকল কোথায় ? আতা বললেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম ঃ হে আবুল আব্বাস! এটা আপনার জন্যে যথেষ্ট হবে না। .... আমি যদি মরে যাই কিংবা আপনি মরে যান, আমাদের মীরাস বন্টন হবে জনগণের গৃহীত নীতির ভিত্তিতে— আপনার ও আমার মতের বিরুদ্ধে। তখন তিনি বললেনঃ লোকেরা যদি চায় তাহলে আমার বংশধরদের ও তাদের বংশধরদের, আমাদের মেয়েলোকদের ও তাদের মেয়েলোকদের এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তাদের নিজেদেরকে ডাকব এবং তারপর 'মুবাহিলা' করব, আল্লাহ্র লা'নত মিথ্যাবাদীদের উপর বর্ষিত হওয়ার দো'আ করব। আল্লাহ মীরাসে শুধু অর্ধেক অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশই বানান নি।

প্রথমোক্ত কথাটির দলীল হল, আল্লাহ্ স্বামীর জন্যে স্ত্রী রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক নির্দিষ্ট করেছেন। আর আপন সহোদর— বাপ-মা উভয়ের দিক দিয়ে— বোনের জন্যেও অর্ধেক নির্দিষ্ট করেছেন। আর মায়ের দিকের ভাইদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট করেছেন। এরা একসাথে থাকবে বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকবে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তাই কুরআনের আয়াতের 'নস'কে অবশ্যই কার্যকর করতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী, সম্ভাব্যতা সামনে রেখে। তারা যখন ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থান করবে ও রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে সংকুলান হবে, তখন তা উক্ত নীতি অনুযায়ী বন্টন করে দেয়া হবে। আর যখন এরা সকলে একসাথে থাকবে, তখন আয়াতের হুকুম কার্যকর করা ওয়াজিব হবে তাকে পারস্পরিক কম-বেশি করে। কতকের অংশ কমিয়ে ও কতককে প্রত্যাহার করে কিংবা কতকের অংশ লাঘব করে এবং অন্যদেরকে তাদের পূর্ণ অংশ দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হবে। কতকের ক্ষতি অপর কতকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে— নির্ধারণে অন্যদের জন্যে সমতা রক্ষা করে। ইবনে আব্বাস আল্লাহ যাকে অগ্রবর্তী করেছেন তাকে অগ্রবর্তী করার এবং যাকে পশ্চাদবর্তী করেছেন তাকে পশ্চাদবর্তী করা পর্যায়ে যা বলেছেন, তার অর্থ হল, তিনি কতককে অগ্রবর্তী ও কতককে পশ্চাদবর্তী করেছেন। আর তাকে আসাবা ধরে অবশিষ্ট যা তাকে দিয়েছেন।

তবে যেসব নির্দিষ্ট অংশ ঘোষিত হয়েছে, সেখানে আসাবা বানাবার প্রশ্ন উঠে না। তাদের মধ্যে থেকে একজন ও অপরজন অপেক্ষা অগ্রবর্তী হওয়ার অধিকারী নয়। লক্ষণীয়, বোন সম্পর্কে কুরআনের আয়াতেই নির্দিষ্ট অংশ ঘোষিত হয়েছে। বলেছে ঃ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ 'এবং তার বোন রয়েছে, তাহলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তার হবে।' স্বামীর অংশও কুরআন দ্বারা নির্দিষ্ট। মা ও মায়ের দিকের ভাইদের জন্যেও কুরআনে নির্দিষ্ট অংশ ঘোষিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় এ লোকদেরকে বোনের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার বাধ্যবাধকতা আসবে কোত্থেকে ? এ অবস্থায় আল্লাহ্ তার অংশ নির্ধারণে 'নস' নাযিল করেছেন, যেমন তার সঙ্গীদের অংশ নির্ধারণেও 'নস' নাযিল করেছেন। কিন্তু তা ওয়াজিব নয়, কেননা আল্লাহ্ তার নির্দিষ্ট অংশ অনির্দিষ্ট অবস্থায় নামিয়ে দিয়েছেন, যে-অবস্থায় আল্লাহ তার অংশের জন্যে 'নস' নাযিল করেছেন, সেই অবস্থায়ই তা নামিয়ে দিয়েছেন, এরূপ কথা কুরআনের আয়াতের বিরুদ্ধতায় অত্যন্ত জঘন্য, যে সব আয়াতে মীরাসের অংশসমূহ ঘোষিত হয়েছে। তা জঘন্য

কথা 'মুজারিবা' পদ্ধতিতে অর্ধেক অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠিত করার কথার তুলনায়। তার নযীর হচ্ছে মীরাসের মৌল নীতিসমূহে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ -

যে অসিয়ত মৃত ব্যক্তি করেছে তা এবং ঋণ শোধ হওয়ার পর।

মৃত ব্যক্তি যদি এক হাজার টাকা রেখে যায়, আর তার উপর ঋণ ধার্য থাকে এক হাজার টাকা কারোর পাওনা হিসেবে, আর অপরজনের পাওনা পাঁচশত টাকা এবং আর একজনের পাওনা ধার্য থাকে হাজার টাকা, তাহলে রেখে যাওয়া হাজার টাকা এ পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে প্রত্যেকের পাওনার পরিমাণ অনুরূপ। একথা বলা জায়েয হবে না যে, যেহেতু মোট ঋণ ১০০০ + ৫০০ + ১০০০ = ২,৫০০ টাকা, এক হাজার টাকা থেকে শোধ করা যায় না, এ কারণে তার কিছুই দেয়া হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ কারোর নামে অসিয়ত করে, আর তার এক-ষষ্ঠাংশের অসিয়ত করে অপর একজনের নামে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীর জন্যে অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা জায়েয হবে না অসিয়তের পরিমাণ দেয়ার মাধ্যমে। তাই একজনকে দেয়া হবে এক-ষষ্ঠাংশ, আর অপর জনকে দেয়া হবে এক-তৃতীয়াংশ, যদিও এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা অর্ধেক পূরণ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে পুত্র একা থাকলে মৃতের সমস্ত সম্পত্তি পাবে। মেয়ে একাকী থাকলে সে অর্ধেক পাবে। যদি এ ছেলে ও মেয়ে দুজনই থাকে, তাহলে পুত্রের সমস্ত প্রাপ্য মীরাস থেকে এবং কন্যার প্রাপ্য অর্ধেক থেকে কমিয়ে দিতে হবে। তখন এ দজুনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি এক-তৃতীয়াংশ এক-তৃতীয়াংশ করে দেয়া হবে। ফরায়েযে এটাই হচ্ছে 'আওল'-এর নিয়ম— যখন নির্দিষ্ট অংশসমূহ পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

মীরাসের অংশ শরীকানা

রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীগণ মীরাসের অংশে শরীকানার ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তা এভাবে যে, একজন মেয়েলোক তার স্বামী, তার মা, তার মায়ের দিক দিয়ে কয়েক ভাই, আর পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়ে কয়েক ভাই রেখে মরে গেল। এরূপ অবস্থায় আলী ইবনে আবূ তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কাব ও আবূ মূসা আল-আশআরী বলেছেন, আর স্বামী পাবে অর্ধেক, মা এক-ষষ্ঠাংশ এবং মার দিকের ভাইরা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। আর আপন সহোদর— মা-বাবা উভয় দিকের ভাই বোনরা কিছুই পাবে না। সুফিয়ান সওরী আমর ইবনে মুররা, আবদুল্লাহ ইবনে সালামাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, মায়ের দিকের ভাইদের মীরাস সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যদি একশ জন হতে তাহলে তোমরা কি তাদের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে বৃদ্ধি করতে ? তারা বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ আমিও তাদের অংশ থেকে কিছুই কমাইনি। মা-বাপ উভয়ের দিকের ভাই-বোনদেরকে এ অংশ নির্ধারণে আসাবা বানিয়েছেন। নির্দিষ্ট অংশসমূহ তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উমর ইবনে

খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও জায়দ ইবনে সাবিত বলেছেন, স্বামী পাবে অর্ধেক, মা এক-ষষ্ঠাংশ আর মার দিকের ভাইদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ। পরে বাপ-মা উভয় দিকের ভাইরা মার দিকের ভাইদের সাথে শরীক হবে। ফলে তারা যে এক-তৃতীয়াংশ পাবে তাতে তারা সমান অংশীদার হবে। মামার সামাক ইবনুল ফযল, অহব ইবনে মুকাব্বাহ, আল-হিকাম ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাবকে দেখেছি, তিনি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে বাপ-মা— উভয় দিকের ভাইদেরকে মার দিকের ভাইদের সাথে শরীক বানিয়েছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলনে ঃ প্রথম বছর আপনি এর বিপরীত ফায়সালা দিয়েছিলেন। বললেন, কিভাবে ফায়সালা দিলাম ? বললে, আপনি মার দিকের ভাইগণকে অংশ দিয়েছিলেন, মা-বাপ উভয় দিকের ভাইদেরকে আপনি কিছুই দেন নি। বললেন, হ্যাঁ, ওটাও আমারই বিচার ছিল। আর এটাও আমারই বিচার। বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) তাদেরকে শরীক করতেন না। তাই তখন মা-বাপ উভয় দিকের ভাইরা আপত্তি জানায় ও তার প্রতিবাদ করে। তারা বলে ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের পিতা আছে, ওদের তো পিতা নেই! তবে আমাদের মা আছে, যেমন ওদের আছে। আমাদের পিতা থাকা সত্ত্বেও আপনি যদি আমাদেরকে বঞ্চিত করেন, তাহলে আমাদের মার সাথে আমাদের ওয়ারিস বানান, যেমন করে ওদেরকে ওদের মার সাথে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আর ধরে নিন যে, আমদের পিতা গাধা ছিল। আপনি কি একই মার গর্ভে আমাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন না ? তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা সত্য বলেছ। তখন তিনি সেই এক-তৃতীয়াংশ মীরাসে তাদেরকে ও মার দিকের ভাইদেরকে এক-তৃতীয়াংশ শরীক বানিয়ে দিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও আল-হাসান ইবনে যিয়াদ হযরত আলী ইবনে আবূ তালিবের মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের অনুসারীরাও তাই করেছেন। তাঁরা সকলে এক-তৃতীয়াংশ সকলকে শরীক বানানো পরিহার করেছেন।

প্রথম কথাটির সহীহ্ হওয়ার দলীল হল আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْاُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ -

কোন ব্যক্তি যদি কালালা বা কোন মেয়েলোককে ওয়ারিস বানায়, আর তার ভাই কিংবা বোন থাকে, তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ। আর তারা যদি তার থেকে সংখ্যায় বেশী হয়, তাহলে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশেই শরীক হবে।

এ আয়াতে মার দিকের ভাইদের মীরাসী অংশের নস পাওয়া গেল, আর তা হল এক-তৃতীয়াংশ। আর বাপ মা উভয় দিকের ভাইদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আল্লাহ্র এ কথাটিতে ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ .... وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

লোকেরা তোমার নিকট ফতোয়া চায়, বল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে 'কালালা' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন .... যদি তারা পুরুষ-নারী মিলিয়ে ভাই বোন হয়, তাহলে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন মেয়েলোকের অংশের সমান। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)

এদের জন্যে কোন নির্দিষ্ট অংশ ঘোষণা করা হয়নি, তাদের জন্যে আসাবা হিসেবে মীরাস পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, 'একজন পুরুষের জন্য দুইজন মেয়েলোকের অংশের সমান।' আর সে যদি স্বামী, মা, মার দিকের ভাই ও বাপ-মা উভয় দিকের ভাই ও বোন কয়েকজন রেখে যায়, তাহলে স্বামী পাবে অর্ধেক, মা এক-ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট যে এক-ষষ্ঠাংশ তা বাপ-মা উভয় দিকের ভাই বোনদের মধ্যে 'একজন পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়েলোকের অংশ' এই নিয়মে বিভক্ত করা হবে। তারা মার দিকের ভাইর জন্যে নির্দিষ্ট অংশে শরীক হবে না। এভাবে তারা নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের সঙ্গে থাকবে, তখন তারা আসাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে। নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে নয়। তাদেরকে মার দিকের ভাইদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ শরীক হবে না। কেননা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থই তা করতে নিষেধ করে, কেননা আয়াতটি তাদের জন্যে ঘোষণা করেছে তা যা তারা আসাবা হিসেবে 'একজন পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়েলোকের অংশ' নিয়মে পাবে ও গ্রহণ করবে। নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে নয়। এমতাবস্থায় তাদেরকে নির্দিষ্ট অংশ দিতে চাইলে আয়াত থেকে প্রমাণিত কথার পরিপন্থী কাজ হবে। নবী করীম (স)-এর কথা থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا اَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلَاَوْلٰى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ -

তোমরা নির্দিষ্ট অংশসমূহ তাঁর প্রাপককে দাও। এই অংশসমূহ যা অবশিষ্ট রাখবে তা আসাবাদের জন্যে।

আসাবাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষণে যদি কেউ তাদেরকে নির্দিষ্ট অংশ প্রাপকদের সাথে শরীক গণ্য করে— তাদের আসাবা হওয়া সত্ত্বেও-তা হলে সে এ হাদীসেরও বিরুদ্ধতা করে।

যদি বলা হয়, তারা যখন মার বংশধারায় শরীক, তখন বাপের বর্তমানতায় তাদের মাহরূম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা হবে, একথা ভুল। কেননা মেয়েলোক যদি স্বামী, মা, মার দিকের ভাই এবং বাপ-মা উভয় দিকের ভাই-বোনদের রেখে মরে যায়, তাহলে ভাই মা'র ষষ্ঠাংশ পূর্ণ নিয়ে নেবে, আর মা-বাপ উভয় দিকের সহোদর ভাই-বোনরা নিজে অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ পারস্পরিক ভাগ করে। আর সম্ভবত তাদের প্রত্যেকেই এক-দশমাংশের কম পাবে এবং তাদের কারোর পক্ষে একথা বলার সুযোগ হবে না যে, পিতার কারণে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করেছ, যদিও আমরা মার সাথে শরীক (অর্থাৎ আমাদের মা এক) বরং মার তুলনায় ভাইর অংশ তাদের প্রত্যেকের তুলনায় অধিক পূর্ণ মাত্রার হবে।

এ কথাটি দুটি তাৎপর্য প্রকাশ করে। একটি— মা'তে শরীক হওয়ার দরুন ইল্লাত (কারণ) ক্ষুণ্ন হবে। আর দ্বিতীয়— তারা কোন নির্দিষ্ট অংশ পায়নি, তারা যা পেয়েছে তা আসাবা

হিসেবে। অপর একটি দৃষ্টান্তে উক্ত কথার অযথার্থতা প্রমাণ করে। যদি মেয়েলোক স্বামী, মা-বাপ উভয় দিকের বোন এবং শুধু পিতার দিকের ভাই ও বোন রেখে যায়, তাহলে স্বামীর জন্যে অর্ধেক এবং মা-বাপ উভয় দিকের বোন পাবে অর্ধেক। আর পিতার দিকের ভাই ও বোন কিছুই পাবে না। কেননা তারা দুজনই আসাবা। অতএব তারা নির্দিষ্ট অংশ প্রাপকদের মধ্যে দাখিল হবে না। আর পিতার দিকের ভাইকে না থাকার মতো বানান নি। ফলে পিতার দিকের বোন তার জন্যে সেই নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে যাবে, যা সে ভাই থেকে আলাদা হয়ে একাকী থাকলে নিতে পারত। আর আসাবা হওয়া তাকে সেই এক-ষষ্ঠাংশ থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে যা সে পেত। অনুরূপভাবে আসাবা হওয়া মা পিতার দিকের ভাইদেরকে এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তি থেকে বাইরে এনেছে, যা মার দিকের ভাইরা পেত।

কন্যার সাথে বোনের মীরাস

এক ব্যক্তি তার এক কন্যা ও মা-বাপ উভয় দিকের এক বোন রেখে মরে গেল। আর থাকল আসাবা একজন এ অবস্থায় কন্যা পাবে তার মোট সম্পত্তির অর্ধেক। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পাবে বোন। এ মত দিয়েছেন হযরত আলী, উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জায়দ ইবনে সাবিত ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)। এই ব্যাপারে তাঁদের বিপরীত মত কেউ পেশ করেনি, এতে বোনকে সকলেই আসাবা বানিয়েছেন— কন্যাদের সঙ্গে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও ইবনুয যুবায়র (রা) বলেছেন, কন্যা পাবে অর্ধেক, আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবার জন্যে— তার বংশীয় সম্পর্ক যতই দূরের হোক। কন্যার সঙ্গে বোন থাকলে মীরাসে তার কোন অংশ নেই।

ইবনুয যুবায়র সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর উক্ত মত অনুযায়ী একটা রায় ও ফায়সালা দেয়ার পর তাঁর মত ত্যাগ করেছেন। এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলা হয়েছিল, হযরত আলী, আবদুল্লাহ ও জায়দ (রা) কন্যাদের সাথের বোনদেরকে আসাবা গণ্য করতেন এবং এভাবে তাদেরকে অতিরিক্ত মালের উত্তরাধিকারী বানাতেন। তখন তিনি বললেন : তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ্ বেশি জানেন? আল্লাহ তো বলছেন :

انِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَه اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

কোন ব্যক্তি যদি মরে যায়, যার সন্তান নেই, আছে তার বোন, তখন এই বোনের জন্যে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক প্রাপ্য হবে। (সূরা নিসা : ১৭৬)

আর তোমরা সন্তানের সঙ্গে থাকলে অর্ধেক দিচ্ছ :

আবূ বকর বলেছেন : প্রথম কথার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্র এই কথাটি পেশ করা হয়।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ - وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا -

পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে তা থেকে যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং মেয়েলোকদের জন্যেও নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে তা থেকে যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে, তা কম হোক, কি বেশি— সুনির্দিষ্ট অংশ হিসাবে।

এ আয়াত বাহ্যতই দাবি করে, কন্যার সাথে বোন থাকলে সে মীরাস পাবে। কেননা এ বোনের মৃত ভাই তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যের লোক। আর আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবেই নিকটাত্মীয়দের মীরাস পুরুষ ও মেয়েলোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন।

এ পর্যায়ে দলীল হিসেবে যে হাদীস পেশ করা হয়, তা আবূ কায়স আল-আওয়াদী হুযয়ল ইবনে শারাহবীল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) কন্যা, পুত্রের কন্যা ও পিতামাতা উভয় দিকের সহোদর বোন থাকা অবস্থায় ফায়সালা দিয়েছেন যে, কন্যা অর্ধেক পাবে, পুত্রের কথা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে— দুই-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বোন পাবে। বোনকে নির্দিষ্ট অংশসমূহ দিয়ে দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি দিয়েছেন। কন্যার সঙ্গে তাকে আসাবা বানিয়েছেন।

এ পর্যায়ে দলীল হিসেবে এই যে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তার জন্যে অর্ধেক দেয়া নির্দিষ্ট করেছেন সন্তান না থাকলে, সন্তানের সঙ্গে থাকলে তার জন্যে অর্ধেক সম্পত্তি নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়, এরূপ দলীল এদিক দিয়ে অ-বাধ্যতামূলক যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান না থাকা অবস্থায় তার অংশ নির্দিষ্ট করেছেন, সন্তান থাকা অবস্থায় তার মীরাসকে অস্বীকার করেন নি। আর সন্তান না থাকা অবস্থায় তার জন্যে অর্ধেক নির্দিষ্ট করাকেও অগ্রাহ্য করেন নি, তা তার অধিকার নিঃশেষ হওয়ার কোন প্রমাণ হবে না যখন সেখানে সন্তান থাকবে। কেননা এ অবস্থায় মীরাস না হওয়া কিংবা হওয়ার উল্লেখ করা হয়নি, তা তার দলীলের উপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও তার অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি মরে গেলে ও তার সন্তান না থাকলে আল্লাহ্‌র কথার দলীল অনুযায়ী যা আয়াতের ধারাবাহিকতায় রয়েছে ঃ وَهُوَ يَرِثُهَا 'সে তার ওয়ারিস হবে' অর্থাৎ ভাই বোনের মীরাস পাবে। اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ —'যদি তার সন্তান না থাকে'-এর অর্থ সকলের নিকট যদি তার পুরুষ সন্তান না থাকে। কেননা মেয়েলোক যদি মেয়ে সন্তান ও ভাই রেখে যায় তাহলে কন্যা অর্ধেক পাবে, আর ভাই পাবে অবশিষ্ট থাকা সম্পত্তি। এ বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এখানে যে সন্তানের উল্লেখ আছে সে-ই আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত।

উপরন্তু আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ –

এবং তার বাপ-মা প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে যদি তার সন্তান থাকে।

সকলেরই নিকট এর অর্থ ঃ যদি তার পুরুষ সন্তান থাকে। কেননা সে যদি একটি কন্যা ও পিতামাতা রেখে যায়, তাহলে কন্যা পাবে অর্ধেক ও পিতামাতা দুই-এক-ষষ্ঠাংশ করে। আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা পিতার জন্যে। ফলে পিতা মৃতের মেয়ে সন্তানের সঙ্গে এক-ষষ্ঠাংশের বেশী গ্রহণ করবে, এ বিষয়েও সাহাবীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'মৃতের সন্তান থাকলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ' এতেও পুরুষ সন্তান থাকার কথা-ই বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি সে পিতা ও একটি কন্যা রেখে যায়, তাহলে কন্যা পাবে অর্ধেক, আর পিতাও অর্ধেক পাবে। এ দুইটি ক্ষেত্রে সন্তান থাকা অবস্থায় পিতা এক-ষষ্ঠাংশের বেশি পাবে।

আবূ বকর বলেছেন, কিছু লোক সমগ্র মুসলিম উম্মত থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করেছেন। তারা এ ধারণা পোষণ করে যে, যদি একটি মেয়ে ও একটি বোন রেখে যায়, তাহলে সমস্ত সম্পত্তিই মেয়ে পেয়ে যাবে। কন্যা ও ভাইও তেমনি। কিন্তু এ মত কুরআনের বাহ্যিক অর্থেরই বিপরীত। গোটা মুসলিম উম্মাহর মতের সাথেও তা সাংঘর্ষিক।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ -

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে অসিয়ত করছেন ঃ একজন পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়ের অংশের সমান হবে। মেয়েদের সংখ্যা দুইজনের অধিক হলে তারা রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি একজন মাত্র হয়, তবে সে অর্ধেক পাবে।

এতে কন্যার অংশের প্রমাণ অকাট্যভাবে পাওয়া যাচ্ছে। দুই-তৃতীয়াংশের উপরের অংশের কথাও বলা হয়েছে। যখন সে একাকী হবে, তখন সে অর্ধেক পাবে। যদি তাকে ছাড়া অপর কেউ দুই-তৃতীয়াংশ তাদের সঙ্গে মিলায়, তাহলে তার অধিক দেয়া জায়েয নয়, জায়েয হতে পারে কোন দলীলের ভিত্তিতে।

যদি বলা হয়, যদি অর্ধেক ও দুই-তৃতীয়াংশের উল্লেখ হয়, যার দ্বারা সে দুই-তৃতীয়াংশের উপরে যা তার অস্বীকৃতির কোন প্রমাণ ছাড়াই। তাহলে এক্ষণে অতিরিক্তকে বাহ্যত অস্বীকার করা হয়নি। অতিরিক্ত পাওয়ার অধিকার প্রমাণকারী দলীল প্রতিপক্ষের নিকট দাবি করার প্রয়োজন হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র কথা, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করেছেন; একটি আদেশ, উল্লিখিত অংশগুলো সম্পর্কিত। কেননা অসিয়ত একটি আদেশ, আয়াতে নির্ধারিত প্রত্যেকটি অংশ গণ্য করা ওয়াজিব— যেমন তা আছে, তেমনিভাবে। তার উপর বৃদ্ধি করা কিংবা তা থেকে কামানো নিষিদ্ধ। তাই যার জন্যে যে পরিমাণের উল্লেখ হয়েছে, সেইটা যথাযথ রাখা কর্তব্য। তাতে না বৃদ্ধি করা যাবে, না কম করা যাবে। পূর্বে যা বলা হয়েছে তা বাদে বিশেষভাবে যার উল্লেখ হয়েছে। সম্বোধনের শুরুতে তাকে গণ্য করা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এ কারণে দলীল ছাড়া তার উপর বৃদ্ধি করাকে আমরা নিষিদ্ধ করেছি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে'— প্রমাণ করে যে, কন্যাদের সঙ্গে ভাইকেও অংশ দিতে হবে। নবী করীম

(স) থেকে ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হল ঃ নির্দিষ্ট অংশসমূহ সে সবের প্রাপককে দিয়ে দাও। যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ আসাবাদের প্রাপ্য'। আয়াত ও হাদীসের সামষ্টিক অর্থ হল ঃ কন্যাকে আমরা যদি অর্ধেক সম্পত্তি দেই, তাহলে অবশিষ্ট যা থাকবে তা ভাইকে দেব— এটাই ওয়াজিব। কেননা ভাই পুরুষ আসাবা।

চাচার দুইজন পুত্র, একজন মার দিকের ভাই— এখন মীরাস বণ্টন কিভাবে হবে, সে বিষয়ে, আগেরকালের ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন; আলী ও জায়দ (রা) বলেছেন, মার দিকের ভাইকে এক-ষষ্ঠাংশ দিতে হবে। আর যা বাকী থাকবে তা দুজনের মধ্যে অর্ধেক-অর্ধেক। বিভিন্ন দেশের ফিকাহ্‌বিদদেরও এ মত। হযরত উমর ও আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, মার দিকের ভাই সব মাল-সম্পত্তি পাবে। তারা দুজন এ-ও বলেছেন ঃ যার নির্দিষ্ট অংশ নেই, তার তুলনায় নির্দিষ্ট অংশধারীরা বেশি অধিকার সম্পন্ন। শুরাইহ্ ও আল-হাসান এ মত পোষণ করতেন। মার দিকের দুই ভাই— একজন চাচার পুত্র— এ দুইজন এক-তৃতীয়াংশ পাবে— মার সম্পর্কের কারণে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বিশেষভাবে চাচার পুত্র পাবে। এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। চাচার পুত্রকে সমস্ত মীরাসের অধিকারী তাঁরা বানান নি। কেননা এখানে একটি নির্দিষ্ট অংশ আর অপরটি অনির্দিষ্ট। চাচার দুই পুত্র, তাদের একজন মার দিকের ভাই, তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশ-ও আসাবা হওয়ার বিশেষত্বের কারণে তাকে মীরাস পাওয়ার অধিক যোগ্য বানানো জায়েয নয়। উমর ও আবদুল্লাহ্ (রা) এ ব্যাপারটিকে তুল্য করেছেন। আপন সহোদর ভাইর সঙ্গে এ হিসেবে যে, সে মীরাস পাওয়ার অধিক অধিকারী! কিন্তু অন্যদের নিকট তা এ ব্যাপারের সাথে তুলনীয় নয় এ কারণে যে, তার বংশীয় সম্পর্ক মাত্র একটি দিক দিয়ে। আর তা হচ্ছে ভাই হওয়া। এ কারণে সে দুজনের মধ্যে তার দিকে অধিক নিকটবর্তীকে তাতে গণ্য করেছেন। সে বাপ-মা— উভয়ের নৈকট্য সেখানে একত্রিত হয়েছে। আর শুধু মার দিকের নৈকট্য দ্বারা মার দিকের ভাইর অংশ পাওয়ার অধিকারী হয় না। বরং তা ভাই হওয়ার ব্যাপারটির উপর অধিক তাগিদ আসে। চাচার দুই পুত্র— তার একজন মার দিকের ভাই— সেরূপ নয়। কেননা তুমি তো মার দিকের ভাই হওয়া দ্বার যা ভাই নয় তাকে তাগিদপূর্ণ করতে চাও। তাহলে ওটা বাদে আর একটি কারণ। কাজেই তার দ্বারা তাকে তাগিদপূর্ণ করা জায়েয নয়।

এ কথা প্রমাণ করে যে, সে চাচার পুত্র— এই হিসেবে তার সম্পর্ক তার অংশকে অগ্রাহ্য বানায় না এ দিক দিয়ে যে সে মার দিকের ভাই। বরং সে ওয়ারিস হবে সে মার দিকের ভাই বলে মার দিকের ভাইর অংশ থেকে। যদিও সে চাচার পুত্র।

বিবেচ্য এই যে, মৃত ব্যক্তি যদি মা-বাপ উভয় দিকের দুই বোনকে রেখে যায়, আর থাকে তার মা ও স্বামী এবং মার দিকের ভাই— যে কিনা চাচার পুত্র। তখন দুই বোন পাবে দুই-তৃতীয়াংশ, স্বামী পাবে অর্ধেক। আর মার দিকের ভাই পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। তার অংশ পড়ে যাবে না সে চাচার পুত্র হওয়ার কারণে। যদি স্বামী, মা, মার দিকের বোন এবং মা-বাপ উভয় দিকের কয়েক ভাই রেখে যায়, তাহলে স্বামী অর্ধেক পাবে, মা এক-ষষ্ঠাংশ, মার দিকের বোন পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মা-বাপ উভয় দিকের ভাইদের জন্যে। বাবা ও মার দিকের ভাইরা শুধু মার দিকের ভাইদের অংশ থেকে কিছু পাবে না। কেননা তারা মার

বংশ সম্পর্কে মার দিকের ভাইর সাথে শরীক। তারা পাবে শুধু আসাবা হিসেবে। তাদের আসাবা হওয়ায় বাবা ও মার নৈকট্য তাগিদপূর্ণ হবে। অতএব তারা নির্দিষ্ট অংশধারী হওয়ার অধিকারী হবে না। আর মার দিকের বংশ সম্পর্কের কারণে চাচার পুত্রের নৈকট্য তাদেরকে নির্দিষ্ট অংশের ধারক হওয়া থেকে বহিষ্কৃত করবে না। যেখানে তারা মার দিকের ভাইর অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে। আসাবা হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ হওয়ায় এর কোন প্রভাব পড়বে না। কেননা যদি তা হতো, তাহলে কখনই পাওয়ার অধিকারী হতো না আসাবা হওয়া ছাড়া। যেমন বাবা-মার দিকের ভাইরা আসাবা হওয়া ছাড়া কিছুই নিতে পারে না। মার দিকের তাদের নৈকট্যের কারণেও তারা মার দিকের ভাইদের অংশ নিতে পারবে না।

মৃত ব্যক্তির ঋণ ও অসিয়ত

আল্লাহ বলেছেন ঃ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا اَوْدَيْنٍ -

যে অসিয়ত করে তা পূরণ ও ঋণ শোধের পর .....

আল-হারীস আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আয়াতে ঋণের আগেই অসিয়তের কথা পড়। অথচ মুহাম্মাদ (স) অসিয়ত পূরণের পূর্বেই ঋণের ব্যাপারটির ফায়সালা করিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মত-বৈষম্য নেই। কেননা 'যে অসিয়ত করে তা পূরণ ও ঋণের পর' আল্লাহ্র এ কথাটির অর্থ হল, মীরাস বণ্টন করা হবে এ দুটি কাজ সম্পূর্ণ করার পর। এখানে তা সমষ্টিগতভাবে উল্লিখিত হয়েছে, কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে, তা বলা হয় নি। কেননা যে অসিয়ত করে বা ঋণের পর বাক্যটি মীরাস বণ্টন সংক্রান্ত বাক্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন। এখানে ব্যবহৃত او (আও) অক্ষরটি নৈতিবাচক হওয়ার পর তা একত্রিকরণ বোঝায়। যেমন এ আয়াতটিতে ঃ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْكَفُوْرًا -

এবং তাদের মধ্য থেকে পাপী-গুনাহগার কিংবা বড় শক্ত কাফির— কারোরই আনুগত্য করবে না।

এ আয়াতে او - واو অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا اِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِالْحَوَايَا اَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ -

আমরা সে দুটি জন্তুর চর্বিসমূহ তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি। তবে যা তাদের পৃষ্ঠদেশ বহন করে কিংবা আতুড়ি, অথবা যা অস্থিত সাথে মিশ্রিত— তা বাদে........

(সূরা আন'আম ঃ ১৪৬)

এসব আয়াতে او - او অর্থে ব্যবহৃত واو - او কথাতে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا اَوْدَيْنٍ অর্থে ব্যবহৃত। আর এ অব্যাহৃতি প্রাপ্তির অর্থে যেন বলা হয়েছে ঃ 'তবে যদি সেখানে কোন অসিয়ত বা ঋণ থাকে, তাহলে বর্ণিত মীরাস বন্টনের কাজটা এ দুটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে করতে হবে। আর এ দুটির মধ্যে অসিয়তের কথা ঋণের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আগেই অসিয়ত পূরণের কাজ করতে হবে— এমন কথা নেই। কেননা তরতীব বা পরম্পরা অথবা আগে-পরে নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করে না। আল্লাহ্ এ গোটা কথাটাই মীরাস বন্টনের পর বলেছেন। আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মীরাসের অংশ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কার্যকর হবে ঋণ আদায় করার ও অসিয়ত পূরণের পর। কেউ যদি তার ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, তাহলে সেই এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেয়ার পর ওয়ারিসদের মীরাসের অংশ প্রদানের ব্যাপারটি কার্যকর হবে। তাতে স্ত্রী পাবে এক-চতুর্থাংশ কিংবা দুই-তৃতীয়াংশে এক-অষ্টমাংশ। এমনিভাবে মীরাস প্রাপকদের সকলের অংশই দিয়ে দিতে হবে অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ থেকে। যে এক তৃতীয়াংশের উপর অসিয়ত, তা বাদ দিতে হবে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ঋণের কথা ও অসিয়তের কথা একত্রিত করে বলে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মীরাস বন্টনটা হবে অসিয়ত পূরণ করার পর। তেমনি তা কার্যকর হবে ঋণ শোধের পর যদিও অসিয়ত ও ঋণ পরস্পর বিপরীত, তবু দুটিই দিয়ে দেয়ার ব্যাপার। কেননা ধন-মাল থেকে যদি কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা অসিয়তের অংশ থেকেও যাবে, যেমন যাবে মীরাস বন্টনের অংশ থেকেও। ঋণ সে রকমের নয়। কেননা রেখে যাওয়া সম্পত্তির কোন অংশ যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অসিয়ত ও মীরাসের ব্যাপারটি অকার্যকর হয়ে গেলেও ঋণ শোধের বাধ্য-বাধকতা যথাযথ থাকবে। যার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে, সে এক দিক দিয়ে ওয়ারিসদের সমান পর্যায়ে গণ্য। অবশ্য অপর একদিক দিয়ে পাওনাদারকেও ওয়ারিসদের কাতারে দাঁড় করানো হয়। তা এভাবে যে, অসিয়ত পূরণের পর মীরাসের অংশ দেয়া হবে, যেমন মীরাসের অংশ হস্তান্তর করা হবে ঋণ শোধের পর। আল্লাহ্ কথা ঃ 'অসিয়ত যা করার হয় এবং 'ঋণের পর-এর অর্থ এ নয় যে, যার নামে অসিয়ত তাকে মীরাসের অংশ দেয়ার আগেই দিয়ে বিদায় করা হবে। বরং তা সকলের সঙ্গে এক সাথে আদায় করা হবে। এদিক দিয়ে যার জন্যে অসিয়ত সে-ও অংশীদার একজন। আর বন্টনের পূর্বে যা ধ্বংস হবে, তা এ সকলের প্রাপ্য থেকেই বাদ পড়বে।

বৈধ অসিয়তের পরিমাণ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا اَوْدَيْنٍ এতে মনে হয়, অসিয়ত অল্প সম্পদ-সম্পত্তির উপর কি বেশির উপর, তা জায়েয হবে। কেননা কথাটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে, কিছু বাদ দিয়ে কিছু সম্পর্কে অসিয়ত করার কথা মূল আয়াতে বলা হয়নি। তবে এ আয়াত ছাড়া অন্য দলীলের ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে সমস্ত সম্পত্তির উপর অসিয়তের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে তার কতক অংশের উপর অসিয়তের কথা। আর তা হল ঃ 'পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে তা থেকে যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে। মেয়েদের জন্যও অংশ রয়েছে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়র যা রেখে গেছে তা থেকেও— তা

কম হোক কি বেশি।' এ কথায় অসিয়তের উল্লেখ না করেই মীরাস পাওয়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এক্ষণে ঃ 'যে অসিয়ত করা হয় তা এবং ঋণের পর' কথাটিতে অসিয়ত যদি সমগ্র মালের জায়েয মনে করা হয়, তাহলে 'পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষ ও নারীর মীরাস' হওয়ার কথা মনসূখ ও বাতিল মনে করতে হয়। কেননা সব মালের উপর অসিয়ত জায়েয হলে মীরাস বন্টনের হুকুম কেমন করে পালন করা হবে ? তাই এ কথাটি যখন মীরাস বন্টনের বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করে, তাহলে তা অসিয়তের হুকুমের সাথে মিলিয়ে পালন করতে হবে। আর ফল এই দাঁড়াবে যে, অসিয়ত কতক মালের উপরই করা ও ধরা যাবে, যেন অবশিষ্ট মাল ওয়ারিসরা পেতে পারে। এভাবেই দুটো আয়াত অনুযায়ী একসাতে আমল করা সম্ভব হতে পারে।

আল্লাহ্‌র এ কথাটিও সেই কথাই প্রমাণ করে ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا -

যেসব লোক পেছনে দুর্বল-অক্ষম বাচ্চা-কাচ্চা রেখে যেতে ভয় পায়, তাদের উচিত এ পরিস্থিতিতে ভয় করা। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত, উচিত যথাযথ কথা বলা।

অর্থাৎ পূর্বে অসিয়তের আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সেই আলোকে মৃতের সব মালের উপর অসিয়ত করতে নিষেধ করা সম্পর্কে যথাযথ কথা বলা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। তাহলে মৃতের মালের একটি অংশের উপর অসিয়ত করা জায়েয প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এ দুটি অর্থই জ্ঞাপন করে।

এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মত তা গ্রহণ করেছেন এবং সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের উপর অসিয়ত করা জায়েয হওয়া পর্যায়ে এ সব হাদীসকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছে। তার একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, ইবনে আবূ খালফ, সুফিয়ান জুহরী, আমের ইবনে সাদ—তাঁর পিতা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতা ভয়ানকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইবনে আবূ খালফ বলেছেন— মক্কায় এমন একটি রোগে যা থেকে তিনি নিরাময় হয়েছিলন। তাঁকে দেখার জন্যে রাসূলে করীম (স) উপস্থিত হলেন। তখন আমার পিতা বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ, আমার নিকট বিপুল ধন-সম্পদ রয়েছে, কিন্তু আমার একটি কন্যা ছাড়া ওয়ারিস হওয়ার আর কেউ নেই। এরূপ অবস্থায় আমি কি তিন ভাগের দুই ভাগ সাদ্‌কা করে দেব? রাসূল (স) বললেন, না। বললেন, তাহলে অর্ধেক করি? বললেন না। বললেন, তা হলে এক-তৃতীয়াংশ করি? বললেন হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশই তো অনেক । আর তুমি তোমার ওয়ারিসদিগকে ধনশালী রেখে যাবে, এটা তারা অনেক ভালো এ অবস্থা থেকে যে, তুমি তাদেরকে অভাগ্রস্ত রেখে যাবে, তারা লোকদের জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চাইবে। জেনে রাখ, তুমি যে ব্যয়টাই আল্লাহ্‌র

ওয়াস্তে করবে, তার সওয়াব অবশ্যই তুমি পাবে। এমন কি, যে-খাবার মুষ্ঠি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তার-ও।

আমি বললাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ! আমার হিজরতের পর কি আপনি এখানে থেকে যাবেন? বললেন ঃ তুমি যদি আমার চলে যাওয়ার পরও এখানে থেকে যাও এবং এমন কাজ কর যার দ্বারা তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে চাইবে, তাহলে তোমার মর্যাদার উচ্চতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। সম্ভবত তুমি পেছনে থাকবে, যেন তোমার দ্বারা জনগণ উপকৃত হয়, আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর তিনি দো'আ করলেন ঃ হে আমাদের আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরতকে কার্যকর কর, তাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দিও না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সায়াদ ইবনে খাওলা মক্কায়ই ইন্তেকাল করেছেন বলে নবী করীম (স) দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এই বর্ণনাটি থেকে শরীয়াতের কয়েক প্রকারের বিধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে— এক-তৃতীয়াংশের অধিক ধন-মালের অসিয়ত জায়েয নয়। দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশের কমের অসিয়ত হওয়া ভালো, পছন্দনীয়— মুস্তাহাব। এই কারণে কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশের কমে অসিয়ত হওয়া মুস্তাহাব। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ এক-তৃতীয়াংশই অনেক। তৃতীয়, মোট মালের পরিমাণ যদি কম ও সামান্য হয় এবং তার ওয়ারিসরা হয় দরিদ্র, তাহলে কোন মালের অসিয়ত না করাই উত্তম। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমার ওয়ারিসদিগকে সচ্ছল রেখে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্র ভিক্ষুক বানিয়ে রেখে যাওয়া অপেক্ষা অনেক কল্যাণময়। আর এতে এ কথারও দলীল আছে যে, সমস্ত মালের অসিয়ত করাও জায়েয, যদি মালের মালিকের কোন ওয়ারিস না থাকে। কেননা জানানো হয়েছে যে, এক-তৃতীয়াংশের অধিকের অসিয়ত করা নিষিদ্ধ ওয়ারিসদের কারণে। তা থেকে বোঝা যায় যে, রোগাক্রান্ত অবস্থায় দান-সাদকা করা অসিয়ত, যা এক-তৃতীয়াংশের অধিক জায়েয নয়। কেনন হযরত সাদ (রা) বলেছিলেন ঃ আমি কি আমার সমস্ত ধন-মাল সাদ্‌কা করব? তিনি বললেন— না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এনে দিলেন।

জরীর আতা ইবনুস সায়ের, আবূ আবদুর রহমান আস্-সুলামী সাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, আমাকে দেখার জন্যে রাসূলের করীম (স) এলেন। বললেন ঃ তুমি কি অসিয়ত করেছ? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, কতটা? বললাম— আমার সব ধন-মাল আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গিত। বললেন ঃ তা হলে তোমার সন্তানের জন্যে কি রেখেছ? বললেন, ওরা তো সকলে ধনী লোক। বললেন, এক-দশমাংশের অসিয়ত কর। আমি হার কমাতে চেষ্টা করতে থাকলাম। তিনিও আমাকে কম করতে সাহায্য করলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত কর, এক-তৃতীয়াংশ তো অনেক।

আবূ আবদুর রহমান বলেছেন, এরপর থেকেই আমরা এক-তৃতীয়াংশের কমের অসিয়ত করাকে মুস্তাহাব মনে করতে থাকলাম। কেননা নবী করীম (স) এক-তৃতীয়াংশকে অনেক বলেছেন। উক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার সব ধন-মালের অসিয়ত করেছি। রোগাক্রান্ত অবস্থায় সাদকা করার যে কথা প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, তা এ বর্ণনার বিরোধী নয়। কেননা হতে পারে, তাঁকে এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর অসিয়ত করতে নিষেধ করলে তিনি মনে করেছিলেন যে, রোগাক্রান্ত অবস্থায় সাদ্‌কা করা সম্ভবত

জায়েয হবে। তখন তিনি এই বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি জানালেন যে, এক-তৃতীয়াংশের কমে অসিয়ত ও দানের ব্যাপার অভিন্ন। এর দৃষ্টান্ত ইমরান ইবনে হুসায়ন বর্ণিত হাদীস। এক ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে তার ছয়জন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিল। এতে এ কথাও আছে যে, নিজের পরিজনের জন্যে ব্যয় করলেও সওয়াব পাওয়া যায়। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে কিছু 'হেবা' করে, তাহলে তা ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়। কেননা তা-ও দান। তার দরুন আল্লাহ সওয়াব দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এ পর্যায়ের আর একটি হাদীস নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اَعْطَى الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ عَطِيَّةً فَهِىَ لَهُ صَدَقَةٌ -

কোন লোক যদি তার স্ত্রীকে কোন কিছু দেয়, তাহলে তা-ও তার সাদ্‌কা হিসেবেই গণ্য হবে।

হযরত সাদের কথা ঃ আপনি কি আমার হিজরতের পরে এখানে থাকবেন ? এ থেকে বোঝা গেছে যে, তিনি মক্কায়ই মৃত্যুবরণ করবেন। অথচ মক্কার এই ঘর থেকেই তিনি হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন। নবী করীম (স) যাত্রার পর তিন দিনের অধিক এখানে অবস্থান করতে নিষেধ করেছিলেন। তখন নবী করীম (স) তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি পরেও এখানে থাকবেন, যেন তাঁর দ্বারা জনগণের উপকার সাধিত হয় এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল। তিনি নবী করীম (স)-এর পরও মক্কায় থাকলেন। তাঁর হাতে বহু অনারব অঞ্চল বিজিত হয়েছিল। কায়সার— পারস্য সম্রাটের রাজত্বও তাঁরই নিকট পরাজিত ও অধিকৃত হয়। এসব ছিল গায়বী ইলমের ব্যাপার, যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।

আবদুল বাকি ইবনে কানে আবূ আবদুল্লাহ উবায়দুল্লাহ ইবনে হাতিম-আল আজলী আবদুল 'আলা ইবনে ওয়াসিল— ইসমাঈল ইবনে সবীহ মুবারক ইবনে হাসান, নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র কথার বর্ণনাকারী হিসেবে বলেছেন ঃ

يَاابْنَ اٰدَمَ اثْنَتَانِ لَيْسَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيْبًا فِىْ مَالِكَ حِيْنَ اَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لاُطَهِّرَكَ وَاُزَكِّيَكَ، وَصَلاَةُ عِبَادِىْ عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ اَجَلِكَ -

হে আদম পুত্র! দুটি জিনিস, তার একটি তোমার জন্যে নেই। আমি তোমার জন্যে তোমার ধন-মালের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যখন তুমি তোমার ক্রোধ দমনের সাহায্যে তোমার উচ্চ পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার জন্যে গ্রহণ করবে এবং আমার বান্দাগণের তোমার জন্যে দো'আ তোমার মৃত্যু ঘটার পর।

এ হাদীসেও বলা হয়েছে, মৃত্যুকালে একজনের জন্যে তার কতক মাল, সমস্ত মাল নয়। আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে শায়বা, মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ, ইবনে তিতাহ—

হযরত উসমান সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, উসমান বলেছেন, আমি তাল্‌হা ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি, বলেছেন, আমাদের নিকট আতা আবূ হুরায়রা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰيكُمْ ثُلُثَ اَمْوَالِكُمْ فِىْ اٰخِرِ اَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِىْ اَعْمَالِكُمْ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশ তোমাদের জীবনের শেষভাগে তোমাদের আমল বৃদ্ধির দরুন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এসব হাদীস অসিয়তকে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করছে। আমাদের মতে সন্দেহমুক্ত জ্ঞানদানকারী মুতাওয়াতির বর্ণনা। সমস্ত মানুষই তা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে। কুরআনে যে অসিয়তের কথা উল্লিখিত হয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র মর্জী ও বক্তব্যকে প্রকাশ করছে। নিঃসন্দেহে নির্ধারিত হয়েছে যে, অসিয়ত এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِىْ بِهَا اَوْدَيْنٍ -

প্রমাণ করে যে, যার কারুর নিকট কোন ঋণ নেই এবং কোন কিছুর অসিয়তও করেনি, তার সমস্ত রেখে যাওয়া মাল তার ওয়ারিসরা পাবে। যদি তার হজ্জ না-করা হয়ে থাকে, যাকাত না-দেয়া থেকে, তার মৃত্যুর পর হজ্জ করা বা যাকাত দিয়ে দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তি সে জন্যে অসিয়ত করে গেলে ভিন্ন কথা। কাফফারা ও মানতসমূহ সম্পর্কেও এ কথা।

যদি বলা হয়, না-করা হজ্জ-ও একটা ঋণ। আর ধন-মালের নৈকট্য হওয়ায় আর যা যা ব্যক্তির জন্যে বাধ্যতামূলক হয়, তাও তেমনি। কেননা নবী করীম (স) খাস অসিয়তের তার পিতার না করা হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছিলেন ঃ

اَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلٰى اَبِيْكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيْهِ اَكَانَ يُجْزِىْ قَالَتْ نَعَمْ -

তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমার পিতার যদি ঋণ থাকত, তাহলে তুমি তা অবশ্যই শোধ করতে। তাতে কি ঋণ শোধ হয়ে যেত না? বললেন, হ্যাঁ।

এরপর নবী করীম (স) বললেন ঃ

فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ -

তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট ঋণটা তো আরও অধিক হক্‌দার পূরণ হওয়ার জন্যে।

জবাবে বলা যাবে, নবী করীম (স) না-করা হজ্জকে আল্লাহ্‌র ঋণ— আল্লাহ্‌র পাওনা বলেছেন। এই নামে তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেই অভিহিত করেছেন। কাজেই তাকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যায় না। আর 'করা অসিয়তও ঋণের পর' আল্লাহ্‌র এই কথাটির দাবি হল, যাকে ঋণ বলেছেন, তা সাধারণ ঋণ হিসেবেই গণ্য। কাজেই এর অধীন তা আসতে পারে না যা শর্তাধীন ছাড়া অন্যভাবে নির্ধারিত হয়নি। কেননা অভিধানে ও শরীয়াতে নামগুলো সাধারণ,

নিঃশর্ত যেমন আছে, তেমনি শর্তযুক্তও আছে। কাজেই যা সাধারণ ও নিঃশর্ত তাতে গণ্য হবে শুধু তা যার নাম সাধারণ ও নিঃশর্তভাবে প্রবর্তিত হয়। তাই আয়াত আল্লাহ্র হক হিসাবে কোন ঋণ যখন শামিল করা হয় না যেমন বলেছি, 'যে অসিয়ত না করা হয় এবং ঋণের পর'— আল্লাহ্র এ কথার দাবি হল যদি অসিয়ত না করে থাকে এবং তার উপর কারোর পাওনার ঋণ না থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারীরা তার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে যাবে। হযরত সা'দ সংক্রান্ত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। কেননা তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি কি আমার মাল সাদ্কা করে দেব ? আর অপর বর্ণনার ভাষা হল 'আমি আমার মালের অসিয়ত করব।' জবাবে রাসূল (স) বলেছেন ঃ 'মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এবং তা-ই অনেক।' হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে তিনি অব্যাহতির কোন কথা বলেন নি। এই ধরনের আল্লাহ্র আরও যে হক-হুকুমের কথা আছে, তার মধ্য থেকেও কোন বিষয়ের উল্লেখ করেন নি। এবং এক-তৃতীয়াংশ ছাড়া দান বা সাদকা করতে নিষেধ করেছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সে যদি এসব হক-হুকুকের অসিয়ত করে, তাহলে তা সেই এক-তৃতীয়াংশ থেকে যাবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসও সে কথাই প্রমাণ করে। তা হল ঃ তোমাদের বাড়তি আমল হিসেবে তোমাদের জীবনের শেষভাগে তোমাদের ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশ তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসও তাই। নবী করীম (স) আল্লাহ্র কথা ব্যক্ত স্বরূপ বলেছেন ঃ আমি তোমার মালে তোমার জন্যে একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যখন তুমি তোমার ক্রোধ দমন করে তা গ্রহণ করবে।

এসব হাদীসই প্রমাণ করে যে, মৃতের যাকাত, মানত ও অন্যান্য সব নৈকট্য লাভের কাজ যদি বাধ্যতামূলক হয়ই, তাহলে তা এক-তৃতীয়াংশ থেকেই হতে হবে। তার বাইরের মাল থেকে তা করা জায়েয হবে না।

উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল ওহাব ইবনে নজদাতা ইবনে আয়্যায, শারাহবীল ইবনে মুসলিম সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ আমি আবূ আমামাতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হক্ধারীকে তার হক্ দেয়ার নীতি বলে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসের জন্যে কোন অসিয়ত করা যাবে না।

আমর ইবনে খারেজাতা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ تُجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ -

কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত করা যাবে না। তবে সেই ওয়ারিসরাই যদি তার অনুমতি দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

সীরাত গ্রন্থ প্রণেতাগণ নবী করীম (স) প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। আর তাতেই বলা হয়েছে ঃ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ —যে কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত করা যাবে না। বোঝা গেল, কোনরূপ বেশী করা ছাড়াই মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির মধ্যে অসিয়ত সীমাবদ্ধ রাখা সংক্রান্ত হাদীস যেমন ব্যাপক পরিচিতি সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে, ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসমূহও ব্যাপক প্রসিদ্ধি সহকারে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে এবং ফিকাহবিদগণ সে সব হাদীস আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সে সব হাদীসের ব্যাপক ব্যবহারও করেছেন। তাই আমাদের নিকট তা মুতাওয়াতির পর্যায়ের নিশ্চিত নিঃসন্দেহ জ্ঞানদানকারী হাদীস হিসেবে গণ্য এবং সর্বপ্রকারের মুবাহ সন্দেহ বিদূরণকারীরূপে গৃহীত। আমর ইবনে খারেজাতা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তবে ওয়ারিসগণই যদি তা করতে অনুমতি দেয় তাহলে তা ভিন্ন কথা' থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য উত্তরাধিকারী যদি কোন বিশেষ উত্তরাধিকারীর পক্ষে কিছু অসিয়ত (প্রাপ্ত মীরাসের অতিরিক্ত দেয়ার) অনুমতি দেয়, তাহলে তা করা অবশ্যই জায়েয হবে। সে অসিয়ত অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে হবে, উত্তরাধিকারীদের দেয়া 'হেবা' হবে না। কেননা উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে 'হেবা' যার উত্তরাধিকার, তার অনুমতিতে হয় না।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুস সামাদ— মুহাম্মাদ ইবনে আমা ইউনুস ইবনে রাশেদ আতা আল-খুরাসানী ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ تَشَاءَ الْوَرَثَةُ -

উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত করা যাবে না। তবে অন্যান্য উত্তরাধিকারী চাইলে ভিন্ন কথা।

আবূ বকর বলেছেন, যে লোক এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তির অসিয়ত করেছে এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারী তার জীবদ্দশায়ই তাকে তা করার অনুমতি দিয়ে থাকে কিংবা কতক উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত করেছে এবং অবশিষ্টরা তার জীবদ্দশায়ই তার অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়েয হবে কিনা, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ, আল-হাসান ইবনে সালিহ উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান ও ইমাম শাফেয়ী মত দিয়েছেন যে, তা জায়েয হবে না মৃত্যুর পরও তার অনুমতি না দিলে। ইবনে আবূ লায়লা ও উসমানুলবত্তী বলেছেন, অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় ওরূপ করার অনুমতি দিয়ে থাকলে তার মৃত্যুর পর তা থেকে ফিরে যাওয়ার কোন অধিকার তাদের নেই। তা অবশ্যই কার্যকর হবে এবং অসিয়ত সম্পূর্ণ জায়েয হবে। ইবনুল কাসেম ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যখন উত্তরাধিকারীদের নিকট অসিয়তের অনুমতি চাওয়া হবে, তখন প্রত্যেক উত্তরাধিকারীই মৃত থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। যেমন সন্তান যে তার পিতা, ভাই ও চাচার পুত্র যারা তার পরিবারভুক্ত নয়— তাদের ফিরে যাওয়ার কোন অধিকার নেই। তবে তার স্ত্রী ও কন্যা যারা বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং আর যারা তার পরিবারের লোক— যদিও তারা পরে পূর্ণ বয়স্কতা পেয়েছে— তাদের অবশ্য পূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে। চাচা, চাচার পুত্র এবং যারা ভয় পেয়েছে এ জন্যে যে, তারা তার অধিকারের

অনুমতি না দিলে তাদের ক্ষতি হবে, খরচাদি বন্ধ করে দেয়া হবে যদি সহীহ্ হয়, তবে তারা পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে পারে। এ বিষয়ে লায়স-এর মত ইমাম মালিকের অনুরূপ।

আবূ বকর বলেছেন, মূল মালিকের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা যদি অসিয়তের অনুমতি দেয়, তাহলে সকল ফিকাহবিদই তা জায়েয মনে করেন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ সম্পত্তি মালিকের জীবদ্দশায় যখন তারা তা ভেঙ্গে দেয় নি, তখন পরে তাদের অনুমতিও কোন কাজ করবে না। কেননা পারে তারা কিছু করার অধিকারী নয়।

উত্তরাধিকারী না থাকায় সব মালের অসিয়ত

আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ মুহাম্মাদ, জুফার, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, সম্পত্তি মালিকের কোন উত্তরাধিকারী না থাকা তার সমস্ত সম্পত্তির অসিয়ত করলে তা জায়েয হবে। শরীফ ইবনে আবদুল্লাহ এমত দিয়েছেন। আর মালিক, আওজায়ী ও হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন— তখন-ও এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর তার অসিয়ত করা জায়েয হবে না।

আবূ বকর বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

আর তোমাদের কসম তাদের চুক্তিবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও।
(সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

এর তাৎপর্য আমরা ব্যাখ্যা করেছি। তারা কিরা-কসমের ভিত্তিতে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়ে মীরাস দেয়া-নেয়া করত। সে কসম এভাবে হতো যে, একজন কিরা করত এই বলে যে, আমি মরে গেলে আমার মীরাস থেকে তুমি অংশ পাবে। এই অংশ নির্ধারণ করা হতো কখনও এক-তৃতীয়াংশ থেকে, কখনও তার বেশি থেকে। ইসলামের শুরু যামানায়ও এরূপ মিরাস দানের নিয়ম চালু ও কার্যকর ছিল। উপরোদ্ধৃত আয়াত ঃ 'তোমাদের কসম যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও' দ্বারাই সে অংশ দান ফরয করেছিল। তারপর আয়াত ঃ পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে পিতামাতা নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে— নাযিল হয়। আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন ঃ 'প্রত্যেক পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়েলোকের অংশের সমান' এবং যবীল আরহাম আল্লাহ্‌র কিতাবে পরস্পর উত্তম' আয়াতদ্বয়ও নাযিল হয়। এর ফলে যবীল আরহাম কসমভিত্তিক অংশ-প্রাপকদের তুলনায় মীরাস পাওয়ার অধিক অধিকারী সাব্যস্ত হয়। তবে তাতে কসমভিত্তিক মীরাস পাওনাদারদের মীরাস বাতিল হয়ে যায় না। বরং যবীল আরহামকে তাদের তুলনায় উত্তম গণ্য করা হতে থাকে। যেমন পুত্র ভাইর অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। তাই যখন বংশভিত্তিক ওয়ারিস বর্তমান না থাকলে সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি তার আসল অবস্থার উপর নিয়ে আসতে পারে কসমভিত্তিক মিরাস দেয়ার নীতির উপর। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মীরাস বণ্টনের কাজটি রেখেছেন অসিয়ত পূরণের পর— আল্লাহ্‌র নিজের কথা ঃ 'যে অসিয়ত করা হয় ঋণ-এর পর' আর বলেছেন ঃ 'পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষ এবং

নারীর অংশ রয়েছে।' আমরা ইতিপূর্বে বলেছি ঃ 'যে অসিয়ত করা হয় তা এবং ঋণ এর পর'-এর বাহ্যিক অর্থ দাবি করে যে, সমস্ত মাল-সম্পদের অসিয়ত জায়েয হবে। তবে ইজমা ও সুন্নাহ্ যদি নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল পাওয়া যায় এবং এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অসিয়তকে সীমাবদ্ধ রাখা বাধ্যতামূলক প্রমাণিত হয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। তাই মালের কিছু অংশ অসিয়ত বিশেষীকরণ যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে অসিয়ত শব্দটি বাহ্য সমস্ত মালের উপর প্রয়োগ হওয়া ওয়াজিব হতে পারে। হযরত সা'দ বর্ণিত রাসূল (স)-এর কথা ঃ 'তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী বানিয়ে রেখে যাবে তা তাদেরকে দরিদ্র বা ভিক্ষা করতে বাধ্য অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম' ও তা-ই প্রমাণ করে। এ হাদীসেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক-তৃতীয়াংশের অধিকের অসিয়ত নিষিদ্ধ। কেননা তা ওয়ারিসদের প্রাপ্য। শবী প্রমুখ বর্ণিত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। আমর ইবনে শারাহ্‌বীল বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ 'যে আরব গোত্রের একজন লোক মরে যাবে এবং গোত্রের কোন লোক হামাদন থেকে তার ওয়ারিস হবে না, তা হতে পারে না। অবস্থা যখন এই তখন সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি যেখানে রেখে যেতে বা দিয়ে যেতে চায়, তা সে রাখতে বা দিতে পারে। সাহাবাদের কেউ এর বিপরীত মত দিয়েছেন বলে জানা যায় নি।

উপরন্তু যার কোন ওয়ারিস নেই, সে যখন মরে যাবে, তখন সাধারণ মুসলমানরাই তো তা পাওয়ার অধিকারী হবে, হয় মীরাস হিসেবে, নতুবা এ হিসেবে যে, সে মালের মালিক কেউ নেই। তখন মুসলমানদের ইমাম— নেতা বা রাষ্ট্র প্রধান— তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যদি কোন ব্যক্তি তার পুত্র, তার পিতা বা দূরবর্তী ব্যক্তি নিকটবর্তী ব্যক্তির সঙ্গে মিলে তা পাওয়ার হক্‌দার হওয়া জায়েয হয়, তাহলে আমরা জানব যে, সে মীরাস হিসেবে তা পাওয়ার অধিকারী নয়। কেননা পিতা ও দাদা পিতৃত্বের দিকদিয়ে একই মিরাস পাওয়ার অধিকারে একত্রিত হতে পারে না। উপরন্তু যদি মীরাস হয়ই, তাহলে তাদের কোন একজনের মাহরুম হওয়া জায়েয হবে না। কেননা মীরাসের পথ হচ্ছে, তা কতক ওয়ারিস পাবে আর কতক পাবে না তা হতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, যদি মীরাস হয়-ই তাহলে ব্যক্তি যদি হয় হামাদানের, আর তার মীরাস পেতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকেই পাওয়া না যায় তার নিজের গোত্র থেকে,— কেননা তারাই অন্যদের অপেক্ষা তার অতি নিকটবর্তী— তবে তা-ও হতে পারে। আর সে অবস্থা হলে মুসলমানদের বায়তুলমাল-ই তা পাওয়ার অধিকার হবে। মুসলমানদের ইমাম লোকদের মধ্যে যেমন-ইচ্ছা বিলি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তার উপযুক্ত লোকদেরকে কাজে লাগাবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সে সম্পত্তি মুসলমানরা মীরাস হিসাবে নেবে না। আর তারা যখন মীরাস হিসাবে নেবে না, তখন মুসলমানদের ইমাম তার বিবেচনা অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করবে। কেননা তখন সে-ই হবে তার জন্যে দায়িত্বশীল। দায়িত্বশীল-ই ব্যবস্থাপনা গ্রহণের বেশি অধিকারী। অন্যদিক দিয়ে, মুসলমানরা যখন তা মীরাস হিসেবে নিল না, তখন যে এক-তৃতীয়াংশের উপর মৃতের অসিয়ত চলে, তাতেও কোন মীরাস থাকবে না। তার-ও ব্যবস্থাপনা ইমাম-ই করবে, যেমন অন্যান্য ধন-মালের। তারও যখন কেউ ওয়ারিস নেই, তখন তার ব্যবস্থাপনাও যে চাইবে করবে। একটি হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' বশর ইবনে মূসা, আল-হুমায়দী, সুফিয়ান, আইয়ুব-নাফে ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَاحَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوْصِىْ فِيْهِ تَمُرُّ عَلَيْهِ اللَّيْلَتَانِ الاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ -

যে মুসলিম ব্যক্তিরই ধন-মাল আছে, যাতে সে অসিয়ত করতে পারে, নিজের নিকট অসিয়ত লিখিত না রেখে দুটি রাত কাটানোরও তার অধিকার নেই।

এতে কতক মাল ও সম্পূর্ণ মালের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি অসিয়ত করার প্রয়োজনের ব্যাপারে। কাজেই বাহ্যত এ-ই মনে হয় যে, সমস্ত মালের উপর অসিয়ত করা জায়েয। যদিও তার কতকাংশের মধ্যে অসিয়ত সীমিত রাখাই কর্তব্য ছিল দলীলের দিক দিয়ে, যদি তার ওয়ারিস থাকত। ওয়ারিস যখন কেউ নেই, তখন তার বাহ্যিক প্রকাশ এই যে, মালিকের সমস্ত মালের অসিয়ত করে যাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

অসিয়তে ক্ষতি করা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ -

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন অসিয়ত হবে, যা কোন দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, অসিয়তে কয়েক প্রকারে ক্ষতি সাধিত হতে পারে। যেমন অসিয়ত লিপির মধ্যে তার সম্পূর্ণ মালে কিংবা তার অংশে অপরিচিত সম্পর্কহীন ব্যক্তিকে শামিল করা কিংবা নিজের উপর কোন ঋণ মিথ্যা-মিথ্যা চাপিয়ে নেয়া, যার কোন বস্তুবতা নেই— শুধু ওয়ারিস ও অন্যান্য পাওনাদারকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে। অসিয়তনামায় এমন স্বীকারোক্তি করানো যে, তার উপর অন্যের প্রাপ্য ঋণ সে তার রোগাক্রান্ত অবস্থায় আদায় করেছে— যেন তার ওয়ারিসদের উপর বোঝা না চাপে। এই স্বীকারোক্তিও লেখা হতে পারে যে, সে তার রোগাক্রান্ত কালে অন্যের নিকট তার অমুক মালটা বিক্রয় করে দিয়েছে অথবা বাকী মূল্যে ক্রয় করা দ্রব্যের মূল্য সে আদায় করে দিয়েছে। এ-ও একটি যে, তার মাল সে অমুককে 'হেবা' করে দিয়েছে রোগে পড়ে। অথবা এক-তৃতীয়াংশ মালের অধিক সে তার রোগের মধ্যেই দান করে দিয়েছে তার ওয়ারিসদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে। অসিয়তে বাড়াবাড়ি করাও জায়েয পরিমাণের অধিকের অসিয়ত করা— এক-তৃতীয়াংশের অধিক— এই সবই হল অসিয়তে ক্ষতিকরণ। নবী করীম (স)-এর হযরত সাদ (রা)-কে বলা কথার মধ্যে একথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশই অধিক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনী বানিয়ে রেখে যাওয়া দরিদ্র ভিক্ষুক রেখে যাওয়া অপেক্ষা অনেক কল্যাণময়।

আবদুল বাকী ইবনে নাফে আহমাদ ইবনুল হাসান, আল মিসরী, আবদুস সামাদ ইবনে হাসান, সুফিয়ান সওরী, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দু, ইকরামা — ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'অসিয়তে ক্ষতি সাধন করা একটি কবীরা গুনাহ।' তার পর তিনি আয়াত পাঠ করলেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ....

এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ। যে লোক আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে....

অসিয়ত পর্যায়ে বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

যে লোক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য অনুসরণ করবে ...... এটাও অসিয়ত পর্যয়ের কথা।

আবদুল বাকী, আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল লায়স, হুমায়দ ইবনে জনন্‌জু ইয়াতা, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসূফ, উমর ইবনুল মুগীরতা, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ, ইকরামাতা ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন— রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِضْرَارُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ -

অসিয়তে ক্ষতি সাধন কবীরা গুনাহ পর্যায়ে অপরাধ।

আবদুল বাকী, তাহির ইবনে আবদুর রহমান, ইবনে ইসহাক আল-কাযী, ইয়াহইয়া, ইবনে মুঈন, আবদুর রায্‌যাক, মামার আশআস, শহর ইবনে হাওশব, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَاِذَا اَوْصَى حَافَ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ -

এক ব্যক্তি জান্নাতী হওয়ার উপযোগী আমল সত্তর বছর পর্যন্ত করে। কিন্তু শেষ জীবনে যখন সে তার অসিয়তে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সে তার অত্যন্ত খারাপ আমল দ্বারা জীবন শেষ করে। ফলে সে জাহান্নামে চলে যায়। আর এক ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য আমল করে সত্তর বছর পর্যন্ত; জীবনের শেষ ভাগে সে তার অসিয়তে ন্যায়পরতা রক্ষা করে। ফলে সে সর্বোত্তম কাজ দ্বারা জীবন শেষ করে এবং পরিণামে সে জান্নাতে চালে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে এই হাদীসের সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে; যেমন ইবনে আব্বাস (রা) আল্লাহ্‌র এই কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

এগুলো আল্লাহ্ ঘোষিত সীমাসমূহ। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করে ....

এবং যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে ..... এই নাফরমানী অসিয়তের ক্ষেত্রে .....

বংশীয় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া

আবূ বকর বলেছেন— আল্লাহ্র কথা ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ -

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছেন ......'

কথা এবং এর সঙ্গে যোগ করে উল্লিখিত কতক লোকের মধ্যে মীরাস বন্টন ও কতক লোককে বাদ দেয়ার কথা— এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে এই মীরাস প্রাপক হিসেবে যাদের বাদ দেয়া হয়েছে, তার কতক সর্বসম্মত এবং কতকের সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে। যাদের সম্পর্কে পূর্ণ ঐকমত্য আছে, তার মধ্যে একটি, কাফির মুসলিম ব্যক্তির মীরাস পাবে না, আর ক্রীতদাস মীরাস পায় না, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী ওয়ারিস হয় না। সূরা আল-বাকারা'র আলোচনায় সর্বসম্মতভাবে যারা মীরাস পায় ও যাদের মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে, এই পর্যায়ে বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে।

মুসলিম ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির মীরাস এবং মুরতাদ মীরাস পাবে কিনা— এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। মুসলিম ব্যক্তির কাফির ব্যক্তির মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলেছেন ঃ মুসলিম-কাফিরের মধ্যে মীরাস পাওয়া-দেওয়া চলতে পারে না। সর্বসাধারণ তাবেয়ীন ও বিভিন্ন দেশের অঞ্চলের ফিকাহবিদগণও এই মতই প্রকাশ করেছেন। শুবা আমর ইবনে আবূ হুকাইম ইবনে বাবাহ[১] —ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামার— আবুল আস্ওয়াদ আদ-দুয়ালী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুয়ায ইবনে জাবাল ইয়ামনে অবস্থান করছিলেন। এই সময় একজন ইয়াহুদী ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং সে তার এক মুসলিম ভাই রেখে যায়। এ ব্যক্তি মীরাস পাবে কিনা, এ বিষয়ে তাঁর নিকট মামলা দায়ের হয়। তখন তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ اَلْاِسْلَامُ يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ 'ইসলাম বৃদ্ধিশীল,হ্রাস প্রাপ্তি নয়।

ইবনে শিহাব দাউদ ইবনে হিন্দু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মস্রূক বলেছেন ঃ

مَا اُحْدِثُ فِى الْاِسْلَامِ قَضِيَّةٌ اَعْجَبُ مِنْ قَضِيَّةٍ قَضَاهَا مُعَاوِيَةُ -

মুয়াবিয়া একটি মামলার বিচার করেছিলেন, তার মত আশ্চর্যজনক মামলা ইসলামে আর কখনও সংঘটিত হয়নি।

১. ইবনে বাবাহ, তার নাম আবদুল্লাহ এবং তার পিতার নাম বাবাহ। 'খুলাসাতু তাহযীবেল চোমাল' গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে।

তখন ইয়ামনে মুসলিম ব্যক্তি ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের থেকে মীরাস নিত। কিন্তু ইয়াহুদী খ্রীস্টানরা মুসলিমের কাছ থেকে মীরাস পেত না। তখন সিরিয়াবাসীরা এই মামলার বিচার করে।

দাঊদ বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজীজ যখন অগ্রসর হয়ে এলেন, তখন তিনি তাদেরকে প্রথম নীতির দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

হুশাইম মুজালিদ শবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুয়াবিয়া (রা) যিয়াদের নিকট লিখলেন মুসলিমের কাফির ব্যক্তির নিকট থেকে মীরাস নেয়ার ব্যাপার। যিয়াদ এই বিষয়ে শুরাইহ্-এর নিকট জানতে চাইলেন। তিনি তা করার আদেশ করলেন। কিন্তু শুরাইহ্ এর পূর্বে মুসলিম ব্যক্তিকে কাফিরের মীরাস পাওয়ার অধিকার দেন নি। এই আদেশ যখন যিয়াদ মুয়াবিয়া (রা)-কে জানালেন, তিনি এই কথার ভিত্তিতে মামলার রায় দিলেন। শুরাইহ্ যখন এই ফায়সালা দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

هٰذَا قَضَاءُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

এটা আমীরুল মুমিনিনেরই সিদ্ধান্ত।

জুহরী, আলী ইবনুল হুসায়ন, আমর ইবনে উসমান, উসামাতা ইবনে জায়দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন— রাসূলে করীম (রা) বলেছেন ঃ

لَا يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى -

দুই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীরা পরস্পর মীরাস দেয়া-নেয়া করতে পারে না।

অপর একটি বর্ণনার ভাষায় হল ঃ

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

মুসলমান কাফিরের মীরাস পাবে না এবং কাফিরও মুসলমানের মীরাস পাবে না।

আমর ইবনে শুয়ায়ব তাঁর পিতা— তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ দুই ভিন্ন ধর্মের লোকেরা পরস্পর মীরাস পাবে না।

এই সব হাদীস কাফিরের মীরাস মুসলিম ব্যক্তির পাওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে এবং মুসলিমের মীরাসও কাফির পেতে পারে না বলছে। নবী করীম (স) থেকে এর বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়নি। অতএব তা-ই প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত কাফির-মুসলিমের পারস্পরিক মীরাস পাওয়া-দেয়া সম্পর্কে। হযরত মুয়ায সংক্রান্ত হাদীস এ পর্যায়ে গণ্য নয়। ইসলাম বা ঈমান বাড়ে, কমে না— এটা একটা ব্যাখ্যা। আর ব্যাখ্যায় বলা কথা নস্-এর বিপরীত কিছু প্রমাণ করতে পারে না। এ একটা তওকীফ— আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঠেকিয়ে দেয়া ব্যাপার। তাই এতে নড়চড় হতে পারে না। ব্যাখ্যায় বলা কথাকেও নস দ্বারা প্রমাণিত কথার ভিত্তিতেই গ্রহণ করা যেতে পারে। সঙ্গতিসম্পন্ন হলে তা গৃহীত হবে, বিপরীত হলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

আর নবী করীম (স)-এর কথা الْإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ —'ঈমান বৃদ্ধি পায়, হ্রাস পায় না।' সম্ভবত একথার দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, যে লোক ইসলাম গ্রহণ করল, সে তার ইসলামের জন্যে বিপরীত সব কিছুই ত্যাগ করে, ইসলামের পথেই অগ্রসর হয়ে যায়। আর যে লোক ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল, তাকে সে দিকেই চালিয়ে দেয়া হবে। এ যখন সম্ভব, তখন হযরত মুয়ায (রা)-এর ব্যাখ্যাও সম্ভাব্যতার মধ্যে। তা হযরত উসামা (রা) বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতেই ধারণ করতে হবে অর্থাৎ পারস্পরিক এই মীরাস দেয়া-পাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা নস্ কোন ব্যাখ্যা বা শুধু সম্ভাব্যতার দ্বারা রদ্ করা জায়েয নয়। তা ছাড়া একটা সম্ভাব্যতা কখনও অকাট্য দলীল হতে পারে না। কেননা তা কখনই সন্দেহমুক্ত হয় না। তা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে তার ছাড়া অন্য দলীলের মুখাপেক্ষী। অতএব তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না। মসরুকের কথা— "মুয়াবিয়ার বিচার করা মামলার চেয়ে আশ্চর্যজনক মামলা ইসলামে কখনই ঘটে না" কাফিরের মীরাস মুসলমানের পাওয়া সংক্রান্ত এই মতটিরই বাতুলতা প্রমাণ করে। কেননা বর্ণনায়ই বলা হয়েছে যে, এটা একটা অভিনব ও বিস্ময়কর রায় ছিল। এই বর্ণনাটিই আবশ্যিক করে দেয় যে, মুয়াবিয়ার বিচারের পূর্বে মুসলমান কাফিরের মীরাস পেত না।

মুয়াবিয়ারও তার বিপরীত কোন রায় দেয়ার অধিকার থাকতে পারে না। বরং এটা একটা বাতিল কথা। দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ-এর এ কথা ঃ উমর উবনে আবদুল আজীজ খলীফা হয়ে প্রথম ব্যবস্থা-ই পুনরায় কার্যকর করেন।

মুরতাদ হওয়া ব্যক্তির মীরাস

যে ব্যক্তি মুসলিম থাকা অবস্থায় ও মুরতাদ হওয়ার পূর্বে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে, তার মীরাস সম্পর্কে আগের দিনের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এই তিন পর্যায়ের— হযরত আলী, আবদুল্লাহ, জায়দ ইবনে সাবিত, হাসানুল বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম নখয়ী, জাবির, জায়দ, উমর ইবনে আবদুল আজীজ, হাম্মাদ ইবনুল হিকাম এবং আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার ইবনে শাবরামাতা, সওরী, আওজায়ী ও শুরাইক বলেছেন— তার ওয়ারিস হওয়া যাবে এবং মুসলমানরাই তার ওয়ারিস হবে, যখন সে মরে যাবে বা মুরতাদ হওয়ার দরুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

রবীআতা ইবনে আবদুল আজীজ, ইবনে আবূ লায়লা, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন— তার মীরাস বায়তুলমালে জমা হবে। কাতাদাতা ও সাঈদ ইবনে আবূ আরুবাতা বলেছেন, তার যদি নতুন গ্রহণ করা ধর্মমতের কোন উত্তরাধিকারী থাকে, তবে তার মীরাস সে পাবে, তার মুসলিম ওয়ারিস থাকলে তারা পাবে না। কাতাদাতা, উমর ইবনে আবদুল আজীজ থেকে এ মত বর্ণনা করেছেন। উমর ইবনে আবদুল আজীজের সহীহ্ মত হল, তার মীরাস তারা মুসলিম ওয়ারিসরাই পাবে।

আবূ বকর বলেছেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করেছেন' আল্লাহ্র এই কথার বাহ্যিক দাবি হল— মুসলিমরা মুরতাদের মীরাস পাবে। কেননা মৃত ব্যক্তি মুসলিম না মুরতাদ— এর মধ্যে আয়াতে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

যদি বলা হয়, উসামা ইবনে জায়দ (রা) বর্ণিত হাদীস 'মুসলিম কাফিরের মীরাস পাবে না' আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যকে বিশিষ্ট করেছে, যেমন বিশিষ্ট করেছে মুসলিমের মীরাস কাফিরের পাওয়ার ব্যাপারে। এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ হলেও জনতা তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানের মীরাস কাফিরের জন্যে নিষিদ্ধকরণে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে তা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে হয়ে গেছে। তাছাড়া মীরাসের আয়াত সর্বসম্মতভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আর 'খবরে ওয়াহিদ' এই ধরনের আয়াতকে বিশেষীকরণেই ব্যবহৃত।

জবাবে বলা যাবে, উসামা বর্ণিত হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ দুই ভিন্ন ভিন্ন মিল্লাতের লোকদের মধ্যে মীরাস দেয়া-পাওয়া হবে না। মুসলিম কাফিরের মীরাস পাবে না। জানা গেল দুই ভিন্ন ভিন্ন মিল্লাতের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক মীরাস দেয়া-পাওয়া পরিত্যক্ত। কিন্তু মুরতাদ হওয়া কোন স্থায়ী মিল্লাত গ্রহণ নয়। কেননা সে যদি খ্রীস্টান বা ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত হয়ে থাকে, তাহলে তা তার উপর অ-স্থিতিশীল। কাজেই তাকে ভিন্ন মিল্লাতের বলে চিহ্নিত করা যায় না, যে মিল্লাতে সে এখন গেছে। লক্ষণীয়, যদি সে কোন আসমানী কিতাবের মিল্লাতেও চলে যায়, তাহলে তার যবেহ করা জন্তু খাওয়া যাবে না, মেয়ে হলে তাকে বিয়ে করা যাবে না। তাতে প্রমাণিত হয় যে, মুরতাদ হওয়াটা কোন ভিন্নতর মিল্লাত গ্রহণ হয় না। অথচ উসামা বর্ণিত হাদীস দুই মিল্লাতের লোকদের পারস্পরিক মীরাস দেয়া-পাওয়া নিষিদ্ধকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর ব্যাখ্যাকারী একটি হাদীসে এই কথার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীসটি হুশাইম কর্তৃক জুহরী থেকে বর্ণিত। বলেছেন, আলী ইবনুল হুসায়ন আমর ইবনে উসমান, উসামা ইবনে জায়দ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ দুই ভিন্ন ভিন্ন মিল্লাতের লোকদের মধ্যে মীরাস দেয়া-পাওয়া হবে না। মুসলমান কাফিরের মীরাস পাবে না, কাফির মুসলমানের মীরাস পাবে না।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স)-এর লক্ষ্যই হল দুই মিল্লাতের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক মীরাস দেয়া-পাওয়া নিষিদ্ধ করা। ইমাম আবূ হানীফার আসল মত হল— মুরতাদ ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা মুরতাদ হওয়ার দরুন নিঃশেষ হয়ে গেছে। পরে সে নিহত হোক বা মরে যাক, তার সে মালিকানা উত্তরাধিকারীর দিকেই চলে যাবে। এই কারণেই মুরতাদ হওয়ার পূর্বে মুসলিম অবস্থায় অর্জিত ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্বই ছিন্ন হয়ে যাবে। এ-ই যখন তাঁর আসল মত, তখন তিনি মুসলিমকে কাফিরের ওয়ারিস বানাতে পারেন না। কেননা মুরতাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম থাকার শেষ মুহূর্তে তার মালিকানা খতম হয়ে গেছে। এক্ষণে একজন মুসলিম থেকেই অপর এক মুসলিম মীরাস গ্রহণ করছে।

যদি বলা হয়, তার অর্থ কি এই যে, সে জীবিত থাকতেই লোকেরা তার মীরাস পেয়ে গেছে ? জবাবে বলা যাবে, জীবিতাবস্থায় মীরাস বন্টন নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ -

এবং তাদের জমিন, ঘর-বাড়ি, ধন-মালের উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে বানিয়েছেন।
(সূরা আহযাব ঃ ২৭)

এ আয়াতে যাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাবার কথা বলা হয়েছে, তারা তো জীবিতই ছিল। তা হলে জীবিতাবস্থায় সম্পত্তির মালিক কেন ওয়ারিস বানাতে পারবে না? তা ছাড়া উত্তরাধিকারীদের নিকটে ধন-মালের মীরাস হস্তান্তরিত করা হয় মালিকের মৃত্যুর পর। তাতে জীবিত ব্যক্তির মীরাস বন্টনের প্রশ্ন উঠে না। এ পর্যায়ে প্রশ্নকারীকে বলা যেতে পারে— তুমি যখন তার মাল বায়তুলমালে পৌঁছে দেবে, তখন কার্যত তো মুসলিম জনসমষ্টিকে ওয়ারিস বানালে। অথচ সে কাফির, সে জীবিত আছে, আর এ সময়ই তার মীরাস হস্তান্তরিত হয়ে গেল, যদিও সে মুরতাদ হয়ে দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে গেছে।

উপরন্তু মুসলমানরা তার ধন-মাল পাওয়ার অধিকারী হয় ইসলামের কারণে। ওয়ারিসরা যে যেমন নিকটাত্মীয়, তেমনি মুসলিম, তাহলে তারা তার মাল পাওয়ার অধিক মাত্রার অধিকারী হবে দুটি কারণ তাদের মধ্যে একত্রিত হওয়ার দরুন। আর মুসলিম জনগণ দুটি কারণের একটির দিক দিয়ে হকদার, অন্যটির দিক দিয়ে নয়। কিন্তু ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে দুটি কারণ এক সাথে উপস্থিত। তা হল— মুসলিম হওয়া ও নিকটাত্মীয় হওয়া— বংশীয় নৈকট্য। মুসলমানদের মধ্যে যারাই মরে যায়, তাদের মতোই অবস্থা। মুসলিম জনগণ যদি কেবল মাত্র ইসলামের কারণে তার মাল পাওয়ার অধিকারী হতে পারে, তাহলে যারা মুসলিম হওয়ার পর বংশীয় সম্পর্কের দিক দিয়েও নিকটবর্তী, তারা আরও অধিক যোগ্যতার সাথে তা পাওয়ার অধিকারী হবে— অন্ততঃ তাদের তুলনায়, যারা বংশের দিক দিয়ে নিকটাত্মীয় নয়, যদিও তারা মুসলিম।

যদি কেউ বলে, এই ইল্লাত'টা যিম্মীর মাল পাওয়ার অধিকারী বানাতে পারে, কিন্তু তা বানানো হয় না কেন? তাকে বলা যাবে— না, তা কর্তব্য নয়। কেননা যিম্মীর মাল তার মৃত্যুর পর মুসলিম হওয়ার দরুন প্রাপ্য হতে পারে না। কেননা তার উত্তরাধিকারীরাও যিম্মী, তারা মুসলমানের তুলনায় তার মাল পাওয়ার বেশি অধিকারী। এ বিষয়ে সকল ফিকহবিদই একমত। সর্ব দেশের ফিক্‌হবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, মুরতাদের মাল ইসলামের কারণে পাওয়ার অধিকার আছে। কেউ বলতে পারে, মুসলিম সমষ্টি তা পাওয়ার অধিকারী। আর অন্যরা বলেছেন, তার মুসলিম ওয়ারিসরা তা পাবে। তাই ইসলামের দরুন যখন তার মাল পাওয়ার অধিকারী হতে পারে, তখন মুসলিম মৃত ব্যক্তির মাল পাওয়ারও অধিকারী হতে পারে— তাদের যারা ইসলাম ও নিকটাত্মীয়তার দিক দিয়ে মুসলিম সমষ্টির তুলনায় অধিক নিকটবর্তী।

যদি বলা হয়, যিম্মী মরে গেলেও মাল-সম্পদ রেখে গেলে তার নিজের ধর্মের কোন ওয়ারিস তার না থাকলে মুসলিম নিকটাত্মীয় থাকলে তার মাল-ও মুসলিম সমষ্টির জন্যে হওয়া উচিত। তার নিকটাত্মীয় মুসলিমদের বেশি অধিকারী না হওয়াই উচিত ইসলাম ও বংশীয় আত্মীয়তার এই দুটি কারণ থাকা সত্ত্বেও।

জবাবে তাকে বলা যাবে, ইসলামের দিক দিয়ে যিম্মীর মাল পাওয়ার অধিকার হতে পারে না। তার প্রমাণ এই যে, সেই যিম্মীদের মধ্য থেকেই যদি তার ওয়ারিস থাকে, তাহলে মুসলমানরা তা পাওয়ার অধিকারী হবে না। আর ইসলামের কারণে যিম্মীর মাল পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তাই তার যিম্মী উত্তরাধিকারীরা মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি অধিকারী হবে না, বরং তারা অধিক অধিকারী হবে মুসলমানদের মীরাসের মতই। বোঝা

গেল, যিম্মীর মাল যদি বায়তুলমালে জমা করা হয় তার কেউ ওয়ারিস নেই বলে, তাহলে মুসলমানরা ইসলামের কারণেও তা পেতে পারে না। তখন তা এমন মাল গণ্য হবে, যার কেউ মালিক নেই। তখন তা মুসলমানদের ইমাম পেয়ে যাবে দারুল ইসলামে। তখন তা যেন পড়ে পাওয়া মাললুকতা, যার প্রাপক কে তা জানা নেই। তখন তা আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক কার্যাদিতে ব্যয়িত হবে।

যদি বলা হয়, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর যা কিছু উপার্জন করেছে তা 'ফাই' হিসেবে বায়তুলমালে জমা হবে। এর ফলে মীরাসের 'ইল্লাতটাই চূর্ণ হয়ে যায় এবং মূল বিষয়টি বিরোধী মতের পক্ষে চলে যায়।

জবাবে বলা যাবে— না, তা বাধ্যতামূলক নয়। তাতে বিপরীত মতের সমর্থনে কোন দলীলই পাওয়া যাবে না। তা এ কারণে যে, মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর সে যা উপার্জন করেছে, তা একজন যুধ্যমান ব্যক্তির মালের মতই। সে তার সঠিক-সহীহ্ মালিক নয়। তার মৃত্যুর পর বা আগেই আমরা যখন তা বায়তুলমালে দাখিল করে দেব, তখন সে মাল গনীমতের পর্যায়ে পড়ে যাবে। যুধ্যমান ব্যক্তিগণের মাল এমনিই হয়ে থাকে, যখন মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। আর যা গনীমত হিসেবে নিয়ে নেয়া হবে, বায়তুলমাল তা ইসলামের কারণে পাওয়ার অধিকারী হয় না। কেননা গনীমতের মাল পাওয়ার অধিকার ইসলামের কারণে হয় না। এর প্রমাণ এই যে, যিম্মী যখন যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে, তখনই সে তার ধন-মাল গনীমত হওয়ার জন্যে উৎসর্গিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যুধ্যমান ব্যক্তি ও মুরতাদ ব্যক্তি— যা মুরতাদ অবস্থায় উপার্জন করেছে, গনীমতের মধ্যে গণ্য বটে, কিন্তু তা ইসলামের কারণে নয়। অতএব তা পাওয়ার ব্যাপারে বংশীয় নৈকট্য ও ইসলামের কোন গুরুত্ব নেই। যেমন তার মুসলিম থাকা অবস্থায় উপার্জিত ধন-মালে আমরা গণ্য করে থাকি। কেননা তার মুরতাদ হওয়া পর্যন্ত তো সে তার ধন-মালের যথার্থ মালিক ছিল। কিন্তু পরে মুরতাদ হওয়ার কারণে সে মালিকানা খতম হয়ে গেছে। এক্ষণে যারা তা পাওয়ার অধিকারী হবে, তা হবে মীরাস হিসেবে। আর মীরাসে মুসলমান হওয়ারও বংশীয় নৈকট্য গণ্য হয়ে থাকে। কেননা মুলমানের মালিকানা যথার্থ, মুরতাদ হওয়ার দরুন সে মালিকানা বিলীন হয়ে গেছে, যেমন মৃত্যুর কারণে মালিকানা খতম হয়ে যায়। অতএব তাকে তার মুরতাদ অবস্থায় তার মালের মালিক বলা যাবে না। কেননা সে যখন তা উপার্জন করছিল, তখন সে ছিল আইনের দৃষ্টিতে হত্যাযোগ্য, তার রক্তপাত ছিল মুবাহ্। ফলে তার মাল যখন মুসলমানদের হাতে পড়ল, তখন গনীমতের মাল হয়ে গেল। যেমন কোন যুধ্যমান ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট নিরাপত্তার সনদ লাভ না করেই যদি রাষ্ট্রের সীমায় প্রবেশ করে এবং তার মালসহ তাকে পাকড়াও করা হয়, তাহলে তার মাল গনীমত হয়ে যাবে। মুরতাদ থাকা অবস্থায় যে যা উপার্জন করেছে, তা-ও ঠিক তা-ই হবে।

এই প্রেক্ষিতে বরা ইবনে আজিব বর্ণিত হাদীসটি বিবেচ্য। তিনি বলেছেন, আমার মামা আবূ বুরদাতা হাতে পতাকা নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হল। আমি বললাম, আপনি কোথায় যাবেন? বললেন ঃ আমাকে রাসূল (স) পাঠিয়েছেন এমন এক ব্যক্তির নিকট যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, তাকে আমি হত্যা করব এবং তার নিকট যে মাল পাওয়া যাবে তা নিয়ে নেব।

এই হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে যদি কেউ বলে যে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুরতাদ হওয়ার ব্যক্তির মাল 'ফাই' সম্পদ হয়।

জবাবে তাকে বলা যাবে, সে কাজও এজন্যে করা হয়েছিল যে, সে ব্যক্তি ছিল শত্রুপক্ষের যুধ্যমান-হরবী। আর সেজন্যে সে হত্যাযোগ্য ছিল। আর সেইজন্যেই তার মাল গনীমত হয়ে গিয়েছিল। কেননা পতাকা ছিল যুধ্যমানতার নিদর্শন। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) মুয়াবিয়ার দাদাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে ছিলেন, যা তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। রাসূল (স) তার গর্দান মারা ও তার মালের 'খুমুস' এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তির মাল গনীমত ছিল যুধ্যমানতার কারণে। আর এ কারণেই তার মালের এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে নেয়া হয়েছিল।

যদি বলা হয়, মুরতাদ ব্যক্তির মাল যে গনীমত ছিল, তা আমি অস্বীকার করিনি।

জবাবে বলা যাবে, কিন্তু মুরতাদ অবস্থায় সে যা উপার্জন করেছে, তা-ও তো সেই রকমের। তবে যা মুসলিম থাকা অবস্থায় উপার্জন করেছিল, তাকে গনীমত মনে করা জায়েয হতে পারে না এদিক দিয়ে যে, যে মাল গনীমত হয়েছে তার পথ তো এই যে, তার মালিকানাটাই সহীহ নয় গনীমত হওয়ার পূর্বে। যেমন যুধ্যমান ব্যক্তির মাল ও মুরতাদ হওয়া ব্যক্তির মাল তার মুরতাদ হওয়ার পূর্বের মালিকানা। তাতে তার মালিকত্ব সহীহ্ ছিল। তাই সে মালকে গনীমত বানানো জায়েয হবে না। যেমন সমস্ত মুসলমানের মালকে গনীমত বলা যায় না। কেননা তাতে তাদের মালিকানা সহীহ— যথার্থ। মুরতাদ হওয়ার এই মালিকানা খতম হওয়াটা তেমনি, যেমন কেউ মরে গেলে তার মালিকানাও খতম হয়ে যায়। তাকে হত্যা করা কিংবা তার মৃত্যু সঙ্ঘটিত হওয়া অথবা দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে তার মাল থেকে তার হক ছিন্ন হয়ে গেল, তখন তা পাওয়ার হক্‌দার হবে তার ওয়ারিসান। সব মুসলমান তার ওয়ারিস নয়। আর মুসলমান সমষ্টি যখন ইসলামের কারণে সে মাল পাওয়ার হকদার হবে— গনীমত হিসেবে নয়, তখন তার ওয়ারিসান আরও বেশি করে তা পাওয়ার অধিকারী হবে। কেননা তারা মুসলমান, সেই সাথে তার নিকটাত্মীয়ও। তাকে গনীমত মনে করে মুসলমানদের তা পাওয়ার অধিকারী হওয়া সহীহ্ নয়। কেননা আমরা আগেই বিশ্লেষণ করে বলেছি যে, কারোর মাল গনীমত হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে তার মালিকত্ব মূলতই সহীহ্ না হওয়া।

মীরাস বণ্টন হওয়ার পূর্বেই যে লোক ইসলাম কবুল করল, তার বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি মরে গেলে, তখন তার মীরাস বণ্টন হওয়ার আগেই তার পুত্র—. যে সে পর্যন্ত অমুসলিম ছিল— ইসলাম কবুল করল কিংবা ক্রীতদাস ছিল, পিতার মীরাস বণ্টনের পূর্বেই স্বাধীন— মুক্ত হয়ে গেল, সে তার পিতার মীরাস থেকে কিছুই পাবে না। আতা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সুলায়মান ইবনুল ইয়াসার, জুহরী, আবুজ জিনাদ, আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক, আওজায়ী, শাফেয়ীও উক্ত মত গ্রহণ করেছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব ও উসমান ইবনে আফফান (রা) বলেছেন ঃ মীরাসের কোন অধিকারী মীরাস বণ্টনের পূর্বে ইসলাম কবুল করলে সে তাতে শরীক হবে— সেও অংশ পাবে। আল-হাসান ও আবূশ শামারও এই মত। তাদের মতে তা জাহিলিয়াতের মীরাসের মতই, যার উপর ইসলাম দাঁড়িয়েছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী মীরাস বণ্টনের পূর্বে। তাতে মৃত্যুর সময় কখন, তা কোন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু প্রথমোক্ত দুইজন তা মনে করেন না। কেননা মীরাসের বিধান জ্ঞাত কারণসমূহের উপর স্থিতি লাভ করেছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ -

তোমাদের জুড়িরা যা রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমাদের জন্যে।

বলেছেন ঃ

اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

যদি কোন ব্যক্তি মরে যায়, তার সন্তান নেই, আছে তার এক বোন, সে বোন রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

দুটি আয়াতেই মৃত্যুর পর-ই মীরাস সাব্যস্ত হয়েছে। বোনের জন্যে অর্ধেক সম্পত্তি ধার্য হয়েছে। আর জুড়ির (স্বামী বা স্ত্রী) জন্যে অর্ধেক সাব্যস্ত হয়েছে অপর অংশের মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার কারণে। তাতে সম্পত্তির বণ্টন হওয়া-না-হওয়ার কোন শর্ত করা হয়নি। আর বণ্টন তো বাধ্যতামূলক হয় সেই সম্পত্তিতে, যাতে লোকেরা মালিকানা লাভ করেছে। তাই যখনই মীরাস বণ্টন হবে তখন তার প্রাপ্ত ওয়ারিসরা নিজ নিজ অংশ পেয়ে যাবে। কেননা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পরই সম্পত্তির বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়। ব্যাপার যখন এই, তখন পুত্রের ইসলাম গ্রহণের কারণে বোনের মালিকত্ব খতম হয়ে যায় না। যেমন তার মালিকানা খতম হয় না সম্পত্তির বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর-ও। আর জাহিলিয়তের সময়ের মীরাস তো ইসলামী শরীয়াতের ভিত্তিতে বণ্টন হতো না। তাই যখন ইসলাম গ্রহণ সঙ্ঘটিত হল, তখন শরীয়াতের হুকুম অনযায়ী সব কাজ সম্পাদিত হবে। কেননা যা ঘটেছে, তা শরীয়াতের বিধান স্থিতিশীল হওয়ার পূর্বে সঙ্ঘটিত হয়নি। তাই লোকেরা যা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করেছে তা থেকে তাদেরকে মার্জিত করা হল। আর যা এখনও বণ্টন হয়েনি, তাতে শরীয়াতের হুকুম কার্যকর হবে। যেমন যে সুদ যথারীতি হস্তগত হয়ে গেছে, তা থেকে হস্তগতকারীদেরকে মার্জনা করা হয়েছে। আর সুদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট আছে, তার উপর সে আইন কার্যকর হবে, যা শরীয়াতের হুকুম অনুযায়ী হস্তগত হয়নি। তাই তা বাতিল ঘোষিত হয়েছে এবং মূলধন ফিরিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ইসলামে মীরাসের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার নীতি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই তার মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাই সম্পত্তির বণ্টন হওয়া ও না-হওয়ার কোন গুরুত্ব নেই। যেমন সুদের চুক্তিসমূহ যদি সুদ হারাম হওয়ার পর ইসলামে ঘটানো হয় অথচ তার হুকুম স্থিতিশীল হয়ে গেছে, তার যে অংশ হাতে এসেছে আর যা হাতে আসেনি— এই সবই বাতিল হওয়ার দিক দিয়ে ও দুটি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। উপরন্তু যে লোক

কোন মীরাস পেয়ে গেল, পরে সে মরে গেল মীরাস বন্টন হওয়ার আগেই। তার অংশ মীরাসে অবশ্যই থাকবে এবং তা তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্যের কথা আমাদের জানা নেই। অনুরূপভাবে যদি মীরাস বন্টন হওয়ার পূর্বে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে সে মীরাসের যে অংশ পেল তা বাতিল হয়ে যাবে না। এবং সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুকালে তাকে মুরতাদ ধরা হবে না। তেমনি যে লোক মীরাস বন্টন হওয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল করল কিংবা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেল, মীরাসে তার কোন অংশ হবে না।

ব্যভিচারীর শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ .... سَبِيلًا -

তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যের যারা নির্লজ্জতার— যিনার কাজ করে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও।

আবূ বকর বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক কালে যিনা-ব্যভিচারীর এ-ই শাস্তি ঘোষিত হয়েছিল। এক্ষণে তা মনসূখ হয়ে গেছে, হুকুমটা টিকে নি। এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের কোন মতপার্থক্য নেই।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা আল-খুরাসানী ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এই আয়াত পর্যায়ে ঃ 'তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যের যারা নির্লজ্জতার— যিনার কাজ করে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও .... পথ'।

এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ -

তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করো না, তারাও বের হবে না .....তবে যদি তারা প্রকাশ্য-স্পষ্ট নির্লজ্জতার— যিনার কাজ করে বসে ..... । (সূরা তালাক ঃ ১)

বলেছেন ঃ এসব আয়াত সূরা আন-নূর-এর দোররা মারা সংক্রান্ত আয়াতের পূর্বে নাযিল হওয়া। তাই সূরা আন-নূর-এর এ আয়াত ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— এ দুইজনার প্রত্যেককে একশটি করে দোররা মারো ... ।

পূর্ববর্তী এই সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে মনসূখ করেছে। আর প্রথমোক্ত আয়াতে যে পথ বা উপায়-এর কথা বলা হয়েছে, তা হল— দোররা ও সঙ্গেসার— প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা।

বলেছেন, যদি তারা কোনদিন এই সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার ঘটনা ঘটায়, তাহলে তারা বহিষ্কৃতও হবে ঘর থেকে এবং 'রজম'— প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করাও হবে।

আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুয়াবিয়াতা ইবনে সালিহ, আলী ইবনে আবূ তালহ। ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট উপরোক্ত আয়াত এবং وَالَّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا 'তোমাদের মধ্য থেকে দুজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদেরকে পীড়ন দাও' আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, পূর্বে কোন মেয়েলোক যিনা করলে তাকে ঘরে আটক করে রাখা হতো। এ আটকাবস্থায়ই সে মরে যেত। তেমনি কোন পুরুষ যখন যিনার অপরাধ করত, তাকে লজ্জা দিয়ে পীড়ন করা হতো এবং জুতা দিয়ে মারা হতো। বলেছেন— এ সময় আয়াত নাযিল হয় ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

যিনাকারী নারী ও পুরুষ— এদের দু'জনার প্রত্যেককে একশটি করে দোররা মার।
(সূরা নূর ঃ ২)

আর যদি তারা বিবাহিত হতো, তাহলে রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত অনুযায়ী 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করা হতো। আল্লাহ্ তাদের জন্যে এটাকেই পথ রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। এ পথেরই ইঙ্গিত ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল এ আয়াতে ঃ

حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْيَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا -

তাকে ঘরে বন্দী করে রাখবে 'যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের খতম করে দেয় কিংবা আল্লাহ্-ই তাদের জন্যে কোন পথ বা উপায় নির্ধারণ করেন।

আবূ বকর বলেছেন, ইসলামের সূচনাকালে ব্যভিচারিণীর বাধ্যতামূলক দণ্ড ছিল আটক রাখা তাদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত। অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে পথ করে দেন। কিন্তু তখন তাদের জন্যে এ ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। তা ছাড়া এ আয়াতে কুমারী ও অকুমারী নারীর মধ্যে কোন পার্থক্যও করা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায়— তা ছিল একটি সাধারণ বিধান, কুমারী অ-কুমারী সকলের জন্যে একই ব্যবস্থা।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالَّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا -

এবং তোমাদের মধ্যে যেই দুজন এ কাজ করবে, সেই দুজনকে পীড়ন দাও।

আল-হাসান ও আতা থেকে বর্ণিত, এই দুজন বলতে যিনাকারী পুরুষ ও নারী। সুদ্দী বলেছেন, অবিবাহিত পুরুষ ও নারী। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, এখানে ব্যভিচারী দুজন পুরুষের কথা বলা হয়েছে। এ শেষোক্ত ব্যাখ্যাটা সহীহ নয়, বলা যায়। কেননা তা বলতে হলে দ্বিবচন শব্দের ব্যবহার অর্থহীন। কেননা ওয়াদা ও হুমকির কথা দুটোই সাধারণত বহুবচনের শব্দে বলা

হয়। কেননা তা তাদের সকলের প্রতি প্রয়োগীয় অথবা এক বচনের শব্দে বলা হবে। তা সমস্তকেই পরিব্যাপ্ত জাতীয় পর্যায়ের কথা হবে। এ বিষয়ে আল-হাসান-এর কথাই সহীহ্। সুদ্দীর ব্যাখ্যাও সম্ভাব্যতার মধ্যে। ফলে দুটি আয়াতের সামষ্টিক অর্থ হচ্ছে নারীর শাস্তি ছিল দৈহিক পীড়ন ও আটক— দুটো-ই মৃত্যু পর্যন্ত। আর পুরুষের শাস্তি ছিল লজ্জাদান ও জুতা দিয়ে মারা। কেননা প্রথমোক্ত আয়াতে নারীর কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, তাকে আটক করে রাখতে হবে। আর দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে পুরুষের সঙ্গে একসাথে পীড়ন দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে মেয়েলোকের জন্যে দুটি হুকুম একত্রিত হল। আর পুরুষের জন্যে শুধুমাত্র পীড়নের কথাই বলা হয়েছে।

অবশ্য এ-ও সম্ভব যে, দুটো আয়াতই একসঙ্গে নাযিল হয়েছে। পরে নারীর জন্যে একক ব্যবস্থা হল আটক করা, আর পীড়নে দুজন-ই শামিল হল। নারীর উল্লেখ আলাদা ও একক হওয়ার ফায়দা হল, কেবল তার জন্যেই মৃত্যু পর্যন্ত আটক ব্যবস্থা। এ হুকুমে পুরুষ শরীক নেই, আটকের শাস্তি পুরুষের জন্যে নয়। আর নারীকে পুরুষের সঙ্গে একত্রিত করা হল পীড়নে। কেননা মূল পাপকার্যে দুজনই শরীক। এ-ও হতে পারে যে, নারীকে পীড়নের পূর্বেই আটক করতে হবে। পরে তার শাস্তি বৃদ্ধি করা হল এবং পুরুষের জন্যে পীড়ন সাব্যস্ত হল। ফলে নারীর জন্যে দুটো শাস্তি একত্রিত হল। আর পুরুষের জন্যে এককভাবে পীড়ন সাব্যস্ত হল নারী ছাড়া-ই। যদি তা-ই হয়ে থাকে, কেননা মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে আটক রাখা অথবা অন্য কোন উপায়— তাই ছিল তার শাস্তি। তার সঙ্গে পীড়ন যোগ হলে তা মনসূখ হয়ে গেল। কেননা 'নস্'-এর হুকুম স্থিতিলাভ করলে পর তাতে বৃদ্ধি ঘটলে পূর্বেরটা মনসূখ হয়ে যায়। কেননা তখন আটক-ই ছিল তার সমগ্র শাস্তি। পরে যখন বৃদ্ধি ঘটল, তখন সেটা হল শাস্তির অংশ। এ কারণেই আটক রাখার শাস্তি একটা মনসূখ শাস্তিতে পরিণত হল। আর এ-ও হতে পারে যে, শুরুতে দুজনের জন্যই শুধু পীড়ন শাস্তি ছিল। পরে নারীর শাস্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত আটককে বৃদ্ধি করা হল অথবা আল্লাহ্ তার জন্যে যে পথ-ই করে দেন। ফলে নারীর ক্ষেত্রে পীড়ন শাস্তি হিসেবে মনসূখ হয়ে গেল। কেননা আটক শাস্তির হুকুম নাযিল হওয়ার পর তা শাস্তির অংশে পরিণত হল। .... মোটকথা, এই সবই সম্ভব।

যদি বলা হয়, আটকের হুকুমটা প্রত্যাহৃত হওয়ার কারণে তা মনসূখ হয়েছে— বলা যায় কি ? পরে 'পীড়ন' নাযিল হলে তা-ই হল একমাত্র শাস্তি ?

জবাবে বলা যায়, সে হুকুমটা মূলতই উঠে গেছে, এ কারণে তা মনসূখ হয়েছে, বলা জায়েয হবে না। কেননা পীড়নের দণ্ড কার্যকর হলে তা আটক শাস্তির পরিপন্থী কিছু হয় না। যেহেতু দুটোই একসাথে কার্যকর হতে পারে। তবু তা এদিক দিয়ে মনসূখ হতে পারে যে, তা সমগ্র শাস্তি থাকার পর শাস্তির অংশে পরিণত হয়েছে। আর মনসূখ হওয়ার এ-ও একটা ধরন।

আয়াত দুটির পরস্পরা পর্যায়ে দুটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি আল-হাসানের বর্ণনা ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا নাযিল হয়েছিল وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ-এর পূর্বে। পরে পাঠক্রমে তা ওটির পূর্বে বসানোর নির্দেশ হয়েছে। ফলে পীড়ন উভয়ের জন্যে সমগ্র শাস্তি হয়ে দাঁড়াল। পরে নারীদের জন্যে আটক সাব্যস্ত হল পীড়নের সঙ্গে।

কিন্তু এ কথাটি দূরবর্তী মনে হয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَالَّذَانِ يَاْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا -এর هَا ইঙ্গিতমূলক, পূর্বে উল্লেখ করা একটা শব্দের প্রয়োজন, যার দিকে এই ইঙ্গিত বলা যাবে এবং যাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মনে তা স্পষ্ট উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু এই আয়াতটিতে الفاحشة هَا যিনাকেই ইঙ্গিত করে— তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তা সত্ত্বেও এ ইঙ্গিতটা যে পূর্বে আয়াতের শুরুতে উল্লেখ الفاحشه -এর দিকে, তা নিশ্চিত। কেননা সেদিকে ইঙ্গিত না করলে বাক্যটিই অর্থপূর্ণ হয় না। বক্তব্য জানা যায় না, বোঝা যায় না। এ আয়াতটি এ দুটি আয়াতের মত নয়। একটি ঃ

مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ -

তার পিঠের ওপর কোন জীবন্ত প্রাণী রেখে দেয়নি। (সূরা ফাতির ঃ ৪৫)

দ্বিতীয়টি ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

আমরা নিশ্চয়ই তাকে কদর রাত্রে নাযিল করেছি। (সূরা কাদ্‌র ঃ ১)

কেননা এ আয়াতের বক্তব্য কুরআন নাযিল করা সম্পর্ক। আর পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্য পৃথিবী সম্পর্কে। এই অবস্থাগত নিদর্শনের জন্যেই উভয় আয়াতে 'পূর্বে' শব্দের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ছিল। যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা যে-কোন শ্রোতাই নিঃসন্দেহে বোঝাতে পারে। তাই সম্বোধনের বাহ্যিক দাবি হচ্ছে যে, আয়াত দুটির বিন্যাস শব্দের বিন্যাস অনুযায়ী হবে। এক্ষণে হয় দুটোই এক সাথে নাযিল হয়েছে বলতে হবে, না হয় পীড়নের আয়াতটি আটক সংক্রান্ত আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে— যদি পীড়ন সেই নারীর জন্যে নির্দেশিত হয়, যাকে আটক করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় কারণ সুদ্দী থেকে বর্ণিত ঃ وَاللَّذَانِ يَاْتِيَانِهَا مِنْكُمْ, আল্লাহ্‌র এই কথাটি বিশেষভাবে দুজন কুমারী নারীর ব্যাপারে হুকুম ছিল। আর প্রথমটি অ-কুমারীদের জন্যে। কুমারীদের জন্যে নয়। তবে এ কথাটি একটি শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে বলতে হবে কোন দলীল ছাড়াই। কিন্তু শব্দ দুটিকে তার আসল তাৎপর্যে ব্যবহৃত মনে করা সম্ভব হলে তা না করা কারোর জন্যেই শোভন নয়। আয়াত দুটির হুকুমে ও বিন্যাসে সম্ভাব্য যত দিকই থাক, ব্যভিচারীদের সম্পর্কে এ দুটি আয়াত যে মনসূখ হয়ে গেছে, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

এ আয়াতটিতে উল্লিখিত السبيل -এর তাৎপর্য কি, এ বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাদের জন্যে আল্লাহ্ যে পথ বা উপায় ঘোষণা করেছেন, তা হল দোররা অবিবাহিতের জন্যে আর 'রজম' বিবাহিতের জন্যে।

কাতাদাতা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ থেকে কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا -

'কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে কোন পথ করে দেবেন'— এর অর্থ, তারা তাদের গর্ভের ফসল প্রসব করবে।

কিন্তু এটা তাৎপর্যহীন। কেননা আয়াতটি গর্ভবতী ও অগর্ভবতী নির্বিশেষে সকলের জন্যে সাধারণ। কাজেই যে পথই বলা হবে, তা সকলের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে।

এ হুকুম দুটির মনসূখ হওয়ার ব্যাপারেও বিভিন্ন মত রয়েছে। কিছু লোক বলেছেন, তা মনসূখ হয়েছে —

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশটি করে দোররা মার—এই আয়াত দ্বারা।

(সূরা নূর ঃ ২)

আর وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا আয়াতটি ছিল দুই কুমারী সম্পর্কে। পরে এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায় উক্ত দোররা মারা সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা।

পরে অবশিষ্ট থেকে গেলে অ-কুমারী মেয়েদের জন্যে আটকের আদেশ। সে আদেশ মনসূখ হয়ে যায় 'রজম' করার বিধান দ্বারা।

অন্যরা বলেছেন, তা মনসূখ হয়েছে উবাদাতা ইবনুস সামেত বর্ণিত হাদীস দ্বারা।

সে হাদীসটি জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল-ইয়ামান, আবূ উবায়দ আবুন-নসর, শুবা, কাতাদাতা, আল-হাসান, হাত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর রুকাশী, উবাদাতা ইবনুস-সামেত সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে উবাদাতা বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، اَلْبِكْرُ تُجْلَدُ وَتُنْفَى وَالثَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتَرْجَمُ -

তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের জন্যে পথ জানিয়ে দিয়েছেন। কুমারী কুমারীর সঙ্গে, অ-কুমারী অ-কুমারীর সঙ্গে। কুমারীকে দোররা ও নির্বাসন, আর অ-কুমারীকে দোররা রজম।

এ কথাটি সহীহ্। কেননা রাসূল (স)-এর 'তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, আল্লাহ তাদের জন্যে পথ করে দিয়েছেন' কথাটি আয়াতে উল্লিখিত পথ-এর ব্যাখ্যা। আর জানা-ই আছে যে, নবী করীম (স)-এর কথা এবং আটক ও পীড়ন— এ দুটির মাঝে কোন হুকুমের মধ্যস্থতা ছিল না। আর সূরা আন্-নূর-এ যে 'দোররা' মারার হুকুমের আয়াত রয়েছে, তা তখন পর্যন্ত নাযিল হয়নি। কেননা তা নাযিল হয়ে থাকলে 'তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তাদের জন্যে পথ করে দিয়েছেন' কথাটির আগেই তা হতো। আর তা হলে এরূপ কথার কোন সুযোগ ছিল না। তাই বলতে হবে, এ কথা প্রমাণিত যে, আটক ও পীড়নের বিধান

মনসূখ হওয়ার কারণ হচ্ছে নবী করীম (স)-এর এ কথাটি, যা তিনি উবাদাতা ইব্‌নুস সামেত বর্ণিত হাদীসে বলেছেন এবং দোররা মারা সংক্রান্ত হুকুমের আয়াত তার পরে নাযিল হয়েছে।

এ থেকে সুন্নত দ্বারা কুরআনের হুকুম মনসূখ হওয়ার জায়েয প্রমাণিত হয়। কেননা এ আলোচনায়ই আমরা দেখলাম, 'তোমরা আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তাদের জন্যে পথ করে দিয়েছেন' দ্বারা কুরআনের আটক রাখা ও 'দোররা মারার হুকুম মনসূখ হয়েছে কুমারীদের ক্ষেত্রে এবং অ-কুমারীদের ক্ষেত্রে রজম-এর হুকুম নতুনভাবে কার্যকর হয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ —'যারা তোমাদের মধ্য থেকে তা করে' এবং আটক ও পীড়ন-এর কথা যে দুটি আয়াতে এসেছে, তা ছিল দুই কুমারী সম্পর্কে; অ-কুমারীদের সম্পর্কে নয়।

জবাবে বলা যাবে, অ-কুমারী মেয়েদের জন্যে যিনার শাস্তি ছিল আটক রাখা, এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। সুদ্দী যে বলেছেন পীড়ন ছিল বিশেষভাবে দুই কুমারীর জন্যে, অথচ নবী করীম (স) আটক-সংক্রান্ত আয়াতে উল্লিখিত পথ সম্পর্কে যা জানিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অ-কুমারীদের সম্পর্কে। অতএব তা রাসূলে করীম (স)-এর ঃ - الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ অ-কুমারীর অ-কুমারীর সাথে— এর জন্যে দোররা ও 'রজম' এ কথা দ্বারাই তা মনসূখ হয়েছে। তাহলে আটক-আদেশ উভয় স্থান থেকেই মনসূখ হয়ে গেছে অ-কুরআন দ্বারা অর্থাৎ যার দ্বারা মনসূখ হয়েছে, তা কুরআন নয়, তা রাসূলের সুন্নাত। আর তা হচ্ছে সেই হাদীস যাতে বিবাহিতের জন্যে 'রজম' বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ পর্যায়ে একটি হাদীস এবাদাতা বর্ণিত, যা আমরা উপরে উদ্ধৃত করেছি। আর আবদুল্লাহ, আয়েশা ও উসমান (রা) বর্ণিত হাদীস যখন কার্যকর ছিল, নবী করীম (স)-এর এ সাহাবীগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ اِيْمَانٍ وَزِنَا بَعْدَ اِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ -

কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত তিনটির কোন একটি কারণ ছাড়া হালাল নয়। সে তিনটি কারণ ঃ ঈমানের পর কুফর গ্রহণ— মুরতাদ হওয়া, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করা এবং নর হত্যার দণ্ড ছাড়া বিনা কারণে নরহত্যা।

মায়েয ও গামেদীয়াকে নবী করীম (স) কর্তৃক হত্যা করার ঘটনার বিবরণ মুসলিম উম্মত এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাতে কারোর কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না।

যদি বলা হয়, খাওয়ারিজ গোষ্ঠীর সব লোক-ই 'রজম'কে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে। রজম যদি সর্বজনমান্য সূত্রে বর্ণিত হতো, যার ফলে সন্দেহমুক্ত ইলম লাভ হয়, খাওয়ারিজরা তা নিশ্চয়ই ভুলে যেত না।

জবাবে বলা যাবে, এসব হাদীস বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত এবং বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শুনতে পাওয়ার মাধ্যমে এসেছে। আর সব হাদীসই তো এমনিভাবেই বর্ণিত হয়ে এসেছে। আর

খাওয়ারিজরা কখনই মুসলিম সর্বজনমান্য ফিকাহবিদদের মজলিসে বসেনি, হাদীস বর্ণনাকারীদের নিকট হাদীস শুনতেও প্রস্তুত হয়েনি। তারা তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্ক-যোগাযোগবিহীন রয়েছে। তারা হাদীস গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে তারা এসব হাদীস সম্পর্কে সংশয়ের গভীর তলায় ডুবে গেছে। তারা এ বিষয়ে স্থিতিশীলও হয়নি। তাদেরই প্রাথমিক কালের বহু সংখ্যক মনীষী যে এসব হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রেই জানতে পেরেছিলেন, তা কোনক্রমেই অসম্ভব বা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এসব হাদীসকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। কেননা তাদের কথার সঙ্গে যারা একমত নয় তাদের দেয়া কোন খবরই প্রত্যাখ্যান করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের লোকেরা এ রোগে আক্রান্ত ছিল, আর শেষদিকের লোকেরাও তাদেরই অন্ধ অনুসরণে পড়ে এসব হাদীস সংগ্রহ করেছে। অন্যদের নিকট থেকে কিছু শুনতে বা জানতে তারা প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে তারা এসব হাদীস সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি কিংবা যারাও বা তা জানতে পেরেছিল, তারা সংখ্যায় ছিল খুবই নগণ্য। সেই নগণ্য সংখ্যক লোকদের পক্ষে এসব হাদীস গোপন রাখা অসম্ভব কিছু নয়। ফলে তারা তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। সর্বোপরি, তারা তো রাসূল (স)-এর সাহাবী ছিলেন না। তা যদি হতো তা হলে তারা এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীর জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেত অথবা প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকে সরাসরি শুনতে ও জানতে পারত। এসব কিছুর বাইরে থাকার কারণে তারা যদি তা না জেনে থাকে, তাহলে তা কোন বিচিত্র ব্যাপারে নয়।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার কথা নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত হাদীসের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। সে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা দুই শ্রেণীর লোকেরাই জানে। হয় ফিকাহবিদগণ, যাঁরা তা শুনেছেন এবং সে বিষয়ে তাঁদের নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে হাদীস বর্ণনাকারীর লোকদের মাধ্যমে অথবা যারা নিজেরা সেই সময়ে এসব জন্তু পালতেন বেশি সংখ্যায়। ফলে তাদেরকে সেগুলোর যাকাত দিতে হতো। এ কারণে এ যাকাতের ফরয হওয়া সংক্রান্ত নিশ্চিত জ্ঞান সরাসরি লাভ করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের পক্ষে।

এর আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ। তা বহু লোক-ই শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান পেয়েছেন, যদিও তা তাঁরা শুনেছেন একক ব্যক্তির সূত্রে। খাওয়ারিজদের অবস্থাও এরূপ। এ কারণেই তারা 'রজম' শাস্তিকে অস্বীকার করেছে। ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও বোনঝিকে একসাথে একজন পুরুষের যে বিয়ে করা হারাম, তাও তারা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। এভাবে আরও অনেক বিষয়ে তারা অজ্ঞ থাকার কারণে অস্বীকার করেছে। অথচ তা ন্যায়পন্থী লোকেরা বর্ণনা করেছেন। তবে খাওয়ারিজ ও শরীয়ত বিদ্রোহীরা তা গ্রহণ করেনি।

উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে বহুসংখ্যক আইন উৎসারিত হয়েছে। তার একটি যিনার প্রমাণের জন্যে কম-সে-কম চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। দ্বিতীয়, যিনাকারী মেয়েলোককে আটক করতে হবে এবং পুরুষ ও নারী উভয়কেই পীড়ন করতে হবে। অবশ্য পীড়ন ও লজ্জাদান দুটিই প্রত্যাহার করা যাবে তওবা করলে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا -

তারা দুজন যদি তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তোমরা তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।

এ তওবা কার্যকর হয় পীড়ন প্রত্যাহারের জন্যে। তবে আটক নয়। এ আটকের ব্যাপারটি কুরআন ঘোষিত পথ-এর আসার ওপর নির্ভরশীল ছিল। পরে রাসূলে করীম (স) সে 'পথ' ঘোষণা করেন। সে 'পথ' হচ্ছে ঃ দোররা ও রজম। আয়াতে যা কিছু উল্লেখ হয়েছিল তা সবই মনসূখ হয়ে গেছে। শুধু দাঁড়িয়ে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী দাঁড় করানোর কথাটি। কেননা শরীয়াত প্রস্তাবিত শাস্তির حد -এর ক্ষেত্রে সাক্ষীদের এ সংখ্যা অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে পূর্বের ঘোষিত দুটি 'হদ্দ' মনসূখ হয়ে গেছে। তা হল দোররা ও রজম।

আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি এ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً -

যারা পবিত্র সতী নারীদের ওপর যিনার তুহ্‌মাত— মিথ্যা অভিযোগ তোলে, কিন্তু পরে তা চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে দাঁড় করে না, তাদেরকে আশিটি দোররা মারো।

(সূরা নূর ঃ ৪)

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

لَوْلَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ -

যদি না তারা চারজন প্রত্যক্ষদর্শী নিয়ে আসে, যখন তারা এ সাক্ষী নিয়ে না এলো, তখন তারা আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হল। (সূরা নূর ঃ ১৩)

এখানেও সাক্ষীদের সংখ্যাটির গুরুত্ব মনসূখ হয়নি আর সাক্ষী উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতাও মনসূখ হয়ে যায়নি। বরং এ আয়াত সাক্ষী উপস্থিত করাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং ব্যভিচারকারীদের প্রতি নজর দেয়া সে দুজনের ওপর 'হদ্দ' কায়েমের জন্যে গুরুত্ব পেয়েছে। কেননা আল্লাহ্ যিনার ঘটনার ওপর সাক্ষী আনবার আদেশ করেছেন। আর তা গুরুত্ব আরোপ ব্যতীত হয়নি। প্রমাণিত হল, ব্যভিচারীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ সে দুজনার ওপর 'হদ্দ' কায়েমের উদ্দেশ্যে তার সাক্ষ্যকে প্রত্যাহার করে না। হযরত আবূ বকর (রা) শবল ইবনে মাবদ, নাফে ইবনুল হারিস জিয়াদের সঙ্গে মুগীরা ইবনে শুবা (রা)-এর ঘটনায় তা-ই করেছেন। তার সেই কাজ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিসম্পন্ন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মেয়েলোকের ওয়ারিস হবে জোর করে, তা তোমাদের হালাল নয় এবং তাদেরকে তোমরা আটক করে রেখো না।

শায়বানী ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে এ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আগে এমন রীতি ছিল যে, কোন ব্যক্তি মরে গেলে তার অভিভাবকগণই তার স্ত্রীর ওপর বড় হকদার হয়ে দাঁড়াতো তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কতক লোক চাইত তাকে বিয়ে করতে, আবার কতক লোক চাইত তাকে বিয়ে দিতে। কতক লোক চাইত তাকে বিয়ে না দিতে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। আল-হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন, এরূপ অবস্থা ছিল যে, এক ব্যক্তি যখন মরে যেত ও তার স্ত্রীকে রেখে যেত, তখন মৃতের অভিভাবক বলত ঃ আমি তার স্ত্রীকেও মীরাস হিসেবে পেয়েছি, যেমন তার ধন-মাল পেয়েছি। তখন সে চাইলে তাকে পূর্বে দেয়া মহরানার ভিত্তিতেই বিয়ে করত, আর চাইলে সে তাকে বিয়ে করত এবং মহরানা নিয়ে নিত।

মুজাহিদ বলেছেন, তা হতো যদি মৃতের পুত্র সন্তান না থাকত। আবূ মজলজ বলেছেন, যে লোক তার অভিভাবক হয়ে দাঁড়াত, সে-ই মীরাস হিসেবেই তাকে নিয়ে নিত। জুয়াইবর দহাক ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিককালে এ নিয়ম ছিল যে, ব্যক্তি মরে গেলে তার কোন নিকটবর্তী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যেত এবং তার স্ত্রীর ওপর একটা কাপড় ফেলে দিত। তাতে সে মেয়েলোকটির বিয়ের ওয়ারিস বা অধিকারী হয়ে যেত। কাবশা বিনতে ময়সের স্বামী আবূ আমের মরে গেলে আমেরে অপর স্ত্রী থেকে পুত্র এসে তার উপর একটা কাপড় ফেলে দিল। পরে তার নিকটেও যায়নি, তার খরচাদিও দেয়নি। তখন সে মেয়েলোকটি নবী করীম (স)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করে। তখন আল্লাহ উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

'তোমরা মেয়েলোকদের জবরদস্তিভাবে ওয়ারিস হয়ে দাঁড়াবে— তা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তোমরা তাকে আটকেও রাখবে না।' এভাবে যে, তোমরা তাদেরকে প্রথম মহরানা দেবে। জুহরী বলেছেন ঃ মেয়েলোকটিকে লোকেরা আটক করে রাখত, অথচ তার প্রতি তাদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। এভাবে আটক থাকা অবস্থায়ই মেয়েলোকটি মরে যেত। তখন সে তার ওয়ারিস হতো। এ ধরনের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতেই বলা হয়েছে এ আয়াতটিতে। এ পর্যায়ে আরও বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ -

এবং তোমরা তাদেরকে আটকিয়ে রাখবে না এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কিছু অংশ নিয়ে নেবে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদাতা, সুদ্দী ও দহাক বলেছেন ঃ এ আয়াতে স্বামীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তাদের স্ত্রীদের পথ মুক্ত করে দিতে যদি তাদের নিকট তাদের কোন প্রয়োজন না থাকে। তাদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রাখবে না। যেমন শেষকালে তার মালের একটা অংশ তোমরা নিতে পার এ উদ্দেশ্যে।

আল-হাসান বলেছেন, এ আয়াতে মৃত স্বামীর অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে তাকে অন্য

স্বামী গ্রহণ করতে নিষেধ করে বা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে। জাহিলিয়াতের সময়ে এ-ই ছিল সামাজিক রীতি।

মুজাহিদ বলেছেন ঃ স্ত্রীলোকটির অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে তার পথে বাধা দিতে, তাকে আটকাতে।

আবূ বকর বলেছেন, বাহ্যত মনে হয়, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়তটির যে ব্যাখ্যা বলেছেন, তা-ই যথার্থ ব্যাখ্যা। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوهُنَّ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কিছু অংশ যেন ফিরিয়ে নিতে পার। এবং এরপর যা বলা হয়েছে তা সেই কথা-ই প্রমাণ করে। কেননা 'যেন যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরিয়ে নিতে পার' কথাটির দ্বারা মহরানাই বুঝিয়েছে। যার পরিণাম এ-ই দাঁড়াত যে, তাকে কার্যত আটকই রাখা হতো কিংবা তার প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করা হতো দেয়া মহরানার কিছু অংশ ফিরিয়ে নেয়ার হীন উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ -

তবে যদি সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার-যিনার কাজ তারা করে (তাহলে ভিন্ন কথা)।

আল-হাসান, আবূ কালাবা ও সুদ্দী বলেছেন, এ আয়াতাংশে যিনার কথা বলা হয়েছে। কেননা স্ত্রীলোকের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার খবর যদি জানতে পারে, তা হলে বিনিময় গ্রহণ তার জন্যে হালাল হবে। ইবনে আব্বাস, দহাক ও কাতাদাতা বলেছেন, এ আয়াতে 'নুশুজ' স্ত্রীর বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে স্বামীর জন্যে তার নিকট থেকে ফিরিয়া (বিনিময়) নেয়া হালাল হবে। সূরা আল-বাকারায় আমরা খুলা তালাক ও তৎসংক্রান্ত বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা দিয়েছি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং তাদের সাথে খুব ভালোভাবে জীবন যাপন কর।

স্বামীদেরকে এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে— তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে খুব ভালো ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে একত্রে জীবন যাপন করে। সে ভালো ব্যবহারের একটা হল— স্ত্রীর প্রাপ্য হক মহরানা, খরচাদি, দিন বণ্টন, রুঢ় কর্কশ কথার দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দান পরিহার, তার দিকে অনাকৃষ্ট ও তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর প্রতি ঝুকে পড়া এবং কোন অপরাধ— গুণাহ ছাড়াই মুখ বিকৃতি ও ভ্যাংচি-ঝামটা দিয়ে কথা বলা ও এ ধরনের আরও যা আছে বা হতে পারে, তা সবই পরিহার করতে হবে। এ আয়াতটিতেও এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ -

হয় ভালোভাবে রাখো, না হয় অনুগ্রহপূর্বক সদ্ব্যবহারের সাথে ছেড়ে দেবে।
(সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দই কর, তাহলে জানবে, হয়ত তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করবে অথচ আল্লাহ্ তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

এ আয়াত প্রমাণ করে— স্বামী যদি স্ত্রীকে অপছন্দও করে, তবু তাকে রেখে দেয়াই পছন্দনীয় কাজ। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে এ তাৎপর্যেরই সমর্থন রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ, মারূফ ইবনে ওয়াসিল, মুহারিব ইবনে দিসার, ইবনে উমর নবী করীম (স) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَ الطَّلَاقُ -

আল্লাহ্‌র নিকট তালাক হচ্ছে সর্বাধিক ক্রোধ উদ্রেককারী হালাল কাজ।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ, ইবনে উয়াজীদুন নীলি, সহলব ইবনুল উলা, গুয়ায়ব ইবনে বয়ান, ইমরাসুল কাতান, কাতাদাতা, আবূ তমীমাতা আল-হুজাইমী, আবূ মূসা আল-আশ্আরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

تَزَوَّجُوْا وَلَا تَطَلِّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ -

তোমরা বিয়ে কর; কিন্তু তালাক দিও না। কেননা স্বাদ আস্বাদন করে বেড়ানো পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না।

এ হাদীসে উল্লিখিত নবী করীম (স)-এর কথাটি আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আয়াতে তালাক দেয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভালোভাবে স্ত্রীকে রাখাকে পছন্দ করা হয়েছে— তাকে যত অপছন্দই করা হোক-না-কেন। আল্লাহ আয়াতটিতে এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যা অপছন্দ করি, তা দিয়েই ধৈর্য সহকারে জীবন যাপন করায় বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। আয়াতটি আগেই উদ্ধৃত হয়েছে, যার অর্থ ঃ তোমরা হয়ত কোন জিনিস অপছন্দ কর, কিন্তু আল্লাহ্ তাতেই বিপুল কল্যাণ রেখেছেন।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ -

এটা সম্ভব যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করবে অথচ আল্লাহ্ তাতেই তোমাদের জন্যে বিপুল কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তোমরা কোন জিনিস পছন্দ করবে, অথচ তা-ই তোমাদের জন্যে অত্যন্ত মন্দ ও ক্ষতিকর। (সূরা বাকারাহ ঃ ২১৬)

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا -

তোমরা হয়ত একজন স্ত্রীর স্থানে আর একজন স্ত্রীকে বদলাতে ইচ্ছা করবে অথচ তোমরা তাদের কোন একজনকে বিপুল সম্পদ দিয়ে দিয়েছ।

এ আয়াতের দাবি হচ্ছে— মহরানা স্ত্রীকে সহীহ্‌ভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া ওয়াজিব এবং স্বামীকে তার স্ত্রীকে দেয়া কোন জিনিস-ই ফিরিয়ে নেয়া স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ এবং জানিয়ে দিয়েছে যে, স্ত্রীর জন্যে তা নিশ্চিত, তাকে বদলিয়ে দেয়া হোক কিংবা রেখেই দেয়া হোক। স্বামীর জন্যে স্ত্রীকে দেয়া জিনিস ফেরত নেয়ার কোন অনুমতি নেই। তবে আল্লাহ্ অন্যের যে মাল যেভাবে নেয়া জায়েয করেছেন সেভাবে নেয়া যেতে পারে। যেমন বলেছেন ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

তবে যদি ব্যবসায় হয় তোমাদের দুই পক্ষে সম্মতির ভিত্তিতে হবে ....

অবশ্য আয়াতের এটাও দাবি যে, স্ত্রীর সাথে নিবিড় নিভৃতে মিলিত হওয়ার পর তাকে দেয়া কোন জিনিসই তার কাছ থেকে ফেরত নেয়া যাবে না। এটাই এমন দলীল যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সাথে নিবিড় নিভৃতে মিলিত হওয়ার পর তালাক দিলে পূর্ণ মহরানা দিয়ে দিতে হবে। কেননা কোন দলীলের ভিত্তিতে বিশেষীকরণ করা না হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীকে দেয়া জিনিস ফিরিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ থাকবে। আর সেই দলীলের বিশেষীকরণ হয়েছে আল্লাহ্‌র এ কথাটির দ্বারা ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ -

আর তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদেরকে সম্পর্শ করার পূর্বেই, অথচ তোমরা তাদের জন্যে মহরানা সুনির্দিষ্টরূপে ধার্য করেছ, তাহলে তোমাদের নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক দিতে হবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৭)

এ আয়াতটি বলছে, নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মহরানা বাদ পড়ে যায়। কেননা নিবিড় নিভৃতে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক দেয়ার অর্থই তাই।

এই নিবিড় একাকীত্বে (الخلوة) বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তার অর্থ কি শুধু স্পর্শ করা যেমন কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা বাহ্যত মনে হয় কিংবা এই স্পর্শ বলতে যৌন সম্ভোগও বুঝিয়েছে ? ব্যবহৃত শব্দ অবশ্য দুটি অর্থ-ই দেয়। কেননা হযরত আলী, উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) এ স্পর্শ বলতে যৌন ক্রিয়া সম্পাদন বুঝেছেন। অতএব فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا তাহলে তোমরা তার কাছ থেকে কিছুই ফেরত নিও না— এ সাধারণ তাৎপর্যের কথাটির কোন বিশেষ অর্থ হবে না।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا -

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, যদি কেউ তার মহল তার স্ত্রীকে হেবা করে দেয়, তাও ফিরিয়ে নেয়ার কোন অধিকার তার নেই। কেননা তা তো সে তাকে দিয়ে দিয়েছে। আর কুরআনের আয়াত সাধারণভাবেই দেয়া কোন জিনিসই ফেরত নিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছে, সেই দেয়া জিনিস মহরানাই হোক, কি অন্য কিছু। যে লোক তার স্ত্রীকে 'খুলা' তালাক দিয়েছে কোন মালের বিনিময়ে, অথচ সে তাকে তার মহ্‌রানা পূর্বেই আদায় করে দিয়েছে, সে তার মহরানা থেকে কিছুই ফিরিয়ে দেবে না। কেননা তা তো সে দিয়েই দিয়েছে সুনিশ্চিতভাবে। তা যে মাল-ই হোক-না-কেন, কোন বস্তুগত জিনিসই হোক, কি ব্যবহার্য কোন জিনিস। ইমাম আবূ হানীফা (রা) এ পর্যায়ে এ কথাই বলেছেন ।

যদি কেউ তার স্ত্রীর খরচাদি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে আগে-ভাগেই দিয়ে দেয়, পরে সে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই স্ত্রীলোকটি যদি মরে যায়, তাহলে তাকে দেয়া কোন জিনিসই স্ত্রীর মীরাসে ফিরিয়ে নিয়ে ধরবে না। কেননা ফিরিয়ে না নেয়ার কথাটি ব্যাপক ও সাধারণ। কেননা হতে পারে, মরে যাওয়া স্ত্রীর জায়গায় সে আর একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে সেই ফিরে পাওয়া জিনিস দ্বারা। আয়াতের বাহ্যিক অর্থে এ ব্যাপারটিও শামিল হয়েছে।

যদি বলা হয়, উক্ত কথার পর-ই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

আর কেমন করে তোমরা তা ফিরিয়ে নেবে, অথচ তোমরা পরস্পর গভীরভাবে ও (স্বামী-স্ত্রী হিসেবে) মিলিত হয়েছ।

তা প্রমাণ করে যে, শুরু সম্বোধনে যা দেয়ার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে মহরানা। অন্য কিছু নয়। কেননা এ ধরনের কথা বিশেষভাবে মহরানা সম্পর্কেই বলা যেতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, এটা হওয়া নিষিদ্ধ নয় যে, সম্বোধনের প্রথম দিকে সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ নামটি যতটা শামিল করে, তা সবই তার মধ্যে গণ্য। আর তার ওপর যা সংযোজিত হয়েছে, তা বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক হবে। তাতে প্রথম ব্যবহৃত শব্দের বিশেষ অর্থবোধক হওয়া জরুরী হয় না। বিভিন্ন স্থানে আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এসেছি। এ আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগ যদি হয়ে থাকে এবং তারপর তালাক সেই স্ত্রীর দিক থেকেই ঘটে কোন অপরাধের কারণে কিংবা কোন অপরাধ ছাড়া, তার প্রাপ্য মহরানা তাকে অবশ্যই দিতে হবে, তা বাতিল হয়ে যাবে না স্ত্রীর দিক দিয়ে তালাক সঙ্ঘটিত হলেও। আর আল্লাহ্ যে বিশেষভাবে স্ত্রী বদলের অবস্থার উল্লেখ করে স্ত্রীকে দেয়া জিনিস থেকে কোন কিছুই ফেরত নিতে নিষেধ করেছেন, তা সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ হওয়াকে শামিল করে। তার ফায়দা হল, লোকদের এ ধারণা দূর করা যে, তা জায়েয হবে যদি স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হাসিল করার পর তালাকের কারণে স্বামীর হক্ প্রত্যাহৃত হয়। দ্বিতীয়টি প্রথমটির স্থানে দাঁড়িয়ে গেছে! অতএব স্ত্রীকে যে

মহরানা দিয়ে দেয়া হয়েছে, তা তো অবশ্যই। তাই এ অবস্থায়ও ফিরিয়ে নেয়ার নিষেধ কার্যকর থাকবে এবং তা সর্বাবস্থায়ই সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত হবে। কেননা স্ত্রীকে যা দিয়েছে তার কোন জিনিসই ফিরিয়ে নেয়া মুবাহ হতে পারে না, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ওপর স্বামীর হক্ শেষ হয়ে গেলেও নয়। তখন তো আরও বেশি করে তা ফেরত না নেয়া বাঞ্ছনীয়, স্ত্রীর যৌনাঙ্গ মুবাহ হওয়া স্বামীর হক অবশিষ্ট থাকা এবং তার ওপর তার নিজের তুলনায় স্বামীর মালিকত্ব অধিক হওয়া সত্ত্বেও।

স্বামীর স্ত্রীকে দেয়া কোন জিনিস ফেরত নেয়া নিষিদ্ধ হওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা অধিক তাগিদ করেছেন এভাবে যে, তিনি এ ফেরত নেয়াকে জুলুম বলেছেন। যেমন 'বুহ্তান'— মিথ্যা দোষারোপ। তা এমন মিথ্যা যা তার খবরদাতার ওপর আরোপিত হয়। যাকে তা বলা হবে, সে তদ্দ্বারা বড়ত্বের ভান করবে। এটা বরং মিথ্যার চাইতেও অধিক জঘন্য ও সাংঘাতিক লজ্জাকর। তাই স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে, তা ফেরত নেয়াকে 'বুহ্তান' সদৃশ বলা হয়েছে জঘন্যতার দিক দিয়ে। সেই কারণে কুরআনে তাকে বলা হয়েছে 'বুহ্তান' ও ইস্ম— মিথ্যা দোষারোপ ও পাপ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا -

এবং তোমরা তা কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পার, অথচ তোমাদের পরস্পর যৌন মিলন সঙ্ঘটিত হয়েছে এবং তার দরুন স্ত্রীরা তোমাদের নিকট থেকে শক্ত-দুশ্ছেদ্য চুক্তি নিয়ে নিয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ ফররা উল্লেখ করেছেন اَلْاِفْضَاءُ শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিবিড় নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়াকে, যদিও ঠিক যৌন মিলন ও সম্ভোগ না-ও হয়। আভিধানিক অর্থহানির জন্যে ফররার কথাই অকাট্য দলীল। اَلْاِفْضَاءُ বলতে যখন নিবিড়-নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া বোঝায়, তখন বোঝা গেল, এ নিবিড় নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া ও তার পরে তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার পর স্ত্রীকে দেয়া জিনিস ফেরত নেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এ আয়াত। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ 'যদি তোমরা স্ত্রী বদল করতে— একজনকে তালাক দিয়ে আর একজনকে গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক' বিচ্ছেদ ও তালাক বুঝিয়েছে। আর اَلْاِفْضَاءُ - اَلْفَضَاءُ থেকে গৃহীত। তা বোঝায় এমন স্থান, যেখানে তাতে অবস্থিত কোন জিনিস ধরার পথে প্রতিবন্ধক নেই। স্ত্রীর সাথে নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়াকে এজন্যেই اِفْضَاءُ বলা হয়েছে। কেননা সেখানে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ঘটানোর পথে কোন বাধা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, اَلْفَضَاءُ অর্থ প্রশস্ততা, আর এই প্রশস্ততার মধ্যে অবস্থান গ্রহণকে বলা হয় اَفْضَى —যা চাইবে তা করাই সেখানে সম্ভব। শব্দের এ সংগঠনের দরুন নিবিড়-নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়াকেও اِفْضَاءُ বলা খুবই সঙ্গত। কেননা সেখানে স্বামী স্ত্রীর সাথে যৌন-সঙ্গমের নির্বিঘ্ন সুযোগ ও প্রশস্ততা পেয়ে থাকে। অথচ স্ত্রীর নিকট পৌঁছাই এর

পূর্বে অনেক কষ্টসাধ্য ছিল পরিবেশ অনুকূল না হওয়ার কারণে। এ কারণে নিবিড় নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া خلوة। কে افضاء বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নিবিড় নির্ভৃতে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রীকে দেয়া কোন জিনিসই ফেরত নেয়া কোন ক্রমেই জায়েয নয়। এ নিভৃতে মিলিত হওয়ার অর্থ স্ত্রী-সঙ্গম হওয়ার অবস্থায় পৌছা, যেখানে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পিত করতে এবং স্বামীর জন্যে তার নিকট পৌছার সুযোগ করে দিতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই আয়াতটি স্ত্রীকে স্বামীর দেয়া কোন জিনিস ফেরত নিতে নিষেধ করেছে— বিশেষ করে বিদ্রোহটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়। কেননা আল্লাহ্র কথা 'তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক' প্রমাণ করে যে, স্বামী-ই এখানে বিচ্ছেদ ঘটানোর উদ্যোক্তা, স্ত্রী নয়। এ কারণে হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ বিদ্রোহটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে স্ত্রীকে দেয়া মহরানা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া মাকরূহ— অপছন্দনীয় কাজ। আর যদি বিদ্রোহটা স্ত্রীর দিক থেকে হয়, তাহলে তা স্বামীর জন্যে জায়েয। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ -

এবং তোমরা স্ত্রীদের দেয়া জিনিস থেকে কিছু অংশ নিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক করে রাখবে না। তবে স্ত্রীরাই যদি কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা .....।

ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আয়াতে الفاحشة অর্থ বিদ্রোহ। অন্যরা বলেছেন, এর অর্থ 'যিনা'। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ.... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ -

তোমরা যদি ভয় পাও এজন্যে যে, তারা দুজন— স্বামী-স্ত্রী— আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে তাদের দুজনার কোন দোষ হবে না স্ত্রী যে বিনিময় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করবে তাতে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২২৯)

কোন কোন লোক আবার বলেছেন, এ আয়াতটি মনসূখ হয়েছে এ আয়াত দ্বারা ঃ যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে থাক, তাহলে .....

কিন্তু এ কথা ভুল। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যদি একজন স্ত্রীর স্থানে বদল করে আর একজন স্ত্রী নিয়ে নিবার ইচ্ছা করে থাক' থেকে স্বামীর দিক থেকে বিদ্রোহ হওয়া বোঝায়। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'তারা দুজন আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করবে না বলে যদি তোমরা ভয় বোধ কর' অপর একটি অবস্থার কথা বোঝায়, প্রথম অবস্থায় বোঝায় না। আর সে অবস্থাটা হচ্ছে স্ত্রীর দিক থেকে বিদ্রোহ হওয়ার অবস্থা। এজন্যেই স্ত্রীর বিনিময় মূল্য দেয়ার কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ অবস্থাটা ওটা থেকে ভিন্ন। আর এ দুটি অবস্থার প্রত্যেকটিই এক-একটা হুকুমের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। অন্যটি সেখানে নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا -

এবং স্ত্রীরা তোমাদের নিকট থেকে অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ় চুক্তি নিয়ে নিয়েছে।

আল-হাসান, ইবনে সীরীন, কাতাদাতা, দহাক ও সুদ্দী বলেছেন, তা হচ্ছে ঃ

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -

অতঃপর হয় ভালোভাবে রেখে দেবে, না হয় দয়া সহকারে ছেড়ে দেবে।

(সূরা বাকারাহ ঃ ২২৯)

কাতাদাহ বলেছেন, ইসলামের শুরুতে বিবাহকারীকে বলা হতো ঃ আল্লাহ তোমার ওপর এই কর্তব্য চাপিয়ে দিয়েছেন যে, 'হয় ভালভাবে রাখবে, না হয় দয়া সহকারে ছেড়ে দেবে।' মুজাহিদ বলেছেন, বিয়ের যে বাক্য দ্বারা স্বামীর জন্যে স্ত্রী-অঙ্গ হালাল হয়, তার কথাই বলা হয়েছে, অন্যরা বলেছেন তা হচ্ছে নবী করীম (স) এর কথা ঃ

اِنَّمَا اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

বিয়ে আর কিছু নয়, তা হল– তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত স্বরূপ গ্রহণ করে থাক এবং আল্লাহ তা'আলার কালেমার দ্বারাই তোমরা স্ত্রীদের যৌন-অঙ্গ হালাল করে নিয়ে থাক।

মুহাররম মেয়েলোক

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -

তোমাদের পিতা-দাদার বিয়ে করা মেয়েলোকদেরকে তোমরা বিয়ে করবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আবূ উমর– সালবের গোলাম– আমাদেরকে জানিয়েছেন, বলেছেন সালবের সূত্রে কুফীদের থেকে এবং আল-মুবরাদের মাধ্যমে বসরাবাসীদের থেকে আমরা যেন জ্ঞান লাভ করেছি, তা হল, النكاح বিবাহ-এর আভিধানিক অর্থে দুটি জিনিসকে একত্রিতকরণ বোঝায়। আরবরা বলে ঃ

اَنْكَحْنَا الْفَرَا فَسَنَرٰى هُوَ مِثْلَ ضَرَبُوْهُ لِلْاَمْرِ يَتَشَاوَرُوْ فِيْهِ -

ফরা আমাদেরকে বিবাহ করিয়েছে। ফলে আমরা শীঘ্রই এমন দৃষ্টান্ত দেখব, যার দৃষ্টান্ত তারা এমন ব্যাপারে জন্যে দিয়েছে, যার জন্যে তারা পরস্পর পরামর্শ করে এবং যে জন্যে তারা একত্রিত হয়। পরে দেখে, কোন জিনিস থেকে তার তাৎপর্য উৎসারিত হয়, আমরা পুরুষ গাধা ও স্ত্রী গাধাকে একত্রিত করে দিয়েছি।

আবূ বকর বলেছেন, প্রকৃত অভিধানে বিয়ের নামটি দুটি জিনিসকে একত্রিতকরণ বুঝবার জন্যে তৈরী হয়েছে। পরে আমরা তার ব্যবহার এরূপ পেয়েছি যে, লোকেরা মূল যৌন-সঙ্গমকেই 'নিকাহ' নামে অভিহিত করেছে, যাতে আকদ্ নেই। আল-আশা বলেছেন ঃ

বিবাহিতা, কিন্তু মহরানা দেয়া এবং অন্য একটি, তাকে বলা হয় ফাদেহ।

অর্থাৎ মহরানা না দিয়ে যার সাথে সঙ্গম করা হয়, সেই দাসীকে, বহু স্বামীহীনা মেয়েলোককে আমার তীরগুলো বিবাহিতা করেছে। আর অপর মেয়েলোক, চাচা মামার ওপর দুঃখ প্রকাশ করে।

অপর একজনের কথা ঃ

তারা বিয়ে করেছে পূর্বে অবিবাহিত যুবককে। অথচ ওরা নিয়ামত প্রাপ্ত। ওরা খুব তাড়াহুড়া করেছে, অথচ ওরা-আন্‌কোরা, ওদের খতনা হয়নি।

এ সব কথায়ও যৌন সঙ্গমের কথাই বলা হয়েছে। 'নিকাহ' শব্দের অর্থে যৌন সঙ্গম হওয়ায় কারোর দিক থেকে কোন নিষেধ নেই। অবশ্য তাতে আক্‌দও শামিল রয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ -

তোমরা যখন ঈমানদার মেয়েলোককে বিবাহ কর। পরে তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে দাও ...... (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৭)

এখানে 'নিকাহ' অর্থ বিয়ের আক্‌দ করা, স্ত্রী সঙ্গম নয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَنَا مِنْ نِكَاحٍ وَلَسْتُ مِنْ سِفَاحٍ -

আমি একজন বিবাহকারী, স্বেচ্ছাচারী যিনাকার নই।

এ কথাটি দ্বারা দুটি তাৎপর্য জানা যায়। একটি নিকাহ্ এমন বিয়ের নাম, যা আক্‌দ-এর ভিত্তিতে সঙ্ঘটিত হয়। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য, এ শব্দটি আক্‌দ ছাড়া যৌন সঙ্গমকেও শামিল করে। তা যদি না হতো, তা হলে রাসূলের কথা শুধু 'আমি বিবাহকারী' বলাই যথেষ্ট ছিল। কেননা 'উচ্ছৃঙ্খল যিনা' নিকাহ্ অর্থ শামিল করে না কোন অবস্থায়ই। বোঝা গেল, প্রথমে বিবাহের কথা বলে তার পরে উচ্ছৃঙ্খল যিনাকারী না হওয়ার কথা বলায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিবাহ— নিকাহ— শব্দটি দুটি ব্যাপারকেই বোঝায়। এ কারণে রাসূলের উক্ত কথাটির তাৎপর্য দাঁড়াল, তিনি 'হালাল আক্‌দকারী' সেই বিবাহে তিনি নেই, যাতে সিফাহ্ বা উচ্ছৃঙ্খল যিনা রয়েছে। এখানে যা বলা হল, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, নিকাহ্ নামটি 'আক্‌দ' ও যৌন সঙ্গম— দুটি ব্যাপারই বোঝায়। আর যে আভিধানিক তাৎপর্যের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি, তা হল, তা দুটি জিনিসকে একত্রিতকরণের নাম। এ একত্রিতকরণ যৌন সঙ্গম দ্বারাই হতে পারে বিয়ের আক্‌দ ছাড়াও। কেননা 'আক্‌দ' হলেই কার্যত দুটি জিনিস একত্রিত হয়ে যায় না। কেননা এ কথাটি একসাথে দুজনের থেকেই হয়ে থাকে, যা শুধু কথার মধ্যে সীমিত, কার্যত ও প্রকৃত একত্রিতকরণ হয় না। বোঝা গেল, নিকাহ্-এর প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থ যৌন

সঙ্গম, আর পরোক্ষ অর্থ, আক্‌দ। তবে শুধু আকদকেও 'নিকাহ' বলা হয়, কেননা তা এমন কারণ, যার দরুন যৌন সঙ্গম পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয়। এটাকে বলা হয়, অন্য একটির নামে কোন জিনিসের নামকরণ, যা কোন কারণে হয় অথবা হয় তার পার্শ্ববর্তী হওয়ার দরুন। যেমন সদ্যপ্রসূত বাচ্চা মাথায় করে যে চুল নিয়ে আসে, তাকেই আকীকা বলা হয়। পরে তা কামিয়ে ফেলার সময় যে ছাগী যবেহ করা হয়, তার নাম রাখা হয়েছে 'আকীকা'। যেমন الراوية নাম হচ্ছে সেই উটের, যা পাথেয় বহন করে। পরে সেই পাথেয়কেই الراوية বলা হতে থাকে উট বাহিত পাথেয়কে। কেননা তা ওরই সাথে মিলিত ও জড়িত, তা তারই নিকটবর্তী। আবুন-নজম বলেছেন ঃ

تَمْسِي مِنَ الرِّدَّةِ مَشْيَ الْحُفَّلِ - مَشْيَ الرَّوَايَا بِالْمَزَادِ الْأَثْقَلِ -

এর আর একটি উপমা যেমন الغائط শব্দটি। এটি নাম হল জমিনের নিশ্চিন্ততাপূর্ণ স্থানের। পরে পরোক্ষ অর্থে মানুষের ত্যাগ করা মল ও প্রস্রাবকে বোঝাতে থাকে।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে— হাজত পূরণের জন্যে লোকেরা উক্ত ধরনে স্থানে যায়। এভাবে এরূপ নামকরণের অনেক দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় রয়েছে। 'নিকাহ' শব্দটিও প্রকৃতপক্ষে ও প্রত্যক্ষভাবে যৌন সঙ্গম অর্থ দেয়। মূল অভিধানে শব্দটি এজন্যেই গঠিত। আর পরোক্ষ অর্থে তা 'আক্‌দ' এর নাম। কেননা এ 'আক্‌দ' দ্বারাই তো যৌন সঙ্গম কাজটি সম্ভব হয়। 'আক্‌দ' হল যৌন সঙ্গমের কারণ। 'আকদ'-এর এ পরোক্ষ নামকরণে বোঝা যায় ক্রয়-বিক্রয়, হেবা ইত্যাদি যাবতীয় কাজকে বোঝাবার জন্যে কখনই নিকাহ শব্দের ব্যবহার হয় না। যদিও এ আক্‌দই মাধ্যম হয় দাসীর সাথে যৌন সঙ্গম মুবাহ হওয়ার জন্যে। কেননা যৌন সঙ্গম মুবাহ হওয়ার জন্যে এ 'আক্‌দ' বিশেষ অর্থজ্ঞাপক নয়। কেননা এসব চুক্তি তার ব্যাপারেও হতে পারে, যার সাথে যৌন সঙ্গম হারাম। যেমন দুই বোন, বংশের বোন, স্ত্রীর মা প্রভৃতি। যে আক্‌দ যৌন সঙ্গম মুবাহ হওয়ার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত, তার নাম নিকাহ। কেননা যার সাথে যৌন সঙ্গম হালাল নয়, তার সাথে 'নিকাহ' সহীহ্ নয়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'নিকাহ' প্রকৃত যৌন সঙ্গমের নাম আর পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয় আক্‌দ বোঝাবার জন্যে। আমরা এই যে ব্যাখ্যা দিলাম, এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَاتَنْكِحُوا مَانَكَحَ اٰبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 'তোমার বাপ-দাদা যে মেয়েলোককে বিবাহ করেছে, তোমরা তাকে বিবাহ্ করবে না— কে যৌন সঙ্গম অর্থে ব্যবহার করতে হবে। তার ফলে পিতা যে মেয়েলোকের সাথে সঙ্গম করেছে, তার সাথে যৌন সঙ্গম করা হারাম প্রমাণিত হল। কেননা যখন প্রমাণিত হল যে, 'নিকাহ্' যৌন সঙ্গমকে বলা হয়, তখন তার মধ্যে যা মুবাহ তাই বিশেষভাবে বোঝায় না, নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গমও বোঝায়। যেমন মারা— আঘাত করা, হত্যা করা, স্বয়ং যৌন সঙ্গম ব্যবহারকালে তা কেবল মুবাহ আঘাত, মুবাহ হত্যা ও মুবাহ যৌন সঙ্গমই বোঝাবে না। বরং তা দুটো ব্যাপারকেই বোঝাবে, যতক্ষণ কোন দলীল দ্বারা তার বিশেষীকরণ প্রমাণিত না হবে।

আবুল হাসান বলতেন, আল্লাহ্‌র কথা مانكح اباءكم যা নিকাহ করেছে তোমাদের বাপ-দাদা'— এর অর্থ যৌন সঙ্গম করা আক্‌দ নয়। এটা শব্দের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ ও শব্দ বলে 'আকদ' বোঝাতে চাওয়া হয়নি। কেননা একটি শব্দের একটা অর্থ প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ—

একই অবস্থায় সেই শব্দের পরোক্ষ ও অপ্রকৃত অর্থ হওয়া সম্ভব নয়। তবে পিতার সঙ্গমকৃতা মেয়েলোকের সাথে বিয়ের আক্‌দ করাও হারাম এ আয়াত ভিন্ন অপর একটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

মা ও মেয়ে যৌন সঙ্গমে একত্রিত করা হারাম হওয়া সম্পর্কে মনীষিগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সাঈদ ইবনে আবূ আরুবা, কাতাদাতা, আল-হাসান ইমরান ইবনে হুসায়ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর মার সাথে যিনা করে, তাহলে তার স্ত্রী তার প্রতি হারাম হয়ে যাবে। আল-হাসান ও কাতাদাতাও এমত প্রকাশ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, মুজাহিদ, আতা, ইবরাহীম, আমের, হাম্মাদ, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, সওরী ও আওজায়ী প্রমুখেরও এ মত। কন্যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে— তার মার সাথে যৌন সঙ্গম তার কন্যার সাথে বিবাহ হওয়ার আগে হয়েছে কি পরে হয়েছের তার মধ্যে তাঁরা কোন পার্থক্য করেন নি।

ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মা'র সাথে যিনা করল নিজ স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম সঙ্ঘটিত হওয়ার পর, সে দুটি হারাম কাজ একসাথে করেছে।[১] তাতে তার নিজের বিবাহিতা স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে না তার জন্যে। তাঁর থেকে পাওয়া অপর একটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন ঃ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ -

হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না।

ইমাম আল-আওজায়ী উল্লেখ করেছেন আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাসের এ হারাম কাজ 'হালালকে হারাম করে না' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে ঃ এক ব্যক্তি যদি কোন মেয়েলোকের সাথে যিনা করে, তাহলে এ যিনার কারণে সে মেয়েলোকটি পুরুষটির জন্যে হারাম হয়ে যাবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইবনে আব্বাসের এই যে কথাটি ইকরামা বর্ণনা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'মা'র সাথে যিনা তার কন্যাকে হারাম করে না'— তা আতার মত-সম্মত ছিল না। কেননা তা যদি তার নিকট প্রমাণিত কথা হতো, তাহলে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিত না। জুহরী, রবীআতা, মালিক, লায়স ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ যিনার কারণে মেয়েটি এবং তার মা কেউ-ই হারাম হয়ে যাবে না। উসমান আলবত্তী বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মার সাথে যিনা করল, সে পর্যায়ের কথা হল হারাম হালালকে হারাম করে না। কিন্তু যদি মার সাথে যিনা করে তার কন্যাকে বিয়ে করার পূর্বে কিংবা কন্যার সাথে যিনা করল তার মাকে বিয়ে করার পূর্বে তাহলে সে হারাম হয়ে যাবে। এই মতে বিয়ের পূর্বে ও পরে স্ত্রীর মার সাথে যিনার হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে লাওয়াতাত করল। তাতে কোন একজনের মা অপর জনের জন্যে হারাম হয়ে যাবে? ..... এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হানাফী

১. একটি হারাম কাজ— যিনা। আর অন্যটি নিজ স্ত্রীর মার সাথে যিনা।

ফিকাহবিদগণ বলেছেন, না, তা হারাম হয়ে যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন বলেছেন, এটাও একটি মেয়েলোকের সাথে যিনা করার মতই তার মা ও কন্যার হারাম হওয়ার দিক দিয়ে। বলেছেন, যিনার কারণে যে মেয়েলোক হারাম হল, লাওয়াতাতের দ্বারাও সে মেয়েলোক হারাম হবে। ইবরাহীম ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এক ব্যক্তি কোন এক বালকের সাথে খেলা করে— সে কি তার মাকে বিয়ে করতে পারে? তিনি জাবাবে বললেন, না এবং বলেছেন, আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, এ ব্যক্তির এমন একটি মেয়েলোককে বিয়ে করা মকরুহ, যার পুত্রের সাথে সে খেলা করেছে। দুইজন বালক— যারা একজন অপরজনের সাথে লাওয়াতাত করেছে— তাদের একজনের— যার সাথে লওয়াতাত করেছে তার কন্যা সন্তান জন্মিলে ক্রিয়াকারী তাকে বিবাহ করতে পারবে না— ইমাম আওজায়ী মত দিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের পিতা যে মেয়েলোককে বিয়ে করেছে, তোমরা তাকে বিয়ে করবে না' সেই স্ত্রীলোক বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছে তার জন্যে যার পিতা সেই মেয়েলোকটির সাথে যিনার সঙ্গম করেছে। কেননা 'নিকাহ' শব্দটি তার প্রকৃত অর্থেই এ তাৎপর্য বহন করে। অতএব তার এ অর্থ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। পিতার সঙ্গম সম্পর্কে যখন এ কথা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন স্ত্রীর মা কিংবা তার কন্যার সাথে যিনার সঙ্গম হলেও স্ত্রী অনুরূপভাবে হারাম হয়ে যাবে। কেননা এ দুটি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য কেউ করেনি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَرَبَآ ئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِّسَآ ئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -

তোমাদের ক্রোড়ে পালিতা তোমাদের সঙ্গমকৃতা স্ত্রীদের কন্যাও হারাম।

উক্ত কথাকেই সত্য প্রমাণ করে। আয়াতে الدخول শব্দটি যৌন সঙ্গম বোঝায়। তা সর্ব প্রকারের যৌন সঙ্গম পরিব্যাপ্ত, তা মুবাহ হোক কি নিষিদ্ধ। নিকাহ হোক কি সিফাহ-উচ্ছৃঙ্খল যিনা। অতএব কন্যা হারাম হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তা তার মাকে বিয়ে করার আগে হোক— কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ اللاتى دخلتم যাদের সাথে তোমরা যৌন সঙ্গম করেছ। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এই دخول অর্থ যৌন সঙ্গম। আর আয়াতের তা-ই মূল বক্তব্য। دخول নামটি বিয়ে করার পরে করা সঙ্গমই কেবল বোঝায় না বিশেষভাবে, অন্য ধরনের সঙ্গম থেকে আলাদা করে। যেমন কেউ যদি কারোর মার সাথে সঙ্গম করে সে তার ক্রীতদাসী বলে, তা হলেও এই মার কন্যা তার জন্যে চিরন্তনভাবে হারাম হয়ে যাবে। আয়াতের এটাই সিদ্ধান্ত। তেমনি যদি কোন মেয়ের সাথে অসহীহ্ বিবাহের (نكاح فاسد) ভিত্তিতে সঙ্গম করে, তাহলেও সে কারণে তার কন্যা তার জন্যে হারাম হবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, الدخول বলতে যৌন সঙ্গম বোঝায় তা কোনরূপ বিয়ের পরে হোক কিংবা অন্য কোনভাবে, সর্বক্ষেত্রেই এ হুকুম কার্যকর হবে, কোন প্রকারের সঙ্গমকে তা বিশেষভাবে বোঝায় না।

একটু চিন্তা করলে এ কথাও প্রমাণিত মনে হবে যে, সঙ্গমই হারামকরণে আক্দ অপেক্ষাও অধিক তাগিদকারী। কেননা কোন মুবাহ সঙ্গমও এমন নেই, যা এ হারামকরণের কারণ হয়ে

না দাঁড়াবে। অথচ সহীহ্ আক্দ কোন মেয়েলোকের সাথে হলে এবং সঙ্গম না হয়ে থাকলে তার মেয়ে শুধু এ আকদ-এর কারণেই হারাম হয়ে যাবে না। কিন্তু যদি সঙ্গম হয়, তাহলে অবশ্য হারাম হবে। ফলে আমরা জানলাম যে, এ হারামকরণে সঙ্গম সজ্ঘটিত হওয়াই মূল 'ইল্লাত' কারণ। তাই তা যে ভাবেই ঘটুক, তা অবশ্যই হারাম করবে। তা মুবাহ্ হিসেবে হোক, কি নিষিদ্ধভাবে। কেননা হারামকরণ যথার্থভাবে সঙ্গম হওয়া ছাড়া অন্য কোন কারণে হয় না। তাই 'নিকাহ' শব্দে এ অর্থ দুটি শরীক। তাছাড়া অবশ্যই হারাম হবে। উপরন্তু সন্দেহক্রমে সঙ্গম হলে বা দাসী হওয়ার কারণে সঙ্গম হোক, দুটোতেই তার কন্যা হারাম হবে, যদি বিয়ের আকদ ছাড়াও তা হয়। মোটকথা, যে ভাবেই ঘটুক, সঙ্গম হলেই হারাম হবে। তাই আরও অধিকভাবে হারাম হবে যদি সঙ্গমটা হারাম যিনা হয়। কেননা সঙ্গমটা যথার্থভাবে ঘটেছে।

যদি বলা হয়, দাসী হওয়ার কারণে ও সন্দেহক্রমে সঙ্গম হয়, তাও হারাম করবে। কেননা এ উভয় দিক দিয়ে সন্তান জন্মিলে বংশধারা প্রমাণিত হবে। কিন্তু যিনার ফলে সন্তান জন্মিলে বংশধারা প্রমাণিত হবে না। অতএব তদ্দরুন কারোরই হারাম হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

জবাবে বলা যাবে, এ ব্যাপারে বংশধারা প্রমাণিত হোক না হোক, হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার কোন প্রভাব নেই। কেননা ছোট বয়সের বালক যে যথার্থভাবে সঙ্গম কার্যে সক্ষম নয়, যদি কোন মেয়েলোকের সাথে সঙ্গম করে, তাহলে সেই মেয়েলোকটির মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। তার সাথে বংশধারা প্রমাণিত হওয়ার তো সম্পর্ক নেই। যদি কেউ কোন মেয়েলোকের সাথে নিকাহ্র আকদ করে, তাহলে যৌন সঙ্গমের আগেও বংশধারা প্রমাণিত হবে। এমন কি স্ত্রী যদি কোন সন্তান কোলে করে নিয়ে আসে অথচ স্বামীর সাথে তার সঙ্গম হয়নি, তবুও। আকদ-এর ছয় মাস পরে হলেও বংশধারা প্রমাণিত হবে। কন্যার হারাম হওয়ার সাথে নিছক আকদ-এর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যখন এ অবস্থাও দেখতে পাচ্ছি যে, সঙ্গম হয়েছে, কিন্তু বংশধারা তা রক্ষা পায়নি, সেই সঙ্গমেও কন্যা হরাম হয়ে যাবে। আকদ হবে, বংশধারা প্রমাণিত হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও কন্যা হারাম হবে না। এ থেকে আমরা জানলাম যে, এ ক্ষেত্রে বংশ প্রমাণিত হওয়ার কোন ভূমিকা নেই। এ ব্যাপারে গণ্য করার মত একটা জিনিস-ই আছে। তা হল শুধু সঙ্গম কার্যটি, অন্য কিছুর নয়।

উপরন্তু তাদের ও আমাদের মাঝে এ বিষয়েও কোন মতপার্থক্য নেই যে, কেউ যদি তার দাসীকে যৌন কামনা সহকারে শুধু স্পর্শ করে, তবে তার জন্যে সেই দাসীর মা ও কন্যা হারাম হয়ে যাবে। অথচ শুধু স্পর্শ করার কোন ভূমিকা নেই বংশধারা প্রমাণের জন্যে। এ কথা প্রমাণ করে যে, হারাম হওয়ার হুকুমটা বংশধারা প্রমাণিত হওয়ার ওপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়। হারাম হওয়ার ব্যাপার ঘটবেই বংশধারা প্রমাণিত হলেও। আর তা সম্ভব হবে বংশধারা প্রমাণিত না হলেও।

এ আলোচনার দ্বারা হানাফী ফিকাহবিদদের মত সহীহ্ প্রমাণিত হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ্ কখনও যিনার ব্যাপারটির ওপর কঠোর আক্রোশ প্রকাশ করছেন, সেজন্যে রজমের শাস্তি সাব্যস্ত করে। আবার কখনও দেখছি, সেজন্যে দোররা বাধ্যতামূলক করেছেন এবং সেজন্যে জাহান্নামের অশুভ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন করছেন এবং তার সাথে বংশধারা সংযুক্ত

করছেন। এসব তাঁর হুকুমের কঠোরতাই প্রমাণ করে। অতএব হারাম হওয়ার আবশ্যিক হয়ে পড়বে অধিক উত্তম ভাবে, কেননা হারামকে বাধ্যতামূলক করণও এক প্রকারের কঠোরতা।

যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান গ্রহণের পূর্বে নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল, তার হজ্জ বাতিল হয়ে গেল বলে আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন, এ যখন সত্য, তখন যিনাকারের হজ্জ যে বাতিল হবে, তা তো আরও অধিক নিশ্চিত। হজ্জ বাতিল হয়ে যাওয়ার ব্যাপার প্রমাণ করে হজ্জের সময় স্ত্রী-সঙ্গম হারাম। অনুরূপভাবে আল্লাহ যখন হুকুম দিয়েছেন, হালাল সঙ্গমের দ্বারা তার (যার সাথে সঙ্গম হয়েছে) মা ও কন্যা হারাম হওয়া একান্তই অনিবার্য, তাই যিনার কারণে এ হারাম হওয়াটা তাঁর হুকুমের কঠোরতাই প্রমাণ করে। ইমাম শাফেয়ী মনে করেছেন, ভুলবশত যে হত্যা করল তার ওপর যখন আল্লাহ্ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব করেছেন, তখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর কাফ্‌ফারা দেয়া আরও বেশিভাবে বাধ্যতামূলক হবে, এটাই স্বাভাবিক। কেননা ইচ্ছাপূর্বক মানুষ হত্যা ভুলবশত হত্যার তুলনায় অধিক মারাত্মক কাজ। এটা অবশ্যই বিবেচ্য। এমনিভাবে এটাও বিবেচ্য যে, যৌন সঙ্গম যিনা হিসেবে হোক, কি অন্যভাবে, হজ্জ, রোযা বিনষ্ট হওয়া ও গোসল ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে মূল হুকুমে কোনই পার্থক্য হয় না। তাই তার দরুন, সেই মেয়েলোকটির মা ও কন্যার তার জন্যে হারাম হওয়ার ব্যাপার পার্থক্যহীন।

যদি বলা হয়, জায়েয সঙ্গম হলে মহরানা দেয়া বাধ্যতামূলক হয়; কিন্তু যিনার সাথে মহরানার কোন সম্পর্ক নেই।

জবাবে বলা যাবে, যিনা হলে রজম কিংবা দোররা বাধ্যতামূলক, তা টাকা-পয়সা দেয়া ওয়াজিব হওয়ার তুলনায় অনেক বেশি কঠোর। আর মাল— টাকা-পয়সা ও দণ্ড দুটিই সঙ্গমের পরেই উপস্থিত হয়। কেননা যখনই দণ্ড ওয়াজিব হবে, তখন আর মহরানার প্রশ্ন উঠবে না। আর যখনই মহরানা দেয়া বাধ্যতামূলক হবে, তখন দণ্ডের কারণ থাকবে না। বোঝা গেল, দুটিই বিকল্প হিসেবে উপস্থিত, একটি অপরটির স্থান দখল করে। দণ্ড যখন বাধ্যতামূলক হবে, তা-ই স্থলাভিষিক্ত হবে টাকা-পয়সার, যা সঙ্গমের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এদিক দিয়ে দুটির মধ্যে পার্থক্য নেই। এ পর্যায়ে কেউ একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারে। হাদীসটি আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনুল লায়সুজজরী, ইসহাক ইবনে বহ্‌লুল, আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' আল-মাদানী আল মুগলীরা ইবনে ইসমাইল ইবনে আইয়ূব ইবনে সালমাতাজ্ জুহরী— ইবনে শিহাবুজ জুহরী-উরওয়াতা, আয়েশাতা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ এক ব্যক্তি কোন মেয়েলোকের পেছনে হারাম ভাবে চলে। সে কি সেই মেয়েটির মাকে বিয়ে করতে পারে ? কিংবা মার পিছু বলে, সেই ব্যক্তি কি তার কন্যাকে বিয়ে করতে পারে? জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ

لَايُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ اِنَّمَا يُحَرِّمُ مَاكَانَ بِنِكَاحٍ -

হারাম হালালকে হারাম করে না। হারাম করে তা, যা বিয়ের মাধ্যমে হয়।

এ হাদীসটিও দলীল হিসেবে কেউ পেশ করতে পারে, যা ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদুল ফুরুভী

আবদুল্লাহ ইবনে উমর নাফে ইবনে উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ -

হারাম হালালকে হারাম করে না।

উমর ইবনে হিফ্স উসমান ইবনে আবদুর রহমান, জুহরী, উরওয়াতা, আয়েশাতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ -

হারাম হালালকে বিনষ্ট করে না।

কিন্তু হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানীদের নিকট এসব বর্ণনাই সম্পূর্ণ বাতিল, গ্রহণ-অযোগ্য। এসব হাদীসের বর্ণনাকারীরা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মুগীরা ইবনে ইসমাঈলের নাম বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল। কিন্তু সে অজ্ঞাত পরিচয় (مجهول) ব্যক্তি। সে কারুরই পরিচিত নয়। তার বর্ণনার ভিত্তিতে শরীয়াতের হুকুম প্রমাণিত হতে পারে না। তেমনি উমর ইবনে হাফসও অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। এদের বর্ণনা যদি সহীহ্ প্রমাণিত হয়, তবু তদ্দারা বিরোধী পক্ষের মত প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা প্রথমোক্ত হাদীসটিতে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি একটি মেয়েলোকের পেছনে চলে। কিন্তু তার সাথে তার সঙ্গম হওয়ার উল্লেখ নেই। তাই রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ لَايُحَرِّمُ الا مَاكَانَ بِنِكَاحٍ বিয়ের দরুন যা হয়, তা ছাড়া হালালকে কেউ হারাম করে নাই— নারীর পেছনে চলা সংক্রান্ত সব প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট জবাবে। তা এভাবে হয় যে, পুরুষটি নিজে থেকে মেয়েলোকটির পেছনে চলে। তাতে বড়জোর তাকে সে দেখে কিংবা তাকে সে সঙ্গমের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইতে পারে। কিন্তু তাতে সঙ্গম হয়েছে এমন প্রমাণ তো কিছুই নেই। তাই নবী করীম (স) জানিয়েছেন যে, এ ধরনের কাজের ফলে কারুর হারাম হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তাই যতক্ষণ বিয়ের আকদ না হচ্ছে, ততক্ষণ মেয়লোকটির মা বা কন্যার হারাম হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে না। আর তাতে সঙ্গম হওয়ারও উল্লেখ নেই। রাসূল (স)-এর কথাঃ 'হারাম হালালকে হারাম করে না' প্রযোজ্য কেবল মাত্র নারীর পিছু লওয়া— অথচ কোন সঙ্গম সঙ্ঘটিত না হওয়া সংক্রান্ত জবাবের ক্ষেত্রে। ইবনে আমর বর্ণিত হাদীস 'হারাম হালালকে হারাম করে না' সহীহ হলে তা ঠিক উক্ত ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অন্যত্র নয়। নারীর ওপর নজর দেয়া এবং তাকে সঙ্গমে রাজী করানোর চেষ্টা— অথচ সঙ্গম না হওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নেরই জবাব মাত্র। আর তা শুধু সন্দেহ দূরকরণ। নারীকে শুধু দেখলেই তার কারণে কেউ হারাম হয় কিনা এ সন্দেহ দূর করা হয়েছে সে জবাব দিয়ে যে, না, তাতে হারাম হয় না। যেমন রাসূল (স)-এর কথা ঃ

زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَاالرِّجْلَيْنِ الْمَشْىُ -

দুই চোখের যিনা নারীর ওপর নজর দেয়া এবং দুই পা'র যিনা হচ্ছে নারীর দিকে চলা।

এ হাদীসের আলোকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, শুধু দেখা-ই কাউকে হারাম করে, যেমন হারাম করে সঙ্গম কার্য। কেননা রাসূলে করীম (স) শুধু দেখাকেও যিনা বলেছেন। এ

সন্দেহের অপনোদনের জন্যে রাসূল (স) উক্ত হাদীসে জানিয়েছেন যে— না, তা কোন কিছুকে হারাম করে না। যদি ছোঁয়া ছুঁয়ি— ধরা-ধরি না হয়, তাহলে হারামকরণ সম্পর্কিত হবে বিয়ের আক্‌দকরণের সাথে। হাদীসের এই প্রয়োগের সম্ভাবনা যখন আছে, তখন তার দ্বারা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। সেই সাথে ফিকাহবিদগণ একমত এই ব্যাপারে যে, হারামকরণটা কেবল 'নিকাহ' হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সীমাবদ্ধ নয় কেবল জায়েয সঙ্গমের মধ্যেও। কেননা কেউ যদি তার দাসীর সাথে সঙ্গম করে তার হায়য অবস্থায়, এ সঙ্গম বিয়ে ছাড়াও হারাম। তাতেও কেউ হারাম হতে পারে। তাই হারামকরণ কেবল 'নিকাহ' হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়াটা বাতিল হয়ে গেল। মুবাহ সঙ্গমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়াও বাতিল হয়ে গেল। এ-ও সর্বসম্মত কথা। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন দাসীর সাথে সঙ্গম করে এবং সে বা অপর কেউ বলে যে, সে একজন মজুসী— অগ্নিপূজক, এ সঙ্গম বিবাহ ছাড়া-ই হয়েছে এবং হারাম হয়েছে, তাও তার মা কিংবা কন্যাকে সঙ্গমকারীর জন্যে হারাম করে দেবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস যদি সহীহ্-ও হয়, তাহলে তা সঙ্গম করে এবং সে বা অপর কেউ বলে যে, সে একজন মজুসী-অগ্নিপূজক, এ সঙ্গম বিবাহ ছাড়া-ই হয়েছে এবং হারাম হয়েছে, তাও মার মা কিংবা কন্যাকে সঙ্গমকারীর জন্যে হারাম করে দেবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস যদি সহীহ্-ও হয়, তাহলে তা সঙ্গম দ্বারা হারাম না হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ ও ব্যাপক নয়। যে লোক তার স্ত্রীর সাথে জিহার (ظهار) করবে, এ জিহার দ্বারা তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তাকে অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথা বলে অভিহিত করেছেন। আর এ কথাও তার সাথে সঙ্গম হারাম হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। কেননা রাসূলের 'হারাম হালালকে হারাম করে না' কথাটিকে দলীল হিসেবে পেশ করা এখানে সহীহ্ হয় না। কেননা তা সহীহ্‌র দিক দিয়ে সাধারণত নিঃশর্ত উল্লিখিত হয়েছে। কেননা। কোন দলীল ব্যতীত হারামকরণ বা হালালকরণ বাধ্যতামূলক হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। তার দুটি দিক। একটি হারাম ও হালাল আল্লাহ্‌র হুকুমে কার্যকর। তিনি যা হারাম করেছেন, তা হারাম এবং যা হালাল করেছেন তা হালাল। আমরা প্রকৃত ভাবেই জানি যে, কোন জিনিসের হারাম হওয়া সংক্রান্ত হুকুম এবং অপর কোন জিনিসকে হালালকরণের হুকুম অপর কোন হুকুমের সাথে সম্পর্কিত নয় হারাম বা হালাল বাধ্যতামূলককরণে। তাই এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা হলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না। কেননা আমরা অনুরূপভাবে বলব, আল্লাহ্‌র হারামকরণের হুকুম শুধু হুকুমটার কারণে কোন মুবাহকে হারামকরণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। তবে অন্য কিছুকে হারামকরণের দলীল স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া গেলে সেই দিক দিয়ে শুধু তা হারাম হতে পারে। এর ফায়দা হল আল্লাহ নিজে 'নস' দ্বারা যে জিনিসকে হালাল করেছেন, তা সেই হালালের ওপরই স্থিতিশীল হয়ে থাকবে। আর যখন অপর কোন জিনিসকে হারামকরণের হুকুম হবে, তখন 'কিয়াস' উপায়ে অপর কোন জিনিস দ্বারা হারামকরণের কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তাকে হালালকরণের ওপর কোন আপত্তি তোলা যেতে পারে না। কাজেই কোন মুবাহ কাজকে 'কিয়াস' দ্বার হারামকরণ নিষিদ্ধ হবে— এ কথার দ্বারা এ তত্ত্বও প্রমাণিত হল যে, শুধু 'কিয়াস' দ্বারা কোন হুকুমের মনসূখ হওয়াকে জায়েয মনে করা একটি বাতিল কথা। শব্দ সহীহ্ হলে তার হাকীকত এ জিনিসেরই দাবি করে। আমরা পূর্বে যে দুটি কারণের উল্লেখ করেছি, এ হল তার একটি। আর দ্বিতীয় কারণটি

হল — 'হারাম হালালকে হারাম করে না'— এ কথাটির তাৎপর্য হল, হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না। এ কথাটি বলাই যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে শব্দের মধ্যে অবশ্যই একটি সর্বনাম উহ্য ধরতে হবে, শব্দের প্রকৃত অর্থ গণ্য করা যাবে না। অতএব এ কথাটিকে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে না। তার দুটি কারণ রয়েছে। একটি সর্বনাম উল্লিখিত নয়, তার সাধারণত্ব ও ব্যাপকতাকে গণ্য করতে হবে। তাই তার সাধারণত্ব ও ব্যাপকতাকে যুক্তি বা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবে না। কেননা সর্বনাম উল্লিখিত নয়। ফলে শব্দটির সাধারণত্বের নিচে যেসব নামের জিনিস রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। তাই অনুল্লিখিত সর্বনামের সাধারণত্ব দ্বারা কোন জিনিস প্রমাণ করতে চাওয়া কারুর জন্যেই সহীহ্ হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত্বকে গণ্য করা সহীহ্ হয় না। কেননা মুসলমানরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, হারাম হালালকে হারাম করে অনিবার্যভাবে। তা হল, অ-সহীহ্ ফিকাহর দরুন সঙ্গম এবং হায়য হচ্ছে— এমন দাসীর সাথে সঙ্গম, হয়য ও জিহার অবস্থায় তিন তালাক দেয়া এবং মদ্য যখন পানির সাথে মিশ্রিত হয়, আর মুরতাদ হলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়, তখন স্ত্রী স্বামীর জন্যে হারাম— প্রভৃতি ধরনের কাজ, যা হালালকে হারাম করে দেয়। অতএব নবী করীম (স)-এর 'হারাম হালালকে হারাম করে না' কথাটিতে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে তাতেও সাধারণত্বের ভাবধারা কার্যকর মনে করা সহীহ্ নয়। কথাটি যে ভাবে বলা হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, তার অর্থ কোন কোন হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না, এ কথা বলাই উদ্দেশ্য। তাই তার হুকুম প্রমাণের জন্যে একটি দলীলের প্রয়োজন, যেমন সব মুজমাল শব্দের একটি অর্থ গ্রহণে দলীলের প্রয়োজন। উপরন্তু, নবী করীম (স) যদি কোন 'নস' নিয়ে এসে থাকেন— যেমন তুমি তার একটা সর্বনাম থাকার দাবি করেছ এবং তারপর বলে থাকেন ঃ হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না, তাহলে তুমি যা বলেছ, তা-ই প্রমাণিত হবে। কেননা অনুরূপভাবে আমরা বলে থাকি যে, হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না। তখন তা তার প্রকৃত অর্থে ধরা যাবে। অথচ তার কোন প্রমাণ নেই এ কথার যে, হারাম কাজ সঙ্ঘটিত হওয়া কালে আল্লাহ্ হালালকে হারাম করেন না।

যদি বলা হয়, এর অর্থ হচ্ছে— আল্লাহ্র হারাম কাজের দ্বারা হালালকে হারাম করে না।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, তা হতে পরে তখন, যখন রাসূল (স)-এর কথা 'হারাম হালালকে হারাম করে না'-এর পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হবে। প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। তাই তখন তার হুকুমটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে একটা দলীলের প্রয়োজন দেখা দেবে। কেননা কিছুর প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ দলীল ছাড়া জায়েয হতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, আমাকে একজন লোক বলে ঃ তুমি কেন বল যে, হারাম হালালকে হারাম করে না? আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তোমরা নিকাহ করবে না যাকে তোমার বাবা নিকাহ করেছে এবং বলেছেন ঃ এবং তোমাদের নিজদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও হারাম। আরও বলেছেন ঃ 'তোমাদের স্ত্রীদের মারাও হারাম— যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ' এ আয়াতে নিকাহ দ্বারা যা চিহ্নিত কিংবা যার সাথে সঙ্গম হয়েছে বা নিকাহ হয়েছে তা অন্যকে হারাম করেছে, তা কি তুমি দেখতে পাও না? লোকটি

বলল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন বললাম, তাহলে আল্লাহ হালাল দ্বারা কোন জিনিস হারাম করেছেন— এ কি সম্ভব ? এবং হালালকে হারাম দ্বারা হারাম করেছেন ? অথচ হারাম হচ্ছে হালাল-এর বিপরীত। আর 'নিকাহ' আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দীয় এবং তার ওপর আদেশ হয়েছে এবং যিনা হারাম করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى - اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا -

তোমরা যিনার নিকটেও যাবে না, তা অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ এবং খুবই খারাপ পন্থা (যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার)। (সূরা নবী ইসরাইল ঃ ৩২)

আবূ বকর বলেছেন ইমাম শাফেয়ী নিকাহ-সঙ্গম দ্বারা হারামকরণ সংক্রান্ত আয়াত এবং যিনা হারামকরণের আয়াত পাঠ করেছেন। এ দুটি হুকুম ওদুটির ভিন্নতাপূর্ণ নয়। অর্থাৎ নিকাহ্ ও সঙ্গম মুবাহ হওয়া ও যিনা হারাম হওয়া কোন ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নয়— একটি অপরটির এ-পিঠ ও-পিঠ। মূল আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্নতা প্রমাণকারী কোন দলীলও এখানে নেই। কেননা নিকাহ্ ও সঙ্গম মুবাহ হওয়া এবং এ দুটির দ্বারা অন্য কিছুর হারাম হওয়া এ দুটির মধ্যে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, এ দুটি ছাড়া অন্যভাবে 'তাহরীম' 'হারাম'করণ হয় না। যেমন দাসীর সাথে সঙ্গমের কারণে তাহ্‌রীম বাধ্যতামূলক হওয়াও নিষিদ্ধ হয় না। আর আল্লাহ্ যিনা হারাম করেছেন, একথা বোঝায় না তাছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তাহ্‌রীম হয় না। তাই যিনার সঙ্গমের নিকাহ্ হারাম না হওয়ার কোন কথাই আয়াত দুটির বাহ্যিক পাঠে পাওয়া যায় না। কেননা যিনা সংক্রান্ত আয়াতে যিনাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর যিনা হারামকরণ বোঝায় না যে, নিকাহ হারামকরণে কোন ভূমিকা পালন করে না। নিকাহ্ ও সঙ্গম হারামকরণের দ্বারা সে দুটি ছাড়া অন্য কিছুকে হারাম না করার কথাও বোঝায় না— বিতর্কে পাঠ করা আয়াত দুটিতে তার কোন দলীলও পাওয়া যায় না। তার কথার সত্যতা প্রমাণকারী দলীল সম্পর্কে প্রশ্নকারী জবাব হিসেবেও নয়।

তারপরে বলেছেন, হারাম হালাল-এর বিপরীত। প্রশ্নকারী এ কথা বলার সময় এ দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌ই এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কেননা আল্লাহ 'নিকাহ' পছন্দ করেছেন ও যিনা হারাম করেছেন ফলে আল্লাহ ও-দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন হালালকরণে ও হারামকরণেও। তা প্রশ্নকারীর বিপরীতের দলীল, অথচ প্রশ্নকারীর জন্যে নিকাহ মুবাহ হওয়া ও যিনা হারাম হওয়া কোন মুশকিল ব্যাপার ছিল না। তার প্রশ্ন ছিল, সে যে কথা বলেছে তার ওপর আয়াতের দলীল সম্পর্কে। কিন্তু তিনি দলীলের কারণ বলেন নি, বরং তিনি মশগুল হয়ে পড়েছেন একথা বলায় যে, এটা হারাম, ওটা হালাল। এ প্রশ্নকারী যদি হৃদয়ের অন্ধ হয়ে থাকে, নিকাহ ও যিনার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বুঝতে অক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের প্রশ্নকারীর প্রশ্নের কোন জবাব না দেয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা সে বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। কেননা প্রশ্নকারী বুদ্ধিমান হলে সে নিজেকে মূর্খতার এ স্তরে ঠেলে দিতে পারে না। সে যদি এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারে এ হিসেবে যে, দুটির একটি নিষিদ্ধ, আর অন্যটি মুবাহ। তার প্রশ্ন ছিল এ দুটির মধ্যে পার্থক্যকরণে নিকাহ হারাম হওয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার ক্ষেত্রে এ দুটির একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে। ইমাম

শাফেয়ী প্রশ্নকারীকে সে বিষয়ে জবাব দেন নি। মুবাহ্ ও নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত আয়াত দুটি তিলাওয়াত করা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই করেন নি। আর হালাল হারামের বিপরীত। কেননা হালালের হারাম বিপরীত হওয়ার এমন কিছু নেই, যা হারামকরণ বাধ্যতামূলক করণে সে দুটির একত্রিত হওয়ার প্রতিবন্ধক হতে পারে। লক্ষণীয়, ফাসেদ— অ-সহীহ্ বিবি দ্বারা সঙ্গম করা হারাম, হায়যধারী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হারাম, কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। দুনিয়ার মুসলমান এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। তা হালাল সঙ্গমেরও পরিপন্থী। হারামকরণে এ দুটি সমান ও অভিন্ন। হায়য অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হারাম নিষিদ্ধ। তুহ্রে তালাক দিলে সঙ্গমের পূর্বে দেয়া মুবাহ। হারামকরণ বাধ্যতামূলককরণে এ দুটির সম্পর্ক সমান। এক্ষণে ইমাম শাফেয়ীর মত যদি এই হয় যে, দুই বিপরীতের মধ্যে 'কিয়াস' নিষিদ্ধ, তাহলে একই হুকুমে এ দুটির একত্রিত না হওয়া চিরদিনের জন্যেই বাধ্যতামূলক।

এ কথা তো জানা-ই আছে, শরীয়াতের একই হুকুমে দুই বিপরীতের একত্রিত হওয়া বিধান আছে। এ দুটির পরস্পর বিপরীত হওয়া বহু সংখ্যক হুকুমে সে দুটির একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। সে ধরনের 'নস' আসাও সম্ভব। আর যে বিষয়ে 'নস' আসা সম্ভব, তখন দলীল পাওয়া গেলে 'কিয়াস'-এর সম্ভাব্যতাও অস্বীকার করা যায় না। বিবেক-বুদ্ধিতে যখন তা নিষিদ্ধ নয়, একই হুকুমে দুই বিপরীতের একত্রিত হওয়া শরীয়াতেও নিষিদ্ধ নয়। তাই তাঁর কথা ঃ 'হালাল হারামের বিপরীত' কথাটি এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার কারণ হয়নি— যেমন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন ছিল। তা একথাও প্রমাণ করে যে, তা অ-নিষিদ্ধ, অর্থাৎ নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহ্ নামাযীকে নামাযে চলাচল করতে এবং তাতে বিনা কারণে শুয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন। চলাচল ও শয়ন এক জিনিস নয়, দুটি ভিন্ন ভিন্ন কাজ। অথচ নিষেধে দুটি একত্রিত হয়েছে। তাতে বহুকরণেরও প্রয়োজন নেই। কেননা কেউ তা জায়েয মনে করতে পারে— তা নিষিদ্ধ নয়। তাহলে শাফেয়ীর কথা 'এ দুটি পরস্পর বিপরীত' থেকে এমন কোন তাৎপর্য পাওয়া গেল না, যা দুটির মধ্যে পার্থক্য অনিবার্য করতে পারে। পরে প্রশ্নকারীর এ কথাও উদ্ধৃত করেছেন যে, সে বলেছে ঃ আমি বহু সঙ্গমকারী ও বহু সঙ্গমকারী পাই। তখন একটিকে অপরটির ওপর 'কিয়াস' করি। বলেছেন, আমি বললাম ঃ আমি বহু সঙ্গমকারী পাই যারা হালাল সঙ্গম করে বলে সে জন্যে তারা প্রশংসিত এবং বহু সঙ্গমকারী পাই হারাম পথে। সেজন্যে তারা রজমে নিহত হয়েছে। তুমি কি লক্ষ্য করেছ সে কিভাবে সাদৃশ্য দেখায়? বললে ঃ যার সাথে সাদৃশ্য দেখায়, তাকে এর চেয়েও অধিক স্পষ্ট করে তোলে?

আবূ বকর বলেছেন, প্রশ্নকারী তার জন্যে শাস্তিই নিয়ে এসেছে। সে যে সাদৃশ্য দেখায়, তার বক্তব্য যদি এই হয় যে, সে দুটি বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তাহলে সে বিষয়ে ঝগড়ার কিছু নেই। আর যদি তার বক্তব্য এ হয় যে, তা সাদৃশপূর্ণ নয় এ হিসেবে যে, তাহ্রীম বাধ্যতামূলককরণের দিক দিয়ে দুটিকে একত্রিত করতেই সে চেয়েছে, তাহলে সে এমন কোন দলীল পেশ করেনি, যা সে দুটির মধ্যে এদিক দিয়ে সাদৃশ্যকে অস্বীকার করে। দুনিয়ায় প্রচলিত কিয়াস তো একটি জিনিসের সাথে অপর একটি জিনিসের সাদৃশ্য দেখানো। সে সাদৃশ্য কোন কোন দিক দিয়ে হতে পারে এবং অপর কোন কোন দিক দিয়ে না-ও হতে পারে। যদি দুটি জিনিসের বিচ্ছিন্ন হওয়া এমন দিক দিয়ে হয়, যা দুটির মধ্যে পার্থক্যকে

আবশ্যিক করে— সর্বদিক দিয়ে, তাহলে মৌলিকভাবেই কিয়াস বাতিল প্রমাণিত হয়। কেননা সর্বদিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন জিনিস 'কিয়াস' হওয়া জায়েয নয়। এতে স্পষ্ট হল যে, শাফেয়ী যা প্রশ্নকারীকে বলেছেন এবং প্রশ্নকারী যা মেনে নিয়েছে, তা সর্বশেষ কথা। যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তার অধীন কোন হুকুমে তার কোন অর্থ নেই। পরে প্রশ্নকারী তাঁকে বলেছে, আপনি কি এর চাইতেও বেশি কিছু ব্যাখ্যা দেবেন, আরও স্পষ্ট করবেন ? বলল, হ্যাঁ, যে হালাল একটি নিয়ামত, তাকে তুমি সেই হারামের ওপর কিয়াস করবে, যা নিয়ামত নয়, বরং কঠিন অসন্তুষ্টি ও আযাব ? .... এ কথাটি প্রথম তাৎপর্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র। ..... এতে নিয়ামত ও অসন্তুষ্টি বা আযাবের কথা (نقمة) অতিরিক্ত। অথচ প্রশ্নটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে, প্রশ্নকারীর চাহিদানুযায়ী যেরূপ জবাবে দেয়া আবশ্যক, তা দেয়া হয়নি। এ কিয়াস নিষিদ্ধ হওয়ার দলীলের বিশ্লেষণ করা হয়নি। এ কিয়াস-ই তো এ হারামকে আযাব বানিয়েছে, তা হল হায়য অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম, মজুসী দাসীর সাথে সঙ্গম ও অ-সহীহ্ বিবাহের ফলে সঙ্গম।— এগুলো হালাল পর্যায়ের কাজ— নিয়ামত ছিল। তা তাহ্‌রীম ওয়াজিব করে। ফলে যা বলা হয়েছে তা চূর্ণ হল এবং তার প্রমাণে কোন দলীলও পেশ করা হয়নি। প্রশ্নকারীর এ কথাও বলা হয়েছে, সে বলেছিল, আমাদের সঙ্গী বলেছেন, 'হারাম হালালকে হারাম করে' এ কথা তোমাদেরকে পেয়ে বসবে। বলেছে, আমি বললাম ঃ আমরা যে মেয়েলোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করি, সে ক্ষেত্রে ? বললেন, না, অন্য ক্ষেত্রে, যেমন নামায, পানীয় ও মেয়েলোককে তার ওপর কিয়াস করা। বলল, আমি বললাম ঃ আপনি কি অন্য কারোর জন্যে জায়েয মনে করেন যে, সে সালাতকে কিয়াস বানাবে মেয়েলোকদের উপর ? বললেন, না, কোন জিনিসেই নয়।

আবূ বকর বলেছেন, হারাম হালালকে হারাম করে— এ কথাকে কিয়াস করতে নিষেধ করেছেন মেয়েলোকের ওপর মেয়েলোক ছাড়া অন্যত্র। অথচ শুরুতে তিনি কথাটিকে নিঃশর্ত বলেছিলেন। তিনি যিনাকে মুবাহ্ সঙ্গমের ওপর কিয়াস করা জায়েয বলেন নি। কেননা তা হারাম ও তা হালালের বিপরীত। আর হালাল একটা নিয়ামত। আর হারাম একটা আযাব। এতে কোন কয়েদ নেই, যা বলবে যে, এ গোটা ব্যাপারটি কিয়াস নিষিদ্ধকরণে কেবল মেয়েদের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। তাদের ছাড়া অন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আর তাকে নিঃশর্ত পেশ করা উল্লিখিত পার্থক্যের কারণ। যাতেই সে কারণ পাওয়া যাবে, সেখানেই তা কার্যকর ও চালু হতে পারবে। কিন্তু তা যখন করেনি, তখন কথাটিকে চূর্ণ করল। পরে তাকে বলা যাবে, মেয়েলোক ছাড়া অন্যত্র যখন হারাম হালালকে হারাম করতে পারে, তাহলে তা মেয়েলোকদের ক্ষেত্রে কেন করতে পারবে না ? যদিও তার একটি অপরটির বিপরীত এবং তার একটি নিয়ামত ও অপরটি আযাব, সমুচিত প্রতিশোধ। যেমন দাসী হওয়ার কারণে তার সাথে সঙ্গম বিবাহভিত্তিক সঙ্গমের মতই তাহ্‌রীম বাধ্যতামূলক হওয়ার দিক দিয়ে। অথচ দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব (দাসত্ব) নিকাহ্‌র বিপরীত। লক্ষণীয়, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব ও নিকাহ্ এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।

প্রশ্নকারীর এ কথারও বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে তাঁকে বলেছে, নামায হালাল, তার মধ্যে কথা বলা হারাম— নিষিদ্ধ। যদি কেউ নামাযের মধ্যে কথা বলে, তাহলে তার নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে হালাল হারাম দ্বারা বিনষ্ট হল। বললেন, আমি তাকে বলেছি, তুমি ধারণা

করেছ, যে নামায নামাযের বিনষ্টকারী, সে নামায বিনষ্ট হতে পারে না। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, বিনষ্ট হয়েছে তার কাজটা, নামায নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার নামায আদায় হল না। কেননা তা তুমি সেভাবে আদায় করনি, যেভাবে নামায আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আমি মনে করি না, বিপরীত মতের লোকদের সাথে যারা 'মুনাযিরা' বা বিতর্ক করতে অভ্যস্ত, তাঁরা প্রমাণ পেশ করতে এতটা অপদার্থতার পরিচয় দিতে পারেন যে, শেষ পর্যন্ত এ ধরনের কথার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অথচ প্রশ্নকারী ছিল বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। সে ছিল এক নির্বোধ ব্যক্তি। তা এ কারণে যে, নামাযে এমন জিনিস যা তাকে বাতিল করে— এসে গেলে তা বাতিল হয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। তেমনি নিষিদ্ধ নয় বিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া, যদি তাতে এমন জিনিস এসে যায় যা তাকে বাতিল করে দেয়। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী জিনিস যদি হয়, তাহলে বিনষ্ট হওয়ার কথাটি নামাযের ওপর আরোপ করা যাবে না, যদিও তা তার কারণেই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য লোকেরা সকলেই সেরূপ বলে। কেননা বিপরীত পক্ষ নিকাহ্ সম্পর্কেও এরূপ কথা বলতে কুণ্ঠিত হবে না যে, আমি বলি না তার বিয়েটা নষ্ট ও অ-সহীহ্ হয়ে গেছে। বিবাহ বিনষ্ট হয় না। শুধু তার যিনার কাজটি— তাই বিনষ্টকারী। নিকাহ বিনষ্ট হল না, কিন্তু স্ত্রীটি তার থেকে 'বায়ন' হয়ে গেল। তার স্ত্রীত্বের রজ্জু থেকে বাইরে চলে গেল, বন্ধন মুক্ত হল। এদিক দিয়ে এ দুটি কাজই সমান।

তাকে আরও বলা যাবে, আমি মেনে নিয়েছি তুমি যা দাবি করেছ যে, কথা বলার দরুন যে নামায বাতিল হয়ে গেছে তার উপর ফাসেদ বা বিনষ্ট হওয়া বলা যাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার প্রতি আমার প্রশ্ন তো দাঁড়িয়েই থাকল, তার তো কোন জবাব দেয়া হয়নি এভাবে যে, আমি তোমার নামটা মেনে নিলাম, তা সত্ত্বেও তুমি যা মেনে নিতে অস্বীকার করেছ, তা-ই তোমাকে বলা হবে। তা এই যে, নামাযের মধ্যে যে লোক কথা বলল, সে নামাযের বাইরে চলে গেছে। সে নামায তার হয়নি একথা বলার কারণে। কেননা নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায় কথা বললে তার নামায হয় না। মেয়েলোকটির অবস্থাও তা-ই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই তার 'নিকাহ' অবশিষ্ট থাকবে না তার মার সাথে যিনা করা হলে। যেমন নামায অবশিষ্ট থাকবে না তার মধ্যে কথা বললে। তাই তার স্ত্রী তার থেকে 'বায়ন'— বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তার বিবাহ-বন্ধন থেকে ফসকে বের হয়ে যাবে। যেমন কথা বলার দরুন লোকটি নামায থেকে বাইরে চলে গেছে। এ অবস্থায় ইমাম শাফেয়ীর কর্তব্য হয় যে, তিনি ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কোন কিছুকে ফাসেদ হয়ে গেছে (বা ভেঙ্গে গেছে) বলতে পারবেন না। অন্যান্য চুক্তি সম্পর্কেও এই কথা। তাতে বলা যাবে যে, তা হয়নি, তার দরুন কেউ মালিকত্ব পেতে পারবে না। এ-ই হচ্ছে ভাষা বা বর্ণনাগত নিষেধ। অথচ আমাদের কথা মূলত তাৎপর্য পর্যায়ের, ভাষা বা বর্ণনাগত নয়। শুধু নাম নিয়েও আমাদের বলার কিছুই নেই।

শাফেয়ী তাঁর প্রশ্নকারী সম্পর্কে এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, সে বলেছিল, আমাদের সঙ্গী বলেছে ঃ পানি হালাল, মদ্য হারাম। এ পানি যখন মদের সঙ্গে মেশানো হবে, তখন পানিও হারাম হয়ে যাবে। বোঝা গেল, হারাম হালালকে হারাম করে দিল।

বলেছেন, আমি তাকে বলেছিলাম, তুমিই বিবেচনা কর, তুমি যখন মদের ওপর পানি

ঢাললে, তখন হয় সেই হালাল পানি হারামের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। সে বলেছিল, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, তুমি কি সেই মেয়েলোকটিকে সকল পুরুষের জন্যেই হারাম মনে কর ? যেমন সেই মদ্য সকলের জন্যেই হারাম হয়ে গেছে ? সে বলল, না। আমি বললাম, তুমি কি সেই মেয়েলোকটি ও তার কন্যাকে পরস্পর সংমিশ্রিত পাও, যেমন পানি ও মদ্য পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে গেছে ? বলল, না। বললাম, অল্প পরিমাণ মদ্য যদি বেশি পরিমাণ পানির মধ্যে ফেলা হয়, তখন কি তা 'নাজাস'— নাপাক হয়ে যায় ? বলল, না। বললাম, অল্প মাত্রার যিনা, চুম্বন, লালসার স্পর্শ ইত্যাদি কি তাহরীমের কারণ হয় না, তার বেশি মাত্রা তাহ্‌রীমের কারণ হয়। বলল, না। যদি তাই হয়, তাহলে মেয়েলোকের ব্যাপারেও পানি মদের ব্যাপার এক রকমের হতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, এ-ও এক ধরনের পার্থক্য। মদ্য পানিকে হারাম করে এ পর্যায়ে যা বলা হয়েছে বলে ইমাম শাফেয়ী থেকে জানা গেছে, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুয়ীনের বিরুদ্ধেও এ যুক্তিটি পেশ করা হয়েছিল, যখন তিনি বলেছিলেন ঃ হারাম হালালকে হারাম করে না। এ হারামকরণকে যারা অস্বীকার করে, উক্ত যুক্তি তাদের ওপরই সহীহ্ হয়— এই ইল্লাতের কারণে। কেননা এখানেও সেই ইল্লাতটি রয়েছে। কিন্তু হারাম হালালকে হারাম না করণে ইল্লাতটিও থাকবে না। কেননা সে দুটি অ-সংমিশ্রিত। যদি বলা হয়— যিনা হারাম করে, তা হলে তার 'ইল্লাত' হচ্ছে হারাম হালালের বিপরীত। আর হালাল নিয়ামত, হারাম প্রতিশোধ। প্রশ্নকারীর সমস্ত মুনাযিরা বা বিতর্কের মধ্যে সে এ কথাটি ছাড়া অন্য কিছুর যুক্তি পেশ করেনি। সে যে পার্থক্যসমূহের উল্লেখ করেছে, সে পার্থক্যসমূহ অন্যান্য দিক দিয়ে তার ইল্লাত তাতে অধিকভাবে বিচূর্ণ। কেননা ইল্লাতটি পাওয়া গেছে, হুকুম পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া 'তাহ্‌রীম' যদি শুধু সংমিশ্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় এবং মুবাহকে নিষিদ্ধ থেকে আলাদা করা অসম্ভব বা কঠিন হয়, তাহলে তো মুবাহ সঙ্গমকে হারাম করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা এখানে সংমিশ্রণ নেই। ফাসেদ (বাতিল) নিকাহ্‌র সঙ্গম এবং অন্যান্য যত প্রকারের সঙ্গম যার সাথে তাহরীম জড়িত, সবই তেমনি। কেননা মেয়েলোক তার মা থেকে স্বতন্ত্র, পৃথক। ওরা দুজন অ-সংমিশ্রিত, একাকার নয়। এ দিকগুলো থেকে যখন তাহরীম হতে পারে সংমিশ্রণ না হওয়ার কারণে, তা হলে যিনার ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করা হবে কোন কারণে ?

অথচ আমরা আলোচনার শুরুতেই আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছি ঃ 'তোমাদের বাপ যে মেয়েলোককে নিকাহ করেছে, তোমরা তাকে নিকাহ করবে না।' আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ।', এসব আয়াত যিনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর কথা থেকে এ বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার নিকট যে প্রশ্ন করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরে ইমাম শাফেয়ী তাঁর এ প্রশ্নকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, পানি ও মদ্য এবং মেয়েলোকের মধ্যকার কথা কেন বলা হল, অথচ মেয়েলোকের ব্যাপার ও মদ্য ও পানির ব্যাপারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। শাফেয়ী বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি তার কাছ থেকে একথা কবুল করে নিলে কি ভাবে ? বলল, আমাদের নিকট একজন যা বলেছে, তা-ই আমাদের জন্যে তোমার কথা। আমাদের সঙ্গী যদি জানতে পারে তা হলে আমি মনে করি, সে

তার কথার ওপর অবচিল হয়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু সে গাফিল হয়ে রয়েছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে তার কথায়।

বলেছেন— পরে সে তার কথা থেকে ফিরে যায় এবং বলে আমার মতে তোমাদের কথাই সত্য। আমাদের সঙ্গী কোন কিছুই বানায়নি, আমরা জানতেও পারিনি, এ প্রশ্নকারী কে ছিল। জানতে পারিনি, তাদের সঙ্গী বলে তারা কাকে বুঝিয়েছে। যার সম্পর্কে তারা বলেছে আমাদের সঙ্গী যদি এ পার্থক্যগুলো জানতে পারে, তাহলে আমাদের ধারণা সে নিজের কথার ওপর অটল হয়ে থাকতে পারবে না।

মূলত এ প্রশ্নকারীর হৃদয়ের অন্ধত্ব স্পষ্ট হয়ে গেছে। শাফেয়ী যা কিছু বলেছেন, তা সে সবই মেনে নিয়েছে, বিষয়ের ওপর কোন দলীল দেয়ার দাবি করেনি। হতে পারে, সে একজন সাধারণ মানুষ, ফিকাহ্র ইল্ম সে কিছুই জানে না। তবে এতদসত্ত্বেও তার মধ্যে দুটি জিনিস একসঙ্গে একত্রিত ছিল। তার একটি মূর্খতা ও বোকামী। তার মুনাযিরা বা বিতর্কের ধরন দেখেই আমরা তার আন্দাজ করতে পারি, যা মেনে নেয়া উচিত নয়। তাই মেনে নেয়া এবং যার নিকট প্রশ্ন করেছিল তার নিকট পার্থক্যসমূহের দাবি করছিল— যা ইল্লাত ও কিয়াসের বিষয়াদির তাৎপর্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে না এবং পরে তার ফিরে যাওয়া তার সেই মতের দিকে, যা সে ধারণা করে রেখেছিল এবং তার সঙ্গীদের কথা ত্যাগ করাই তার নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর বাস্তব প্রমাণ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে বোধশক্তির স্বল্পতা। সে এই ধারণা করে বসেছিল যে, সে যদি এসব কথা শুনতে পায়, তা হলে সে নিজের মত ত্যাগ করে এ মত গ্রহণ করবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতেই অপর একজন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া। অথচ সে এর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না।

এ ধরনের মুনাযিরা বা বিতর্কে শাফেয়ীর আনন্দ লাভ এবং তার মতের দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, এরা দুজনই মুনাযিরার খুব কাছাকাছি ছিল। অন্যথায় তাঁর যদি প্রাথমিক শোধ-বোধও থাকত, তা হলে তিনি তাঁর কিতাবে এ হাস্যকর মুনাযিরার বিবরণ লিপিবদ্ধ কখনই করতেন না। আমাদের মাযহাবের নব্য ও প্রাথমিক পর্যায়ের লোকেরাও যদি এ পর্যায়ে কথা বলত, তাহলে এসব যুক্তির অন্তসারশূন্যতা এবং প্রশ্নকারী ও প্রশ্নিত ব্যক্তির দুর্বলতা তাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকত না।

ইমাম শাফেয়ী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর সাথে মুনাযিরাকারীকে বলেছেন যে, তুমি মেয়েলোকটির ওপর বিচ্ছেদ টেনে আনছ শুধু এই অপরাধে যে, সে তার পুত্রকে চুম্বন করেছে। অথচ আল্লাহ্ এজন্যে তার ওপর বিচ্ছেদ চাপান না। সে বলল— তাহলে আপনি মনে করেন যে, সে মেয়েলোকটি তার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যাবে, যদি সে মুরতাদ হয়ে যায়? বলেছেন, আমি বললাম, যদি যে মেয়েলোকটি ইদ্দত পালন অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলে তাদের দুজনের বিয়ে বহাল থাকবে। সে মেয়েলোকটি তার স্বামীর পুত্রকে চুম্বন দিল, তার সম্পর্কেও এরূপ মনে করেন? বললেন, না।

আবূ বকর বললেন, তিনি তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট স্ত্রীর দিক থেকে তাহরীম সজ্ঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। পরে বলেছেন, স্বামী তারই থাকবে। মেয়েলোকটির ফিরে আসা

বাধ্যতামূলক করেছেন, যেমন 'তাহ্রীম'ও তারই কাজ বলেছেন। পরে শাফেয়ী বলেছেন, আমি বলি, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি মেয়েলোকটি ইসলামে ফিরে আসে, তাহ্লে তার স্বামী তাকে 'নিকাহ্' করতে পারবে। যে মেয়েলোকটি তার স্বামীর পুত্রকে চুম্বন করেছে, তার সম্পর্কেও কি তুমি তাই মনে কর ? বলল : মুরতাদ হওয়া মেয়েলোক সব মুসলমানের জন্যেই হারাম, যতক্ষণ না সে ইসলাম কবুল করছে। স্বামীর পুত্রকে চুম্বন করা সে রকমের ব্যাপার নয়।

আবূ বকর বলেছেন, তার প্রতিপক্ষের নিকট সে যা অস্বীকার করেছিল, সেই মূল জিনিসকেই চূর্ণ করে দিল।

এরপর পার্থক্যসমূহের উল্লেখ করা শুরু করেন, যেমন পূর্বে তাঁর কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমি তার পুনরাবৃত্তি করব না। কেননা এ ধরনের ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। তবে আমাদের ফিকাহ্ বিপরীত মতধারীদের জ্ঞানের পরিমাণ এবং চিন্তার দিক দিয়ে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে।

উসমানুলবত্তী বিয়ের পর স্ত্রীর মার সঙ্গে যিনা এবং বিয়ের পূর্বের যিনার মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, আমাদের মতে তার কোন অর্থ হয় না। কেননা যা চিরস্থায়ী তাহরীমের কারণ, তা বিয়ের পূর্বে হোক বা পরে হোক, তার হুকুম কখনই ভিন্নতর হতে পারে না। তার দলীল এই যে, দুগ্ধপান, স্থায়ী তাহরীমের কারণ। সে তারহীম কার্যকর হওয়ায় বিয়ে দেয়ার পূর্বে ও পরের মধ্যে কোন পার্থক্য হতে পারে না। আমাদের ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, সেই কাজটি যদি কোন পুরুষের সাথে হয় তাহলে তার মা তার জন্যে বিয়ে করা হারাম হবে না, তার কন্যাকে বিয়ে করাও নয়। তা এদিক দিয়ে যে, এ হারাম হওয়াটা সম্পর্কিত তার সঙ্গে, যার সাথে নিকাহ্র আক্দ সহীহ্ হয়। এ নিকাহ্ দ্বারা সে মেয়েলোকটি স্বামীর অধিকারী হতে পারে। ফলে হারাম সঙ্গম হালাল সঙ্গমের মতই হবে তাহরীম বাধ্যতামূলককরণে। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে তার অস্তিত্ব যখন মুবাহরূপে পাওয়া যায়নি এবং তা তার সাথে আক্দ করে তার মালিক হওয়া যায় না, তখন তার সাথে তাহ্রীমের হুকুম সম্পর্কিত হল না। যেমন যদি কেউ যৌন কামনা সহকারে মেয়েলোককে স্পর্শ করে, তাহলে তার সাথে তার মা কিংবা কন্যার তার জন্যে হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কিত হবে না। অথচ স্পর্শ নারীর ক্ষেত্রে সকলের মতে সঙ্গম পর্যায়ের কাজ। তাহ্রীম তার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার দিক দিয়ে। কিন্তু সকলেই যখন এ বিষয়ে একমত যে, শুধু স্পর্শ হলে তাতে নারীর মা বা কন্যার হারাম হওয়ার কারণ হবে না, তখন তা সঙ্গম হল না, হলে অন্য কিছু। এ কথা দ্বারা দুটি দিক দিয়ে আমাদের মতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। একটি হল একজন পুরুষের অপর একজন পুরুষকে যৌন কামনা সহকারে স্পর্শ করায় সে জিনিস হল না, যা নিকাহ্র আকদ-এর দ্বারা হয়, তাই সে কারণে তাহ্রীম হবে না অর্থাৎ তাতে সেই পুরুষের মা বা কন্যা সে পুরুষটির জন্যে হারাম হয়ে যাবে না। সঙ্গমের হুকুম-ও তাই হবে। কেননা নিকাহ্র আকদ তার মালিক হওয়া সহীহ্ হয় না। আর দ্বিতীয় নারীকে স্পর্শ করা সকলের মতেই সঙ্গমের মতো। সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, স্ত্রীকে স্পর্শ করলে তার কন্যা হারাম হবে, যেমন হারাম হবে সঙ্গম হলে দক্ষিণ হস্তের মালিকানার বলে দাসীকে। স্পর্শ করলেও তার মা ও কন্যা হারাম হবে, যেমন সঙ্গমের কারণে হারাম হয়। তেমনি যে

মেয়েলোক হারাম হবে যিনার সঙ্গমের কারণে, সে স্পর্শের কারণেও হারাম হবে। কিন্তু পুরুষকে স্পর্শ করলে তা তাহরীমের কারণ হবে না, তেমনি তার সাথে সঙ্গম হলেও হারাম হবে না। কেননা মেয়েলোকের ক্ষেত্রে স্পর্শ ও সঙ্গম উভয়ই সমান— কোন পার্থক্য নেই দুটির মধ্যে।

আবূ বকর বলেছেন, হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ, সওরী, মালিক, আওজায়ী, লায়স ও শাফেয়ী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যৌন কামনাসহ স্পর্শ সঙ্গমের সমান— সেই নারী ও তার কন্যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে। তাই হারাম সঙ্গমের দ্বারা যে যে-ই হারাম হবে, স্পর্শ দ্বারাও সে সে-ই হারাম হবে যদি তা যৌন কামনা সহকারে হয়। আর হারাম সঙ্গম দ্বারা যা হারাম হবে না, যৌন কামনার স্পর্শেও তা হারাম হবে না। স্ত্রীর ক্ষেত্রে মুবাহ্‌ স্পর্শ ও দক্ষিণ হস্তের মালিকানার সুযোগের স্পর্শে মা ও কন্যা উভয়ই হারাম হওয়ার কারণ হবে। তবে শাবরামাতা থেকে ভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, স্পর্শের কারণে কেউ হারাম হবে না। হারাম হবে যৌন সঙ্গম দ্বারা, যার কারণে 'হদ্দ' অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ এক বিরল মত, এর পূর্বেই এ মতের বিপরীত মতের ওপর ইজমা হয়ে গেছে।

নারীর ওপর নযর দেয়া— তাতে কি কেউ হারাম হবে, কি হবে না, এ পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আমাদের হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহবিদ বলেছেন, কেউ যদি কোন নারীর স্ত্রী-অঙ্গের ওপর যৌন কামনা সহকারে নযর দেয়, তাহলে তা স্পর্শ তুল্য, তার দরুন তাহ্‌রীম হবে। কিন্তু স্ত্রী-অঙ্গ ছাড়া দেহের অন্যত্র নযর দিলে তাতে হারাম হবে না। সওরী বলেছেন, নারীর যৌন অঙ্গের ওপর ইচ্ছাপূর্বক নযর দিলে তাতে সে নারীর মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। তা যৌন কামনা সহকারে হওয়ার কোন শর্ত তিনি আরোপ করেন নি।

ইমাম মালিক বলেছেন, কেউ যদি তার দাসীর চুলের ওপর নযর দেয়, স্বাদ আস্বাদন করে; কিংবা তার বুকের ওপর বা উরি অথবা পার গোড়ালি কিংবা তার দেহের রূপময় অঙ্গসমূহের ওপর নযর দেয় ও স্বাদ পায়, তাহলে তার মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। ইবনে আবূ লায়লা ও শাফেয়ী বলেছেন, শুধু নযর কোন জিনিস হারাম করে না যদি স্পর্শ না করে। আবূ বকর বলেছেন, জরীর ইবনে আবদুল হামীদ হাজ্জাজ আবূ হানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যে লোক কোন মেয়েলোকের যৌন অঙ্গের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তার মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম হয়ে গেল। হাম্মাদ ইবরাহীম আল-কামা আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ نَظَرَ اِلٰى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا -

যে লোক কোন মেয়েলোক ও তার কন্যার যৌন অঙ্গের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্‌র তার প্রতি তাকাবেন না।

আওজায়ী মকহুল থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর (রা) তাঁর দাসীকে একাকী ডেকে তাকে তার কোন কোন সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন তিনি বললেন, সে তোমার জন্যে

হালাল হবে না। হাজ্জাজ আমর ইবনে শুয়ায়ব তাঁর পিতা— তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর এক দাসীকে একাকীত্বে তার কোন কোন সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তারপরে বলেছেন, সে তোমার জন্যে হালাল নয়। আল-মুসান্না আমর ইবনে শুয়ায়ব ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَجَارِيَةً لَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ مِنْهَا يَرِيْدُ ذٰلِكَ الْأَمْرَ فَانَّهَا لَا تُحِلُّ لِابْنِهِ -

যে ব্যক্তি তার কোন ক্রীতদাসীকে আলাদা করে নেবে ও তার সেই 'জিনিসের' দিকে নযর দেবে— সেই কাজটি করার ইচ্ছা করবে, সেই ক্রীতদাসী তার পুত্রের জন্যে সে দাসী হালাল হবে না।

শবী থেকে বর্ণিত, বলেছেন, মসরূক তার পরিবারের লোকদেরকে লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ তোমরা আমার অমুক দাসীকে দেখ, তাকে বিক্রয় করে দাও। আমি তার থেকে যা পেয়েছি, তাতে আমার সন্তানদের জন্যে তাকে হারাম করে দিয়েছে, যেমন স্পর্শ ও দৃষ্টিদান। আল-হাসান, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম প্রমুখের মত-ও তাই। দেখা যাচ্ছে আগের দিনের এসব ফিকাহবিদ এ বিষয়ে একমত যে, শুধু দৃষ্টি ও স্পর্শের কারণে তাহ্রীম অনিবার্য হয়। আমাদের ফিকাহবিদগণ 'তাহরীম' হওয়ার জন্যে স্ত্রীর যৌন অঙ্গের প্রতি নযর দেয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সারা দেহের প্রতি নযর দেয়ার শর্ত করেন নি। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا بِنْتُهَا -

যে ব্যক্তি কোন মেয়েলোকের স্ত্রী-অঙ্গের ওপর দৃষ্টি দিল, তার জন্যে সেই মেয়েলোকের মা ও কন্যা হালাল হবে না।

এতে নারী-অঙ্গের ওপর নযর দেয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাহরীম কার্যকর হওয়ার জন্যে, সমগ্র দেহের প্রতি নযর দেয়ার কথা বলা হয়নি। এমনিভাবে ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর (রা) থেকেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। আগের দিনের মনীষিগণের এ দুজনের মতের বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল নারীর যৌন অঙ্গের ওপর নযর দেয়া তাহরীম কার্যকর হওয়ার জন্যে বিশেষ শর্ত। তাছাড়া অন্য কিছুর শর্ত নেই। অথচ 'কিয়াস' বলে যে, স্ত্রী-অঙ্গের ওপর নযরে তাহরীম হবে না। যেমন তাছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের ওপর নযর দিলে তাহরীম হয় না। কিন্তু উক্ত মনীষিগণ এক্ষেত্রে কিয়াস পরিহার করেছেন, হাদীসকে গ্রহণ করেছেন, আর তাতেই আগের মনীষীদের ঐকমত্য হয়েছে। যৌন অঙ্গ ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের ওপর নযর দেয়া তাহরীম-এর কারণ বানান নি। তা যৌন স্পৃহা ও কামনা সহকারে হলেও। কিয়াস তো তারই দাবি করে। লক্ষণীয় যে, দৃষ্টিদানের সাথে হুকুম সংশ্লিষ্ট নয় সমস্ত মৌলিক ব্যাপারে। কেননা ইহ্রাম বাধা থাকা অবস্থায় যদি দেখে কিংবা রোযাদার অবস্থায় দেখে, তাতে তার মনে কামনা জাগ্রত হয়, তাতে তার রোযা বিনষ্ট হবে না। তবে স্পর্শের ফলে যদি বীর্যস্খলন ঘটে, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইহরাম বাধা অবস্থায় হলে একটা জন্তু কুরবানী দিতে হবে। এ থেকে জানা গেল, স্পর্শ ছাড়া শুধু দেখার সাথে কোন হুকুম

সম্পর্কিত হয় না। এ কারণে আমরা বলেছিলাম যে, কিয়াস বলে শুধু দৃষ্টিপাত— শুধু দেখায় কিছু হারাম হয়ে যায় না। তাই ফিকাহ্‌বিদগণ কিয়াস ত্যাগ করে হাদীস অনুযায়ী নারী অঙ্গের ওপর নযরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে শাবরামাতার দলীল হল ঃ

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -

তোমরা যদি তাদের সাথে সঙ্গম কার্য না কর, তালে তোমাদের কোন দোষ হবে না ।

আল্লাহ্‌র এ কথাটি। শুধু স্পর্শ তো সঙ্গম নয়। অতএব স্পর্শের কারণে কোন কিছুই হারাম হবে না।

এ কথা ও যুক্তির জবাব হল, আয়াতে সঙ্গম কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত যা হয়, তাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে— এটা নিষিদ্ধ নয়। যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا -

সে যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে পরে দুজনই ফিরে এলে— একত্রিত হলে— তাদের দুজনার কোন দোষ হবে না। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩০)

এ আয়াতে তালাকের উল্লেখ হয়েছে শুধু। তবে তার অর্থ, তালাক কিংবা তার যা স্থলাভিষিক্ত হয় তা। তার প্রমাণ হল আগের কালের ফিকাহবিদদের কথা এবং তাদের ঐকমত্য, কোন বিপরীত মত ছাড়াই— এ কথায় যে শুধু স্পর্শ ও তাহরীম বাধ্যতামূলক হবে।

এ ব্যাপারেও মনীষীদের মতপার্থক্য নেই যে, কোন মেয়েলোকের সাথে 'নিকাহ'র আক্‌দ হলে সে মেয়েলোক সেই পুরুষের পুত্রের জন্যে হারাম হবে। এ মত আল-হাসান, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, ইবরাহীম, আতা ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকেও বর্ণিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ 'তবে যা আগে ঘটে গেছে' ..... এর তাৎপর্য পর্যায়ে আতা থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তবে যা ইসলাম পূর্বকালে জাহিলিয়াতের জামানায় ঘটে গেছে, তা।

আবূ বকর বলেছেন, এটা সম্ভব যে, বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যা জাহিলিয়াতের সময়ে ঘটে গেছে, সে বিষয়ে তোমাদের পাকড়াও করা হবে না। আর এ-ও হতে পারে যে, বলতে চাওয়া হয়েছে ঃ যা আগে ঘটেছে, তার ওপর তোমরা স্থিতিশীল হয়ে রয়েছ। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় এ কথাই বলেছেন। কিন্তু তা ভুল। কেননা নবী করীম (স) পিতার স্ত্রীকে কেউ বিয়ে করে থাকলে তা রক্ষা করেন নি। তা জাহিলিয়াতের সময়ে হয়ে থাকলেও বরা ইবনে আযিব (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) আবূ বুরদাতা ইবনে নায়ারকে এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছিলেন, সে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। কোন কোন বর্ণনার ভাষায় এরূপ আছে ঃ সে তার পিতার স্ত্রীকে নিকাহ করেছিল— আবূ বুরদাকে— সেই লোকটি হত্যা করা ও তার ধন-মাল নিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে। অথচ জাহিলিয়াতের যুগে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা ছিল ব্যাপক, সর্বপরিচিত ও সাধারণ ব্যাপার। নবী করীম (স) যদি কাউকে এ অবস্থার ওপর টিকিয়ে রাখতেন, তাহলে তা নিশ্চয়ই বর্ণনার মাধ্যমে জানা যেত, জনগণের নিকট কিছু মাত্র

অজানা থাকত না। কিন্তু কোন বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়নি— এ রকমের কোন বর্ণনাও পাওয়া যায়নি। এ থেকে বোঝা গেল, اِلَّامَاقَدْ سَلَفَ বলে আল্লাহ্‌ বলতে চেয়েছেন, আগে যা হয়ে গেছে, সেজন্য কাউকে পাকড়াও করা হবে না— কোন শাস্তি দেয়া হবে না। কেননা তা ইসলামের শরীয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কিন্তু এ সময় যারা সেই অবস্থায় স্থিতিশীল ছিল, তাদেরকে আল্লাহ্‌ জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ কাজ যে হারাম তা শুনতে ও জানতে না পারা পর্যন্ত যা হবে, তার দরুন তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। ফলে এ ক্ষেত্রে اِلَّامَاقَدْ سَلَفَ-এর অর্থ যে তা-ই যা আমরা বলেছি, তাতে কোন সংশয় থাকতে পারে না। আল্লাহ্‌র কথা اِلَّامَاقَدْسَلَفَ দুই বোনকে একত্রে স্ত্রী বানিয়ে রাখা সম্পর্কে ভিন্ন হওয়ার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না। আলোচনা সে পর্যন্ত পৌঁছলে আমরা সে বিষয়টির উল্লেখ ও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্‌। اِلَّامَاقَدْ سَلَفَ 'তবে আগে যা হয়ে গেছে' কথাটি এখানে এর পূর্ববর্তী কথা থেকে অব্যাহতি দেয়ার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন বলা হয় ঃ তুমি অমুককে দেখতে পাবে, তবে যার সাক্ষাত পেয়ে গেছ অর্থাৎ যাকে দেখবে, সেজন্যে তোমাকে ভর্ৎসনা করা হবে না। আল্লাহ্‌র কথা ঃ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً তা ছিল নির্লজ্জতা। এ هـ ইঙ্গিতে পূর্বোল্লিখিত বিয়ে বা নিকাহ বোঝায়। এতে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি নিষেধের পর নিকাহ অত্যন্ত লজ্জাকর অর্থাৎ এ বিয়ে লজ্জাকর। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান ও মহাবিজ্ঞানী। সম্ভবত এ কথাটি বলে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, জাহিলিয়াতের সময়ে এ ধরনের যে কাজ-ই হয়েছে তাই লজ্জাকর। অতএব এ কাজ তোমরা আর করবে না। এ কথার বাস্তবতা হতে পারে তা যে হারাম এ কথা শ্রবণের পর, কেননা দলীল কায়েম হয়ে গেছে। যাঁরা এ তাৎপর্য বলেছেন, তারা اِلَّامَا قَدْ سَلَفَ কথাটিকে আগের কথা থেকে ভিন্ন করার তাৎপর্যের বাহক বলেছেন এবং তা থেকে তওবা করা বুঝিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন, উত্তম কথা এই যে, সে কাজ হারাম, এ কথা নাযিল হওয়ার পরই তা অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজরূপে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা সকলের মতে তা-ই নিশ্চিত বক্তব্য, সন্দেহ নেই। আগের কালের নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এ কাজের হারাম হওয়ার সপ্রমাণিত বলে সকলেই শুনতে পেয়েছে, এর কোন দলীল পাওয়া যায়নি। তাই এ কাজের দরুন তাদেরকে তিরস্কার করা যায় না। এ থেকে اِلَّامَا قَدْ سَلَفَ-এর তাৎপর্য বোঝা গেল। তার বাহ্যিক অর্থের দাবি হল, আগের কাজের দরুন পাকড়াও না হওয়া।

যদি বলা হয়, এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি পিতার স্ত্রীর সাথে নিকাহ্‌র আকদ করে এবং পরে তার সাথে সঙ্গম করে, তাহলে তার এ সঙ্গম যিনা হবে। সেজন্যে তার ওপর 'হদ্দ' জারী হবে। কেননা আল্লাহ্‌ সে কাজকে فَاحِشَةً চরম লজ্জাকর বলেছেন। এ শব্দটি বহু প্রকারের নিষিদ্ধ কাজ বোঝায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ -

তবে যদি তারা সুস্পষ্ট চরম নির্লজ্জতার কাজ করে ....

অর্থাৎ তাদের ঘর থেকে বাইরে যাওয়া চরম নির্লজ্জতার কাজ— এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এ-ও বর্ণিত যে, الفاحشة এখানে স্বামীর পরিবারের লোকদের সাথে জবান দরাজ করা— তিক্ত কথা বলা, গালাগাল করা বোঝায়। এর অর্থ হিসেবে এ-ও বলা হয়েছে যে, তার অর্থ যিনা الفاحشة নাম হচ্ছে যাবতীয় নিষিদ্ধতম কাজসমূহ করা, কেবল যিনা-ই নয়, অন্যান্য বহু কিছু তার মধ্যে শামিল। এমন কি الفاحشة শব্দ ব্যবহৃত হলেই যিনা বোঝাবে। অসহীহ্ বিয়ের মাধ্যমে যে সঙ্গম হয়, তা-ও এর অর্থ। তাকে হয়ত যিনা বলা হয় না। কেননা অগ্নিপূজারী সমস্ত মুশরিক— যারা ইসলামে সহীহ্ নয় এমন সব বিয়ের ফসল হিসেবে তারা প্রসূত, তাদের 'অবৈধ সন্তান' বলা হয় না। আর যিনা অনধিকারভাবে যৌন সঙ্গমকে বলা হয়। তা বিনা বিবাহে হতে পারে, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব ছাড়াও হতে পারে। এবং দুজনের কারোর দিক থেকেই কোন সন্দেহ থাকবে না। যদি আক্দ-এর ফলে হয়, তাহলেও তাকে যিনা বলা হয় না। সে আক্দ অ-সহীহ্ কিংবা সহীহ্ যা-ই হোক।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيْلًا -

এবং ক্রোধ উদ্রেককারীও অত্যন্ত খারাপ পথ।

অর্থাৎ এ এমন কাজ, যাতে আল্লাহ্র ক্রোধ জাগে এবং মুসলিম জনগণও ক্রুদ্ধ-অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। এ কথা সে কাজের হারাম, অত্যন্ত জঘন্য এবং যে তা করে তার ঘৃণ্য হওয়া বোঝায়। সেই সঙ্গে এটা যে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অত্যন্ত খারাপ পথ ও উপায়, তা-ও বলা হয়েছে। কেননা এ কাজের পরিণাম জাহান্নাম।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ -

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা ও কন্যাগণকে। —আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনে সালামাতা, সুনায়দ ইবনে দাউদ, অকীই, আলী ইবনে সালিহ, সামাক, ইকরামা, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ —'তোমাদের প্রতি তোমাদের মাগণকে হারাম করা হয়েছে, ... بَنَاتُ الاخْتِ —'বোনের কন্যাগণ পর্যন্ত। বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বংশের দিক দিয়ে সাতজনকে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে সাতজনকে হারাম করেছেন। তারপর বলেছেন, তা তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র লিখে দেয়া জিনিস ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ -

তোমাদের এ কয়জন বাদে আর যারা আছে, সকলকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

অর্থাৎ এ বংশের বাইরে যারা আছে। তারপর বলেছেন ঃ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ -

এবং তোমাদের সে সব মা-ও (হারাম) যারা তোমাদেরকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধ ভাইরা (হারাম)।

শেষেঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

এবং যেসব মেয়েলোক পর স্ত্রী হিসেবে সংরক্ষিত। তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যে মেয়েলোকদের মালিকত্ব পেয়েছে, তারা নয়।

দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের অধীন যারা, তারা ক্রীতদাসী।

আবূ বকর বলেছেন আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে' সাধারণ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। উল্লিখিত নাম প্রকৃতপক্ষে যাদের বোঝায়, তারা সকলেই এর মধ্যে শামিল। দাদী— দূরবর্তী হলেও হারাম, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। শুধু امهات মা'গণ বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কেননা 'মা' নামটি এ পর্যায়ের সব মেয়েলোককেই শামিল করে। যেমন ابا 'বাপগণ' বললে দাদাও গণ্য হয়, তা যত দূরেরই হোক। এবং তোমাদের বাপগণ যে মেয়েলোকদেরকে নিকাহ্ করেছে, তোমরা তাদেরকে নিকাহ্ করবে না' এ কথা দ্বারা আল্লাহ্ দাদার বিবাহিতাদেরকে বুঝিয়েছেন। যদি-ও 'দাদা' একটা স্বতন্ত্র নাম, তার মধ্যে বাবা কখনই শামিল হয় না। কেননা ابو একটা সাধারণ নাম। এর মধ্যে সকলেই শামিল। এমনিভাবে আল্লাহ্র কথা ঃ وبناتكم 'এবং তোমাদের কন্যাগণ।' এর মধ্যে সন্তানের কন্যারাও শামিল, তা যত নিম্নের দিকের হোক। কেননা এ নামটি তাদেরকেও শামিল করে, যেমন 'বাপ' নামটি দাদাগণকেও শামিল করে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ -

এবং তোমাদের বোনগণ, তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ, ভাইর কন্যাগণ ও বোনের কন্যাগণ।

এ আয়াতে ভাইর কন্যা ও বোনের কন্যাদের আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা 'ভাই' ও 'বোন' নাম কন্যা নাম— সন্তানের কন্যাগণকে শামিল করে না। এ সাতজন মেয়েলোক হারাম কুরআনের দলীল দ্বারা এবং বংশের দিক দিয়ে। এরপর বলা হয়েছে ঃ তোমাদের যে সব মা'রা তোমাদেরকে দুধ খাইয়েছেন, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের সঙ্গমকৃতা স্ত্রীদের কোলে করে নিয়ে আসা ও তোমাদের লালিতা-পালিতা কন্যাগণ। যদি তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম না করে থাক, তাহলে সেই মেয়েলোকদের কন্যা হারাম হবে না— বিয়ে করলে গুনাহ হবে না এবং তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীরা— যেসব পুত্র তোমাদের নিজের ঔরসজাত এবং এ-ও হারাম যে, তোমরা দুই বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করবে। তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তার কথা আলাদা।' এর পূর্বে বলা হয়েছে ঃ 'তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব

মেয়েলোককে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে নিকাহ্ করবে না। এই সাতজন মেয়েলোক বৈবাহিকতার কারণে হারাম এবং 'ভাইর কন্যা ও বোনের কন্যা' আল্লাহ্র এ কথায় তাদের নিম্নের দিকের মেয়েলোকদেরও শামিল করা হয়েছে। যেমন 'তোমাদের মা-গণ বলে উপরের দিকের মেয়েলোকদের বুঝিয়েছে। আর 'তোমাদের কন্যাগণ' বলে নিম্নের দিকের মেয়েলোক বুঝেয়েছে। 'এবং তোমাদের ফুফুগণ' বলে বাবার ফুফু ও মার ফুফুও বুঝয়েছে। এমনিভাবে 'তোমাদের খালাগণ' বলে মা'র খালা ও বাবার খালাও বুঝিয়েছেন। যেমন পিতার মা-গণের হারাম হওয়াও বুঝিয়েছেন উপরের দিকে সব সহ।

আল্লাহ্ ফুফুগণ ও খালাগণকে বিশেষভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাদের সন্তানগণ কিন্তু হারাম নয়। ফুফুর কন্যা ও খালার কন্যা বিয়ে করা জায়েয হওয়ায় কোনই মতভেদ নেই। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমাদের সেসব মা'রা যারা তোমাদেরকে দুধ খাইয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোনগণ'— জানা আছে, এ মা ও বোন নামকরণ দুধ সেবন করানোর দরুন লাভ করেছে। দুধ সেবন কার্যের সাথে এ নাম দুটি সংশ্লিষ্ট বলেই যার দুধ পান করা হয়েছে সে 'মা' এবং তার কন্যা (কিংবা একত্রে অন্য যে কন্যা পান করেছে সে) 'বোন' নাম পেয়েছে। আর তার ফলে তারা অবশ্যই হারাম হবে মা ও বোন নাম লাভ করার কারণে, সে দুধের পরিমাণ খুব অল্প হলেও।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের সে মা'রা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে' এ কথাটির মতই, যেমন কেউ বলে ঃ তোমাদের সেসব মা, যারা তোমাদের দিয়েছে, তোমাদের সে সব মা যারা তোমাদেরকে পরিয়েছে। কাজেই তারা এ কারণে মা, এ কথা স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন ছিল। তাই দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয় এভাবেই। কথাটি এরূপ বলা হয়নি ঃ 'যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে তারা তোমাদের মা।'

এর জবাবে বলা যাবে, এরূপ কথা সহীহ্ নয়। কেননা দুধ পান করানো হচ্ছে সেই কাজ যার দরুন মা নামটি অর্জন করা হয়। এ নামটি যখন দুধ পানের কারণে অর্জিত, তখন তার সাথে হুকুম সম্পর্কিত হবে। আর অভিধানে ও শরীয়াতে 'দুধ পান' নামটি অল্প পরিমাণ ও বেশি পরিমাণ উভয়কেই শামিল করে। 'দুধ পান' বললে কম পরিমাণেও এ নাম হয়, বেশি পরিমাণেও হয়। তাই দুধ পান হলেই 'মা' হবে। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমাদের সে সব মা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে।' এ কথাটি সে রকমের নয়, যেমন তুমি বলেছ ঃ তোমাদের সেই মা যে তোমাদেরকে দিয়েছে, তোমাদের সেই মা যে তোমাদের পরিয়েছে।' কেননা মা নাম কি পরানোর কাজের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন তার সম্পর্ক রয়েছে দুধ পানের সাথে। এ কারণে আমরা নাম ও তার সাথে সম্পর্কিত কাজ দুটোরই পাওয়ার প্রয়োজন। 'তোমাদের দুধ পানের বোন' আল্লাহ্র এই কথাটিও তাঁর বোন হওয়া আবশ্যিক হয় দুধ পানের কারণে। কেননা 'বোন' নামটি দুধ পানের দরুন অর্জিত হয়েছে। তাছাড়া অন্য কোন কাজের দরুন নয়। আয়াতের সম্বোধন-ও এ তাৎপর্যই প্রমাণ করে। কথাটির দাবিও তাই; যা আবদুল ওহাব আবূ রুবাই— আমর ইবনে দীনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এলো। বলল ঃ ইবনে নুয যুবায়র বলেছেন, একবার-দুবারের দুধ পানে

কোন দোষ নেই। ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র ফয়সালা ইবনুয যুবায়রের ফয়সালার তুলনায় অনেক ভালো। আল্লাহ তো বলেছেন ঃ

وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ -

এবং তোমাদের দুধ পানের বোন।

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থই ইবনে উমর (রা) এ বুঝেছেন যে, অল্প পরিমাণ দুধ পানেও বোন হারাম হবে।

অল্প পরিমাণের দুধ পানে হারাম হওয়ার ব্যাপারে আগের ও পরবর্তী ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উমর, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর (রা) এবং আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, তায়ূস, ইবরাহীম, জুহ্রী ও শবী বলেছেন, পান করা দুধের পরিমাণ কম হোক, কি বেশি— দুধ পানের দুই বছরের মধ্যে পান করা হলে তাতে তাহ্রীম হবে— তা সে দুধ-মা ও দুধ-বোন বিয়ে করা হারাম হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক, সওরী, আওজায়ী প্রমুখ ফিকাহবিদেরও এ কথা এবং সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, দুধ অল্প হোক বেশি হোক— পান করা হলে তাতে মা ও বোন হারাম হবে— অবশ্য এমন পরিমাণ যদি হয়, যদ্দারা রোযাদারের ইফতার হয়ে যায়।

ইবনুয যুবায়র, আল-মুগীরা ইবনে শুবা ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন ঃ

একবার কি দুইবার— (এক চুমুক বা দুই চুমুক) দুধ পান করলে কেউ হারাম হবে না। শাফেয়ী বলেছেন ঃ বিচ্ছিন্নভাবে পাঁচবার দুধ পান না হলে কেউ হারাম হবে না। আবূ বকর বলেছেন, দুধ পানের মিয়াদ সম্পর্কে আমরা সূরা আল-বাকারার আলোচনায় বলে এসেছি। এ বিষয়ে যে মতের ভিন্নতা আছে, তারও উল্লেখ করেছি। আয়াতটি যে অল্প পরিমাণও তাহ্রীম হয় বলে প্রমাণ করে, পূর্বে এ বিষয়েও কথা বলেছি। কুরআন ও সুন্নাত থেকে পাওয়া ইল্ম ব্যতীত অন্য কোন ভাবে দুধের পরিমাণ নির্ধারণ করার কাজের অধিকার থাকতে পারে না— কারুর জন্যেই তা জায়েয হতে পারে না। সুন্নাহও এমন হতে হবে, যা মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত। এ বিষয়ে 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের মতে আয়াতটির হুকুম হচ্ছে বিশেষভাবে সেই 'কারণ নির্ধারণ' যা অল্প পরিমাণেও তাহ্রীম প্রমাণিত করে। কেননা আয়াতটি মুহকাম। এর অর্থ প্রকাশমান— স্পষ্ট প্রতিভাত। এর কোন বিশেষ অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হয়নি। যার এ পরিচিতি, তাকে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বিশেষ অর্থে গ্রহণ জায়েয নয়, জায়েয নয় কিয়াস দ্বারাও তা করা। সুন্নাত দ্বারা তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

اِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

এ দুধ পানটা ক্ষুধার দরুন হতে হবে।

মসরূক আয়েশা (রা) নবী করীম (স)-এর সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতে অল্প পরিমাণ ও বেশি পরিমাণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এ উভয় পরিমাণেই দুধ পান

ব্যবহৃত। নবী করীম (স) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত অপর একটি হাদীসও তা প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন ঃ

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

বংশের দিক দিয়ে যে যে হারাম হয়, দুধ পানেও সে সে হারাম হয়।

এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আলী, ইবনে আব্বাস, আয়েশা ও হাফসা সরাসরি নবী করীম (স) থেকে এবং ইলমওয়ালা সব লোকই এ হাদীসটি আন্তরিকভাবে সহীহ্‌রূপে গ্রহণ করেছেন এবং মাস্‌লার হুকুম জানায় ব্যাপাকভাবে ব্যবহার করেছেন। নবী করীম (স) নিজেই যখন দুধ পানে তা হারাম করেছেন যা বংশের কারণে হারাম আর জানা-ই আছে যে, বংশ সম্পর্ক যে দিক দিয়েই প্রমাণিত হোক, তা তাহ্‌রীম অনিবার্য করে। অন্য কোন দিক দিয়ে তা প্রমাণিত না হলেও ক্ষতি নেই। দুধ পানের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তারও হুকুম হচ্ছে একবার দুধ পান হলেই তাহরীম প্রমাণিত হবে। কেননা নবী করীম (স) এ দুটিকে সমান করে দিয়েছেন। উভয় অবস্থার সাথেই 'তাহরীম' সম্পর্কিত।

যিনি পাঁচবার দুধ পান হওয়া দরকার বলেছেন, হাদীস থেকে তাঁর দলীল হল আয়েশা ইবনুয যুবায়র ও উম্মুল ফযল (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ -

একবার চোষণ হারাম করে না, দুইবার চোষণও নয়।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ কুরআনে প্রথমে দশবার জানাশুনাভাবে দুধ পানের কথা বলা হয়েছিল। পরে তা মনসূখ হয়ে যায়। তদস্থলে জানা-শুনা পাঁচবারের কথা এসেছে। তার পরে নবী করীম (স) ইন্তেকাল করেন। তখন এ কথাই কুরআনে পড়া হচ্ছিল।

আবূ বকর বলেছেন, এ হাদীসকে দলীল হিসেবে ধরে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত— 'তোমাদের মা-রা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং দুধ পানের বোনেরা' এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো জায়েয হতে পারে না। কেননা আমরা বলেছি যে, কুরআন থেকে তা প্রমাণিত নয়। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে কুরআনের সাধারণ তাৎপর্যকে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বিশেষীকরণ জায়েয নয়। এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করার মর্যাদা নষ্ট হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এ হচ্ছে একটি কারণ।

আর দ্বিতীয় কারণ আবুল হাসান আল-কারখী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল-হাজরমী আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আবূ খালিদ হাজ্জাজ হুবায়ব ইবনে আবূ সাবিত তায়ূস, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি দুগ্ধ পান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। তখন আমি বললাম, লোকেরা তো বলে, একবার দুধ পান করলে তা কিছু হারাম করে না দুইবার করলেও না। বললেন হ্যাঁ, আগে তাই ছিল। কিন্তু আজকের দিনে একবার দুধ পানই হারাম করে।

মুহাম্মাদ ইবনে শুজা বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনে সুলায়মান, হানজালা, তায়ূস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, দশবার দুধ পানের শর্ত ছিল। কিন্তু পরে বলা হয়েছে, একবারের দুধ পানেই তাহ্রীম করে। বোঝা গেল, ইবনে আব্বাস ও তায়ূস উভয়ই দুধ পানের বার-সংখ্যা জানেন। তবে একবার দুধ পানের দ্বারাই তাহ্রীম হওয়ার সে সংখ্যা মনসূখ হয়ে গেছে। এ-ও হতে পারে যে, এ সংখ্যা নির্ধারণ বয়স্কদের দুধ পানে শর্ত করা হয়েছিল। আর তা নবী করীম (স) থেকে বড়দের দুধ পানের ব্যাপারে বর্ণিতও হয়েছিল। কিন্তু তা বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের নিকট মনসূখ হয়ে গেছে। আর বড়দের দুধ পানের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা নির্ধারণ যখন মনসূখ হয়ে গেল, তখন এ সংখ্যা বা বার নির্ধারণই মনসূখ হয়ে গেল। কেননা তা শর্তযুক্ত ছিল। উপরন্তু ইমাম শাফেয়ী তিনবার দুধ পানেই তাহ্রীম অনিবার্য বলেছেন। তার এ কথা থেকেই তা প্রমাণিত হয়, একবার বা দুইবারের পানের তাহ্রীম হয় না। এটা আমলের ওপর বৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস— যেভাবে তা এসেছে— সহীহ্ বলে বিশ্বাস করা জায়েয নয়। তা এজন্যে যে, তিনি উল্লেখ করেছেন, কুরআনে দশবারের দুধ পানের কথা নাযিল হয়েছিল, পরে তা মনসূখ হয়ে পাঁচবার স্থির হয়েছে। অতএব রাসূল (স) ইন্তিকালের করে গেছেন, তখনও তা-ই তিলাওয়াত করা হচ্ছিল। অথচ নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর কুরআনের কোন কিছু মনসূখ হওয়ার কথা বলা কোন মুসলমানের জন্যেই জায়েয নয়। যদি তা প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে তা এখনও কুরআনে তিলাওয়াত হওয়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু কুরআন পাঠে এ কথা কক্ষণই পাওয়া যায় না। আর নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর তার মনসূখ হওয়ার বা বাদ পড়ে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। হাদীসে এরূপ কথা আসার দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় হাদীসটি মূলের মধ্যে প্রবিষ্ট, এর কোন হুকুম প্রমাণিত নয়। অথবা যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায়ই মনসূখ হয়ে গেছে। আর যা মনসূখ হয়ে গেছে, তদনুযায়ী আমল করার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। আর এ হওয়াও অসম্ভব নয় যে, বয়স্কের দুগ্ধ পান সম্পর্কেই বার-এর এ নির্ধারণ। আর হযরত আয়েশা (রা) বয়স্কের দুগ্ধ পানেও তাহ্রীম কার্য করার মত পোষণ করতেন। তবে রাসূল (স)-এর সব বেগম এ মতই রাখতেন না। আমাদেরও শাফেয়ীর নিকট বয়স্কের দুগ্ধ পানের হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে। কাজেই হযরত আয়েশা (রা) হাদীসে যে বার-সংখ্যার নির্ধারণ রয়েছে, তা-ও মনসূখ হয়ে গেছে। এই যে সব ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যের আমরা উল্লেখ করলাম এসব যদি অসম্ভব মনে করা হয়, তাহলেও কুরআনের সহজ অর্থে যা প্রমাণিত হয়, তার বিপরীত কথা তোলা-ই জায়েয হতে পারে না। কেননা এসব হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ।

আমরা এই যে উল্লেখ করলাম— দুধ পানের কোন পরিমাণ বা বার নির্ধারণ বাতিল হয়েছে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুধ পান চিরস্থায়ী তাহ্রীম বাধ্যতামূলক করে। ফলে তা সেই সঙ্গম সমতুল্য, যা স্ত্রীলোকটির মা ও কন্যাকে চিরদিনের জন্যে হারাম করে দেয়। এর কোন একজনের সঙ্গে শুধু আক্দ হওয়াটাও তাহ্রীমের কারণ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। যেমন পুত্রদের স্ত্রীরা এবং বাবার বিবাহিতারা। সে দুধের স্বল্প পরিমাণ ও বেশি পরিমাণের মতোই, যার ফলে তাহ্রীমের হুকুম কার্যকর হবে। অল্প পান করলে যেমন, বেশি পরিমাণ পান করলেও তেমন।

শুষ্ক স্তনের দুগ্ধ পান করলে দুগ্ধ পানের হুকুম কি হবে, এ বিষয়ে ইলমওয়ালাদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তার রূপ এই যে, এক ব্যক্তি একজন মেয়েলোক বিয়ে করল। সে মেয়েলোকটি এ পুরুষটি থেকে একটি সন্তান প্রসব করল। আর তার স্তনে দুধ এসে গেল সন্তান প্রসবের পরে। তখন সে একটি শিশুকে দুগ্ধ পান করায়। কেউ বলেছেন, সে এ শুষ্ক স্তনের দুগ্ধ পান করলেও এ শিশুটি সেই পুরুষটির অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের জন্যে হারাম হবে। যদিও তারা সেই মেয়েলোকটির গর্ভজাত সন্তান নয়। এ মত দিয়েছেন ইবনে আব্বাস (রা) জুহরী, আমর ইবনুস সরীদ, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে, যার দুজন স্ত্রী আছে। একজন দুধ খাওয়ালো একটি ছেলে শিশুকে আর অপরজন দুধ খাওয়ালো একটি কন্যা শিশুকে। এমতাবস্থায় এই ছেলে কি সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে ? তিনি জওয়াবে বললেন, না। কেননা উভয় স্ত্রীলোকের দুধের উৎস অভিন্ন। আল-কাসেম, সালিম, আতা ও তায়ূস প্রমুখ ফিকাহবিদও এই মতই প্রকাশ করেছেন। খিফাফ সাঈদ ইবনে সীরান সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন ঃ কিছু লোক এ দুটি ছেলে-মেয়ের পারস্পরিক বিয়েকে মকরূহ মনে করেছেন, অপছন্দ করেছেন আর কিছু লোক তাতে দোষ মনে করেন নি। তবে যাঁরা অপছন্দ করেছেন, তাঁরা তাদের তুলনায় অধিক সমঝদার যাঁরা তাতে কোন দোষ দেখেন নি।

উবাদ ইবনে মনসুর উল্লেখ করেছেন, বলেছেন ঃ আমি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে বললাম, আমার পিতার স্ত্রীলোকদের থেকে একটি কন্যা নিয়ে আমার বাপের দিকের বোনের দুধ খাইয়ে লালন করে। সে কি আমার জন্যে হালাল, আমি তাকে বিয়ে করতে পারি ? জবাবে বললেন, না। কেননা তোমার পিতা-ই তো তার পিতা। পরে আমি তায়ূস ও আল হাসানকেও এ প্রশ্ন করি। তাঁরা দুজনও অনুরূপ জবাবই দিলেন। মুজাহিদকেও আমি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বললেন, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আমি নিজে এ বিষয়ে কিছুই বলছি না। পরে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে এ প্রশ্ন করি। তিনি মুজাহিদ যা বলেছেন, তাই বললেন। ইউসুফ ইবনে মাহিককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবূ কুয়ায়স বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করলেন। আর আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক, সওরী, আওজায়ী, লায়স ও শাফেয়ী বলেছেন, لبن الفحل হারাম করে। সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ইবরাহীম নখয়ী, আবূ সালামাতা ইবনে আবদুর রহমান, আতা ইবনে আবদুর রহমান, আতা ইবনে ইয়াসার ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেছেন, لبن الفحل পুরুষের দিক দিয়ে কাউকে হারাম করে না। রাফে' ইবনে খাদীজ থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কথা সহীহ্। তার দলীল হচ্ছে জুহ্‌রী ও হিশাম ইবনে উরওয়াতা, উরওয়াতা আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস। আবূল কুয়ায়সের ভাই আফলাহ্ এসে হযরত আয়েশার নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। তিনি হযরত আয়েশার দুধ চাচা। এটা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। হযরত আয়েশা বলেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে ও তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। পরে নবী করীম (স) ঘরে পৌঁছলে তাকে এ বিষয়ে জানাই। তিনি বললেন, হ্যাঁ সে তোমার নিকট আসতে পারে। কেননা সে তোমার চাচা। আমি বললাম— আমাকে তার স্ত্রী দুধ খাইয়েছে, সে তো নয়। তবু নবী করীম (স) বললেন, সে

তোমার ঘরে আসতে পারে। কেননা সে তোমার চাচা। আবূল কুয়ায়স ছিল সেই মহিলার স্বামী। তিনি হযরত আয়েশাকে দুধ খাইয়েছিল।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়— মেয়েলোকের স্তনে যে দুধ আসে, তা পুরুষ ও মেয়েলোক উভয়েরই। কেননা নারীর গর্ভ সঞ্চারের কারণেও দুজনই শরীক। কাজেই মেয়েলোকের বুকের দুধ পান করলে তার কারণে দুজনের সাথে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যেমন সন্তান স্বামী স্ত্রী উভয়েরই, তার কারণ যত বিভিন্নই হোক-না-কেন।

যদি বলা হয়, মালিক আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম— তাঁর পিতা— আয়েশা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশার নিকট সে-ই আসত, যার বোন তাঁকে দুধ খাইয়েছে এবং তার বোনের কন্যারাও। তবে তার ভাইর যে স্ত্রীরা তাঁকে দুধ খাইয়েছে, তারা যেতে পারত না।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা لبن الفحل পর্যায়ে বলা হয়েছে তার বিপরীত কিছু নয়। কেননা তাঁর মুহররমদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি দেখা করার অনুমতি দিতে পারতেন। আর যার সাথে ইচ্ছা পর্দা করতেন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কন্যা দাদার মুহররম, যদিও সে তার ঔরসজাত নয়। বরং তার জন্ম যে পিতার ঔরসে, সেই পিতা তো দাদারই সন্তান। তেমনি পুরুষটি স্ত্রীর বুকের দুধ আসার কারণ। অতএব সে তার জন্যে হারাম, তবে অনিবার্যভাবে। যদিও সে যে দুধ পান করেছে তা সেই পুরুষটির বুকের নয়। বরং সে তার পান করা দুধের সঞ্চারিত হওয়ার আসল কারণ। যার বুকের দুধ পান করা হয়েছে তার সাথে যেমন মাতৃত্বের সম্পর্ক হয়, সেই মেয়েলোকটির বুকে দুধের সঞ্চার হওয়ার কারণ যে পুরুষটির, তার সাথে দুধের পিতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হবে— এ-ই স্বাভাবিক। কুরআন মজীদের দুধ-মা, দুধ-বোন ইত্যাদির কথা 'নস' হিসেবে নাযিল হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে সর্বজনবিদিত হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, যা নির্ভুল জ্ঞান দান করে। তিনি বলেছেন ঃ 'দুধ পানে তা-ই হারাম হয়, যা বংশ-সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।' ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

স্ত্রীদের মা ও পালিতা কন্যা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -

তোমাদের স্ত্রীদের মারা এবং তোমরা যে সব স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করেছ, তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা যেসব কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে পালিতা— হারাম।

যে স্ত্রীরা অন্য ঘর থেকে যেসব ছেলেমেয়ে কোলে করে নিয়ে আসে, সেই স্ত্রীদের সাথে তোমাদের সঙ্গম না হওয়া পর্যন্ত সেই ছেলে-মেয়েরা তোমাদের জন্যে হারাম হয় না। এ স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম হলে অথবা স্পর্শ ও দর্শন— যেমন পূর্বে বলেছি— হলেও পালিতা কন্যার হারাম হওয়ার কারণ ঘটে। এ কথা 'নস' হিসেবেই কুরআন মজীদে নাযিল হয়েছে ঃ

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -

তোমরা সেই স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কার্য না করে থাকলে সেজন্য তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

স্ত্রীদের মাদের ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। স্ত্রীদের মা কি শুধু বিয়ের আক্‌দ হলেই এবং সঙ্গম না হলেও হারাম হয়ে যায় ?

হাম্মাদ ইবনে সালমাতা কাতাদাতা— খালাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার সাথে সঙ্গম হওয়ার আগেই তালাক দিয়ে দিল। এ ব্যক্তি সে স্ত্রীর মাকে বিয়ে করতে পারে। যদি বিয়ে করে এবং সঙ্গম হওয়ার আগেই তাকে তালাক দেয়, তাহলে তার কন্যাকে সে বিয়ে করতে পারে। এ দুটি একই ধারায় প্রবাহিত। অবশ্য হাদীস পারদর্শীগণ হযরত আলী সূত্রে খালাস বর্ণিত হাদীসকে জয়ীফ বলেছেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকেও অনুরূপ কথা জানা যায়। এ হল মুজাহিদ ও ইবনুয যুবায়রের মত। এ পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে দুটি বর্ণনা এসেছে। তার একটি ইবনে জুরাইয আবূ বকর ইবনে হাফস, আমার ইবনে মুসলিম ইবনে উয়াইমার ইবনুল আজদা' সূত্রে বর্ণিত। তা হল ঃ স্ত্রীর মা হারাম হয় না সেই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না হলে। অপর হাদীসটি ইকরামা তাঁর থেকেই বর্ণনা করেছেন যে, কোন মেয়েলোকের সাথে বিয়ের আকদ হলেই সেই মেয়ের মা হারাম হয়ে যাবে। উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইমরান ইবনে হুসায়ন, মাসরুক, আতা, আল-হাসান ও ইকরামা বলেছেন ঃ শুধু আক্‌দ হলেই স্ত্রীর মা হারাম হয়ে যাবে, তার সাথে সঙ্গম হোক কি না-ই হোক।

আবূ উসামাতা সুফিয়ান— আবূ ফরওয়াতা-আবূ আমর আশ-শায়বানী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ একজন মেয়েলোক— তাকে এক ব্যক্তি বিয়ে করে তালাক দিয়েছে তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বেই, তালাক দিয়েছে অথবা সে মরে গেছে, তার মাকে বিয়ে করা কি সেই ব্যক্তির জন্যে জায়েয ? বললেন, না, তার মাকে বিয়ে করলে তার কোন দোষ হবে না। পরে তিনি মদীনায় এলেন। তখন তিনি ফতোয়া দিয়ে তা করতে নিষেধ করলেন, অথচ ইতিমধ্যে সেই লোকটি সন্তান জন্ম দিয়েছে। ইবরাহীম শুরাইহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হযরত আলী (রা)-এর কথার উপরই ফতোয়া দিতেন অর্থাৎ স্ত্রীদের মা'দের সম্পর্কে। পরে রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ হজ্জ করার পর একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করলেন। তারপরে তাঁরা সেই মেয়েলোকটিকে বিয়ে করার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করলেন, তাঁরা তা পছন্দ করলেন না। পরে ইবনে মাসউদ (রা) যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি যাকে ফতোয়া দিয়েছিলেন তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। তারা ছিল বনু জুফারাতা গোত্রের উপগোত্র। তাদেরকেই তিনি পূর্বোল্লিখিত ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি আমার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা এ কাজটিকে অপছন্দ করেছেন। কাতাদাতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, জায়দ ইবনে সাবিত বলেছেন, যে ব্যক্তি সঙ্গমের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, সে সেই তালাক দেয়া স্ত্রীর মাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছে। সে যদি বাস্তবিক সঙ্গম করার পূর্বেই তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে সে

সেই তালাক দেয়া স্ত্রীর মাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সে স্ত্রী যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে সে তার মাকে বিয়ে করতে পারবে না। হাদীস পারদর্শীগণ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব— জায়দ সূত্রে কাতাদাতা বর্ণিত এ হাদীসকে জয়ীফ বলেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে কাতাদাতা যতটুকু বর্ণনা করেছেন, তাঁরা তার চাইতে অনেক বেশি বলেন। কেননা এ দুই জনের মাঝে বহু কয়জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। সাঈদ থেকে তার বর্ণনাকারী সাঈদের অধিকাংশ সিকাহ সঙ্গীদের বিরোধী। আবদুর রহমান ইবন মাহদী মালিক সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রটি কাতাদাতাই সাঈদ সূত্রের তুলনায় অধিক প্রিয় বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদুল আনসারী— সাদ ইবনে সাবিত সূত্রে কাতাদাহর বর্ণনার বিপরীত কথা বলেছেন ও বর্ণনা করেছেন। বলা হয়, ইয়াহ্ইয়া বর্ণিত হাদীস যদিও 'মুরসাল' তবু তা কাতাদাতা— সাঈদ সূত্রের হাদীস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এই যা বললাম, হাদীস পারদর্শী ও ফকীহবৃন্দের এটাই নিয়ম। হাদীস কবুল করার বা রদ করার ব্যাপারে তাঁরা একে গণ্য করেন না। তবু আমরা তার উল্লেখ করলাম, যেন লোকদের মত সকলে জানতে পারেন যে, তারা তাকে গণ্য না করেও সেটি অনুযায়ী আমল করেন। এই সন্দেহ রয়েছে যে, জায়দ ইবনে সাবিত মৃত্যু ও তালাকের মধ্যে তাহ্রীমের ব্যাপারে পার্থক্য করেছেন— মরে গেলে তার মা'কে বিয়ে করা জায়েয নয়, আর তালাক দিলে তাকে বিয়ে করা জায়েয। কেননা সঙ্গমের পূর্বে তালাক হলে সঙ্গম হওয়া সংক্রান্ত কোন হুকুমই উহার সাথে সম্পর্কিত হয় না। এরূপ অবস্থায় অর্ধ মহরানা দেয়া ওয়াজিব হয়। তার ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে যদি মরে যায়— সঙ্গম হলে যেমন পূর্ণ মহরানা পাওয়া অধিকার জন্মে এবং ইদ্দতও পালন করতে হয়— তাহরীমে সেই হুকুম কার্যকর করেছেন। শুধু আক্দ হলেই স্ত্রীদের মা'রা যে হারাম হয়ে যায় তার দলীল হলো وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীদের মারা (হারাম)। এ কথাটি وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ এবং তোমাদের পুত্রদের স্ত্রী'রা (ও হারাম) এই কথার মতো-ই অতি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। 'এবং তোমাদের পিতারা যে সব মেয়েলোক বিয়ে করেছে, তোমরা তাদের বিয়ে করবে না' কথাটিও তেমনি। অতএব এ সাধারণ ব্যাপক কথাকে বিশেষীকরণ করা যায় না। অবশ্য বিশেষীকরণের কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -

এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে, সে স্ত্রীদের কন্যারা যাদের সাথে তোমাদের সঙ্গম হয়েছে।

এ হুকুমটা বয়ে নিয়ে আসা ও লালিতা-পালিতা কন্যাদের সম্পর্কেই সীমিত। স্ত্রীদের মা'রা এর মধ্যে শামিল নয়। এর কয়েকটি কারণ আছে। একটি— এখানকার প্রত্যেকটি বাক্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে উল্লিখিত হুকুমটি বাধ্যতামূলক হওয়ার দিক দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের স্ত্রীদের মা'রা এবং তাঁর কথা ঃ তোমাদের লালিতা পালিতা সেসব কন্যা, যারা তোমাদের সেসব স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমাদের সঙ্গম হয়েছে' এর প্রতিটি কথাই

স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য কোন কথার উপর নির্ভরশীল নয়। এ শব্দের দাবি অনুযায়ীই তা কার্যকর হবে। অন্য কারুর সাথে তাকে সম্পর্কিত করা ছাড়া-ই। তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের স্ত্রীর মা'রা' স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য, তখন স্ত্রীদের মা'রাও সাধারণভাবেই হারাম হবে, সঙ্গম হওয়া সহকারে হোক, কি সঙ্গম ছাড়া-ই। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমাদের ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা তোমাদের স্ত্রীদের সেসব কন্যারা, যাদের সাথে তোমাদের সঙ্গম ঘটেছে'-ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য সম্বলিত কথা। অবশ্য এ কথাটিতে সঙ্গমের শর্ত করা হয়েছে। তাই একটি বাক্যকে অপর বাক্যের উপর ভিত্তিশীল মনে করা আমাদের জন্যে সঙ্গত নয়। বরং যেমন নিঃশর্ত ও সাধারণ বাক্য, তেমনি রাখা আবশ্যক। আর যেটি শর্তযুক্ত, সেটিকে শর্তযুক্ত রাখা-ই বাঞ্ছনীয়। তবে একটির অপরটির উপর হওয়ার ও তার শর্ত সাপেক্ষ হওয়ার দলীল পাওয়া গেলে তা-ই করতে হবে।

আর দ্বিতীয় হল, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং তোমাদের ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা তোমাদের সঙ্গমকৃতা স্ত্রীদের বয়ে নিয়ে আসা কন্যারা সঙ্গমকৃতা না হলে তোমাদের কোন দোষ নেই।' এখানে শর্তের উল্লেখ হয়েছে। এ শর্তটি অব্যাহতি দানের পর্যায়ে গণ্য। এর উহ্য শব্দের দিক দিয়ে এর অর্থ হবে ঃ 'তোমাদের স্ত্রীদের নিয়ে আসা তোমাদের কোলে লালিতা-পালিতা কন্যারাও তোমাদের জন্যে হারাম। তবে যেসব স্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গম করনি, তাদের কথা আলাদা। কেননা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক কথার মধ্যে যা শামিল হয়, তা থেকে কতক বাদ দেয়া হয়েছে এ কথা বলে। অর্থাৎ বাক্যের শেষাংশটুকু স্বতন্ত্র অর্থ দেয় পূর্ববর্তী কথা থেকে। আর 'ইস্তিসনা' (Exception)-র হুকুম হচ্ছে পরবর্তীর প্রতি ফিরে আসা যদি কোন দলীল থাকে পূর্ববর্তী কথার দিকে ফিরে যাওয়ার। আর তৃতীয়টি হচ্ছে সঙ্গমের শর্ত করে বাক্যের সাধারণ অর্থবোধক শব্দ থেকে বিশেষীকরণ। তা অবশ্যই মেয়েদের ক্ষেত্রে কার্যকর এবং স্ত্রীদের মা'দের প্রতি প্রত্যাবর্তনের ব্যাপার সম্পর্কে সংশয়। আর সংশয় দ্বারা সাধারণ তাৎপর্যকে বিশেষীকরণ অসঙ্গত। তাই তাহ্‌রীমের সাধারণত্ব স্ত্রীদের মা'দের ক্ষেত্রে তার পথে স্থিতিশীল। আর পরবর্তী হল, স্ত্রীদের মা'দের ব্যাপারে প্রকাশমান সঙ্গমকে প্রচ্ছন্ন করা। কেননা কথাটি এরূপ বলা ঃ 'তোমাদের স্ত্রীদের মা— সেই স্ত্রীদের যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ' খুব একটা ভাল হয় না। কেননা আমাদের স্ত্রীদের মারা তো আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে নয়। আর আমাদের স্ত্রীদের কন্যারাও আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে নয়। কেননা কন্যা তো তার মা থেকে, মা কন্যা থেকে নয়। স্ত্রীদের মা'দেরকে শর্ত দ্বারা প্রকাশমান করে কথা বলা যথার্থ কাজ হয় না। সহীহ্ হয় না তাকে প্রচ্ছন্ন বা উহ্য রাখা। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্‌র কথার অংশ ঃ مِنْ نِّسَائِكُمْ 'তোমাদের স্ত্রীদের থেকে .....' এটা কন্যাদের পরিচিতিমূলক কথা, স্ত্রীদের মা'দের পরিচিতি এটা নয়। উপরন্তু তোমাদের সেসব স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ' কথাটিকে যদি স্ত্রীদের মা'দের পরিচিতি ধরি, আর বাক্যটি এভাবে দাঁড় করি ঃ 'এবং তোমাদের স্ত্রীদের মা'রা— সেসব স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ, তাহলে লালিতা-পালিতা কন্যারা এর বাইরে পড়ে যাবে, তাদেরকে বাদ দিয়ে শর্তের হুকুমটা স্ত্রীদের মা'দের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তা নাযিল হওয়া 'নস'-এর পরিপন্থী হবে। প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীদের মা'দের ব্যাপারে নয়, লালিতা-পালিতা কন্যাদের ব্যাপারে এ সঙ্গমের শর্তটা

আরোপিত, অর্থাৎ সঙ্গম হয়েছে যে স্ত্রীদের সাথে তাদের বাহিত ও তোমাদের লালিতা-পালিতা কন্যারা।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইসমাঈল ইবনুল ফযল-কুতায়বাতা ইবনে সাঈদ ইবনে লহ্ইয়াতা, আমর ইবনে শুয়ায়ব, তাঁর— তাঁর দাদা, নবী করীম (স) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَاَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَاَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَاَةً فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَايَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ اُمِّهَا -

যে ব্যক্তি কোন মেয়েলোক বিয়ে করল, তার সাথে সঙ্গম করল, তার কন্যা নিকাহ্ করা সেই ব্যক্তির জন্যে হালাল নয়। যদি সঙ্গম না করে থাকে, তাহলে সেই মেয়েলোকের কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। আর যে ব্যক্তি কোন মেয়েলোক নিকাহ্ করল, তার সাথে সঙ্গম করেছে বা করেনি, উভয় অবস্থায়ই সেই ময়েলোকটির মা'কে সে নিকাহ করতে পারবে না।

আগের দিনের ফিকাহবিদদের লালিতা-পালিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে জুরাইয বলেছেন, ইবরাহীম ইবনে উবায়দ, ইবনে রাফায়াতা, সালিম ইবনে আওস, আলী ইবনে আবূ তালিব কার্‌রামাল্লাহু আজহাহু (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ লালিতা-পালিতা কন্যা যদি স্বামীর ক্রোড়ে না থাকে, ভিন্ন কোন শহরে বা জনপদে থাকে, পরে তার মা সঙ্গম হওয়ার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেই পালিতা কন্যাকে সে লোকটির বিয়ে করা জায়েয হবে। আবদুর রাজ্জাক ইবরাহীম এ কথা সম্পর্ক বলেছেন। ইবরাহীম ইবনে উবায়দ এই হাদীসটি ছাড়া অন্যত্র বলেছেন— সে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণনা। এ ধরনের কথা প্রমাণিত হয় না। তা সত্ত্বেও ইলমে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একে কেউ-ই কবুল করেন নি। কাতাদাতা খালাস আলী (রা) সূত্রে বলেছেন ঃ লালিতা-পালিতা কন্যা ও তার মা একই ধারায় চলবে অথবা তা এ হাদীসের বিপরীত। কেননা মার সাথে কোন পুরুষের সঙ্গম হলে তার কন্যাকে সে সেই ব্যক্তির জন্যে অবশ্যই হারাম করে দেবে। লালিতা-পালিতা কন্যাকেও তদ্রূপ বানিয়েছে। অতএব মা'র সাথে সঙ্গম হলে তার মেয়ে অবশ্যই হারমা হবে। অতএব এ মা তার ক্রোড়ে থাকুক কি না-ই থাকুক, তা সমান কথা। ইবরাহীম বর্ণিত এই হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আলী (রা) এ ব্যাপারে দলীল রূপে পেশ করেছেন আল্লাহ্র এ কথা ঃ এবং তোমাদের লালিতা-পালিতা কন্যা, যা তোমাদের ক্রোড়ে রয়েছে, যদি ক্রোড়ে না থাকে তাহলে সেই কন্যা হারাম হবে না। এ দলীলের উল্লেখ করায় প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি দুর্বল ও হালকা। কেননা হযরত আলীর মতো লোক এ ধরনের হাদীসকে দলীলরূপে গ্রহণ করতে পারেন না। আর তা এজন্যে যে, আমরা নিশ্চিত জানি যে, وَرَبَائِبُكُمْ কথাটির দাবি এ নয় যে, মেয়েটির মা'র স্বামীর নিকটই লালিত পালিত হতে হবে। তাহ্রীম-এর জন্যে তা একটি শর্ত। যদি স্বামীর নিকট লালিতা-পালিতা না হয়, তাহলে বুঝি সে হারাম হবে না। স্ত্রীর কন্যাকে رَبِيْبَةٌ 'লালিতা-পালিতা' বলা হয়েছে। কেননা সাধারণত এবং অধিকাংশই এ রকম

হয় যে, মা'র স্বামীই তাকে পালন-পালন করে। এ-ও জানা যে, এ অর্থের নামটা হওয়ার জন্যে বিশেষভাবে স্বামীরই নিকট তার লালন শর্ত হবে তার হারাম হওয়ার জন্যে। তেমনি 'তোমাদের ক্রোড়ে' আল্লাহ্‌র এ কথাটিও একটি সাধারণ ও প্রায়ই প্রচলিত হিসেবে বলা হয়েছে। কেননা মার স্বামীর কোলে এ ধরনের মেয়ের লালিতা-পালিতা হওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু হারাম হওয়ার এটা কোন শর্ত নয়, যেমন সে মেয়ের স্বামীর কোলেই লালিতা-পালিতা হওয়া শর্ত নয়। এই কথাটি রাসূল (স)-এর এই কথার মতোই, যেমন তিনি বলেছেন ঃ

فِىْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِىْ سِتٍّ وَثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنَ –

পঁচিশটি উট হলে একটি এক বছরের উষ্ট্রী এবং ছত্রিশটি উট হলে একটি তিন বছরের উষ্ট্র দিতে হবে।

এতে সেই এক বছরের বাচ্চারও দুই বছরের বাচ্চাকে মা'র সঙ্গে নিয়ে নেয়া শর্ত নয়। এটা একটা সাধারণ প্রচলিত ধরনের উপর বলা কথা। কেননা বাচ্চা দুই বছরে পড়লে সাধারণত মা'র সঙ্গেই থাকে, তিন বছরে পড়লেও মা'র সঙ্গ ছাড়ে না বেশির ভাগ বলা নিয়মের উপর ভিত্তি করে বলা এ কথা। 'তোমাদের ক্রোড়ে' কথাটিও ঠিক তেমনি। আবূ বকর বলেছেন ঃ যে পুরুষ দক্ষিণ হস্তের মালিকানা দ্বারা দাসত্বমুক্ত হয় তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আর দুধ পানের দিক দিয়ে মা ও বোনের দক্ষিণ হস্তের মালিকানার কারণে হারাম হওয়া নিশ্চিত। যেমন বিয়ের কারণে হারাম হয়। স্ত্রীর মা ও কন্যাও— যদি মা'র সাথে সঙ্গম হয়— হারাম হবে। সে দুজনার প্রত্যেকেই সেই পুরুষের জন্যে চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যাবে, যদি তার যে কোন একজনের সাথে সে পুরুষটির সঙ্গম হয়। তেমনি এ মা ও মেয়েকে তার দক্ষিণ হস্তের মালিকানা দ্বারা একত্রিত করাও কখনও জায়েয হবে না। উমর, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়েও কোন মতপার্থক্য নেই যে, নিকাহ্‌র দরুন সঙ্গমের কারণে যে তাহ্‌রীম হয়, তাও চিরদিনের জন্যে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ –

এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা 'হারাম'।

আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ বলেছেন, এ আয়াতটি নবী করীম (স) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, যখন তিনি জায়দের স্ত্রীকে (তালাক দেয়ার পর) বিয়ে করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে এই আয়াতটিও নাযিল হয়েছিল ঃ

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ –

তোমাদের মুখে-ডাকা পুত্রকে আল্লাহ্ ঔরসজাত পুত্র বানিয়ে দেন নি। (সূরা আহযাব ঃ ৪)

এবং

وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ -

মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কোন একজনেরও পিতা নয়। (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

রেওয়াজ অনুযায়ী বলা হতো জায়দ ইবনে মুহাম্মাদ— মুহাম্মাদ (স)-এর পুত্র জায়দ।

আবূ বকর বলেছেন حَلِيْلَةُ الْاِبْنِ 'পুত্রের স্ত্রী'। এ-ও বলা হয়েছে যে, তাকে حليه বলা হয় এজন্যে যে, সে তার পুত্রের সাথে শয্যায় একাকার হয়ে যায়। এ-ও বলা হয়েছে যে, যেহেতু পুত্র তার সাথে সঙ্গমে মিলিত হয় বিবাহের মাধ্যমে, এজন্যে তাকে এ নাম দেয়া হয়েছে। দাসীর যৌন অঙ্গ মালিকত্বের মাধ্যমে মুবাহ্ হলেও তাকে حليله বলা হয় না এবং তার সাথে পুত্রের সঙ্গম না হওয়া পর্যন্ত পিতার জন্যে সে হারাম হয় না। তার সাথে পুত্রের নিকাহ্‌র আকদ হলে অবশ্য সে তার পিতার জন্যে হারাম হবে চিরদিনের জন্যে। এ থেকে বোঝা যায়, حليله বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে একটি বিশেষ নাম। দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের সাথে এই নাম যুক্ত নয়। আর সঙ্গম ছাড়া শুধু নামের সাথেই তাহ্‌রীমের হুকুম সম্পর্কিত হয় না। কিন্তু পুত্রের স্ত্রীরা শুধু আক্‌দের কারণেই পিতার জন্যে হারাম হবে, সেখানে সঙ্গম হওয়ার শর্ত নেই। কেননা সঙ্গমকে শর্ত বানালে মূল কুরআনের 'নস'-এর উপর বাড়তি জিনিস ধার্য করা হবে।

এ ধরনের কাজে মনসূখ হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাতে আয়াত যা নিষিদ্ধ করেছে, তাকে মুবাহ্ বানানো হয়। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَلَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ —'যারা তোমাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে উৎসারিত।' দাদার জন্যে সন্তানের সন্তানের স্ত্রীকেও হারাম করে। আর তা প্রমাণ করে যে, সন্তানের সন্তানকে 'দাদার পৃষ্ঠপ্রসূত' বলা যায়। আয়াতের বক্তব্য সকলেরই মতে তাই। এতেই এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, সন্তানের সন্তান দাদার সাথে বংশের দিক দিয়ে সম্পর্কিত জন্মগতভাবে। এ আয়াতে পুত্রের স্ত্রীকে বিশেষভাবে 'পৃষ্ঠদেশ থেকে উৎসারিত' বলা হয়েছে এ অর্থে; যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ
فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا -

জায়দ যখন তার স্ত্রীর থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন আমরা তাকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম, যেন মুমিনদের জন্যে তাদের মুখে-ডাকা পুত্রদের ব্যাপারে— যখন তারা তাদের প্রয়োজন পুরা করে নেবে— কোনরূপ সংকট দেখা না দেয়। (সূরা আহযাব ঃ ৩৭)

এতে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা মুবাহ্ প্রমাণিত হয়েছে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ 'তাদের মুখে-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে প্রমাণ করে যে, পুত্রের حلية হচ্ছে পুত্রের স্ত্রী। কেননা উক্ত আয়াতে সেই حليه কেই স্ত্রী বলা হয়েছে। আর পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে حليه।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ -

এবং দুই সহোদর বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করবে (তা-ও হারাম) তবে আগে যা হয়েছে তা ভিন্ন কথা।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের দাবি হল, যে কোন দিক দিয়ে বোন হোক, দুই বোনকে একত্রে একজন পুরুষের স্ত্রীত্বে একত্রিত করা হারাম। ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থ এ-ই দাঁড়ায়। একত্রিত করার কয়েকটি রকম আছে দু'জনের উপরই আক্‌দ করা এক সাথে। তা করা হলে দুজনের একজনেরও বিবাহ সহীহ্ হবে না। কেননা এই আক্‌দ দ্বারা দুজনকে একত্রিত করা হয়েছে। সে দুজনার কোন একজনের বিয়ে জায়েয হবে, অন্য জনের বিয়ে জায়েয হবে না, তা-ও হতে পারে না। কেননা একজন অপরজন থেকে কোন দিক দিয়ে উত্তম নয়। আর আল্লাহ্ যখন সে দুজনকে একসাথে স্ত্রী বানানো হারাম করেছেন, তখন তাদের দুজনের একসাথে বিয়ে সহীহ্ হতে পারে না। দুই বোনকে একত্রিত করার এ-ও একটি পন্থা যে, প্রথমে একটিকে বিয়ে করবে, পরে অন্যটিকে। এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয়টির বিয়ে সহীহ্ হবে না। কেননা এ দ্বিতীয়টির বিয়ের কারণে দুই বোনকে একত্রিত করা হয় এবং দ্বিতীয়টির আক্‌দ নিষিদ্ধ অবস্থায় হয়। অবশ্য প্রথমটির আক্‌দ মুবাহ ও সহীহ্‌ভাবে সম্পন্ন হয়। তাই দ্বিতীয়টির বিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এ-ও এক প্রকারের একত্রিকরণ যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানার ভিত্তিতে সঙ্গমে দুবোনকে একত্রিত করা। তাতে প্রথমে একজনের সাথে সঙ্গম করা হবে, পরে করা হবে দ্বিতীয়জনের সাথে। তাতে তার মালিকত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ও বহিষ্কৃত করার আগেই। এ-ও এক প্রকারের একত্রিকরণ। এ ব্যাপারে আগের দিনের ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন মত ছিল। পরে সে মতদ্বৈততা দূর হয় এবং দক্ষিণ হস্তের মালিকানার ভিত্তিতেও দুই বোনকে একত্রিতকরণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে 'ইজমা' সংঘটিত হয়।

উসমান ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা দুজনই এ কাজকে মুবাহ্ বলেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, একটি আয়াত তাদের দুজনকে হালাল প্রমাণ করেছে। অপর আয়াত তাদের দুজনকেই হারাম ঘোষণা করেছে। উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, যুবায়র, ইবনে উমর আম্মার ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন ঃ দক্ষিণ হস্তের মালিকানায়ও দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয নয়। শবী বলেছেন, এ বিষয়ে হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন, একটি আয়াত তাদের দুজনকে হালাল করেছে, অপর আয়াত তাদের দুজনকে হারাম করেছে। তাই হারাম হওয়াই অধিক গ্রহণীয়। আবদুর রহমান আল-সুক্‌রী, মূসা ইবনে আইয়ুবুল গাফেকী, তাঁর চাচা আয়াস ইবনে আমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-কে দক্ষিণ হস্তের মালিকানায় দুই বোনকে একত্রিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাদের একজনকে সেই সূত্রে সঙ্গম করেছে, অপর জনকেও সঙ্গম করা যাবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, সঙ্গমকৃতাকে মুক্ত করে নেয়ার পর দ্বিতীয় জনের সাথে সঙ্গম করতে পারবে। আরও বলেছেন, স্বাধীন মুক্ত মেয়েলোকদের মধ্যে

যাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের দিক দিয়েও তাকে হারাম করেছেন। তবে চারজন স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। আম্মার থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে।

আবূ বকর বলেছেন, একটি আয়াত দুই বোনকে দক্ষিণ হস্তের মালিকানায় একত্রিত করা হালাল করেছেন বলে যে আয়াতটির ইঙ্গিত করেছেন, তা হল ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

এবং সেই সব নারীও তোমাদের জন্যে হারাম, যারা অন্য কারোর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, অবশ্য সেই সব নারী এর মধ্যে গণ্য নয়, যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানার অধীন হয়েছে।

আর অপর আয়াত তাদেরকে হারাম করেছে বলে যে আয়াতের কথা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হল ঃ

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ -

এবং দুই বোনকে তোমরা একত্রিত করবে তা-ও হারাম।

উসমান (রা) থেকে মুবাহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাহ্রীম ও তাহলীল— দুটোর কথাই বলেছেন। এ-ও বলেছেন যে, 'আমি এ কাজের আদেশও করছি না, নিষেধও করছি না।' তাঁর এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ হারাম হওয়াও চূড়ান্ত মনে করতেন না, হারাম হওয়াও চূড়ান্ত ভাবতেন না। তাই হতে পারে, তিনি তা মুবাহ মনে করতেন হয়ত; কিন্তু পরে তিনি এ ব্যাপারে স্থিতি গ্রহণ করেন, হ্যাঁ বা না কোন মত-ই প্রকাশ করতেন না। তবে হযরত আলী (রা) তাকে হারাম মনে করতেন চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে— এ কথার ভিত্তি এই যে, তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, নিষিদ্ধ ও মুবাহ দুটি যেখানে একত্রিত হবে, দুটিরই কারণ সমান-সমান হবে, তখন নিষেধই অগ্রাধিকার পাবে। এরূপ মত তখনই হতে পারে, যদি দুটি হুকুম নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। আর আমাদের হানাফী মায্হাবও তাদের কথাকেই প্রমাণিত করে। আমরা 'উসূলুল ফিকাহ' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আয়াস ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, তিনি আলী (রা)-কে বললেন, লোকেরা বলে, আপনি বলেন, একটি আয়াত তাদের হালাল বলে, অপর একটি আয়াত তাদেরকে হারাম করে ? তিনি বললেন, ওরা মিথ্যা কথা বলে। এ থেকে এই সম্ভবনা পাওয়া যায় যে, তিনি হয়ত আয়াত দুটির বক্তব্যে সমতাকে অস্বীকার করেছেন এবং এ ব্যাপারে যে লোক স্থিতি গ্রহণ করেছে— হ্যাঁ বা না কিছুই বলেন না, তার মত বাতিল হওয়ার কথাও বলেছেন, যেমন উসমান (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। কেননা তিনি শা'বীর বর্ণনায় বলেছেন ঃ একটি আয়াত তাদের দুজনকে হারাম করে, অপর একটি বর্ণনা তাদেরকে হালাল বলে এবং তাহরীম-ই অগ্রাধিকার পাবে। তিনি তা অস্বীকার করেছেন। একটি আয়াত তাদেরকে হালাল বলে, অপর একটি আয়াত তাদেরকে হারাম করে— এ কথা কেবল এ দিক দিয়ে যে, তাহলীল ও তাহরীমের আয়াত সেই দুটির বক্তব্য অসমতাপূর্ণ। বরং তাহরীম তাহলীল অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

আর অপর একটি দিক দিয়ে 'একটি আয়াত দুজনকে হালাল করে ও অপর একটি আয়াত দুজনকে হারাম করে'— কোনরূপ শর্ত কয়েদ ছাড়া সাধারণভাবে বলা একটা অপছন্দনীয় কথা। কেননা তার আসল দাবি হচ্ছে, একই অবস্থায় একটি কাজ মুবাহ্ হবে ও নিষিদ্ধও হবে। তাই হযরত আলী (রা) সম্ভবত এরূপ নিঃশর্ত কথাকে অস্বীকার করেছিলেন। আর যখন তা দুই দিকের কোন একটি দিক দিয়ে কয়েদযুক্ত ও চূড়ান্ত হবে, তাহলে অপর এক হাদীসের বর্ণনানুযায়ী জায়েয হতে পারে। দুইটি আয়াতেরই হুকুম যদি সমান সমান হয়, তাহলে তন্মধ্যে তাহরীম উত্তম ও গ্রহণীয় হবে এ দিক দিয়ে যে, নিষিদ্ধ কাজটির দরুন আযাব ভোগ করতে হবে। আর মুবাহ্ কাজ না করলে তো আযাব পাওয়ার কারণ ঘটে না। আর সতর্কতার দিক হল আযাব অনিবার্য হওয়ার কাজটি থেকে বিরত থাকা। এ ব্যাপারটি বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে অবশ্য বিবেচ্য। উপরন্তু দুটি আয়াতই তাহ্‌রীম ও তাহ্‌লীল অনিবার্য কারণে সমান নয়। কাজেই তার একটির ভিত্তিতে অপরটি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা জায়েয হবে না। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন কারণে উপস্থিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ -

তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করবে— তা হারাম।

সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণার জন্যে এসেছে।

যেমন ঃ

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ -

তোমাদের পুত্রদের স্ত্রী হারাম।

এবং

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ -

এবং তোমাদের স্ত্রীদের মা'রা-ও হারাম।

এই কথাটি তিনটি সুস্পষ্ট হারাম নির্দেশক। অন্যান্য যেসব আয়াত তাহ্‌রীম ঘোষণা করছে, তা-ও এই ধরনের কথা। আর-

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

এবং অন্যান্য লোকদের বিবাহ বন্ধনে বন্দী, তবে যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত।

আয়াতটি এমন হাদীসকে মুবাহ্ করে, যার দারুল হরবে স্বামী রয়েছে। এ দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে এবং এ দুজনের মধ্যে ইসমাত নিশ্চিত হবে। অতএব এ আয়াতটি যে জন্যে নাযিল হয়েছে, তাতেই তা ব্যবহৃত হবে। তা হল যুদ্ধবন্দী দাসী এবং তার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো এবং তাকে তার মালিক-মনিবের জন্যে হালাল করা। অতএব দুই বোনের মধ্যে একত্রিত করণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে উক্ত কথার ভিত্তিতে আপত্তি তোলা জায়েয হবে না। কেননা এ দুটির প্রতিটি আয়াত এক-একটি কারণে এসেছে, যা অপর আয়াতের কারণ থেকে

স্বতন্ত্র। অতএব যে কারণে নাযিল হয়েছে সেই একটি কারণের হুকুম দেয়ার ব্যাপারেই সেটি ব্যবহৃত হবে।

আর একটি কথা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তা হল সে আয়াতটি পুত্রদের স্ত্রীদের ও স্ত্রীদের মা'দের এবং অন্যান্য যাকে যাকে সে আয়াত হারাম করে তার পথে তা প্রতিবন্ধক হয় না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এ-ও সর্বসম্মত যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানার দৌলতেও পুত্রের স্ত্রী ও স্ত্রীর মা'র সাথে সঙ্গম করা জায়েয নয়। আর আল্লাহ্‌র কথা إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ। 'তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তাদের কথা আলাদা'— তাদেরকে বিশেষীকরণের কারণ হয়নি। কেননা তা এসেছে যে কারণে, অপর আয়াতটি সে কারণে অবতীর্ণ হয়নি। দুই বোন একত্রিতকরণ হারাম হওয়ার উপর প্রতিবন্ধক হওয়ার এবং হযরত আলী (রা) ও তাঁর অনুসারী সাহাবীদের 'যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত' কথাটি দ্বারা দুই বোন একত্রিকরণ হারাম হওয়ার পথ প্রতিবন্ধক হওয়া প্রমাণ করে যে, আয়াত দুটি যখন দুটি ভিন্ন ভিন্ন কারণে নাযিল হয়েছে— একটি নাযিল হালালকরণের জন্যে, অপরটি হারামকরণের জন্যে— প্রত্যেকটি তার সেই বিশেষীকরণে তার হুকুমের উপর কার্যকর হবে। সেটির দ্বারা অন্যটির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। দুটি হাদীসে যখন রাসূল (স) থেকে পাওয়া হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, তাহলে সে দুটির হুকুমও অনুরূপ হবে। আমরা 'উসুলুল ফিকাহ' কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেছি। তাছাড়া দুই বোন একত্রিতকরণ— একটিকে বিবাহ করে ও অপরটিকে দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের মাধ্যমে— নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তা এভাবে যে, একজন পুরুষের এক হবে বিবাহিতা স্ত্রী, পরে তার বোনকে ক্রয় করবে দাসী হিসেবে, সেই পুরুষটির পক্ষে এই বোনকে একসাথে সঙ্গমে শরীক করা জায়েয নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানার ক্ষেত্রেও দুই বোনকে একত্রিত করা সাধারণভাবে বিয়ের মাধ্যমে একত্রিত করার মতোই হারাম। এ জন্যে যে, আল্লাহর কথা ঃ 'তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করবে— তা হারাম' কথাটি সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। সর্ব ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। একজন পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনের দুই বোনের একসাথে আবদ্ধ হওয়া এভাবে যে, একজনকে তালাক দেয়া হল, তার তালাক ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তার বোনকে বিয়ে করাও সম্পূর্ণ হারাম। কেননা তাতেও সেই নিষিদ্ধ কাজটি হয়। এই ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রাপ্তার সন্তান জন্মিলে সেই ব্যক্তির সন্তানও বংশধর হওয়া প্রমাণিত হবে। বিয়ের কারণে স্ত্রী যে খরচাদি ও থাকার স্থান পাওয়ার অধিকারী হয়, ইদ্দত পালনকালেও অধিকার বহাল থাকবে। আসলে এসবই হচ্ছে দুই বোনকে একত্রিত করার বিভিন্ন পন্থা এবং তা নিষিদ্ধ দুই বোনকে একত্রিতকরণ নিষিদ্ধ বলে যে ঘোষণা হয়েছে, তার কারণে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করবে— তা নিষিদ্ধ, হারাম, বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত করাকে নিষিদ্ধ করেছে। অন্য কোন উপায়ে একত্রিত করা হলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

জবাবে তাকে বলা যাবে, তোমার একথা ভুল। কেননা দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের দ্বারাও দুই বোনকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সব ফিকহ্‌বিদই সম্পূর্ণ একমত। এ কথা

ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি। আর দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব তো বিবাহ নয়। এ থেকে আমরা জানলাম যে, কেবল বিবাহ দ্বারা দুই বোনকে একত্রিত করাই নিষিদ্ধ নয়, অন্য যে কোন ভাবেই করা হোক, তা নিষিদ্ধ। কেননা দুই বোনকে একত্রিত করার যত পন্থা আছে, তন্মধ্যে খাস করে কেবল বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত করা হারাম বললে বহু কারণের মধ্যে একটিকে বহু উপায় ও পন্থার মধ্যে মাত্র একটিকে চিহ্নিত করা হবে কোন দলীল ছাড়া-ই। কিন্তু তা কারোরই করা জায়েয নয়। অবশ্য এ বিষয়ে আগের আলিম ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, জায়দ ইবনে সাবিত (রা) ও উবায়দা সালমানী, আতা, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন ও মুজাহিদ প্রমুখ তাবেয়ী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সকলে বলেছেন, এক বোনের ইদ্দত পালনকালে তারই অন্য বোনকে বিয়ে করা সেই একই পুরুষের পক্ষে জায়েয নয়। তেমনি চারজন স্ত্রীর একজনের ইদ্দত পালন কালে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ জায়েয নয়। অনেকে ইদ্দতকে শর্তহীন ব্যবহার করেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, জুফার, সওরী, হাসান ইবনে সালিহ্ যে কোন ইদ্দত কালের কথা বলেছেন। আর উরওয়া ইবনুয যুবায়র, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও খালাস মত দিয়েছেন যে, বায়িন তালাকের ইদ্দত পালনকালে অপর বোন এবং পঞ্চম স্ত্রী বিয়ে করা জায়েয হবে। মালিক, আওজায়ী, লায়স ও শাফেয়ীও এ মত দিয়েছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আল-হাসান আতা থেকে— তাঁদের মত ভিন্ন। এঁদের প্রত্যেকের থেকে দুটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। একটি বিয়ে করতে পারবে। আর অপরটি— বিয়ে করতে পারবে না। কাতাদাতা বলেছেন, আল-হাসান তাঁর এ মত প্রর্ত্যাহার করেছেন। এক বোনের ইদ্দত পালনকালে তারই অপর বোনকে বিয়ে করতে পারবে, এ মত তিনি পরে অগ্রাহ্য করেছেন। আয়াতে প্রমাণ ও একত্রিতকরণ সাধারণভাবে হারাম হওয়া পর্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এ পর্যায়ে তা-ই যথেষ্ট। এক বোন যত দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালনে রত থাকবে ততদিন অপর বোনকে বিয়ে করা হারাম। একটু চিন্তা করলেই এ সিদ্ধান্তের যথার্থতা বোঝা যায়। দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের ভিত্তিতেও দুই বোনকে একত্রিত করা সম্পূর্ণ হারাম। এ বিষয়ে সকলেই একমত। এতে এ তাৎপর্যও নিহিত আছে যে, সঙ্গম মুবাহ হওয়া বিবাহের একটা রূপ। যদি বিয়ে ও আক্দ দুটির কিছু না-ও হয়, তবুও দুই বোনকে একত্রিত করা বিবাহেরই একটি রূপ। কেননা বংশীয় সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়া এবং খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থাকরণ ওয়াজিব হওয়া এক ধরনের বিবাহেরই অবস্থা। এ ভাবেও দুই বোনকে একত্রিতকরণ নিষিদ্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক।

যদি বলা হয়, একজনের স্ত্রীত্ব খতম হয়ে যাওয়ার পর-ও দুই বোনকে একত্রিত করণ কিভাবে হল ? কেননা তালাকের পরই সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নারী হয়ে গেছে। তিন তালাক দেয়ার পরও যদি তার সাথে সঙ্গম করে এই তালাকের ইদ্দত পালনের মধ্যে, তাহলে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হওয়া বাধ্যতামূলক হবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তালাক প্রাপ্তা ভিন্ন এক মেয়েলোক হয়ে গেছে, স্ত্রী থাকেনি। অতএব তখন তার বোন বিয়ে করা হারাম হবে কেন ?

জবাবে বলা যাবে, 'হদ্দ' ওয়াজিব হওয়ায় মূল অবস্থায় কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। ইদ্দতকালে সঙ্গম হলে পুরুষটির উপর যেমন 'হদ্দ' কার্যকর হবে তেমনি মেয়েলোকটির উপর-ও 'হদ্দ' হবে। কেননা সঙ্গম তো তার-ই সাথে করেছে। আর তা সত্ত্বেও তার বোন বিয়ে

করা জায়েয হবে না। প্রথম বিয়ে সঞ্জাত অধিকারে আর একজন স্ত্রীকে শামিল করা জায়েয হবে না। এ তালাকপ্রাপ্তা তালাকদাতা স্বামীর সাথে মুবাহ্ সঙ্গমে সম্মত হওয়ার দরুন তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও আর একজন স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করা জায়েয হবে না। দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ, সেই মেয়েলোকটি তার বিবাহের রজ্জুতে এখনও আবদ্ধ আছে। এরূপ অবস্থায় সে স্বামীর পক্ষে এ স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করে দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয হবে না। কেননা বিয়ে সঞ্জাত অধিকার এখনও অবশিষ্ট আছে, যদিও এ অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম হলে 'হদ্দ' জারী হওয়া অনিবার্য হবে।

এর আর একটি দলীল হল দুই বোনকে একত্রিকরণ বিয়ের উপায়ে হারাম। আর একত্রিতকরণের প্রক্রিয়া হিসেবে একজন স্বামীর নিকট থাকলে অপর স্বামী গ্রহণ করা হারাম। এ-ও দেখলাম যে, ইদ্দকাল চলার সময়ও একত্রিত করা নিষিদ্ধ, যা মূল বিয়ে দ্বারাও নিষিদ্ধ। তখন স্বামীর জন্যে সে-স্ত্রীর বোনকে তার ইদ্দতকালে বিয়ে করে একত্রিত করাও নিষিদ্ধ হবে। তার বিবাহ অক্ষুণ্ন থাকা অবস্থায় যেমন নিষিদ্ধ ছিল। কেননা ইদ্দতও তা একত্রিত করা নিষিদ্ধ করে, যা বিবাহ নিষিদ্ধ করে। কেননা ইদ্দতকালে বিয়ের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাই সেই সময় সে স্ত্রীর পক্ষে আর একজন স্বামীর সাথে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। ইদ্দত সম্পূর্ণ শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকবে। কেননা ইদ্দত-ও সেই একত্রিতকরণকে নিষিদ্ধ করে যা শুধু নিকাহ্ নিষিদ্ধ করে। যেমন করে ইদ্দত বিয়ের পর্যায়কে রক্ষা করে, ইদ্দত পালনকারীর জন্যে অপর স্বামী গ্রহণ যেমন নিষিদ্ধ করে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

যদি বলা হয়, এতে ব্যক্তিরও ইদ্দতের মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক করে, কেননা এ ইদ্দত-ই সে স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে নিষেধ করে সে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত।

জবাবে বলা যাবে, বোনকে বিয়ে করা হারাম হওয়া কেবল ইদ্দতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কেবল এজন্যেই আমরা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে নিষেধ করছি না; বরং এই নিষেধটাকে আমরা ইদ্দতকালীন সময়ের মধ্যে রেখেছি। বরং স্ত্রী যদি রিজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনেও রত থাকে, তবুও এ সময়ে তার বোনকে বিয়ে করা সেই স্বামীর জন্যে নিষিদ্ধ হবে। তাতে তো স্বামীকে ইদ্দত পালনের মধ্যে থাকতে হয় না, তালাকের পূর্বেও বোনের উপর অপর বোনের নিকাহ্র আক্দ করা এবং সেই অপর স্বামী গ্রহণ করা— এর প্রত্যেকটিই নিষিদ্ধ। তখন তাদের দুজনের একজন ইদ্দতের মধ্যে নয়। আর আল্লাহ্র কথা ঃ الا ما قد سلف 'তবে আগে যা হয়েছে, তার কথা আলাদা'— আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতাংশের তাৎপর্য আমরা বিশদভাবে আগে বলে এসেছি, যখন আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা সে সব মেয়েলোক নিকাহ কর না, যাদের নিকাহ করেছে তোমাদের পিতারা, তবে আগে যা হয়ে গেছে, তার কথা আলাদা— এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি। এর ব্যাখ্যায় যে বিভিন্ন মত রয়েছে এবং তাতে তর্কবিতর্ক রয়েছে, তা সবই উল্লেখ করেছি। দুই বোনকে একত্রিতকরণ হারাম ঘোষণা কালেও আল্লাহ এ কথাটি বলেছেন। তাই এ বাক্যাংশ সেখানে যে তাৎপর্য দিয়েছে, এখানেও ঠিক সেই তাৎপর্যই দেয়। অবশ্য এখানে অপর একটি তাৎপর্য-ও সম্ভব, যা পূর্বে উল্লিখিত বাক্যাংশে ছিল না। তা হল, দুই বোনের উপর অগ্রবর্তী আক্দ ভেঙ্গে যাবে না। শুধু এই করতে হবে যে, দুই বোনের মধ্যে থেকে একজনকে বাছাই করে নিতে হবে, অপরজনকে বাদ দিতে হবে। এর দলীল সেই

হাদীস, যা আবূ অহব আল-জিশানী দহাক ইবনে ফীরোজ দায়লামী, তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন— আমি যখন ইসলাম কবুল করেছিলাম, তখন দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে একত্রিত ছিল। আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ কথা বললাম। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ দুই জনের একজনকে তালাক দাও। অপর কোন বর্ণনায় রাসূলের কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ দুই জনের যাকে তুমি চাও, তালাক দিয়ে দাও। তখন তিনি দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা তাকে বলেন নি— 'যদি দুজনের আক্‌দ এক সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে থাকে।' আর দুইজনকে দুই আকদে বিয়ে করা হয়ে থাকলে শেষের জনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথাও বলেন নি। এ বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসও করেন নি কিছু। এতে বোঝা যায় যে, দুজনের সাথেই তার নিকাহ্ অবশিষ্ট ছিল। এ জন্যেই তাদের মধ্যে থেকে সে যাকে চায়, তাকে তালাক দিতে বলেছেন। এ কথাও বোঝা যায় যে, দুজনের সাথেই তার আক্‌দ সহীহ্ ছিল, তাহরীম নাযিল হওয়ার পূর্বে। তাদের বিয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে যে আক্‌দ-এর উপর তারা ছিল, তার উপর তারা স্থিতিশীলও ছিল।

যে কাফির লোক ইসলাম কবুল করে যখন তার স্ত্রী হিসেবে দুই বোন রয়েছে; কিংবা অনাত্মীয় পাঁচজন স্ত্রী রয়েছে, এমতাবস্থায় তার করণীয় কি, এ বিষয়ে শরীয়তবিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, সওরী বলেছেন, এদের মধ্যে থেকে প্রথম বিবাহিতা একজন ও পাঁচজন স্ত্রী হলে চারজন বাছাই করে নেবে, দুই বোনকে বা এই পাঁচজনকে একই আক্‌দে গ্রহণ করা হয়ে থাকলে এদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, মালিক, লায়স, আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, পাঁচজনের মধ্য থেকে যে চারজনকে ইচ্ছা বাছাই করে নেবে। আর দুই বোনের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হবে বাছাই করে নেবে। তবে ইমাম আওজায়ী থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, দুই বোনের মধ্যে প্রথমজনকে রাখবে আর অপর জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, প্রথম বিবাহিতা চারজনকে রেখে দেবে। তাদের কোন্ চারজন প্রথম, তা স্মরণ না থাকলে প্রত্যেককে তালাক দিয়ে দেবে, তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে তখন তাদের মধ্য চারজনকে নতুন করে বিয়ে করবে।

প্রথমোক্ত কথাটি সহীহ্। তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করবে— তা হারাম।' এতে শরীয়ত পালনে বাধ্য সব লোককেই সম্বোধন করা হয়েছে— নির্দেশটা তাদের সকলেরই প্রতি। কাফির ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে দুই বোনের নিকাহের আক্‌দ তাহরীমের উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর একজন মুসলিম ব্যক্তির আকদের মতোই ছিল বিপর্যস্ত ও বিনষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে। তাই তার ও অপরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো ছিল কর্তব্য। কেননা তার আক্‌দ আয়াত অনুযায়ী ভেঙে গেছে। যেমন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে যদি ইসলামের পর সেই বিয়ে থাকে। দলীল আল্লাহ্‌র সেই কথা ঃ 'এবং তোমরা দুই বোনকে স্ত্রীতে একত্রিত করবে— তা হারাম।' দ্বিতীয় জনের সাথে বিয়ে হওয়ার কারণেই দুই বোনের একত্রিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তা একই আকদের হয়ে থাকলেও, তা সবই ফাসাদপূর্ণ। কেননা সে কাজটাই নিষিদ্ধ কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট ঘোষণার কারণে। এতে আমাদের কথা দুদিক দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়। একটি আক্‌দটা নিষিদ্ধ হিসেবেই সংঘটিত হয়েছে। আর

নিষেধ অমান্য করাই ফাসাদ। আর দ্বিতীয়, সর্বাবস্থায়ই দুই বোনকে স্ত্রীতে একত্রিত করা নিষিদ্ধ। তাই ইসলাম গ্রহণের পরও তা তার এ আক্দকে টিকিয়ে রাখা হলে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজকে জায়েযকারী হবো আমরা। তাই যে আক্দের কারণে দুই বোনের একজন পুরুষের স্ত্রীতে একত্রিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, তা বাতিল প্রমাণিত হবে। চিন্তা-বিবেচনার দিক দিয়েও কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে দুই বোনকে একত্রে স্ত্রীত্বে বরণ করা কখনই জায়েয হতে পারে না। দুই বোনের উপর তার কোন আক্দকে বহাল রাখাও জায়েয নয়। আক্দের সময় দুজন পরস্পর বোন না হলেও পরে দুই বোন হলেও তা হারাম হবে। পরে দুই বোন এভাবে হতে পারে যে, এক ব্যক্তি দুই দুগ্ধপোষ্যকে বিয়ে করল, পরে কোন একজন সেই দুইজনকেই দুধ খাওয়াল। তাহলে এটা শুরুতেই দুই বোনকে বিয়ে করার মত ব্যাপার হয়ে গেল। এ দুজনকে একত্রিত করার নিষেধের মধ্যে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হলে যবীল হরমকে বিয়ে করার মত হবে। পূর্বে হওয়া বিয়ে টিকিয়ে রাখা ও শুরুতেই দুই বোনকে বিয়ে করার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, তা কাফির অবস্থায় হোক, কি ইসলাম গ্রহণের পর হোক। যখনই কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তখনই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা কর্তব্য হয়ে পড়বে। তখন এ ব্যাপারটি ইসলামে প্রথম আক্দ হওয়ার মতই হবে। তাই এ বিচ্ছেদ ঘটানো দুই বোনের ক্ষেত্রেও কর্তব্য হবে, কর্তব্য হবে চার-এর অধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রেও। শুরুতেই এ কাজ করা কিংবা পূর্বে হওয়া এ কাজকে টিকিয়ে রাখার মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য হবে না, তেমনি যবীল আরহামকে বিয়ে করাও তার থেকে ভিন্ন কিছু হবে না। ইসলামে তা সবই বিপর্যস্ত ও ভেঙ্গে দেয়ার হুকুম অনিবার্য। যেমন যবীল আরহাম পর্যায়ে আমরা বলেছি।

ইসলাম গ্রহণের পর যে লোক তা করেছে, সে পূর্বোল্লিখিত ফীরোজ দায়লামী বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছে। ইবনে আবূ লায়লা কর্তৃক হুমায়যাতা ইবনে শিমর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও তার দলীল। সে হারিস ইবনে কায়স থেকে বর্ণনা করেছে। সে বলেছে, আমি ইসলাম কবুল করার সময় আমার আটজন স্ত্রী ছিল। তাই তখন রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন তাদের থেকে চারজনকে বাছাই করে নেই। মা'মার জুহ্রী সালিম ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, গায়লান ইবনে সালামাতা যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল। রাসূলে করীম (স) তাকে বললেন— এদের মধ্য থেকে চারজনকে নিয়ে নাও। ফীরোজ বর্ণিত হাদীসটির শব্দগুলি প্রমাণ করে যে, আক্দ সহীহ্ ছিল এবং তা ছিল চার-এর অধিক হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ব্যাপার। কেননা তিনি বলেছিলেন ঃ 'এদের মধ্যে থেকে যে চারজনকে তুমি চাও।' এ থেকেই বোঝা যায় যে, ইসলামের পরও তাদের আক্দ বহাল ছিল। হারিস ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসটি থেকে মনে হয়, সম্ভবত আক্দ হয়েছিল তাহ্রীম নাযিল হওয়ার পূর্বে। ফলে তাহ্রীম নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা সহীহ্ ছিল। এ কারণেই তাদের মধ্যে থেকে চারজনকে বাছাই করার প্রয়োজন দেখা দেয় অপর সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার। যেমন এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। তাদের একজনকে তিন তালাক দিল। তাকে বলা যাবে, এদের মধ্যে থেকে যাকে চাও বাছাই করে নাও। কেননা আকদ তো সহীহ্ ছিল তাহরীম সম্মুখে আসার সময় পর্যন্ত।

যদি বলা হয়, যদি তা বিভিন্ন ব্যাপার হয়ে থাকত, তাহলে রাসূল করীম (স) নিশ্চয়ই তাকে আক্‌দের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।

জবাবে বলা যাবে, হতে পারে, খোদ নবী করীম (স) তা জানতেন, এ কারণে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তবে মামার কর্তৃক জুহরী, সালিম, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত গায়লান সংক্রান্ত কাহিনীর হাদীস সম্পর্কে বর্ণনাবিশারদগণ এ ব্যাপারে কোনই সংশয়ের মধ্যে নেই যে, তিনি এ বর্ণনায় ভুল করেছেন। এ হাদীসটির মূল জুহরীর হাদীস— যা মালিক জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন— থেকে বিচ্ছিন্ন করা অংশ। জুহরী বলেছেন, আমাদের নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, নবী করীম (স) সকীফ গোত্রের এক ব্যক্তিকে— যে ইসলাম কবুল করেছিল এমন সময়, যখন তার দশজন স্ত্রী ছিল— বলেছিলেন ঃ তুমি এদের মধ্য থেকে মাত্র চারজন বাছাই করে নাও। এ হাদীসটি উকাউল (বা আকীল) ইবনে খালিদ, ইবনে শিহাব জুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ সুয়াইদ সূত্রে এ কথা পৌঁছে যে, নবী করীম (স) গায়লান ইবনে সালমাতাকে বলেছিলেন ..... তাই এ হাদীস তার নিকট সালিম— তাঁর পিতা সূত্রে আসতে পারে ? তার পরে তা উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুয়ায়দ সূত্রে পৌঁছা বানিয়ে দিল কিভাবে ? বলা যায়, ভুলটা এসেছে এদিক থেকে যে, মা'মার-এর নিকট জুহরী থেকে পাওয়া দুটি হাদীস ছিল গায়লানের কাহিনী সম্বলিত। একটি এ হাদীস এবং তা উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ সুয়ায়দ থেকে পৌঁছা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি সালিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যাতে বলা হয়েছে যে, গায়লান ইবনে সালমাতা তার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছে হযরত উমর (রা)-এর সময়ে এবং তার ধান-মাল তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। তখন হযরত উমর (রা) তাকে বললেন ঃ তুমি যদি তোমার স্ত্রীদের ফিরিয়ে না নাও, আর না এনেই তুমি মরে যাও, তাহলে আমি তাদেরকে তোমার ওয়ারিস বানিয়ে দেব এবং তার পরে তোমার কবরের উপর 'রজম' করব নিশ্চিত জানবে, যেমন আবূ রিগালের কবরকে রজম করা হয়েছে।

এভাবে মা'মার ভুল করেছেন এবং এ হাদীসের সনদকে তার ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসের সনদ বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে দশজন স্ত্রী সহ তার ইসলাম কবুলের কথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনের হারাম হওয়ার ব্যাপারে যে 'নস' এসেছে, তা হল দুই বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করা সম্পর্কে। বহু মুতাওয়াতির হাদীসে স্ত্রীর সাথে তার ফুফু ও খালাকে একত্রে স্ত্রী বানানোর ব্যাপারেও স্পষ্ট-অকাট্য নিষেধ এসেছে। এ হাদীস হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, জাবির, ইবনে উমর, আবূ মূসা, আবূ সায়ীদুল খুদরী, আবূ হুরায়রা, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবী (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا وَلَا عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا - وَفِىْ بَعْضُهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرٰى وَلَا الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرَى -

১. মামার-তিনি মা'মার ইবনে রাশেদ আল-বসরী, পরে ইয়ামানী।

কোন মেয়েলোককে বিয়ে করা যাবে না তার ফুফু, তার খালা, তার ভাই-কন্যা ও বোনের কন্যা স্ত্রী থাকা অবস্থায়।

কোন কোন বর্ণনায় এ কথাও পাওয়া যায় যে, ছোট মেয়েকে বড়'র উপর, বড়কে ছোট মেয়েরে উপরও বিয়ে করা যাবে না।

এ সব বর্ণিত হাদীসের ভাষায় ও শব্দে পার্থক্য থাকলেও মূল বক্তব্যে পূর্ণ অভিন্নতা রয়েছে। জনগণ এসব হাদীস অন্তর দিয়ে কবুল করেছে, তা মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে যেমন এসেছে, তেমনি তা জনগণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতিও পেয়েছে। এ সব হাদীস থেকে নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত ইল্‌ম পাওয়া যায় এবং তদনুযায়ী আমল করা একান্ত কর্তব্য হয়ে দেখা দেয়। তাই কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এসব হাদীসের হুকুমকে কার্যকর করা আবশ্যক। অবশ্য খারেজী মতের লোকেরা সর্বসাধারণ মুসলমান থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করেছে। তারা দুই বোনকে ছাড়া অন্যান্য সব ধরনের মেয়েদেরকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করাকে মুবাহ মনে করেছে। তাদের দলীল হল দুই বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করার নিষেধের পর আল্লাহ্‌র বলা এ কথা ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ -

এসব ছাড়া (বা এর বাইরে) আর যারা যারা আছে, তাদের সকলকে একত্রিত করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

কিন্তু তারা এ মত গ্রহণ মারাত্মক ভুল করেছে এবং পরিণামে ইসলামের সরল সহজ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ্ যেমন বলেছে ঃ 'এর বাইরে সব মেয়েলোককে একত্রিত করা তোমাদের জন্যে হালাল। তেমনি এ-ও তো বলেছেন ঃ

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ -

রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছে— যা নিয়ে এসেছে তোমাদের নিকট, তা তোমারা গ্রহণ কর। (সূরা হাশর ঃ ৭)

আর সেই রাসূল (স) থেকে উপরোল্লিখিত মেয়েদেরকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করতে স্পষ্ট নিষেধবানী এসেছে। তাই বুঝতে হবে, রাসূল (স)-এর নিষিদ্ধ কাজ কুরআনের উক্ত নিষেধের মধ্যে নিহিত আছে। তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এদের বাইরে যারা, তাদেরকে একত্রিত করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে' দুই বোন সংক্রান্ত কুরআনী নিষেধের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে হবে। রাসূল (স) যে সব মেয়েকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন তা-ও নিষিদ্ধই মনে করতে হবে। আর কুরআনের এ আয়াতটি যে রাসূল (স)-এর নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসের আগেই নাযিল হয়েছে, তা না বললেও চলে। আল্লাহ্‌র এ কথা রাসূলের কথার পরে নাযিল হয়েছে, তা কিছুতেই মনে করা যেতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং এর বাইরে যা তা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে' যেমন মেয়েলোককে একত্রিত

করতে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে তাদের উল্লেখের শেষে বলা হয়েছে। কেননা 'যা এর বাইরে' এর অর্থ তো এ-ই হতে পারে যে, যাদেরকে একত্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছে তাদের ছাড়া অন্যরা সবই হালাল। দুই বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করা হারাম ঘোষণা নাযিল হওয়ার পূর্বে সে সবই মুবাহ্ ছিল। এ থেকে আমরা জানলাম, যাদেরকে হারাম করা হয়েছে, তাদেরকে একত্রিত করতে হাদীসেও নিষেধ করা হয়েছে। তা দুই বোনকে একত্রিত করতে নিষেধ করার পূর্বে তা হারাম ছিল না। হাদীস আয়াতের পূর্বের হতে পারে না বলে যখন নিশ্চিত হওয়া গেল, তখন তা অবশ্যই কুরআনী নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে হবে, না হয় হবে পরে পরে। যদি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে থাকে, তাহলে আয়াতটি বিশেষভাবে তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলে মনে করতে হবে, যারা হাদীসে উল্লিখিতদের বাইরে রয়েছে। হাদীসে যাদেরকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছে, আয়াতে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদের সম্পর্কে নিষেধ এসেছে। আর আমরা জানি নবী করীম (স) তাঁর উক্ত কথা নিশ্চয়ই আয়াতটি পাঠ করার পরই বলেছেন। তার অর্থ, তিনি উক্ত আয়াতের বিস্তারিত তাৎপর্য হিসেবেই তাঁর এ কথা বলেছেন। তাহলে আয়াতের শ্রোতৃমণ্ডলী একটি বিশেষ হুকুম হিসেবেই তা শ্রবণ করেছেন। আয়াতটির হুকুম যদি তার শব্দসমূহের সাধারণ তাৎপর্যের উপর স্থির হয়ে থাকে, আর তার পরে উক্ত হাদীস শ্রুত হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, হাদীসটি আয়াতের বিশেষ তাৎপর্যকে মনসূখ করেছে। আর এ ধরনের মুতাওয়াতির সর্বজন পরিচিত হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতে বিশেষ হুকুম মনসূখ হতেই পারে। উপরন্তু তা নিশ্চিত ইলম দানকারী ও তদনুযায়ী আমল ওয়াজিবকারী হাদীসের আওতা ও পর্যায়ভুক্ত। এক্ষণে আমরা যদি আয়াতটির নাযিল হওয়ার হাদীসটি বলার দিন তারিখ না জানতে পারি আর হাদীসটি সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয় সহকারে জানতে পারি যে, তা আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়নি। কেননা আয়াত হাদীসের পূর্বে নাযিল হয়নি যেমন একটু আগেই বলেছি। তাই এ হাদীসকে আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে একসাথে আমল করাই কর্তব্য। আর সর্বোত্তম মত হল আয়াত ও হাদীস এক সাথেই লোকদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। যেহেতু আমরা নিশ্চিতভাবে এ দুটির সম্মুখে আসার ইতিহাস জানি না, তাই আমরা নিজেরা কোন্টির আগে আসার ও কোন্টির পরে আসার কথা বলতে পারি না । আয়াতের কোন হুকুম তার দ্বারা মনসূখ হওয়ার কথাও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কেননা তার হুকুম স্থিতিশীল হওয়ার পরবর্তী ব্যাপারই হতে পারে। আর আয়াতটি তার হুকুমের সাধারণত্বের ও ব্যাপকতার উপর কখন স্থিতিশীল হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের জানা নেই, পরে হাদীস দ্বারা তার মনসূখ হওয়ার ব্যাপারটিই বা কখন ঘটল, তা-ও নিশ্চিত বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে এই কথায় যে, এ দুটি এক সাথেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর আয়াত ও হাদীসের অবতরণের তারীখ না জানার কারণে দুটির হুকুম এক সাথেই কার্যকর হওয়ার কথা মেনে নিতে হবে। যেমন ডুবে মরা লোক ও ঘর পড়ে গিয়ে মৃত লোকদের সম্পর্কে কার মৃত্যু আগে হয়েছে, তা যখন নিশ্চিত জানা যায় না, তখন বিশ্বাস করতে হবে যে, তাদের সকলের মৃত্যু এক সাথেই সংঘটিত হয়েছে।

স্বামীধারী মেয়েলোকদের বিবাহ করা হারাম

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ -

আর সেসব মেয়েলোক, যারা অন্য পুরুষের বিবাহ দুর্গে আটক ও সংরক্ষিত (তাদের বিয়ে করা হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে (তারা হারাম নয়)।

এ আয়াতাংশ অন্যান্য নিষিদ্ধ মেয়েদের উল্লেখের পর সংযোজিত। এর পূর্ববর্তী আয়াত হচ্ছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ -

তোমাদের প্রতি তোমাদের মা'দেরকে হারাম করা হয়েছে .....

এরপরও এ কথার সাথে সংযোজিত হয়েছে ঃ 'যারা অন্য পুরুষের বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত তারাও হারাম।'

সুফিয়ান হাম্মাদ, ইবরাহীম, আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত ঃ এবং যেসব মেয়েলোক বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত— দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েলোক ছাড়া— তারাও হারাম— তারা এর তাৎপর্যে বলেছেন। যেসব মুসলিম ও মুশরিক মেয়েলোক স্বামীধারী (অর্থাৎ যাদের স্বামী আছে) তাদের হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন, যেসব মুশরিক মেয়েলোকের স্বামী আছে, তারাও নিষিদ্ধ— হারাম। সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, স্বামীওয়ালী যে-কোন নারীকে বিয়ে করা যিনার পর্যায়ভুক্ত। তবে যারা দাসী হয়েছে, তারা এর মধ্যে নয়।

আবূ বকর বলেছেন, সাহাবী-তাবেয়ীন সকলেই একমত যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ -

স্বামী আছে এমন মেয়েলোকদের কথা বলা হয়েছে।

এসব মেয়েলোক বিয়ে করা হারাম, যত দিন তাদের স্বামী এবং তারা তাদের স্ত্রী হয়ে থাকবে।

'তবে যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত হয়েছে'— তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেসব মেয়েলোকের মালিক হয়ে রয়েছে— এ কথার ব্যাখ্যায় মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। আলী ইবনে আব্বাস (রা) একটি বর্ণনায় এবং উমর আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও ইবনে উমর (রা) বলেছে ঃ উক্ত আয়াতটি এসেছে এ কথা বলতে যে, যেসব যুদ্ধ-বন্দিনীর স্বামী আছে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানার বলে তাদের সাথে সঙ্গম করা মুবাহ। তবে তা যুদ্ধবন্ধী মেয়েলোক হতে হবে, তাদের স্বামী না হয়েও তাদের সাথে সঙ্গম করা যাবে। তাদের স্বামী থাকলে তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন মনে করতে হবে। মনীষীদের এ মত-ও ছিল যে, দাসীকে বিক্রয় করে দিলে তাতে তালাক হয় না, তার বিয়েও বাতিল হয়ে যায় না। ইবনে মাসউদ উবাই ইবনে

কাব, আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইকরামার বর্ণনায় ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, এ আয়াত সেই সমস্ত মেয়েলোকদের সম্পর্কে, যাদের স্বামী রয়েছে, তারা বন্দিনী হোক কি অন্য কোন মেয়েলোক। তারা এ-ও বলতেন যে, দাসীকে অন্য কারোর নিকট বিক্রয় করে দিলে তা-ই তার জন্যে তালাক। আর মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মায়সারাতা, ইয়াযীদ ইবনে জুরাই, সাঈদ, কাতাদাহ, আবুল খলীল, আবূ আল কামাতাল হাশিমী, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) একদল সৈন্য আওতাস নামক স্থানে পাঠালেন। সেখানে তারা শত্রুর সম্মুখীন হল, ঘোরতর যুদ্ধ হল, শত্রুর উপর তারা বিজয়ী হল, তাদের হাতে এমন সব মেয়েলোক বন্দী হল যাদের স্বামী আছে, তবে তারা মুশরিক। এ সময় মুসলমানগণ তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াতাংশ নাযিল করেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

'হ্যাঁ, বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত মেয়েরা (হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেসব মেয়েলোকের মালিক হয়েছে .....।

অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্যে হালাল— ইদ্দত শেষ হওয়ার পর। অর্থাৎ এ বন্দিনীদের ইদ্দত পালন করতে হবে। তারপর-ই তাদের সাথে সঙ্গম করা হালাল হবে। উল্লিখিত হয়েছে, হাদীস বর্ণনাকারী এই আল-কামা একজন মহান পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন ইয়ালা ইবনে আতা। তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ সাঈদ থেকে। আবূ হুরায়রা থেকে তাঁর বর্ণনা করা বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। এ হাদীসটির সনদ সহীহ্। এতে আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণ ও উপলক্ষ বিবৃত হয়েছে। আর এ আয়াতটি বন্দী নারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ।

ইবনে মাসউদও তাঁর সাথে একমত। লোকেরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত— স্বামী আছে— এমন সব মেয়েদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এদের মালিকত্ব লাভ হলে মালিকদের জন্যে এদের সাথে সঙ্গম করা হালাল। বন্দীত্বের কারণে তাদের ও তাদের স্বামীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

যদি বলা হয়, তোমরা কারণটিকে গুরুত্ব দিচ্ছ না। তোমরা শুধু ব্যবহৃত শব্দের হুকুমকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছ। যদি তা সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক হয়, তা হলে তা সেই সাধারণত্বের উপরই থাকবে, যদি বিশেষীকরণের কোন দলীল পাওয়া যায়, তা হলে সেই বিশেষীকরণই হবে। তাই এ আয়াতে সে দিকটি বিবেচিত হবে না কেন ? অথচ তুমি সে সব মেয়েলোককে-ই এর মধ্যে শামিল করছ, তাদের উপর দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব স্থাপিত হয়েছে, অথচ তাদের স্বামী আছে। এতে বন্দিনী ও অ-বন্দিনী সকলেই গণ্য হচ্ছে ?

এর জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি যে বিশেষভাবে বন্দিনীদের সম্পর্কে— তার প্রমাণ আয়াতটির বাহ্যিকতায়ই আছে। তা এজন্যে যে, আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

'এবং বিবাহ-দুর্গে রক্ষিত মেয়েলোক—তবে যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত।'

এ মালিকত্বের কারণে যদি বিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে সে বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিয়ই এ বন্দিনী মেয়েলোক ও তাদের স্বামীদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাকে যদি কোন মেয়েলোক ক্রয় করে কিংবা তার দুই ভাই-ও ক্রয় করে, তবুও সে সম্পর্ক ছিন্নই হয়ে গেছে মনে করতে হবে। কেননা এখানে মালিকত্ব এসে গেছে।

যদি বলা হয়— হ্যাঁ, যেসব মেয়েদের উপর মালিকত্ব কায়েম হয়েছে, সে সব মেয়েদের সম্পর্কেই ওকথা বলা যাবে। সে মালিকত্বের দরুন সঙ্গম মুবাহ হোক কিংবা না হোক, মুবাহ না হওয়ার অবস্থা এই হতে পারে যে, তার মালিক হবে কোন মেয়েলোক অথবা মালিক হবে এমন পুরুষ, যার তার সাথে সঙ্গম মূলতই হালাল নয়।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি কিন্তু সে সব লোকদের জন্যে, যাদের দক্ষিণ হস্ত মালিক হবে। ফলে তার সাথে সঙ্গম হালাল হবে। কেননা কথাটি বিবাহ বন্ধনে সংরক্ষিতা মেয়েদের— যাদের সাথে সঙ্গম বৈধ নয় তাদের থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলা। এ কারণে যাদের সাথে দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের সুযোগেও মালিকের পক্ষে সঙ্গম বৈধ নয়, তার কারণ এই হতে পারে যে, তাদের ও তাদের স্বামীদের মধ্যকার স্ত্রীত্ব-স্বামীত্বের সম্পর্ক পূর্ববৎ কায়েম রয়েছে আয়াতের হুকুম অনুযায়ী। আয়াতের হুকুম অনুযায়ী তা-ই যখন ওয়াজিব, তখন 'এবং বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত মেয়েলোক— তবে যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত— তাদের ছাড়া' কথাটি কেবলমাত্র বন্দী মেয়েদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হবে। আর তাদের ও তাদের স্বামীদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার কারণ দুই দেশের পার্থক্য হতে পারে, মালিকত্ব হওয়া নয়। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মালিকত্ব হওয়াটা বিচ্ছেদ ঘটার কারণ হয়নি। যেমন হাম্মাদ ইবরাহীম আল আসওয়াদ আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বুরায়রাতাকে ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দেন এবং তার পরিবারবর্গের সাথে ولا, বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষার শর্ত করলেন। পরে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এই ব্যাপারের উল্লেখ করলেন। শুনে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ الولاء لمن اعتق। 'বন্ধুত্ব তো তার জন্যে যে দাস মুক্তি দিয়েছে।'

এবং বুরায়রা তাকে বললেন ঃ 'এখন তুমি তোমার পথ ধর। গোটা ব্যাপার এখন তোমার নিজের নিকট।' সামাক আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম তাঁর পিতা— আয়েশা (রা) সূত্রেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। আর কাতাদাতা ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বুরায়রা তার স্বামী ছিল কৃষ্ণাঙ্গ দাস। তার নাম ছিল মুগীস। পরে রাসূলে করীম (স) এ বিষয়ে ফয়সালা দিলেন যে, الولاء। 'বন্ধুত্ব— শত্রুতাহীনতার— সম্পর্ক হবে তার সাথে যে দাসমুক্তির মূল্য দিয়েছে ও তাকে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছে।'

যদি বলা হয়, বুরায়রাতার প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, যা তিনি বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ بَيْعُ الْاَمَةِ طَلَاقُهَا দাসী বিক্রয়ই তাকে তালাক দান তুল্য কাজ। অতএব তাঁর ফয়সালা ঠিক তাই হবে, যার বর্ণনা করা

হয়েছে। কেননা নবী করীম (স) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধতা করা বর্ণনাকারীর পক্ষে জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, ইবনে আব্বাস থেকেই বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি বন্দী মেয়েলোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং দাসী বিক্রয় তার ও তার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয় না। তাই তাঁর থেকে যে কথার তিনি উল্লিখ করেছেন ঃ 'দাসী বিক্রয়ই তার তালাক', সম্ভবত তিনি তা বলেছিলেন তাঁর নিকট বুরায়রাতার ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে এবং বিশেষ করে নবী করীম (স) তাকে যে ইখতিয়ার দেয়ার কথা বলেছিলেন, তারও পূর্বে ক্রয় করার পর। পরে তিনি যখন বুরায়রার ব্যাপারটি শুনতে পেলেন, তাঁর কথা ফিরিয়ে নিলেন। 'দাসী বিক্রয়ই তার তালাক' কথাটি বলে হয়ত তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, স্বামী যখন তাকে ক্রয় করবে। কেননা মালিকত্ব হলে বিয়ের সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না।

চিন্তা-বিবেচনার সাহায্যেও প্রমাণিত হয় যে, দাসীকে বিক্রয় করলেই তার তালাক হয়ে যায় না। বিয়ে সম্পর্কও ভেঙ্গে যায় না। তা এজন্যে যে, তালাক তো স্বামী ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। তার নিজের তালাক দেয়া ছাড়া কিংবা তার দিক থেকে ঘটানো কোন কারণ ছাড়া তালাক সংঘটিত হয় না। তাই স্বামীর দিক থেকে যখন এ ব্যাপারে কোন কারণ ঘটেনি, তখন তালাক না হওয়াই সম্ভব। এর আর একটি প্রমাণ এই যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব নিকাহ-পরিপন্থী নয়। কেননা বিক্রয়ের পূর্বেই মালিকত্ব ছিল, অতএব তা নিকাহ্কে নিষেধ করে না। ক্রয়কারীর মালিকত্বও তার পরিপন্থী নয়।

যদি বলা হয়, ক্রয়কারীর মালিকত্ব যখন কায়েম হল, তার সাথে নিকাহ্ করতে সম্মতি ছিল না, তখন তো সে সম্পর্ক ভঙ্গ হয়ে যাওয়াই আবশ্যকীয় ছিল।

জবাবে বলা যাবে, তা ঠিক নয়। কেননা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মালিকত্ব নিকাহ পরিপন্থী নয়। আর তুমি যে তাৎপর্যের উল্লেখ করেছ, তা যদি গণ্য করতেই হয়, তাহলে নিকাহ ভঙ্গ করায় ক্রয়কারীর ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু তা কারোরই কথা নয়। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং তাঁর অনুসারীরা মালিকত্বের উদ্ভব হওয়ার সাথে সাথে নিকাহ ভঙ্গ হওয়ার পক্ষপাতী, তা-ই তাদের পছন্দ!

স্বামী-স্ত্রী— দুজনই এক সঙ্গে বন্দী হলে কি অবস্থা হবে, সে বিষয়ে ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফার বলেছেন, দুইজন যুধ্যমান ব্যক্তি একসঙ্গে বন্দী হলে এবং তারা দুইজন স্বামী-স্ত্রী হলে তারা তাদের বিবাহ সম্পর্কের উপর স্থিতিশীল থাকবে। আর তাদের একজন যদি অন্যজনের আগে বন্দী হয় এবং সে দারুল ইসলামে নীতি হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে যাবে— বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। সওরীরও এই মত। আওজায়ী বলেছেন, দুজন একসঙ্গে বন্দী হলে এবং বন্দী বন্টনেও তারা দুজন একজন মালিকের মালিকানায় এসে গেলে তাদের বিবাহ সম্পর্ক বহাল থাকবে। কোন একজন যদি দুজনকেই একসঙ্গে ক্রয় করে নেয়, তাহলে সে ক্রয়কারী মালিক ইচ্ছা করলে তাদেরকে একত্রিত রাখতে পারে এবং চাইলে দুজনকে বিচ্ছিন্ন ও বিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে পারে। আর দাসীকে সে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিতেও পারে অথবা তাকে অপর একজনের

নিকট বিবাহও দিতে পারে। অবশ্য এক হায়যকাল অপেক্ষার মাধ্যমে তার গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত হওয়ার পর। লায়স ইবনে সা'দও এই মত দিয়েছেন। আল হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, কোন স্বামীওয়ালী মেয়েলোক বন্দী হলে দুই হায়য পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করাতে ও তার গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ করতে হবে। কেননা তার স্বামী-ই তাকে পাওয়ার বেশি অধিকারী, যখন সে তার তালাকজনিত ইদ্দত পালনে রত থাকা অবস্থায় আসবে। আর যাদের স্বামী নেই, তাদেরকে এক হায়যের ইদ্দত পালন করতে হবে।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, মেয়েলোক যখনই শত্রুপক্ষের নিকট বন্দী হয়, তখনই সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার স্বামী তার সঙ্গে থাকুক আর না-ই থাকুক।

আবূ বকর বলেছেন, প্রমাণিত হয়েছে, মালিকত্ব উদ্ভূত হওয়া বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে না। তার প্রকাশ ক্রীত ও মীরাসে প্রাপ্ত দাসী। অতএব শুধু বন্দী হওয়াটাই বিয়ে ভঙ্গের কারণ হবে না। কেননা সেখানে মালিকত্বের উদ্ভব হওয়ার অধিক তো কিছুই ঘটেনি। আর তার দ্বিতীয় প্রমাণ, সে নারীর উপর দাসত্ব চেপে বসা নতুনভাবে আক্‌দকে নিষিদ্ধ করে না! তাই সে আক্‌দ বহাল থাকাই উত্তম। কেননা নতুন করে তার সাথে আক্‌দ করা অপেক্ষা পূর্বের বিবাহ স্থায়ী থাকাই অধিক তাগিদপূর্ণ। লক্ষণীয়, অনেক কাজ এমন যা নতুন করে করা নিষিদ্ধ হতে পারে, যদিও আগে করাকে স্থায়ী ও বহাল রাখা নিষিদ্ধ করে না। যেমন সন্দেহক্রমে করা সঙ্গমের দরুন ইদ্দত পালনে উদ্যত হওয়া নতুন করে আক্‌দ করাকে নিষিদ্ধ করে। কিন্তু আগের আক্‌দকে বহাল রাখা নিষিদ্ধ করে না।

অবশ্য বিভিন্ন মতের লোকেরা একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারে। হাদীসটি আওতাস যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে আবূ সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত। তাতে এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণও বলা হয়েছে। তা হল 'এবং বিয়ের দুর্গে সংরক্ষিত মেয়েরা (হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তাদের ব্যাপার আলাদা।'

এ আয়াতে যেসব মেয়েলোক তাদের স্বামীসহ বন্দী হয়েছে এবং যারা একাই বন্দী হয়েছে, এদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

এই হাদীসকে তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করার জবাবে বলা যাবে, হাম্মাদ আল-হাজ্জাজ খাদেমুল মক্কী মুহাম্মাদ ইবনে আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আওতাস যুদ্ধের দিন পুরুষরা সকলে পাহাড়ে পালিয়ে যায় আর মেয়েরা সব বন্দী হয়। তখন মুসলিম বিজয়ীরা বলতে লাগলেন, 'আমরা কি করব, ওদের তো স্বামী রয়েছে? তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ বিবাহের দুর্গে সংরক্ষিতারা (হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তারা নয়।'

আল্লাহ্ এ আয়াতাংশের দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, বন্দী মেয়েলোকদের স্বামীরা পাহাড়ে পালিয়ে গেছে এবং মেয়েলোকেরা একলারা— স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। আয়াত তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তা ছাড়া হুনায়নের যুদ্ধে নবী করীম (স) কোন পুরুষকে বন্দী করেন নি। যুদ্ধের ইতিহাস লেখকদের ইতিহাস তার প্রমাণ। পুরুষদের অনেকেই নিহত হয়েছিল কিংবা পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল। বন্দী করেছিলেন কেবল

মেয়েলোকদেরকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পুরুষরা সব ফিরে এসে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট প্রার্থনা করল তাদের স্ত্রী বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার জন্যে। তখন নবী করীম (স) বললেন, যেসব মেয়ে বন্দী আমার ও আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকদের ভাগে পড়বে, তাদেরকে তোমরা ফেরত পাবে। তিনি অন্যদেরকেও মেয়েদেরকে ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু তাদের অনেকেই অস্বীকার করলেন। এ-ই ছিল ঘটনা। যারা মেয়েদের আটক করেছিলেন, তাদের মাথাপিছু পাঁচ ভাগ পড়েছিল। লোকেরা বন্দী মেয়েদেরকে পরে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই মেয়েদের সাথে তাদের স্বামীরা বন্দী হয়নি। এর পর-ও 'এবং বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিতা মেয়েরা (হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তারা নিষিদ্ধ নয়' কথাটির সাধারণত্বকে যদি যুক্তি হিসেবে পেশ করে-যে এতে কাদের সঙ্গে স্বামী আছে, আর কারা স্বামীহীন অবস্থার তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি, তারা সকলেই হারাম আওতা থেকে বাইরে। তাহলে জবাবে বলা হবে, আমরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছি যে, মালিকত্বের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার জন্যে কোন হুকুম আসে নাই। কেননা যদি তা-ই হতো, তাহলে ক্রীতদাসী ক্রয়েও বিচ্ছেদ ঘটা অবশ্যম্ভাবী হতো। দাবি 'হেবা' করলেও তা-ই হতো। মীরাসে প্রাপ্তিতেও তা হতো। কেননা উদ্ভূত মালিকত্বের এই সব হচ্ছে বড় বড় কারণ। তাই, তা যখন হয় না, তেমনি আমরা জানতে পেরেছি যে, মালিকত্ব উদ্ভূত হওয়ার কারণের সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটার কোন সম্পর্ক নেই। এভাবেই আমরা আয়াতটির আসল বক্তব্য জানতে পারি। তা এজন্যে যে, বন্দীনীর বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ ঘটা দুটির কোন একটি দিক দিয়েও আল্লাহর লক্ষ্য নয়,— সে দুটি হচ্ছে— হয়, স্বামী-স্ত্রীর দুই দেশী হওয়ার কারণ ঘটবে কিংবা মালিকত্বের উদ্ভব ঘটবে। এর পর সুন্নাতের দলীল পাওয়া গেছে। মালিকত্ব উদ্ভূত হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ ঘটা অনিবার্য না হওয়ার ব্যাপারে প্রতিপক্ষও আমাদের সাথে একমত হয়েছে। এ থেকেই আয়াতের বক্তব্যটা চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়াল। তা হল, দুই দেশ হওয়ার পার্থক্য, আয়াতটি বিশেষভাবে বন্দী মেয়েদের ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে, তাদের স্বামীদের ব্যাপারে নয়।

এ থেকে বোঝা যায়, আমরা যে দুই দেশের পার্থক্যের কথা বলেছি, তা-ই হচ্ছে আসল তাৎপর্য। সে দুজন স্বামী ও স্ত্রী যদি মুসলিম বা যিম্মী হয়ে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে না। কেননা তারা দুইজন দুই দেশের অধিবাসী নয়, একদেশেরই অধিবাসী। এ থেকে বোঝা গেল, বন্দী মেয়ে ও তার স্বামীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটবে যদি সে মেয়েরা একক ও স্বামীহীন অবস্থায় আসে তবে। কেননা তখন দুই কথা হওয়ার পার্থক্য ঘটে গেছে। তার আর একটি প্রমাণ এই যে, শত্রুপক্ষের মেয়ে যদি মুসলিম হয়ে বা যিম্মী হয়ে আমাদের নিকট আসে, তার স্বামী যদি তার সঙ্গে না আসে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। হিজরতকারী মেয়েদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই হুকুম-ই জারী করেছেন তাঁর এ কথাটির মাধ্যমে ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

তোমরা যদি সে মেয়েদেরকে তাদের মহরানা দিয়ে বিবাহ কর, তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। (সূরা মুম্‌তাহানা ঃ ১০)

এরপর বলেছেন ঃ

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -

আর তোমরা নিজেরাও কাফির মেয়েদেরকে নিজেদের বিবাহে আটকে রেখো না।

(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেসব মেয়েদের উপর মালিকত্ব পেয়েছে, তাদের কথা আলাদা।

এর দাবি হল, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের কারণে দাসীদের সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হবে। তবে নবী করীম (স) থেকে একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আমর ইবনে আওন সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, বলেছেন— শরীক কায়স ইবনে অহব আবুল অদাক, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) আওতাস যুদ্ধের নারী বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ গর্ভবতীদের সাথে সঙ্গম করা যাবে না, যতদিন না সে সন্তান প্রসব করছে। আর যে গর্ভবতী নয়, তার সাথেও সঙ্গম করা যাবে না এক হায়য অতিক্রম করা ব্যতীত।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, সাঈদ ইবনে মনসূর-আবূ মুআবিয়া, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ইয়াযীদ ইবনে আবূ হুবায়ব, আবূ মারজুক হনশান আলী রুয়ায়ফা' ইবনে সাবিতুল আনসারী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, একদা আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানরত থেকে বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে ঠিক সে কথাটাই শোনাব, যা আমি নিজে রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি। হুনায়ন যুদ্ধের দিন ঃ আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন লোকের পক্ষে তার বীর্যকে অপরের চাষকার্যে ফেলে নষ্ট করা— যতক্ষণ এক হায়য দ্বারা তার গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ না করা হবে— কখনই হালাল হতে পারে না।' আবূ দাউদ বলেছেন, এখানে ।لاستبرا। শব্দটি ব্যবহার করা— আবূ মুআবিয়া বর্ণনাকারীর একটা বিভ্রান্তি। আবূ সাঈদ বর্ণিত হাদীসে তা সহীহ্ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, নুফাইলী, মিসকীন, শুবা, ইয়াযীদ ইবনে খুমায়র, আবদুর রহমান ইবনে হুবায়ব ইবনে নুফাইর তাঁর পিতা আবুদ দারদা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন— রাসূলে করীম (স) একটি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি মেয়েলোককে দেখলেন— তার সন্তান প্রসবের সময় সমুপস্থিত। নবী করীম (স) বললেন, সম্ভবত এই মেয়েলোকটির মালিক-মনিব তাকে খুবই পীড়ন করেছে। লোকেরা বলল হ্যাঁ, তাই হবে। তিনি বললেন, আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি যে, আমি তার উপর এমন লা'নৎ করব, যা তার সাথে তার কবরে প্রবেশ করবে। কেমন করে তার ওয়ারিস বানাবে, সে তো তার জন্যে হালাল হয় না, সে কি করে তার খেদমত করবে, সে তার জন্যে হালাল নয়।

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে লোক কোন দাসীর মালিকত্ব নতুন করে লাভ করল, সে গর্ভবতী হলে তার গর্ভ প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ, গর্ভের

পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ও তার সাথে সে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ, গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্তও তার সাথে সে সঙ্গম করতে পারে না। এই যেমন বললাম, বন্দী মেয়ে লোকের গর্ভের পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ পাওয়া একান্ত আবশ্যক ও জরুরী হওয়ার ব্যাপারে দেশ-বিদেশের ফিকাহবিদদের কোনই মতপার্থক্য নেই। তবে আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, সেই মেয়েলোকের দুই হায়য পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা কর্তব্য যদি তার স্বামী দারুল হরবে থাকে। আমরা আবূ সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীস একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে এক হায়যের অপেক্ষা পালনের মাধ্যমে গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক হয়। আর গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ করা কোন ইদ্দত নয়। কেননা তা যদি ইদ্দত হতো, তা হলে নবী করীম (স)— তাদের মধ্যে যার স্বামী আছে ও যার স্বামী নেই এদের মধ্যে— তিনি অবশ্যই পার্থক্য করতেন। ইদ্দত তো স্বামীর তালাক বা মৃত্যুর কারণে পালন করতে হয়। যার স্বামী শয্যা নেই, তার এই এক হায়য অপেক্ষা করা কোন ইদ্দত হতে পারে না, তাকে ইদ্দত বলে না।

যদি বলা হয়, পূর্বে উল্লিখিত আবূ সাঈদের হাদীসে বলা হয়েছে, 'তাদের ইদ্দত সম্পূর্ণ ও নিঃশেষ হলে ....' এই অপেক্ষাকে এ হাদীসে ইদ্দতই তো বলা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, হয়ত এ শব্দটি হাদীসের বর্ণনাকারীর নিজের জুড়ে দেয়া এবং তা কথার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা। গর্ভের শূন্যতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রমাণের জন্যে এক হায়য অপেক্ষা করাকে বর্ণনাকারী নিজ থেকে শব্দটি যোগ করে বোঝাতে চেয়েছেন। আর এভাবেও 'ইদ্দত' বলা হয়ে থাকতে পারে যে, তার মূল উদ্দেশ্য তো গর্ভের শূন্যতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ করা। এ জন্যে তার উপর 'ইদ্দত' নামটা চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তা পরোক্ষ অর্থে মাত্র।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর আর একটি ব্যাখ্যা বলা হয়েছে। জমুয়া জুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন المحصنت শব্দের অর্থ ذوات الازواج স্বামীধারী মেয়েলোক। আর তা 'আল্লাহ্‌র যিনা হারাম করেছেন' এই কথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মা'মর ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা সূত্রে উক্ত আয়াত পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ 'আমি তোমার নিকট বিবাহ দিলাম তোমার দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েকে। বলেন, 'আল্লাহ্ যিনা হারাম করেছেন'। তুমি তোমার দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বভুক্ত মেয়েলোক ছাড়া আর কোন মেয়েলোকের সাথে সঙ্গম করবে— তা তোমার জন্যে হালাল নয়। ইবনে আবূ নুজাইহ্ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, والمحصنت من النساء الا ماملكت ايمانكم এ আয়াতাংশে যিনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আতা ইবনুস সায়েব বলেছেন, প্রত্যেক 'মুহসিনা'— 'বিবাহ দুর্গে সংরক্ষিতা মেয়েলোক' তোমার জন্যে হারাম, তবে যে মেয়েলোক বিয়ের মাধ্যমে তোমার মালিকানাভুক্ত হবে, তার সাথে তোমার সঙ্গম হারাম নয়।

আবূ বকর বলেছেন, এই সব লোকের মতেই এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, স্বামীধারী মেয়েলোক হারাম, তাদের স্বামীদের জন্যে হারাম নয়। আল্লাহ্ তাঁর এ আয়াতটি দ্বারা এই বক্তব্য বলতে চেয়েছেন, তা অসম্ভব নয়। কেননা ব্যবহৃত শব্দে এরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। তবে সাহাবীগণ এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা এ আয়াতের লক্ষ্য হওয়াও নিষিদ্ধ

নয়। আর তা হচ্ছে, যে সব বন্দী মেয়েলোকের স্বামীরা যুদ্ধরত শত্রুপক্ষের লোক তাদের সাথে সঙ্গম করা মুবাহ। তাহলে দুটো ব্যাপারে তা প্রযোজ্য। আর সবচাইতে প্রকাশমান কথা, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত বলে দাসীদের বোঝানো হয়েছে, স্ত্রীদের নয়। কেননা আল্লাহ্-ই স্বামীহীনা ও স্বামীওয়ালীদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ- اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُهُمْ -

মুমিন লোকদের আর একটি পরিচিতি হচ্ছে, তারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে কিংবা তাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে (দাসী), তাদের থেকে নয়। (সূরা মুমিনুন ঃ ৫-৬)

এ আয়াতে দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েদেরকে স্ত্রীদের আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, আর এই প্রয়োগ মালিকানাভুক্ত স্বামীহীনাদের শামিল করেছে, স্ত্রীরা শামিল নয়, আর প্রকৃতপক্ষেও তাই। কেননা স্বামী তার স্ত্রীর কোন কিছুর মালিক হয় না। তার সাথে সঙ্গম করতে পারে শুধু, তা তার জন্যে মুবাহ। স্ত্রীর মালিকানায় যে যৌনাঙ্গ রয়েছে, তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে শুধু। কিন্তু সেই অঙ্গের মালিকত্ব তার হয় না। লক্ষণীয়— যদি কোন মেয়ে কোন স্বামীর স্ত্রী থাকা অবস্থায় কারুর দ্বারা সন্দেহক্রমে সঙ্গমকৃতা হয়, তাহলে মহরানা সে পাবে, স্বামী নয়, এ থেকে প্রমাণিত হল যে, স্বামী স্ত্রীর কোন কিছুর মালিক হয় না, তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ- اِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ —তার উপর ব্যবহৃত হবে, যে প্রকৃতই তার মালিক হয়, আর সে হচ্ছে বন্দী মেয়ে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ —'আল্লাহ্‌র কিতাব তোমাদের উপর'। উবায়দাতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, চারজন। আল্লাহ্‌র কিতাব এই নিসাব নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কেননা ফিকহবিদগণ বলেন, কিতাবুল্লাহ্ আলায়কুম' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তা লিখে দিয়েছেন, এ-ও বলা হয়েছে যে, তা হারাম করেছে তোমাদের প্রতি লিখিতভাবে। তা যে ওয়াজিব, তা-ই তাগীদ হচ্ছে এই কথাটুকু এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে তা ফরয করা সম্পর্কে সংবাদ দান। কেননা 'কিতাব' অর্থই হচ্ছে ফরয করা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ -

তোমাদের এ সবের বাইরে যা আছে, তা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

উবায়দাতা আস্-সালমানী ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এর অর্থ ঃ 'পাঁচজনের কম তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এ ভাবে যে, তোমরা তোমাদের ধন-মালের ব্যয়-বিনিয়োগের মাধ্যমে বিবাহের পন্থায় তা পেতে চাইবে। আতা বলেছেন ঃ তোমাদের নিকটবর্তীদের মধ্য থেকে যবীল আরহাম মেয়েলোক বাদে যারা আছে, তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। আর কাতাদাতা বলেছেন ঃ 'তোমাদের এসবের বাইরে (বা এদের ছাড়া) যারা বলে তাদের বুঝিয়েছেন, দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছেন। এ-ও বলা হয়েছে,

যবীল আরহাম মেয়েলোক ছাড়া যারা। আর যা চারজনের বেশি, তাদেরকে ধন-মাল দিয়ে বিয়ের মাধ্যমে পেতে চাইবে অথবা দক্ষিণ হস্তের মালিকানা হিসেবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতে এবং সুন্নাতে রাসূলে যে মুহাররম মেয়েদের উল্লেখ হয়েছে তাদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েই এর অন্তর্ভুক্ত।

মহরানা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ -

এ আয়াতে মুবাহ হওয়ার শর্ত করা হয়েছে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় দানের। তা হচ্ছে ধন-মাল-টাকা-পয়সা। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময়। যে জিনিস দিয়ে তা পাওয়ার অধিকার জন্মে, তা হল মাল দেয়া। আর দ্বিতীয় হচ্ছে মহরানা, যা নির্দিষ্ট পরিমাণের ধন-মালের নামকরণ করা হয়। যেমন 'তোমাদের প্রতি তোমাদের মা ও তোমাদের কন্যাদের হারাম করা হয়েছে'— আল্লাহ্‌র এ কথাটি প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে বলা যে, তার মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম। এতে এই কথার দলীলও আছে যে, 'মহরানা' এমন কিছু হতে পারে না, যাকে 'মাল' বা 'সম্পদ' বলা হয় না।

মহরানার পরিমাণ সম্পর্কে ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ —'ছয় দিরহামের কমে কোন মহরানা হতে পারে না।' তাবেয়ীনের মধ্য থেকে শবী ও ইবরাহীমও এ কথা বলেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও হাসান ইবনে জিয়াদও এই কথাই বলেছেন। আবূ সাঈদুল খুদরী, আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও আতা বলেছেন, বিয়ে কম মহরানাতেও হয়, বেশি পরিমাণের মহরানায়ও হয়। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক দানা পরিমাণ ওজনের স্বর্ণের মহরানা দিয়ে বিবাহ করেছিলেন। এই বর্ণনায় কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, সে এক দানা পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য তিন দিরহাম ও এক-তৃতীয়াংশ দিরহাম ছিল। অন্যান্যরা বলেছেন, এক দানা স্বর্ণ দশ কিংবা পাঁচ দিরহাম মূল্য হয়।

ইমাম মালিক বলেছেন, স্বল্পতম পরিমাণের মহরানা হচ্ছে এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ। ইবনে আবূ লায়লা, লায়স, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন, কম সম্পদেও বিবাহের মহারানা হয়, বেশিতেও হয়। যদি এক দিরহাম হয়, তবুও বিবাহ হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ওদের বাইরে যারা তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এ ভাবে যে, তোমরা তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে ওদেরকে পেতে চাইবে' প্রমাণ করে যে, যে পরিমাণ বা যে জিনিসকে মাল বলা হয় না, তা মহরানা হতে পারে না। তার শর্তই হচ্ছে এই যে, সে জিনিসকে 'মাল' হতে হবে, যেন তাকে 'মাল' বলা যায়। আয়াতের দাবি-ই হচ্ছে এই। তার বাহ্যিক ও প্রকাশমান বক্তব্যও তাই। যার নিকট এক

দিরহাম বা দুই দিরহাম রয়েছে, বলা যায় না যে, তার নিকট 'মাল' আছে। অতএব তার মহরানা হওয়া সহীহ্ হয় না আয়াতের বাহ্যিকতার দাবি অনুযায়ী।

যদি বলা হয়, যার নিকট দশটি দিরহাম আছে, বলা যায় না যে, তার নিকট 'মাল' আছে। অথচ মহরানা হওয়ার জন্যে তা যথেষ্ট।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, বাহ্যত তা-ই মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সর্বসম্মতভাবে ধরে নিয়েছি যে, এই পরিমাণটা মহরানা হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আর আয়াতের সাধারণ কথার বিশেষ অর্থ গ্রহণ সর্বসম্মতভাবে জায়েয। তাছাড়া হারাম ইবনে উসমান জাবিরের দুই পুত্র— তাঁদের পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا مَهْرَ اَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ -

দশ দিরহামের কমে মহরানা হয় না।

আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ দশ দিরহামের কমে মহরানা হয় না। আর এ ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ— যা আল্লাহ্‌র হক্— ইজতিহাদের মাধ্যমে জানতে পারা সম্ভব নয়। এর উপর কোন 'রায়' বা মত খাটে না। এর উপায় হচ্ছে 'তাওকীফ'— ওহীর মাধ্যমে নির্ধারণ। কিংবা সর্বসম্মতভাবে ও ঐকমত্যের ভিত্তিতেও তা করা যেতে পারে। দশ দিরহামের পরিমাণ মহরানা নির্ধারণ— তার কম পরিমাণ নয়— প্রমাণ করে যে, তা তাওকীফের মাধ্যমেই করা হয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, হায়য-এর কম-সে কম মেয়াদ তিন দিন এবং বেশির দিকের মেয়াদ দশ দিন। উসমান ইবনে আবূল আস্-সাকাফী নেফাসের বেশির দিকের মেয়াদ চল্লিশ দিন বলা হয়েছে। এসবই মূলত তাওকীফ। কেননা চিন্তা-ভাবনা করে এই ধরনের কথা বলা সম্ভব নয়। হযরত আলী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যে লোক তার নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ পরিমাণ সময় বসবে, তার নামায সম্পূর্ণ হয়ে গেল। বোঝা গেল, তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ সময় বসা ফরয। এই পরিমাণ নির্ধারণও তাওকীফ-এর মাধ্যমেই সম্ভব।

আমাদের কোন কোন ফিকহবিদ দশ-এর পরিমাণ ধার্য করার প্রমাণ বা যুক্তি হিসেবে বলেছেন, স্ত্রীর যৌন অঙ্গ দেহের একটি অঙ্গ বটে। তা ধন-মাল ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে মুবাহ বানানো যায় না। ফলে তা চুরির অপরাধে হাত কাটার মতোই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। হাত যখন একটা অঙ্গ, তার কর্তন মুবাহ্ হতে পারে কোন মাল চুরির কারণে। আর যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা মুবাহ্ হয়ে পারে, তা হল দশ। এটাই ফিকহবিদদের আসল কথা। মহরানাও তেমনি। এই দশ-ই তাতেও গণ্য হতে হবে। আর সকলেই যখন এ ব্যাপারে একমত যে, স্ত্রী যৌন অঙ্গ বিনিময় ছাড়া মুবাহ হতে পারে না। তবে কত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তা মুবাহ হবে, সেই বিষয়ে ফিকহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এমতাবস্থায় যে পরিমাণ জায়েয হওয়ার দলীল পাওয়া গেছে সেই পরিমাণ না হলে তা মুবাহ হবে না, নিষেধ স্থায়ী হয়ে থাকবে। আর সেই পরিমাণটা হয়েছে 'দশ'— সর্বসম্মতভাবে। এর কম পরিমাণে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই যৌনাঙ্গ নিষেধের আওতার মধ্যেই থেকে যাবে— সে পরিমাণের মহরানা না হওয়া পর্যন্ত।

উপরন্তু বিনিময় ছাড়া যখন তা মুবাহ্ হবে না, তখন বিনিময়টা এমন হওয়া দরকার, যা যৌনাঙ্গের মূল্য হতে পারে। আর তা হল সমপরিমাণের মহরানা। তার চাইতে কম পরিমাণ হতে পারে না যদি না তার দলীল পাওয়া যায়। দলীল পাওয়া গেলে অবশ্যই কমেও হতে পারে। যেমন যদি মহরানার উল্লেখ বা তার পরিমাণ নির্ধারণ ছাড়াও বিয়ে হয় তা হলে তার জন্যে সমপরিমাণের মহরানা ওয়াজিব হবে। এ দলীলের ভিত্তিতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, নিকাহ্র আক্দ হলেই সমপরিমাণের মহরানা দেয়া ওয়াজিব। যে পরিমাণটা ওয়াজিব, তার থেকে কিছু মাত্র ঘাটতি করা দলীল ছাড়া জায়েয নয়। দশ-এর অধিক হলে তা হ্রাস করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে ইজমার দলীল রয়েছে। বিয়ের আক্দ হলে যে পরিমাণ মহরানা দেয়, তার কম করার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেননা দশ থেকে কম করার কোন দলীল পাওয়া যায়নি।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ -

তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও এমতাবস্থায় যে, তোমরা তাদের জন্যে মহরানা ধার্য করেছ, তা হলে ধার্যকৃত মহরানার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে।
(সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৭)

এ আয়াত দাবি করছে যে, মহরানার পরিমাণ কম হোক কি বেশি, উক্ত অবস্থায় অর্ধ মহরানা অবশ্যই দিতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, উপরে আমরা যা বলেছি, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, মহরানা দশ দিরহামের কম পরিমাণে হতে পারে না। এক্ষণে দশ-এর কিছু অংশকে যদি মহরানা নাম দেয়া হয়, তাহলেও তা মহরানা হবে। যেমন অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে যার কোন অংশ করা যায় না— তার কতককে সমগ্রটার নাম দেয়া হয়। যেমন তালাক ও নিকাহ্ এবং এ দুটির মতো আর যা যা আছে। আর আক্দে দশকে যখন অংশে ভাগ করা যায় না, তখন তার অংশকেই সমগ্রটার নাম দিতে হবে। তাই সঙ্গমের পূর্বেই যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়, তাহলে স্ত্রীকে দশ-এর অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা দশ দেয়াই নির্ধারিত পরিমাণ। যেমন যদি কেউ তার স্ত্রীকে অর্ধ তালাক দেয়, তাহলেও স্বামী তার স্ত্রীকে পূর্ণ তালাক দিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। অর্ধেক তালাক দেয়া সত্ত্বেও তার তালাকের গোটা নামটাই ব্যবহৃত হবে। তেমনি ইচ্ছামূলক হত্যার বিনিময় যদি অর্ধেক মাফ করা হয়, তাহলে সমগ্রটাই যেন মাফ করে দিয়েছে, মনে হবে। অবস্থা যখন এই, তখন দশ-এর অর্ধেক পাঁচকেও দশ-ই নাম দিতে হবে। কেননা নিকাহ্র আকদে দশকে অংশে ভাগ করা যায় না— এটার দলীল রয়েছে। তাই আমরা— ফিকাহ্বিদগণ— যখন তালাকের পর পাঁচ দেয়া ওয়াজিব মনে করেছি, তাহলে তা-ই অর্ধেক মহরানা হয়ে যাবে। উপরন্তু আমরা যখন নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব বলি, তখন আমরা আয়াতের হুকুমের বিরুদ্ধতাকারী হই না। আর যদি পাঁচ সম্পূর্ণ করার জন্যে বেশি দেয়া

ওয়াজিব মনে করি, অপর কোন দলীলের ভিত্তিতে তবুও। হ্যাঁ, আমাদের মাযহাব আয়াতের পরিপন্থী হয়ে যাবে, যদি আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক ওয়াজিব মনে না করি। আমরা যখন তাও ওয়াজিব মনে করি, অপর এক দলীলের ভিত্তিতে অধিক দেয়া ওয়াজিব করি, তাহলেও তাতে আয়াতের বিরুদ্ধতা হবে না।

যাঁরা মনে করেন, দশ-এর কম পরিমাণের মহরানাও ধার্য করা জায়েয, তাঁদের দলীল হচ্ছে আমের ইবনে রবিআতা বর্ণিত হাদীস। একটি মেয়েলোককে নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত করা হয়। সে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে দুইটি জুতা মহরানা নির্দিষ্ট করে। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নিজে থেকেই দুই জুতার বিনিময়ে বিয়ে করতে রাযি হয়েছ ? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) তাকে এই বিয়েতে অনুমতি দিলেন। আবূ যুবায়র কর্তৃক জাবির থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ বিবাহে যে লোক স্ত্রীকে অঞ্জলি পরিমাণ ছাতু বা ময়দা অথবা খাদ্য মহরানা হিসেবে দিল, সে তার যৌনাঙ্গকে নিজের জন্যে হালাল করে নিল। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত আবদুল মালিক ইবনুল মুগীরা আততায়েফী, আবদুর রহমান ইবনুল সালমানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের মধ্যের স্বামীহীনা মেয়েদের বিয়ে দাও।' সাহাবীগণ বললেন ঃ হে রাসূল! ছেলে-মেয়ের মধ্যের সম্পর্ক কিসের ভিত্তিতে হবে ? বললেন ঃ উভয় পরিবার যে পরিমাণে রাযি হবে। নবী করীম (স) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন ঃ যে লোক দুই দিরহামের বিনিময়ে হালাল করবে, সে-ও হালাল করে নিল। আর আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বিয়ে করেছিলেন এক দানা পরিমাণ স্বর্ণের মহরানা দিয়ে। নবী করীম (স) জানিয়েছেন, বলেছেন ঃ 'তুমি ওলীমা কর, একটি ছাগী দ্বারা হলেও।' এবং এর কোন প্রতিবাদ করা হয়নি। এ পর্যায়ের আরও একটি হাদীস আবূ হাজিম— সহল ইবনে সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একটি মেয়েলোক নবী করীম (স)-কে বললেন ঃ 'আমি নিজকে আপনার জন্যে হেবা করে দিয়েছি।' তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ মেয়েলোকের কোন প্রয়োজন নেই আমার। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে রাসূল! আপনি ওকে আমার নিকট বিয়ে দিয়ে দিন। বললেন, তোমার নিকট মহরানা বাবদ দেয়ার মতো কোন জিনিস আছে কি ? সে বলল, আমার পরিধেয় বস্ত্র আছে। সেটি এই। নবী করীম (স) বললেন, তুমি যদি তোমার পরিধেয় এই বস্ত্রটি ওকে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি (বা সে) যদি ওর উপর বসে তাহলে তোমার পরিধান করার কিছুই থাকবে না। শেষ পর্যন্ত বললেন, তালাশ করে দেখ, একটি লৌহ অঙ্গুরীয় পেলেও চলবে।

এ হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স) একটি লোহার আঙটিকে মহরানা বানানো যায় বলে স্বয়ং অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু লোহার একটি আঙটি তো দশ দিরহামের সমান হতে পারে না।

এর জবাবে বক্তব্য হল, নবী করীম (স) দুই খন্ড জুতার বিনিময়ে বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন এজন্য যে, সম্ভবত এই দুই জুতা দশ দিরহাম কিংবা তার অধিকের সমপরিমাণ হবে বলে মনে করা হয়েছে। তাহলে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে এটাকে বিপরীত মতের সমর্থনে পেশ করা যায় না। তাছাড়া দুই জুতার বিনিময়ে বিয়ে সম্পন্ন করার পর সে বিষয়ে নবী করীম (স)-কে সংবাদ জানানো হয়েছিল মাত্র। হতে পারে— তার মূল্য দশ কি তার অধিক দিরহাম

হবে বলে মনে করা হয়েছে। তাই দুই জুতার বিনিময়ে বিয়ে জায়েয হওয়ার এই ঘটনা বিপরীত মতকে প্রমাণিত করে না। উপরন্তু, হাদীসের সংবাদটা হল নবী করীম (স) বিয়েটাকে জায়েয বলেছিলেন মাত্র। আর তার ভিত্তিতে বিয়ে জায়েয হলেও তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তা-ই যথার্থ মহরানা । তার ছাড়া অন্য কিছু নয়। মহরানা ছাড়াও যদি কেউ বিয়ে করে, তবে বিয়েটা তো জায়েয হবে। কিন্তু তা প্রমাণ করে না যে, স্ত্রী মহরানা বাবদ কিছুই পাবে না। তেমনি যে দুই জুতার মূল্য দশ দিরহামের কম, তার বিনিময়ে বিয়ে জায়েয হলেও তা প্রমাণ করে না যে, তা ছাড়া স্ত্রীর আর কিছুই প্রাধান্য নেই। তার এই কথা যে, দুই দিরহাম দারা যে স্ত্রী অঙ্গ হালাল করে কিংবা অঞ্জলী ভর্তি আটা-ময়দার বিনিময়ে তা করে, সে তার দ্বারাই হালাল করে নিতে পারে বটে। এ হল যৌন অঙ্গ হালাল হওয়ার কথা। কিন্তু তা প্রমাণ করে না যে, সে স্বামী আর কিছু স্ত্রীকে দিতে বাধ্য হবে না।

আবদুর রহমান বর্ণিত হাদীসটিও তেমনি। তিনি এক দানা পরিমাণ স্বর্ণের মহরানা দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। সংবাদে এ কথাও ছিল যে, তার মূল্য পাঁচ কিংবা দশ দিরহাম।

রাসূল (স)-এর কথা— পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে যার উপর উভয় দিকের পরিবারবর্গ যে পরিমাণে রাযি হয়, তাই। এর অর্থও এই যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এভাবে বিবাহ করা হলে তা জায়েয হবে। এমনকি, তারা যদি কিছু পরিমাণ মদ্য কিংবা শূকর মাংসের উপরও বিবাহ দিতে বা করতে রাযি হয়, তবে তা কখনই জায়েয হবে না, তাদের রাযি হওয়ার ফলেও নয়। তেমনি নামকরণের ব্যাপার শরীয়ত প্রমাণিত হুকুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দশ হল তেমনি এক নামকরণ।

সহল ইবন সাদ বর্ণিত হাদীস, নবী করীম (স) তাকে অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা করার আদেশ করেছিলেন। কথাটি সেই প্রেক্ষিতেই বিবেচ্য। কেননা তিনি ইচ্ছা করলে শুধু নাম করণের দ্বারা আকদ সহীহ্ হতো না। বরং নামকরণ তার যিম্মায় প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হয়। যার দ্বারা আকদ জায়েয হয়, তা-ই জলদি করে ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় যে, এর দ্বারা আসল মহরানা-ই সহীহ্ হবে, তা তিনি প্রমাণ করতে চান নি। এমনকি যখন কোন জিনিসই পাওয়া গেল না, তখন নবী করীম (স) বললেন যে, আমি ওকে তোমার নিকট বিবাহ্ দিলাম তোমার নিকট কুরআনের যতটা ইল্‌ম আছে তার বিনিময়ে। অথচ তার নিকট কুরআনের যে ইল্‌ম ছিল, তা তো মহরানা হতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, তার দ্বারা বিয়েটাই শুধু সহীহ্ হয়, কিন্তু তা মহারানা হয় না।

এক বছর স্বামীর খেদমত করার শর্তে যে লোক বিয়ে করবে, সে সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ বলেছেন, কোন লোক তার এক বছর কাল খেদমত করার শর্তে যদি কেউ বিয়ে করে, সে স্বাধীন হলে স্ত্রী সমপরিমাণ মহরানা পাবে। আর দাসী বা গোলাম হলে, সে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর এক বছর কাল খেদমত করা জরুরী হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, স্ত্রী স্বামীর খেদমতের মূল্য বা বেতন পাবে, যদি সে পুরুষটি স্বাধীন ব্যক্তি হয়। ইমাম মালিক বলেছেন, যদি মেয়েলোকটিকে এই শর্তে বিয়ে করে যে, সে নিজেকে তার ইজারায় এক বছর কালের জন্যে ছেড়ে দেবে কিংবা তার অধিক কি কম সময়ের

জন্যে এবং তা-ই হবে তার মহরানা, তা হলে নিকাহ্ ভঙ্গ হয়ে যাবে তার সাথে সঙ্গম না করা হলে। সঙ্গম করা হলে নিকাহ্ প্রমাণিত হবে। আওজায়ী বলেছেন, পুরুষ যদি মেয়েলোকটিকে বিয়ে করে এই শর্তে যে, সে তাকে হজ্জ করাবে, কিন্তু পরে সে তাকে সঙ্গম করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে তার অর্ধেক হজ্জের খরচ দেয়ার জন্যে দায়ী হবে। তাতে পোশাক ও খরচাদি শামিল রয়েছে।

আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন, স্বামীর খেদমতের বিনিময়ে নিকাহ জায়েয হবে, যদি সময় নির্দিষ্ট থাকে। আর আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, কুরআনের একটা সূরা শিক্ষাদানের বিনিময়ে বিয়ে করলে বিয়ে জায়েয হলেও তা তো আর মহরানা হতে পারে না। সে কারণে তাকে সমপরিমাণের মহরানা দিতে হবে। মালিক ও লায়স-ও এই মত প্রকাশ করেছেন। শাফেয়ী বলেছেন, তা-ই হবে তার মহরানা। সঙ্গমের পূর্বে তাকে তালাক দিলে তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে শিক্ষাদানের মজুরীর অর্ধেকের বিনিময়ে যদি তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এটা আল-মুজানীর বর্ণনা। তাঁর থেকে আর রুবাই বর্ণনা করেছেন, তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে সমরিমাণ মহরানার অর্ধেক দিয়ে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তার বাইরে যেসব মেয়ে আছে তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এ ভাবে যে, তোমরা তোমাদের মালের বিনিময়ে তাদেরকে পেতে চাইবে।'

এ আয়াতের দাবি হল, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় হবে তা, যা মাল হিসেবে হস্তান্তর করা যায়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা পেতে চাইবে তোমাদের মালের বিনিময়ে'— এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি— স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বদলে স্ত্রীকে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া আর দ্বিতীয় অর্থ, তা স্বামীর তা হস্তান্তরিত করা তার ফায়দা— মুনাফা পুরামাত্রায় আদায় করে নেয়ার জন্যে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যে মহরানার বদলে স্ত্রী অঙ্গ সম্ভোগ করার অধিকার হয়, তা হয় মাল হবে অথবা হবে কোন মালের ফায়দা, যা স্বামী স্ত্রীকে দেবে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের মালের বিনিময়ে তোমরা পেতে চাইবে'— এই উভয় অর্থই শামিল করে, দুটোকেই বোঝায়। এও প্রমাণিত হয় যে, মহরানা অবশ্যই মাল হতে হবে। আর আল্লাহ কথাঃ

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا -

এবং তোমারা স্ত্রীদেরকে তাদের প্রাপ্য মহরানা দিয়ে দাও আন্তরিকতা সহকারে। তারা নিজেরা তা থেকে নিজেদের খুশীমনে যদি কিছু তোমাদের জন্যে দেয় তবে তোমরা তা সুখাদ্য সুস্বাদু হিসেবে গ্রহণ কর। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

তা এই জন্যে যে, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা দিয়ে দাও আন্তরিকতা সহকারে'— এ একটি আদেশ। এ আদেশ পালন করা ওয়াজিব। কথার ধরণ থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মহরানা অবশ্যই মাল হতে হবে দুটি দিক দিয়ে। একটি اتوا 'দিয়ে দাও' আর দিয় দেয়া কাজটি কোন বস্তুকে কেন্দ্র করেই হতে পারে। মুনাফা বা ফায়দা ধরনের জিনিস হতে পারে

না। মুনাফা বা কল্যাণ অথবা ফায়দা কথাটি বস্তুর ক্ষেত্রে বলা যায় না। এ দেয়া প্রকৃতই দেয়া, হতে পারে হাতে দেয়া। আর দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তারা নিজেরাই খুশী মনে তা থেকে কিছু যদি তোমাদেরকে দেয় তাহলে তোমরা তা খাও'— এ কথাও মুনাফা বা ফায়দা কি কল্যাণের ক্ষেত্রে বলা হয় না। তা খাদ্যবস্তু কিংবা দেয়ার পর যা খাদ্য বস্তুতে পরিবর্তিত করা যায়, সেই ক্ষেত্রেই বলা যায়। অতএব এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, মুনাফা— অর্থাৎ কোন ফায়দা— উপকারিতা বা কল্যাণ মহরানা হতে পারে না।

যদি বলা হয়, এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাস বা গোলামের খেদমত মহরানা হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, আয়াতের বাহ্যিক দাবি তো তাই। তাই কোন দলীল ছাড়া তো জায়েয হতে পারে না। নবী করীম (স) বদল বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকেও উক্ত কথা প্রমাণিত হয়। বদল বিয়ে হল, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে, একজন অপর জনের বোনকে বিয়ে করবে এই শর্তে যে, সে অপরের বোনকে বিয়ে করবে— অথবা সে অপরের দাসীকে বিয়ে করবে এই শর্তে যে, তার নিজের দাসীকে অপর জন বিয়ে করবে। আর এদের কোন বিয়েতেই মহরানা দেয়া-নেয়া হবে না। এ হল শিগাঢ় বিয়ে। এটা একটা ভিত্তি এ কথার যে, মহরানা শুধু তা-ই হতে পারে, যা মাল হিসেবে হস্তান্তরিত করা সম্ভব। স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহার মহরানা হওয়াকে নবী করীম (স) বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা তা কোন মাল নয়। কেননা যৌনাঙ্গের বদল হিসেবে যা যা শর্ত করা হয়েছে, তা যদি হস্তান্তরযোগ্য মাল না হয়, তাহলে তা মহরানা হতে পারে না। আমাদের হানাফী ফিকহবিদগণ তাই বলেছেন, ইচ্ছামূলক হত্যার রক্ত-বিনিময় ক্ষমা করে দেয়ার বিনিময়ে যদি কেউ বিয়ে করে কিংবা কোন স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিনিময়ে বিয়ে করে, তাহলে তা মহরানা হবে না। যেমন যৌনাঙ্গের সুখ ভোগ মহরানা হয় না। তাকে মহরানা বানানোও যেতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বদল বিয়েতে কোন এক জনের জন্যে মহরানা নির্ধারণ করা হলে নিকাহ জায়েয হবে এবং দুজনের প্রত্যেকের জন্যে সমপরিমাণ মহরানা ওয়াজিব হবে। ঠিক যে অবস্থায় নিকাহ্‌কে জায়েয বলা হয়েছে সেই অবস্থায়। নবী করীম (স) বদল বিয়ে তো নিষিদ্ধ করেই দিয়েছেন। তার দুটি তাৎপর্য বোঝা যায়। একটি এই যে, বদল যদি হয় দুই দাসীর মধ্যে তাহলে অবশ্য যৌনাঙ্গের স্বাদ-আস্বাদন ও মহরানা হতে পারে। কেননা দাসীর মহরানাটা তার মনিব পাবে। তাই নবী করীম (স) বিয়েতে যৌনাঙ্গের স্বাদ আস্বাদনের বিনিময় হওয়াকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় হল, দুইজন স্বাধীনা মেয়েলোকের অদল-বদল হলে একজন অপর জনকে বলবে ঃ 'আমি তোমার নিকট আমার বোনকে বিয়ে দেব এই শর্তে যে, তুমি তোমার বোনকে আমার নিকট বিয়ে দেবে'— অথবা আমি আমার কন্যা তোমার নিকট বিয়ে দেব এই শর্তে যে, তুমি তোমার কন্যা আমার নিকট বিয়ে দেবে'— এ ধরনের বিয়েতে কারোর জন্যেই মহরানার উল্লেখ হয় না। কেননা এতে যাকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে, তার বদলে অন্য এক জনের জন্যে ফায়দা হওয়ার শর্ত করা হয়েছে, আর সে হচ্ছে কন্যার— যাকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে— তার পিতা বা ভাই। দুইটির মধ্যে যে ধরনেরই বদল বিয়ে হোক, সে বিষয়ের

আক্দটা বিবাহিতার জন্যে কিছু বদল নির্ধারণ ছাড়াই হয়ে যায়। আর অপর অবস্থাটিতে যৌনাঙ্গের বিনিময় হয় অপর জনের স্ত্রীর যৌনাঙ্গের আস্বাদন।

এ কারণে নবী করীম (স) বদল বিয়ে বাতিল ঘোষণা করেছেন। তাই আসল কথা হল যৌনাঙ্গের বদল বা বিনিময় হবে তা যা মাল হিসেবে স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

যদি বলা হয়, দাসীর যৌনাঙ্গের স্বাদ আস্বাদন ধন-মালে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে তা দাসের খিদমতের বিনিময়ে বিয়ে দেয়ার মত হবে না কেন ? জবাবে বলা যাবে, দাসের খিদমত ধন-মাল হস্তান্তর করার অধিকার সৃষ্টি করে। আর তা হল দাসের দাসত্ব। যেমন ইজারাদার— যার জন্যে ইজারা তার নিকট দাসকে হস্তান্তর করার অধিকার জানায়— খিদমতের জন্যে। আর দাসীর স্বামী নিকাহ্র আক্দের কারণে দাসীকে তার নিকট হস্তান্তর করার অধিকার সৃষ্টি করে না। কেননা মনিব তার জন্য একখানি স্বতন্ত্র ঘর বানিয়ে দিতে বাধ্য নয়। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে স্ত্রী সন্ধান করে নেবে' দাবি করে যে, নিকাহ্র আক্দ হওয়ার দরুন তার নিকট মাল হস্তান্তর করার অধিকার জন্মায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় হিসেবে। কিন্তু কুরআনের সূরা শিক্ষাদানের বিনিময়ে বিবাহ দিলে তা দুটি কারণে মহরানা হিসেবে সহীহ্ হবে না। একটি— পূর্বে যেমন বলেছি, তা মাল হস্তান্তর করার অধিকার জন্মায় না— যেমন স্বাধীন ব্যক্তির খিদমত। আর দ্বিতীয় কারণ হল, কুরআনের শিক্ষাদান ফরযে কিফায়া। তাই যে কেউ কুরআনের কোন কিছু কাউকে শিক্ষা দেবে, সে তো ফরয আদায় করল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন, আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তাহলে তা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বদল বা বিনিময় কি করে হতে পারে! তা যদি জায়েয হয়, তাহলে ইসলামে শিক্ষাদানের বিনিময়েও বিয়ে দেয়া জায়েয হবে। কিন্তু এ কথা বাতিল। কেননা আল্লাহ্ মানুষের উপর যা ফরয করেন, তা হল তার কাজ, যা কর্তব্য এবং যখনই তা সে করবে ফরয হিসেবেই করবে। তার বিনিময়ে দুনিয়ার কোন স্বার্থলাভ করার কোন অধিকার তার হতে পারে না। তা যদি জায়েয হয়, তাহলে শাসকদের জন্যে শাসনকার্যের বিনিময়ে ঘুষ লওয়াও জায়েয হবে। অথচ আল্লাহ্ তাকে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এক্ষণে কেউ যদি যুক্তি স্বরূপ সহল ইবনে সা'দের কাহিনী সম্বলিত হাদীস পেশ করে, যাতে একটি মেয়ের নিজেকে রাসূল (স)-এর জন্যে হেবা করার কথার উল্লেখ আছে, রাসূল (স) আমার মেয়েলোকের কোন প্রয়োজন নেই বলায় সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি সেই মেয়েটিকে তার নিকট বিয়ে দেয়ার জন্যে রাসূল করীম (স)-কে অনুরোধ জানিয়েছিল। তখন তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ তুমি কুরআনের কোন ইলম রাখো কিনা। সে অমুক সূরাটি জানার কথা বললে তিনি বলেছিলেন আমি এই মেয়েটিকে তোমার নিকট কুরআনের এ সূরা জানার বিনিময়ে বিয়ে দিলাম— সে আরও একটি হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারে, যেটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে হাবাস ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই, ইবরাহীম ইবনে তহমান হাজ্জাজ আল বাহেলী আশআলা, আতা ইবনে আবূ রিবাহ, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে সহল ইবনে সা'দের মত ঘটনাই আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূল (স) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কুরআনের কোন অংশ মুখস্থ করেছ কি ? সে জবাবে সূরা আল-বাকারা

কিংবা তার পরবর্তী সূরাটি মুখস্থ করার কথা বলে। তখন নবী করীম (স) তাকে বললেন ঃ যাও তুমি ওকে বিশটি আয়াত শিক্ষা দিও। সে তোমার স্ত্রী। এর জবাবে বলা যাবে, এর অর্থ হচ্ছে, তোমার নিকট কুরআনের যা আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ -

তোমাদের এই সব হচ্ছে তা, যার বলে তোমরা দুনিয়ায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ এবং যে সব পেয়ে তোমরা অহংকারে মেতে যাও। (সূরা মুমিন ঃ ৭৫)

এর তাৎপর্য হল, এ সবের কারণেই তোমরা আনন্দ ও আত্মম্ভরিতায় নাচতে থাক। তা ছাড়া কারুর নিকট কুরআন থাকার অর্থ এই নয় যে, তা বিনিময় হতে পারে। এ হাদীসে শিক্ষাদানের কথার উল্লেখ নেই। ফলে আমরা জানতে পারলাম, রাসূল (স)-এর কথার তাৎপর্য হল, আমি তোমার নিকট মেয়েটিকে বিয়ে দিলাম কুরআনের মহানত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। আর তোমার নিকট কুরআনের যা আছে, তার কারণে।

এটা ঠিক সে রকমই ব্যাপার, যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে তালহা আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আবূ তালহা উম্মে সুলাইমের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, আমি এই ব্যক্তির প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। এখন তুমি যদি আমার অনুসরণ কর— ঈমান আন— তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ করব। জবাবে আবূ তালহা বললেন, আমিও সেই পথে, যে পথে তুমি চলেছ। পরে উম্মে সুলাইম আবূ তালহাকে বিয়ে করলেন। তখন তার মহরানা হল ইসলাম।

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উম্মে সুলাইম আবূ তালহার দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করাবার উদ্দেশ্যেই তাকে বিয়ে করেছিলেন। ইসলাম তো আর মহরানা হতে পারে না কারোর জন্যেই এবং প্রকৃতপক্ষে।

ইবরাহীম ইবনে তাহমানের হাদীস সনদের দিক দিয়ে যয়ীফ। এই কাহিনীই ইমাম মালিক আবূ হাজিম-সহল ইবনে সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে রাসূল (স) তাকে বলেছেন যে, 'তুমি কুরআনের সেই সূরা ওকে শিক্ষা দাও' এই কথার উল্লেখ নেই। আর ইবরাহীম ইবনে তাহমানের হাদীস কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। তা সহীহ্ হলেও তাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, রাসূল (স) কুরআন শিক্ষাদানকে মহরানা বানিয়েছেন। কেননা হতে পারে, তিনি তাকে— মেয়েটিকে কুরআনের তালীম দিতে আদেশ করেছেন। তা সত্ত্বেও তার যিম্মায় মহরানা প্রমাণিত হয়ে থাকল। কেননা রাসূলে করীম (স) বলেন নি যে, কুরআনের শিক্ষাদানই মেয়েটির জন্যে মহরানা।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ -

আমি চাই আমার এই দুই কন্যার কোন একটিকে তোমার নিকট বিবাহ দেব এই শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার মজুরী খাটবে। (সূরা কাসাস ঃ ২৭)

এ আয়াতে একজন স্বাধীন মুক্ত (গোলাম বা দাস নয়) মানুষের কল্যাণ বা খেদমতকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বদল বা বিনিময় বানানো হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, যে শর্তটির উল্লেখ হয়েছে আয়াতে, তা প্রস্তাবিতা বিয়ের কনের কোন কল্যাণ বা ফায়দা নয়। সে শর্তটি শুয়াইব নবী (আ) করেছিলেন নিজের জন্যে। আর পিতার জন্য যে শর্ত তা তো বিয়ের মহরানা হতে পারে না। অতএব এ আয়াত হক দলীল হিসেবে পেশ করা চলে না, তা অর্থহীন, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। উপরন্তু তা যদি কনের জন্যে শর্ত হওয়া সহীহ্‌ও হয়, তবু নবী করীম (স) তা নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। কেননা তিনিই ছিলেন বিয়ের আক্‌দের অভিভাবক অথবা এজন্যে যে, সন্তানের মাল তো পিতার মালই। যেমন রাসূল (স) বলেছেন ঃ اَنْتَ وَمَالُكَ لاَبِيْكَ 'তুমি এবং তোমার ধন-মাল তো তোমার পিতার। 'কিন্তু মহরানা ছাড়া বিয়ে তো মনসূখ হয়ে গেছে শিঘার বদল বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বারা'। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে পেতে চাইবে' প্রমাণ করে যে, দাসীর দাসমুক্তি মহরানা হতে পারে না। কেননা মহরানা সংক্রান্ত আয়াত দাবি করে যে, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় হবে তা, যা স্ত্রীর নিকট মাল হিসেবে হস্তান্তর করা যায়। দাসীকে মুক্তিদানে তো কোন মাল হস্তান্তরিত হয় না। তাতে শুধু এক ব্যক্তির মালিকত্ব প্রত্যাহৃত হয়, কোন ধন-মালের হস্তান্তরের কোন ব্যাপার তাতে নেই। লক্ষণীয় যে, দাসের মালিক ছিল তার মনিব, সে তো স্ত্রীর দিকে হস্তান্তরিত হয় না। তাতে তার মালিকত্ব বিলুপ্ত হয়। এর ফলে স্ত্রীর কোন মাল হয় না বলে কিংবা তার নিকট কোন মাল হস্তান্তরিত হওয়ার কোন অধিকার তার জন্মে না। অতএব তা তার বিয়ের মহরানা হতে পারে না। নবী করীম (স) থেকে আরও যে বর্ণনাটি এসেছে তিনি সফিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তার এই মুক্তি প্রাপ্তিটাকেই তিনি তার মহরানা বানিয়েছিলেন, তা এইজন্যে যে, তার অধিকার ছিল কিনা মহরানায় বিয়ে করার। এটা রাসূল (স)-এর একটা বিশেষ অধিকার। এ অধিকার অন্য কারুর নেই। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

কোন মুমিন মেয়েলোক যদি নিজেকে নবীর জন্যে হেবা করে, নবী যদি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে, তাহলে খালেস তোমার জন্যে জায়েয হবে, মুমিনদের জন্যে নয়।

(সূরা আহযাব ঃ ৫০)

এ আয়াত অনুযায়ী নবী করীম (স) কোনরূপ মহরানা বা বিনিময় না দিয়েই কোন মেয়েলোককে বিয়ে করতে পারতেন। এইরূপ বিশেষ অধিকার হিসেবেই একসাথে নয়জন স্ত্রী রাখারও অনুমতি তাঁর জন্যে ছিল, অন্য কারুরই এই অধিকার নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা দিয়ে দাও খালেস দিলে। 'তারা যদি নিজের থেকেই খুশি মনে মহরানার কোন জিনিস দিয়ে দেয় তাহলে তোমরা তা সুখাদ্য সুস্বাদু হিসেবেই ভক্ষণ কর' প্রমাণ করে যে, দাসত্বমুক্তি কখনও মহরানা হতে পারে না। তার

কয়েকটি কারণ আছে। একটি— আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তাদেরকে দাও।' এটা পালন করা— কার্যত দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। দাসত্ব থেকে মুক্তিদান ক্ষেত্রে দিয়ে দেয়ার কিছু হয় না। দ্বিতীয়— আল্লাহ্‌র কথা ঃ তারা যদি নিজেদের থেকেই খুশি মনে কিছু (পরিমাণে) করে। দাসমুক্তি দাসের ইচ্ছায় তার কোন অংশ ভেঙ্গে দেয়ার কোন সুযোগ নেই এবং তৃতীয়— আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা তা খাও সুস্বাদু-সুখাদ্য হিসেবে। দাসমুক্তিতে তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ -

বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত হয়ে, স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী যৌন-লালসা চরিতার্থকারী না হয়ে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কথা 'বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত হয়ে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী যৌন লালসা চরিতার্থকারী না হয়ে'— এর দুটি দিক হতে পারে। তার একটি, এতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংরক্ষিত হওয়ার জন্যে। লোকেরা যখন বিয়ে করবে তখন তাদের অবস্থার এটা বর্ণনা। আর দ্বিতীয়, যৌনাঙ্গ মুবাহ হওয়ার জন্যে সংরক্ষণশীলতা একটা শর্ত— যেখানে আল্লাহ্‌র মুহাররম মেয়েদের বাদে অন্যান্য সব মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

যদি প্রথম দিকটিই লক্ষ্যভূত হয়ে থাকে, তাহলে মুবাহ্ হওয়ার ব্যাপার সাধারণ, যারাই এর আওতার মধ্যে আসে, তাদের সকলের ক্ষেত্রে তা সহীহ। তবে কোনটির ব্যাপারে ভিন্ন দলীল পাওয়া গেলে তা বাদ পড়বে।

আর যদি দ্বিতীয় কথাটি লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে মুবাহ করার ব্যাপারটি হবে অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা সংরক্ষণ অর্জনের শর্তেই তা আক্‌দবদ্ধ হয়েছে। আর সংরক্ষণ শব্দটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অতএব তাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা এরূপ অবস্থায় সহীহ্ হতে পারে না। তাই উত্তম পন্থা হচ্ছে, এর অর্থ গ্রহণ করা হবে 'বিবাহ দ্বারা সংরক্ষণ অর্জন সম্পর্কে সংবাদ দান।' কেননা এই অর্থে তা ব্যবহার করা সম্ভব। কেননা যখনই শব্দটি ব্যবহৃত হবে, তখন তা সাধারণ অর্থবোধক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার বাহ্যিক দিকটা ব্যবহার করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব। এ সম্ভাবনাও আছে যে, তার হুকুমটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। তা হলে তার সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ গ্রহণই কর্তব্য। তাকে মোটামুটি ধরনের কথার মধ্যে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। তাহলে সে শব্দটি যখনই ব্যবহৃত হবে, তার হুকুমটা আমরা কাজে লাগাতে পারব। তাই এ দিতে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। তাকে এমন ভাবে রেখে দেয়া উচিত নয়, যার ফলে তার ব্যবহার অন্য কারুর নিকট থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। পাঠের ধারাবাহিকতা আয়াতটির ভঙ্গীতে এমন কিছু আছে যা احصان। সংরক্ষণ তার উল্লেখ হলেই বিবাহের দ্বারা সরক্ষিত হওয়ার সংবাদ বোঝাবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, বিবাহটা করতে হবে সংরক্ষিত হয়ে, উচ্ছৃঙ্খলভাবে যৌন লালসা চরিতার্থকারী হিসেবে নয়— এই অবস্থায়।

কুরআনের ভাষায় سفاح -এর অর্থ যিনা। এ আয়াত জানিয়েছে যে, এতে উল্লিখিত احصان। সংরক্ষণ যিনার বিপরীত। আর তা হচ্ছে সতীত্ব-পবিত্রতা। احصان। শব্দের তাৎপর্য এখানে যখন

নৈতিক পবিত্রতা-পরিশুদ্ধতা, তখন আর তা ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল থেকে যায়নি। কেননা এখন বক্তব্যটা দাঁড়াল এই ঃ মুহররম মেয়েদের ছাড়া আর যারা আছে তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা তোমাদের মালের বিনিময়ে পেতে চাইবে পাক-পবিত্র চরিত্রশীলতা সহকারে, যিনার মাধ্যমে নয়। এ তাৎপর্য খুবই প্রকাশমান, আসল বক্তব্যটা এতে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এর দুটো তাৎপর্য অনিবার্য। একটি 'হালাল' বা মুবাহ শব্দটির ব্যবহার এবং তার সাধারণতা ব্যাপকতা।

আর দ্বিতীয়টি হল এই সংবাদ দান যে, তারা যখন তা করবে, তখন তারা বিয়ের সংরক্ষণে সংরক্ষিত পবিত্র চরিত্রশীল হবে, উচ্ছৃঙ্খল যৌন লালসা চরিতার্থকারী নয়। এখান الْإِحْصَانُ ব্যাপক অর্থবোধক, তার মধ্যে কয়েকটি অর্থ হলেও তা যখন ব্যবহৃত হবে, তখন অন্যান্য বিপুল সংখ্যক অর্থসম্পন্ন শব্দের মতো সাধারণ অর্থবোধক হবে না। কেননা তা একটি নাম, বিভিন্ন অর্থের ধারক হলেও তার আসল অর্থ নিষেধ, প্রতিরোধ। এ থেকেই الْحِصْنُ মানে দুর্গ। তা শত্রুকে প্রতিরোধ করে, তাকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। আর এ থেকেই বানানো হয় الدِّرْعُ الْحَصِيْنَةُ —প্রতিরোধক বর্ম।' আর الْحِصَانُ —পুরুষ অশ্ব। কেননা তা তার উপর আরোহীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। আর الْحَصَانُ অর্থ চরিত্রবতী পবিত্রা নারী। কেননা সে স্বীয় যৌন অঙ্গকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে কবি হাসসান (রা) বলেছেন ঃ

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ - وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ -

আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ -

যারা মিথ্যা সন্দেহে অভিযুক্ত করে সংরক্ষিতা অসতর্ক মেয়েদেরকে .... অর্থাৎ পবিত্রতা সতিত্ব সম্পন্না। (সূরা নূর ঃ ২৩)

শরীয়তের পরিভাষায় الاحْصَانُ একটা নাম, বিভিন্ন অর্থে তা ব্যবহৃত হয়। আভিধানিকভাবে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার থেকে ভিন্নতর একটি অর্থ, ইসলাম। আল্লাহ বলেছেন ঃ فَاِذَا أُحْصِنَّ -এর অর্থ ঃ যখন তারা ইসলাম কবুল করল। বিবাহ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, এর অর্থ ঃ যখন তারা বিবাহ করল। আর আল্লাহ বলেছেন ঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ 'যেসব মেয়েলোক বিবাহ-দুর্গের মধ্যে সংরক্ষিত।' এর অর্থ যাদের স্বামী আছে, তারা। পবিত্রতা ও নৈতিকতাও এর অর্থ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ - (النور : ٢٣)

পবিত্র চরিত্রের মেয়েদের উপর যারা সন্দেহে মিথ্যা অভিযোগ তোলে— সহীহ্ বিয়ের পর সঙ্গম অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়। কেননা তখন রজম থেকে তারা রক্ষা পায়।

শরীয়তের اِحْصَانُ -এর সাথে দুটি হুকুম সম্পর্কিত। একটি হল— তার উপর মিথ্যা

অভিযোগ উত্থাপনকারীর 'হদ্দ' বাধ্যতামূলক। তাতে তার পবিত্র চরিত্রশীলতা স্বাধীনতা—দাসত্বহীনতা, ইসলাম, বিবেক-বুদ্ধি ও পূর্ণ বয়স্কতা তার মধ্যে গণ্য। যা এই গুণ সম্পন্ন নয়, তার উপর মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীর 'হদ্দ' জরুরী নয়। কেননা পাগল, বালক, ব্যভিচারী, কাফির ও দাস-এর চরিত্র দোষারোপকারীর উপর 'হদ্দ' হওয়া ওয়াজিব নয়। اِحْصَانٌ -এর এই দিকগুলি মিথ্যা দোষারোপকারীর উপর 'হদ্দ' ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই গণ্য হবে।

আর একটি হুকুম হচ্ছে, তা এমন احصان। যার সাথে রজমের হুকুম জড়িত। যদি কেউ যিনা করে। বোঝা গেল, এই اِحْصَانٌ -এ শামিল রয়েছে ইসলাম, বিবেক-বুদ্ধি, পূর্ণ বয়স্কতা, স্বাধীনতা-গোলামীহীনতা ও সহীহ্ নিকাহ্র মাধ্যমে সঙ্গম। দুজনই এই গুণে ভূষিত হবে। এর মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসের যিনা হলেও রজম হবে না। 'সিফাহ' অর্থ যিনা। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমি বিবাহের পক্ষে, যিনার পক্ষে আমি নই। মুজাহিদ ও সুদ্দী غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ আল্লাহ্র এই কথাটুকুর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ 'যিনাকারী নয়।' বলা যায়, এই শব্দের আসল অর্থ ঃ পানি ঢালা। বলা হয় ঃ অমুকের অশ্রু ঢালা হয়েছে, অমুকের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। বলা হয় গর্বিত তার নিম্ন ভাগ প্রবাহিত হয়েছে। কেননা এটাই হচ্ছে পানি পড়ার স্থান। কেউ যিনা করলে বলা হয় سَافَحَ الرَّجُلُ কেননা সে তার বীর্যপাত ঘটিয়েছে এমন পথে, যেখানে তার বীর্যপাতে বংশ সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। ইদ্দত পালনও কর্তব্য হয় না। বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম কার্যকর হয় না। এজন্যে যিনাকারীকে مسافح বলা হয়। কেননা লোকটি তার এই কাজ দ্বারা পানি না ঢালা লোক হয়নি। এতে তার বীর্য দ্বারা যে বাচ্চা সৃষ্টি হল, তার সাথে তার বংশ সম্পর্ক প্রমাণিত হল না। সে বাচ্চা তার সাথে সম্পর্কিতও হল না। এর ফলে মেয়েলোকটির ইদ্দত পালন ওয়াজিব হল না। সে মেয়েটি পুরুষটির শয্যাও পেল না। মহরানা দেয়াও তার জন্যে ওয়াজিব হল না। এই সঙ্গম দ্বারা বিবাহের কোন হুকুমের সাথে সম্পর্কও হল না। এই শব্দটির তাৎপর্যে এ সব কথাই শামিল ও নিহিত রয়েছে।

মাত্য়া বা মুত্য়া বিয়ে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً -

অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর তার বিনিময়ে মহরানা ফরয হিসেবে আদায় করে দাও।

আবূ বকর বলেছেন, পূর্বে মুহররম মেয়েলোক ছাড়া অন্যান্য যে কোন মেয়েলোক বিবাহ করা মুবাহ হওয়ার কথার সাথে সংযোজন করে এই আয়াতটি বলা হয়েছে ঃ اِسْتَمْتَعْتُمْ। অর্থ তোমরা যৌন স্বাদ আস্বাদন করেছ সেই বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে। তাই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরাপুরিভাবে দিয়ে দাও। এই কথাটি ঃ 'এবং স্ত্রীদের মহরানাসমূহ আন্তরিকভাবে দিয়ে দাও' আল্লাহ্র এই কথার মতই।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا -

তোমরা তা থেকে কিছুই নিয়ে নিও না। (সূরা নিসা ঃ ২০)

اِسْتِمْتَاعٌ অর্থ, শান্তি সুখ স্বাদ গ্রহণ। এখানে কথাটি ইঙ্গিতমূলক, এরূপ বলে সঙ্গম বুঝিয়েছেন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا -

তোমরা তোমাদের অংশের নিয়ামতসমূহ নিজেদের পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ। তার স্বাদ তোমরা আস্বাদন করেছ। (সূরা আহকাফ ঃ ২০)

অর্থাৎ তোমরা সুখ ভোগের কাজটা আগেই সম্পন্ন করেছ। বলেছেন ঃ

فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ -

তোমরা তোমাদের ভাগ তো পেয়ে গেছ, ভোগ করেছ দুনিয়ায় যা কিছু তোমাদের প্রাপ্য ছিল। (তওবা ঃ ৬৯)

পরে আল্লাহ্ যখন যা হারাম করার তা হারাম ঘোষণা করলেন, বললেন ঃ

وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ -

তোমাদের প্রতি তাদেরকে হারাম করেছেন, অর্থাৎ মা'দের বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে অন্যান্য মুহররমদেরও উল্লেখ করা হল। তারপরে বলা হল ঃ এদের ছাড়া আর যারা তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ— মুহররমাত যাদের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ছাড়া অন্যান্য মেয়েদের বিবাহ করা মুবাহ। তার পরে বলেছেন ঃ তোমরা পেতে চাইবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত হয়ে অর্থাৎ বিবাহ করে তোমরা সংরক্ষিত হবে, পবিত্র হবে, উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার হবে না। এরপর এর সাথে সংযোজিত হয়েছে বিবাহের হুকুম, যখন তাতে সঙ্গম অন্তর্ভুক্ত হবে। বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা তাদের থেকে যে সুখ ভোগ করেছ তার দরুন তাদের হক— মহরানা— তাদেরকে দিয়ে দাও।'

এ আয়াতে 'মহরানা'কে 'মজুরী' বলা হয়েছে। এ আয়াতে বহুবচনে যে اُجُوْرٌ বলা হয়েছে, তার অর্থও মহরানা। মহরানাকে اجر বা 'তুল্য বিনিময়' নাম দেয়ার কারণ হল, তা সুখভোগ ও স্বাদ আস্বাদনের বিনিময়। তা বস্তুত বিনিময় নয়, বস্তুগত জিনিসেরও বদল নয়। যেমন ঘর-বাড়ি ও যানবাহনের সুবিধা সুখের বিনিময়কে, 'তুল্য বিনিময়' নাম দেয়া হয়েছে। আর 'মহরানা'র নাম 'তুল্য বিনিময়' দেয়ায় প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফার কথা সহীহ্‌ঃ কোন মেয়েলোককে মজুর রাখলে ও তার সাথে যিনা করলে তার উপর 'হদ্দ' জারী হবে না। কেননা আল্লাহ মহরানার নাম দিয়েছেন মজুরী। ফলে তা এরূপ হয়েছে যে, কেউ বলল ঃ আমি

তোমাকে এতটা মহরানা দিলাম। উমর উবনুল খাত্তাব (রা) থেকে এরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা 'ফসেদ নিকাহ্' সংঘটিত হয়। কেননা বিয়ের জরুরী শর্ত সাক্ষী এখানে নেই।

আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহরানা দিয়ে তাদের বিবাহ কর তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না। (সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন— আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

এর ব্যাখ্যা করেছেন স্ত্রীদেরকে 'মাত্য়া' দেয়া বলে। এ পর্যায়ে তাঁর থেকে কয়েকটি কথা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, তিনি এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'মাত্য়া' বিয়ে মুবাহ। এ-ও বর্ণিত হয়েছে, উবাই ইবনে কাবের এ আয়াতটির পাঠ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَمَا سْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

তোমরা তাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যে সুখ-ভোগ ও স্বাধ আস্বাদন করেছ, তার মজুরী তুল্য বিনিময় তোমরা তাদেরকে দাও।

তার থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে যখন বলা হল, এ বিষয়ে কবিতা বলা হয়েছে, তখন তিনি বললেন ঃ মাত্য়া বিয়ে মৃত লাশ আহার করতে একান্ত বাধ্য এবং রক্ত ও শুকর মাংস ঠেকায় পড়ে যে খায় তার মতো অবস্থায় পড়া— প্রয়োজনকালে এই মাত্য়া বিয়েকে আল্লাহ হালাল করেছেন।

জাবির ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর মাত্য়া বিয়ে সম্পর্কে তার এই মতকে তিনি প্রত্যাহার করেছেন।

আমাদের নিকট জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবু উবায়দ, ইবনে বুকাইর, লায়স, বুকাইর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ, সরীদের মুক্ত দাস আম্মার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ 'মাত্য়া' বিয়ে কি যিনা না যথার্থ বিয়ে ? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ তা যিনাও নয়, বিয়েও নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে তা কি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ 'মাত্য়া' তেমনি যেমন আল্লাহ বলেছেন। তাঁকে বললাম, এরপর কি মেয়েটিকে ইদ্দত পালন করতে হবে ? বললেন, হ্যাঁ, তার ইদ্দত হল এক হায়য। বললাম, তাতে সন্তানের মধ্যে মীরাস চালু হবে ? বললেন, না।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা, আতা আল-খুরাসীনী ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ -আয়াতটিকে আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - (الطلاق : ١) -হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদেরকে তালাক দেবে তাদের ইদ্দতের জন্যে— মনসূখ করেছে।

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মাত্‌য়া বিয়ে সম্পর্কিত তাঁর আগের মুবাহ্ হওয়ার মত তিনি প্রত্যাহার করেছেন, সে মত থেকে তিনি ফিরে গিয়েছেন।

আগের আলিমদের এক জামা'আত থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'মাত্‌য়া' যিনা ছাড়া আর কিছু নয়। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, লায়স, আকীল, ইউনুস, ইবনে শিহাব, ইবনে আবদুল মালিক, মুগীরাতা ইবনে নওফিল, ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর (রা)-কে মাত্‌য়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছিলন ঃ ذالك السفاح —'তা নিঃসন্দেহে যিনা।'

হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, বলেছেন ঃ

كَانَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الزِّنَا -

মাত্‌য়া বিয়ে যিনার পর্যায়ে গণ্য।

যদি বলা হয়— না, মাত্‌য়া বিয়ে যিনার সমতুল্য হতে পারে না। কেননা হাদীস বর্ণনাকারীগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, 'মাত্‌য়া' বিয়ে কোন কোন সময় মুবাহ ছিল। রাসূল করীম (স) তা মুবাহ ঘোষণা করেছে। কিন্তু যিনা তো কোন সময়ই আল্লাহ মুবাহ করেন নি।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, যিনা কোন সময়ই মুবাহ ছিল না। কিন্তু পরে আল্লাহ্ যখন তা হারাম করেছেন, তখন তা যিনা পর্যায়ে কাজ হয়ে গেছে। তার উপর যিনা নাম প্রয়োগ খুবই যথার্থ। যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اَلزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِيْ تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَاَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ -

যিনাকারী সেই মেয়ে, যে নিজেকে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই বিয়ে দেয়। আর যে দাস-ই তার মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করবে, সে যিনাকার— এর অর্থ, তা হারাম করা হয়েছে, প্রকৃত যিনা নয়।

নবী করীম (স) আরও বলেছেন ঃ

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهُ -

দুই চোখ যিনা করে, দুই পা-ও যিনা করে। চক্ষুর যিনা হচ্ছে দেখা। আর দুই পার যিনা হচ্ছে চলা। পরে যৌনাঙ্গ তাকে সত্য প্রমাণ করে কিংবা মিথ্যা করে দেয়।

এ হাদীসে এই সব কাজকেই যিনা নাম দেয়া হয়েছে। এটা পরোক্ষ ব্যবহার। কেননা তা হারাম। মাত্য়া বিয়েরও নাম দেয়া হয়েছে যিনা। এই নামকরণ পরোক্ষভাবে এবং হারামকরণকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, শুবা, কাতাদাতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাতাদাতা বলেছেন, আমি আবূ নজরাকে বলতে শুনেছি, ইবনে আব্বাস মাত্য়া বিয়ের আদেশ দিতেন। আর ইবনুয যুবায়র তা করতে নিষেধ করতেন। আমি এ কথা জাবির ইবনে আবদুল্লাহর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি দারুল হাদীসকে হাতে নিয়ে বললেন, আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে থেকে মাত্য়া বিয়ে করেছি। পরে হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন ঃ আল্লাহ্ তো তাঁর রাসূলের জন্যে যা-ইচ্ছা হালাল করতেন। অতএব তোমরা হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, যেমন আল্লাহ্ করার আদেশ করেছেন এবং এ সব মেয়েদেরকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাক। মেয়াদী বিয়ে করা যে পুরুষকেই আমার নিকট আনা হবে, আমি অবশ্যই তাকে রজম করব। এ ভাবে হযরত উমর (রা) মাত্য়া বিয়ের দণ্ডস্বরূপ রজম দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। হতে পারে তাঁর এই কথা ভীতকরণ ও বিতাড়িতকরণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, যেন লোকেরা এ কাজ থেকে দূরে সরে থাকে।

আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইয সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমাকে আতা জানিয়েছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ، مَاكَانَتِ الْمَتْعَةُ اِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَحِمَ اللّٰهُ بِهَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَا نَهْيُهُ لِمَا احْتَاجَ اِلَى الزِّنَا اِلَّا شَفًا -

আল্লাহ উমরকে রহম করুন। মাত্য়া বিয়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের প্রতি বিরাট রহমতস্বরূপ ছিল। যদি তা নিষিদ্ধ করা না হতো, তা হলে খুব অল্প লোক ছাড়া যিনার মুখাপেক্ষী কেউ হতো না।

ইবনে আব্বাসের এ সব কথা থেকে যেকথাটি স্পষ্ট হয়ে আসে তা হল তিনি মাতয়া বিয়েকে মুবাহ্ মনে করতেন— কোন কোন বর্ণনা মতে কোনরূপ প্রয়োজনের ঠেকায় এবং তা ছাড়াও।

দ্বিতীয়— তা মৃত লাশ-এর মতো। যা খাওয়া কঠিন প্রয়োজনে হালাল হয়।

তৃতীয়— তা হারাম, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে আমরা আগেই কথা বলেছি আর সেই কথাও যে, তা পরে মনসূখ হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস তাঁর মাত্য়া বিয়ে মুবাহ্ হওয়া সংক্রান্ত মত প্রত্যাহার করা প্রমাণিত হয় আবদুল্লাহ ইবনে অহব বর্ণিত বর্ণনা থেকে। তিনি বলেছেন, আমাকে আমর ইবনুল হারস,

বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ আবূ ইসহাক (বনু হাশিমের মুক্ত গোলাম) সূত্রে জানিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, আমি একটি বিদেশ সফরে ছিলাম। আমার সঙ্গে আমার দাসী ছিল। আর-ও সঙ্গী সাথীও ছিল। আমি আমার দাসীকে আমার সঙ্গীদের জন্যে হালাল করে দিলাম। তারা তাকে ভোগ করতে থাকল। তখন তিনি বললেন, এ তো উচ্ছৃঙ্খল— ব্যভিচার।

এ কথাটিও প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর পূর্ব মত প্রত্যাহার করেছেন। তবে যারা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوا هُنَّ اُجُورَ هُنَّ -

এ আয়াতে উবাই ইবনে কা'বের পাঠ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى 'একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্তের জন্য' কথাটি রয়েছে। কিন্তু কোন মুসলমানের নিকট-ই তা কুরআনের পাঠ বর্তমান নেই। তাই এ আয়াতে মেয়াদী বিয়ের কোন উল্লেখ-ই নাই বলতে হবে। আর তাতে যদি 'মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে' কথাটি থাকেও। তবু তা মেয়েদের মাত্‌য়া বিয়ে করার কোন দলীল হতে পারে না। কেননা সে 'মেয়াদ' কথাটি মহরানার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তখন তার পূর্ণ কথাটি এরূপ দাঁড়াবে ঃ

فَمَا دَخَلْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِمَهْرٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰتُوْ هُنَّ مَهُوْرَ هُنَّ عِنْدَ حُلُوْلِ الْاَ جَلِ -

যদি তোমরা বিয়ের সাহায্যে তাদের সাথে সঙ্গম কর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে মহরানা দেয়ার শর্তে, তাহলে তোমরা মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তাদের মহরানা দিয়ে দাও।

আয়াতটির ধরনেই এই দলীল রয়েছে যে, এখানে বিয়ের কথা বলা হয়েছে, মাত্‌য়া (বিয়ের) কথা নয়। এর তিনটি কারণ রয়েছে। একটি— কথাটি 'ওদের ছাড়া আর যারা তাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' এই কথার সাথে সংযোজিত করেও পরে-পরেই বলা হয়েছে। আর এ হচ্ছে মুহররম মেয়েলোকদের ছাড়া অন্যান্য মেয়েলোকদের বিয়ে করা সংক্রান্ত কথা সুনিশ্চিতভাবে। এর মানে বিবাহ করার কথাই যে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে কুরআন বিশারদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্যই নেই। অতএব সুখ ভোগ ও স্বাদ আস্বাদন اِسْتِمْتَاعٌ বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গম করাই বুঝিয়েছে, যার কারণে সম্পূর্ণ মহরানা পাওয়ার অধিকার জন্মেছে।

দ্বিতীয়— আল্লাহ্‌র مُحْصِنِيْنَ কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা احصان নৈতিক সংরক্ষণ তো কেবলমাত্র সহীহ্ বিবাহের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। 'মাত্‌য়া' বিয়ের সঙ্গম কখনও مُحْصِنٌ হয় না, আর তা এই নামের আওতার মধ্যেও আসে না। তাই আমরা জানলাম যে, এখানে নিকাহ্‌র কথা-ই বলতে চাওয়া হয়েছে।

আর তৃতীয়— আল্লাহ্‌র কথা غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ এতে 'যিনাকে সিফাহ' নাম দেয়া হয়েছে। কেননা তা বিয়ে সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী। তাতে বংশধারা রক্ষিত হয় না, ইদ্দত

পালন ওয়াজিব হয় না, স্বামীর শয্যা স্থায়ীভাবে লাভ করা হয় না। বরং বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত হয়। 'মাত্য়া' বিয়েতে যখন এই সব-ই উপস্থিত, তখন তা যিনা ছাড়া আর কোন তাৎপর্য পেতে পারে না। যারা-ই 'মাত্য়া'কে যিনা বলেছেন, তাঁরা এই সব কিছুকে সামনে রেখেই বলেছেন। আর এই কারণেই যিনাকারীকে 'মুসাফিহ মسافح' বলেছেন। কেননা এর সুযোগে মেয়েলোকটির সাথে সঙ্গম বাতিল পন্থায় বীর্যপাত ঘটানো ছাড়া আর কিছুই নয় না। এতে বংশধারাও সংরক্ষিত বা স্থাপিত হয় না। তাই আল্লাহ্ এর যদি হালাল করেও থাকেন, তবে তা সবই নিষেধ করে দিয়েছেন। আর সিফাহ্-র স্থানে احصان প্রতিস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ যিনার পরিবর্তে নিকাহ চালু করেছেন। তাই আয়াতের استمتاع শব্দের 'মাত্য়া'য় যিনার তাৎপর্য থাকার কারণে এর অর্থ হবে বিবাহ। আর আল্লাহ্র কথা ঃ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ যিনাকার হিসেবে নয়। একটি শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যা মুবাহ করেছেন, তার ক্ষেত্রে। আর এতেই মাত্য়া বিয়ের নিষেধ রয়েছে। কেননা 'মাত্য়া' যিনার নামান্তর হিসেবেই ব্যবহৃত। তা কোন্ দিক দিয়ে, তার ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি।

আবূ বকর বলেছেন, সাহাবীদের মধ্য থেকে 'মাত্য়া' মুবাহ মনে করার ব্যাপারে যার নাম বেশি খ্যাতি লাভ করেছে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)। তবু তার নিকট থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এ পর্যায়ে পাওয়া গেছে। তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাকে মুবাহ বলেছেন। অথচ আমরা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি যে, আয়াতে তা মুবাহ হওয়ার কোন দলীল-ই নেই বরং আয়াতের দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, মাত্য়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সম্পূর্ণ হারাম। এর বহু কয়টি দিকেরও ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি। এ ছাড়া তার থেকে এই বর্ণনাও পাওয়া গেছে যে, তিনি 'মাত্য়া' বিয়েকে ঠেকার সময় মৃত খাওয়া, শুকর মাংস ও রক্ত— যা সম্পূর্ণ হারাম— খাওয়ার সমতুল্য মনে করেছেন। এগুলি যেহেতু মহাঠেকায় পড়া ব্যক্তির জন্যে মুবাহ, তাই 'মাত্য়া' বিয়েও অনুরূপ অবস্থায় মুবাহ। কিন্তু তা এক অসম্ভব কথা। কেননা اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ প্রয়োজন হারামসমূহকে মুবাহ করে দেয়। কিন্তু 'মাত্য়া' বিয়েতে এই রূপ প্রয়োজন কখনই দেখা দেয় না। কেননা যে প্রয়োজন মৃত ও রক্ত ইত্যাদি হারাম জিনিস খাওয়া অপরিহার্য হয়, তা হল জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থা। তখন তা না খেলে মানুষ মরে যেতে পারে, এই আশংকা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। আর এ তো জানা যে, সঙ্গম না করলে মানুষ কখনই নিজের জীবন ধ্বংস হওয়ার বা তার কোন অঙ্গহানি হওয়ার বিন্দুমাত্র ভয় সৃষ্টি হয় না। আর সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায়ও সব নিষিদ্ধ জিনিস খাওয়া যখন মুবাহ বা হালাল হয় না, তখন যিনা করাও হালাল হতে পারে না।

যদি কেউ বলে যে, মরা ও রক্ত— ওগুলি খাওয়া হালাল হয় প্রয়োজনে— অতএব প্রয়োজনে মাত্য়াও হালাল হবে— তাহলে বলব— এটা নিতান্তই স্ববিরোধী ও অপ্রাসঙ্গিক কথা। এই ধরনের কথা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে —তা কল্পনাও করা যায় না। ও দুজন বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করতে পারেন— তা-ও অভাবিত। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস অতি বড় ফিকাহবিদ ছিলেন। এ ধরনের কথার অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর নিকট কখনই অস্পষ্ট থাকতে পারে না।

তাই সহীহ্ কথা হল তিনিও তা নিষিদ্ধই মেনে নিয়েছে। তাঁর মতেও মাত্‌য়া হারাম। আর পূর্বে তিনি তা মুবাহ মনে করে থাকলেও সেই মত তিনিই প্রত্যাহার করেছেন— এ বর্ণনাও তো রয়েছে।

মাত্‌য়া হারাম হওয়ার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ - اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ -

মুমিন তারা যারা তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী। তবে তাদের স্ত্রীদের নিকট থেকে নয় কিংবা তাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে তাদের থেকেও নয়। (যদি স্ত্রী ও দাসীদের থেকে নিজেদের যৌনাঙ্গ সংরক্ষণ না করে) তাহলে তারা তিরস্কৃত নয়। তবে এর বাইরে যারা তার সন্ধান করবে, তারা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। (সূরা মুমিনুর ঃ ৫-৭)

এ আয়াতে সঙ্গম কার্যকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এই দুইটি (স্ত্রী বা দাসী)-এর মধ্যে আর এ দুটির বাইরে সঙ্গমের সুযোগ চাওয়া নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ এর বাইরে যারা সঙ্গমের সুযোগ তালাস করবে তারা সীমালংঘনকারী। মাত্‌য়া নিশ্চয়ই এ দুটির বাইরে। অতএব তা হারাম।

যদি বলা হয়, যে মেয়ের সুখ-সম্ভোগ ও স্বাদ-আস্বাদন করা হবে, সে স্ত্রীর কথা তুমি অস্বীকার করনি। তাহলে যে দুটির মধ্যে মুবাহ সঙ্গম সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, মাত্‌য়া তার বাইরে পড়ে না।

জবাবে বলা যাবে, একথা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা 'স্ত্রী' নামটি সেই মেয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যে বিবাহিতা সহীহ্ আকদের মাধ্যমে। আর মাত্‌য়া যখন বিয়ে-ই নয়, তখন মেয়েটি নিশ্চয়ই 'স্ত্রী' নামে অভিহিতা হতে পারে না।

যদি বলা হয়, মাত্‌য়া বিবাহ নয়, একথার প্রমাণ কি ?

জবাবে বলা হবে, তার দলীল এই যে, বিবাহ এমন একটা নাম, যা দুটির যে কোন একটি অর্থ অবশ্যই দেবে। তা হল সঙ্গম ও আক্‌দ। ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি, বিবাহ বলতে আসলে সঙ্গম বোঝায় আর পরোক্ষ অর্থে আক্‌দ। শব্দটির ব্যবহার যখন এই দুইটি অর্থের যে কোন একটিতে সীমাবদ্ধ এবং পরোক্ষ অর্থে আক্‌দ বোঝাবে যেমন পূর্বে বলেছি এবং আগের মনীষীরা যখন এই নামটি নিঃশর্ত বিবাহদানে ব্যবহার করেছেন তখন তা বিবাহ। কিন্তু তারা মাত্‌য়ার উপর 'নিকাহ' শব্দের প্রয়োগ করেন নি। কেউ যখন কোন মেয়ের সাথে শুধু সুখ-সম্ভোগ ও স্বাদ-অস্বাদনে মিলিত হয়, তখন তারা বলে না যে, অমুক ব্যক্তি অমুক মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। এই কারণে আমাদের জন্যেও মাত্‌য়াকে নিকাহ নামে অভিহিত করা জায়েয হতে পারে না। কেননা কোন শব্দকে তার পরোক্ষ অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত কেবল তখন, যদি সেরূপ ব্যবহার আরবদের নিকট থেকে শুনতে পাওয়া যায়। অথবা শরীয়তে সেরূপ ব্যবহার হতে দেখা যায়। তাই মাত্‌য়া শব্দ অভিধান ও শরীয়ত— কোন একটিতেও বিবাহ

অর্থে ব্যবহৃত হতে আমরা দেখতে পাই না, তখন মাত্‌য়াকে আল্লাহ্‌ মুবাহ্‌ ঘোষিত কাজের বাইরের একটি কাজ মনে করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকে না। আর যে লোক সে কাজ করবে তাকে সীমালঙ্ঘনকারী ও জালিম গণ্য করতে আমরা বাধ্য হই। আমরা অবশ্যই বলব, এই ব্যক্তি নিজের উপর জুলুম করছে, আল্লাহ্‌র হারাম করা কাজ সে (হালাল মনে করে) করছে। উপরন্তু নিকাহর বহু শর্ত রয়েছে। এই শর্তসমূহ পূরণ হওয়া বিবাহের জন্যে বিশেষ জরুরী।যখন সে শর্ত অপূরণ থাকবে, তখন তা আর নিকাহ্‌ বা বিবাহ গণ্য হবে না। তার একটি, সময় অতিবাহিত হওয়ার কোন প্রভাব বিবাহের উপর পড়বে না। নির্দিষ্ট সময় অতীত হয়ে গেলেই তা শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু 'মাত্‌য়া' একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হয়, সময় শেষ হয়ে গেলে তার চুক্তিও নিঃশেষ হয়ে যায়, সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিবাহ স্বামীর শয্যা স্ত্রীর জন্যে নিশ্চিত করে, সন্তান জন্মিলে পুরুষটির সাথে তার বংশীয় সম্পর্ক স্থাপিত ও প্রমাণিত হয়— এ সন্তান সেই পুরুষটির হয় নিঃসন্দেহে। সে জন্যে প্রসূতিকে কোন দাবি উত্থাপন করতে হয় না। বরং পুরুষটির ঔরসে সেই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া কোন সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকৃত হতে পারে না। কিন্তু মাত্‌য়ার সমর্থন করা তাতে কোন বংশীয় সম্পর্ক প্রমাণিত ও স্থাপিত হয় বলে কখনই মনে করে না। এ থেকে আমরা নিঃসন্দেহে জানলাম যে, 'মাত্‌য়া' আর যা-ই হোক, বিবাহ নয় কখনই। স্বামীর স্থায়ী শয্যাও নয়। আর একটি কথা হল, বিবাহ হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে সঙ্গম তালাকের পর ইদ্দত অনিবার্য করে। স্বামী মরে গেলেও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়। তার সাথে সঙ্গম হোক আর নাই হোক। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا -

তোমাদের যারা মরে এবং স্ত্রী রেখে যায়, এই স্ত্রীরা চার মাস দশদিন নিজেদেরকে (পরবর্তী স্বামী গ্রহণ থেকে) বিরত ও অপেক্ষমান বানিয়ে রাখবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৪)

কিন্তু 'মাত্‌য়া'য় স্বামী মৃত্যুর কোন ইদ্দত বাধ্যতামূলক নয়। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ -

তোমাদের স্বামী যা রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমাদের জন্যে। (সূরা নিসা ঃ ১২)

কিন্তু 'মাত্‌য়া'য় মীরাস প্রাপ্তির কোন প্রশ্নই নেই। এটা 'মাত্‌য়া'র সমর্থকদেরই মত। এই যা বলা হল, এগুলি বিশেষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত হুকুম-আহকাম। অবশ্য দাসত্ব ও কুফর হলে তা মীরাসের পথে প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু 'মাত্‌য়া'য় দুজনের একজনের দিক থেকেও মীরাস প্রতিবন্ধক কুফর বা দাসত্ব নেই, দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটারও কোন কারণ নেই, বংশ সম্পর্ক স্থাপিত হতেও কোন বাধা নেই— অথচ পুরুষটি এমনই যে, তার স্থায়ী শয্যা রয়েছে, বংশ সম্পর্কও তার সাথে স্থাপিত হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও পূর্বোদ্ধৃত কোন কিছুই হয় না, তখন এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, 'মাত্‌য়া' বিয়ে নয়। তাই বিয়ে যখন নয়, বিয়ের আওতার সম্পূর্ণ বাইরে তা অবস্থিত, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাও নয়। তখন এই 'মাত্‌য়া' আল্লাহ্‌র হারাম

ঘোষণার ফলে সম্পূর্ণ হারাম রূপে চিহ্নিত হবে। এই কথাই আল্লাহ বলেছেন ঃ ও দুটির বাইরে যারা (যৌন-লালসার সুযোগ) সন্ধান করবে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী লোক।

যদি বলা হয়, মাত্য়ার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে যে বিচ্ছিন্নতা, তা-ই তালাক।

জবাবে বলা হবে, তালাক তো স্পষ্ট শব্দের দ্বারা সংঘটিত হয় অথবা ইঙ্গিত দ্বারা। কিন্তু এখানে— মাত্য়ার— দুটির একটিও নেই। তাহলে এই বিচ্ছিন্নতা তালাক হতে পারে কিভাবে? তদুপরি 'মাত্য়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এবং তখন তার হায়য আসতে থাকলে কোন কথাই তো বলার থাকে না। কেননা 'যারা 'মাত্য়া' জায়েয বলে, তারা কিন্তু হায়য অবস্থায় তালাক দেয়া জায়েয মনে করে না।' তাই 'মাত্য়া'র মেয়াদ শেষের বিচ্ছিন্নতা যদি তালাক হয়, তাহলে হায়য অবস্থায় সে বিচ্ছিন্নতা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে যদি মেয়েলোকটির হায়য অবস্থা হয়, তবুও বিচ্ছিন্নতা অনিবার্যভাবে সংঘটিত হবে। এ কথাই প্রমাণ করে যে, এই বিচ্ছিন্নতা তালাক নয়— যা সহীহ্ নিকাহ্র ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তালাক দেয়া ছাড়াই যদি মেয়েলোকটি পুরুষটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্নতার কোন কারণ পুরুষটির দিক থেকে না ঘটানো হয়, তাহলেও প্রমাণিত হয় যে, 'মাত্য়া' বিয়ে নয়।

যদি বলা হয়, বংশধারা না চলা, ইদ্দত পালন না হওয়া, মীরাস না হওয়া 'মাত্য়া' কে বিয়ে মনে করার প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কেননা ছোট বয়সের পুরুষের কোন বংশধারা চলে না। অথচ তার নিকাহ্ সহীহ্ হয়ে থাকে। দাস তো মীরাস পায় না, আর মুসলমানও তো কাফিরের মীরাস পায় না। এই সব না হওয়ার দরুন যদি এদের নিকাহ সহীহ্ হয়ে থাকে সহীহ্ হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে, তা হলে 'মাত্য়া' কেন বিয়ে নামে অভিহিত হবে না?

জবাবে বলা যাবে, ছোট বয়সের বংশ সম্পর্ক স্থাপিত হবে যদি সে সঙ্গম হয়। স্ত্রীর স্বাদ আস্বাদন করতে সমর্থ হয়। অথচ সে মেয়েলোকটির সন্তানের বংশ সম্পর্ক সেই পুরুষটির সাথে স্বীকারকরণ— যদিও সেখানে বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গম কার্য সম্পন্ন হলে বংশ-সম্পর্ক স্বীকৃত হয়। দাস ও কাফির দাসত্ব ও কুফর-এর কারণে মীরাস পায় না। এ দুজনের পারস্পরিক মীরাস দেওয়া-পাওয়া হয় না। কিন্তু মাত্য়া'র ক্ষেত্রে তো তা নেই। তাদের দুজনই তো পরস্পর থেকে মীরাস পাওয়া লোক। কিন্তু মীরাস না পাওয়ার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও যদি পাওয়া দেওয়া না হয়, তাহলে বুঝতে হবে মাত্য়ায় তা হয় না বলেই তা বিয়ে নয়। কেননা তা 'নিকাহ' হলে নিশ্চয়ই মীরাস দেওয়া-পাওয়া হতো। মীরাস পাওয়ার কারণ উপস্থিত, তাদের দুজনের দিক থেকে মীরাস না পাওয়ার কোন কারণ নেই। বিশেষ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ 'মাতয়া বিয়েও নয়, যিনাও নয়।' এতে তিনি মাত্য়ার বিয়ে হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। কাজেই তা বিয়ে নয়— এটাকেই সত্য মেনে নেয়া কর্তব্য। কেননা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট শরীয়ত ও ভাষাগত নামসমূহ নিশ্চয় অস্পষ্ট থাকতে পারে না। অথচ সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র তিনি-ই এর পক্ষপাতী। কিন্তু তিনিও মাত্য়াকে বিয়ে মনে করেন নি। বরং এ নামে অভিহিত করাকেই তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অতএব প্রমাণিত হল যে, তা বিয়ে নয়।

হাদীসের দলীলেও মাত্‌য়া নিষিদ্ধ। আবদুল বাকী— মুয়ায ইবনুল মুসান্না— কা'নবী মালিক— ইবনে শিহাব— আবদুল্লাহ আল-হাসান— মুহাম্মাদ ইবনে আলীর দুই পুত্র— তাঁদের পিতা আলী (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ -

রাসূল (স) মেয়েলোকের সাথে মাত্‌য়ার সম্পর্ক স্থাপন ও লোকালয়ের গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মলিক ছাড়া অন্যরা এই পর্যায়ে বলেছেন, আলী (রা) ইবনে আব্বাসকে বলেছিলেনঃ

اِنَّكَ امْرُؤٌ تَيَّاهٌ، اِنَّمَا الْمُتْعَةُ اِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ نَهٰى عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ -

তুমি একজন দিশেহারা লোক। মাত্‌য়া ছিল ইসলামের প্রাথমিককালীন একটি অনুমতি মাত্র। পরে রাসূলে করীম (স) খায়বর যুদ্ধের সময়ে এবং লোকালয়ের গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

এই হাদীসটি জুহরী সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না ও অন্যান্যদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইকরামা ইবনে আম্মার সাঈদুল মুকবেরী আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাবুক যুদ্ধের সময় বলেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْمُتْعَةَ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ وَالْمِيْرَاثِ -

আল্লাহ্ তা'আলা মাত্‌য়াকে হারাম করেছেন বিয়ে, তালাক, ইদ্দত ও মীরাস দ্বারা।

আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ আবূ উমাইস— ইয়াস ইবনে সালামাতা ইবনুল আক্‌ওয়া তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) মেয়েলোকদের সাথে মাত্‌য়া করার অনুমতি দিয়েছিলেন আওতাস যুদ্ধের বছর। পরে তা নিষিদ্ধ করেছেন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইসমাঈল ইবনুল ফযল আল-বলখী— মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে মূসা, মুহাম্মাদ— ইবনুল হাসান, আবূ হানীফা, নাফে ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ 'রাসূল (স) খায়বরের দিন মেয়েলোকদের সাথে মাত্‌য়া সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। আর আমরা উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার ছিলাম না।'

আবূ বকর বলেছেন ঃ ইবনে উমর (রা)-এর কথা ঃ 'আমরা তো উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার ছিলাম না'-এর কয়েকটি দিক থাকতে পারে। একটি এই— তাঁদের জন্যে মাত্‌য়া যখন মুবাহ্ ছিল, তখন তাঁরা তা করে যিনাকার হয়ে যাননি। অর্থাৎ তা যদি মুবাহ্ করা না হতো তা হলে তাঁরা যিনাকারী হয়ে যেতেন। এই কথাটির দ্বারা সেই কথার প্রতিবাদ ও অস্বীকৃতি হয়ে গেছে, যারা বলেন যে, মাত্‌য়া প্রয়োজনে মুবাহ করা হয়েছিল, যেমন মৃত লাশ ও রক্ত খাওয়া অনুরূপ

অবস্থায় মুবাহ্ করা হয়েছিল। পরে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়, নিষেধ করার পর-ও তাঁরা তা করতে কখনই প্রস্তুত হয় নি। করলে যিনাকার হয়ে যেতেন। এ-ও সম্ভব যে, মাত্য়া যখন মুবাহ্ ছিল তখন তাঁরা মাত্য়া করে যিনাকারে পরিণত হন নি। কেননা তা মুবাহ্ ছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ মুসাদ্দাস আবদুল ওয়ারিস ইসমাঈল ইবনে উমায়্যাতা— জুহরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ বলেছেন, আমরা উমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমরা মেয়েলোকদের সাথে মাত্য়া সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল— তাঁর নাম রুবাই ইবনে সাবুরাতা— আমি উবাই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বিদায় হজ্জে মাত্য়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আবদুল আযীয ইবনে রুবাই ইবনে সাবুরাতা— তাঁর পিতা— তার দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আসলে এই নিষেধ করা হয়েছিল মক্কা বিজয়ের দিন। ইসমাঈল ইবনে আয়াশ আবদুল আযীয ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয রুবাই' ইবনে সাবুরাতা তাঁর পিতা সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, এটা ছিল মক্কা জয়ের দিনের ব্যাপার। আনাস ইবনে আয়াজ আল-লায়সী— আবদুল আযীয ইবনে উমর আবদুল আযীয রুবাই ইবনে সাবুরাতা তাঁর পিতা সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ ঘটনা বিদায় হজ্জের দিনের।

কোন্ দিন মাত্য়া হারাম করা হয়েছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তা নিষিদ্ধ ও হারাম— এ বিষয়ে হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তাই তারীখ দিন নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই, তার গুরুত্বও নেই। সব বর্ণনাকারীর বর্ণনায় তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা জুহরী, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সাবুরাতাল জুহানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) মেয়েদের সাথে মাত্য়া সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন মক্কা বিজয়ের দিন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইবনে নাহিয়াতা মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আর-রাযী আমর ইবনে আবূ সালমাতা সাদকাতুন উবায়দুল্লাহ ইবনে আলী ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যাত মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ যে সব মেয়েলোক যাদের সাথে আমরা মাত্য়া করতাম, আমাদের সঙ্গে রওয়ানা হল, তখন রাসূল (স) বললেন ঃ هُنَّ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ —ওরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত হারাম।

যদি বলা হয় এই হাদীসসমূহ পরস্পর বিরোধী। কেননা সাবুরাতা আল-জুহানী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বিদায় হজ্জকালে মাত্য়া তাঁদের জন্যে মুবাহ করেছিলেন। অন্যান্যরা বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন। আলী ও ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (স) তা খায়বরের দিন হারাম করেছেন। আর খায়বর বিজয় তো মক্কা বিজয়ের বেশ আগের ব্যাপার এবং বিদায় হজ্জেরও পূর্বের। তাহলে মক্কা বিজয়ের দিন বা বিদায় হজ্জের দিন সেই নিষিদ্ধ কাজ আবার কি করে মুবাহ্ করা হল, যখন তা খায়বরের দিন হারাম ঘোষিত হয়েছিল ?

এর জবাবে দুটি দিক দিয়ে কথা বলা যাবে। একটি হল, সাবুরা বর্ণিত হাদীসেই তারিখের বিভিন্নতা রয়েছে। কেউ বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন, আবার কেউ বলেছেন বিদায় হজ্জের দিন। আর এই দুটি হাদীসেই এ কথা রয়েছে যে, নবী করীম (স) সে সফরে মাত্য়া মুবাহ ঘোষণা করেছিলেন এবং পরে তা হারাম ঘোষণা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, বর্ণনাকারীদেরই মাত্য়া হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার দিন-তারিখ বর্ণনায় পার্থক্য হয়েছে। তাই দিন তারিখের ব্যাপারটা বাদ দেয়া গেল। শুধু আসল খবরটা থেকে গেল, তারিখ তার যা-ই হোক-না কেন। এমতাবস্থায় হযরত আলী ও ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস তো তার নিষিদ্ধ হওয়ার অভিন্ন তারিখের কথা বলেছে এবং তা হচ্ছে তা হারাম করেছেন খায়বর দিবসে। আর দ্বিতীয় দিকটি হল এটা সম্ভব যে, তা প্রথমে খায়বর দিবসই হারাম হয়েছিল। পরে বিদায় হজ্জে তা মুবাহ্ করা হয়। অথবা মুবাহ্ করা হয় মক্কা বিজয়ের দিন। তারপর তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। এতে আলী ও ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি মনসূখ হয়েছে সাবুরাতাল জুহানী বর্ণিত হাদীস দ্বারা। পরে এই মুবাহ মনসূখ হয়ে গেছে সাবুরা বর্ণিত হাদীস দ্বারা। কেননা এরূপ হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নয়, নিষিদ্ধও নয়।

যদি বলা হয়— ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ কায়স ইবনে আবূ হাজিম ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধ গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে মেয়েলোক ছিল না। তখন আমরা বললাম— হে রাসূল আমরা কি বন্ধ্যাত্বকরণ করব না? জবাবে তিনি আমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন। বরং আমাদেরকে কাপড়ের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্যে বিয়ে করার অনুমিত দিয়েছেন। পরে বলেছেন ঃ

لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ -

আল্লাহ্ যে পবিত্র জিনিসসমূহ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না। (সূরা মায়িদা ঃ ৮৭)

জবাবে বলা যাবে এই মাত্য়াই তো তা, যা রাসূলে করীম (স) সমস্ত হাদীসে হারাম করেছেন। আমরা অস্বীকার করি না যে, তা কোন এক সময় মুবাহ্ করা হয়েছিল, পরে তা হারাম করা হয়েছিল। ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসেও কোন তারিখের উল্লেখ নেই। অতএব নিষেধকারী হাদীসসমূহই ফয়সালাকারী হবে। কেননা তাতে মুবাহ্ করার পর নিষিদ্ধ ঘোষণার উল্লেখ হয়েছে । আর দুটি যদি সমান হয় তবু নিষেধের হাদীসই অগ্রাধিকার পাবে— যেমন বিভিন্ন স্থানে আমরা বলে এসেছি।

নবী করীম (স) মাত্য়া মুবাহ ঘোষণাকালে যে আয়াত পাঠ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ যে পবিত্র দ্রব্যাদি তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম করো না। সম্ভবত, বন্ধ্যাকরণ নিষেধকরণই এর উদ্দেশ্য। সেই সাথে মুবাহ বিবাহকে হারাম মনে করাও আল্লাহ্র করা জিনিসকে হারামকরণ পর্যায়ে গণ্য। আর এ-ও হতে পারে যে, কোন একটা অবস্থায় মাত্য়া মুবাহ্ ছিল। আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তা তালাক, ইদ্দত মীরাস ব্যবস্থার দ্বারা মনসূখ করা হয়েছে।

এর আর একটি দলীল হল, একথা জানা গেছে, মাত্‌য়া কোন এক সময় মুবাহ ছিল। এই মুবাহ হওয়াটা যদি স্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকত তাহলে সে সংক্রান্ত হাদীস সর্বজন পরিচিত ও মুতাওয়াতির হতো। কেননা সে তো সাধারণভাবে সকলের জন্যেই প্রয়োজনীয় কাজ। সকল মানুষই তা জানত যেমন প্রাথমিক অবস্থায় সকলেই জেনেছিল। সাহাবীগণের ইজমা হয়েছে তার হারাম হওয়ার উপর। তা মুবাহ থাকলে এই ইজমা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হতো না। আমরা সমস্ত সাহাবীকেই তার মুবাহ হওয়াকে অস্বীকার করতে দেখছি, তাই তার নিষিদ্ধ হওয়া নিশ্চিত। অথচ শুরুতে সকলেরই জানা ছিল তা মুবাহ। তাতে বোঝা যায়, তা মুবাহ থাকার পর নিষিদ্ধ হয়েছে। লক্ষণীয়, বিবাহ যখন মুবাহ, তখন তার মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। তাই মাত্‌য়াও যদি সাধারণ ব্যাপার হতো, যেমন বিবাহ সাধারণ তাহলে এ পর্যায়ের হাদীস বিপুল সংখ্যায় বর্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কোন সাহাবী একান্তভাবে মাত্‌য়া মুবাহ্ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না ইবনে আব্বাস (রা) ছাড়া। আর ইবনে আব্বাসও তাঁর সেই মত প্রত্যাহার করেছিলেন। কেননা পরে মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর নিকটও স্থির সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল যে, মাত্‌য়া হারাম। এক দিরহাম দিয়ে নগদ দুই দিরহাম নেয়া তাঁর মতে প্রথমে মুবাহ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জানাতে পারলেন যে, নবী করীম (স) তা হারাম করে দিয়েছেন এবং এ পর্যায়ের মুতাওয়াতির হাদীস চতুর্দিক থেকে তাঁর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর পূর্বমত প্রত্যাহার করলেন। আর মুসলমানদের সামষ্টিক মতকেই নিজের মত হিসেবে গ্রহণ করলেন। মাত্‌য়ার ব্যাপারটিও ঠিক সেই রকমের।

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনার মাধ্যমেও জানা গেছে যে, 'মাত্‌য়া'র মুবাহ হওয়া মনসূখ হয়ে গেছে। তা হল, তিনি তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ রাসূলের জামানায় দুইটি 'মাত্‌য়া' চালু ছিল। কিন্তু আমি সে দুইটি নিষেধ করছি। সে দুটি কেউ করলে আমি তাকে শাস্তি দেব।' অপর একটি বর্ণনার ভাষা হল, সে কাজে কেউ অগ্রসর হলে আমি তাকে রজম করব। তাঁর এই কথাকে কোন একজন লোক-ও প্রতিবাদ বা অগ্রাহ্য করেনি। আর লোকেরা ভালোভাবেই জানতেন যে, সে দুটি রাসূল (স)-এর সময়ে মুবাহ ছিল। তাই এতে দুটির কোন একটি দিক অবশ্যই থাকবে। হয় তারা সকলেই জানতেন যে, 'মাত্‌য়া' মুবাহ ছিল। পরে তারা সকলেই তার নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন এবং তা সকলেই পরিহার করেছেন। অন্যথায় তারা তো রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধপন্থী হওয়ার অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়বে। অথচ আল্লাহ্ তাদেরকে সর্বোত্তম জনগোষ্ঠি মানুষের কল্যাণের জন্যে উদ্ভাবিত বলেছেন। বলেছেন, তারা মা'রূফ কাজের আদেশ করে ও মুনকার কাজ নিষেধ করে। তাই তাঁদের কেউ রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধতা করেছেন, এমন কথা হতেই পারে না। তাছাড়া রাসূলের বিরুদ্ধতা তো সুস্পষ্ট কুফর। ইসলামের বাইরে চলে যাওয়া। কেননা যে জানবে যে, নবী করীম (স) 'মাত্‌য়া মুবাহ করেছেন আর তখনই কেউ বলে যে, তা হারাম ও নিষিদ্ধ অথচ তা মনসুখ-ও হয়ে যায়নি, তাহলে সে লোক মুসলিম মিল্লাত থেকে বহির্ভূত। তাই এ কাজ যখন জায়েয নয়, তখন আমরা নিঃসন্দেহে জানলাম যে, তাঁরা সকলেই জানতেন যে, 'মাত্‌য়া' শুরুতে মুবাহ থাকার পর নিষিদ্ধ হয়েছে। এ কারণে হযরত উমর (রা)-এর ঘোষণায় প্রতিবাদ

করেন নি। হযরত উমরের কথা যদি অগ্রহণযোগ্য হতো এবং তার মনসূখ হওয়া তাদের নিকট প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত না হতো তাহলে কোন লোকই হযরত উমরের ঘোষণার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারতেন না। আর এটাই একটা বড় দলীল এই কথার 'মাত্‌য়া' মুবাহ্ নয়, তা সুস্পষ্ট হারাম। কেননা রাসূলে করীম (স) যা মুবাহ্ করেছেন, তার মুবাহ্ হওয়াটা মনসূখ না হয়ে থাকলে তাকে নিষিদ্ধ মনে করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

একটু চিন্তা-বিবেচনা করে দেখলেও বোঝা যাবে যে, 'মাত্‌য়া' হারাম। আমরা জানি—বিবাহ বস্তুগত মালিকানাধীন জিনিসের উপর কোন চুক্তি সম্পাদনের মতোই ব্যাপার। বস্তুগত জিনিসের কল্যাণের ইজারায় যে চুক্তি হয়, তার বিপরীত। বিবাহের আক্‌দ সাধারণ ও নিঃশর্ত ভাবেই সহীহ্ হয়। তাতে কোন মুদ্দাতের উল্লেখ থাকে না। কিন্তু ইজারা প্রভৃতি পর্যায়ের চুক্তি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। অথবা তা হয় কোন নির্দিষ্ট কাজের চুক্তি। চুক্তির হুকুম যখন এই, তখন তা স্ত্রী-অঙ্গের সুখ-সম্ভোগের উপর হলে তা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির মতোই হয়ে যায়। আর সেই ধরনের চুক্তি যদি কোন বস্তুগত জিনিসের উপর হয়, তাহলে তা সহীহ্ হতে পারে না। কেননা তা নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে হয়। আর মালিকানাধীন বস্তুগত জিনিসের মালিকানা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অন্য কাউকে দেয়া সহীহ্ হয় না। তাই বিবাহও যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হয়, তাহলে স্ত্রী-অঙ্গ মুবাহ্ হওয়া জায়েয হবে না। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মালিকানা হস্তান্তর করা হলে তাও সহীহ্ হবে না। হেবা ও সদকার কাজও তেমনি। এসব চুক্তি দ্বারা কোন জিনিসের মালিকত্ব পাওয়া যায় না। স্ত্রী-অঙ্গের সুখ-সম্ভোগও তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হয় না।

'মাত্‌য়া' মুবাহ্ হওয়ার পক্ষের লোকেরা একটা যুক্তি এই পেশ করে যে, তা কোন এক সময় মুবাহ্ ছিল এবং তাতে সকলেরই ঐকমত্য অর্জিত ছিল। পরে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়েছে। তাই যেখানে সকলের ঐকমত্য ছিল, আমরা শুধু সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যে বিষয়ে বিভিন্ন মত, সে বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই।

এ কথার জবাবে বলা যায়, যেসব হাদীস দ্বারা 'মাত্‌য়া' মুবাহ্ প্রমাণিত, সেসব হাদীস থেকেই প্রমাণিত যে, তা নিষিদ্ধ।

যেসব হাদীসে মাত্‌য়ার মুবাহ্ হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, সে সব হাদীসেই উল্লেখ আছে তার নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। তাই যেদিক দিয়েই তা মুবাহ্ প্রমাণিত হয়, সে দিক দিয়েই প্রমাণিত হয় তা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। আর তার নিষিদ্ধ হওয়া যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তার মুবাহ্ হওয়াও প্রমাণিত নয়। আর আমরা একটা মতের উপর একমত হয়েছিলাম, পরে তাতে মত-পার্থক্যে লিপ্ত হয়েছি, মতপার্থক্যে আমরা ইজ্‌মা ত্যাগ করিনি— এই রূপ কথা একটি নেহায়েত বাজে কথা। কেননা যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্য, সে ক্ষেত্রে তো ঐকমত্য নেই। আর যদি ঐকমত্যই না হল, তা হলে এমন একটা দলীল হওয়া আবশ্যক, যা তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করবে। তা ছাড়া কোন জিনিসের এক সময়ে মুবাহ্ থাকা প্রমাণ করে না যে, তা চিরদিনই মুবাহ্ থাকবে। কেননা মনসূখ হওয়ার একটা নিয়ম তো কার্যকর আছে। আর ইতিপূর্বে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ও আগের ফিকাহ্‌বিদদের ইজমার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছি যে, একটা জিনিস মুবাহ্ থাকার পর তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, মাত্য়া পর্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যে-লোক নসীহত কবুল করতে প্রস্তুত, তার জন্যে এতে চূড়ান্ত মাত্রার মাল-মসলা রয়েছে। প্রথম দিকের সমাজে তা নিয়ে কোন মত-পার্থক্য দেখা দেয়নি— যেমন পূর্বে আমরা সবিস্তারে বলেছি। সেই সাথে স্মরণীয়, সমস্ত দেশের ফিকাহবিদগণ মাত্য়া হারাম হওয়া বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে একবিন্দু মত-পার্থক্য নেই।

যে লোক নির্দিষ্ট দিনের জন্যে কোন মেয়েলোক বিবাহ করল, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, মালিক ইবনে আনাস, সওরী আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, কেউ যদি কোন মেয়েকে দশ দিনের জন্যে বিয়ে করে তবে সে বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল। তাদের দুজনের মধ্যে কার্যত কোন বিয়েই হয়নি। জুফার বলেছেন, নিকাহ তো জায়েয, কিন্তু তাতে (সময়ের) যে শর্ত করা হয়েছে, তা বাতিল। আওজায়ী বলেছেন, যদি কেউ কোন মেয়ে বিয়ে করে আর তা নিয়ম থাকে যে, সে তাকে তালাক দেবে, তাহলে তাতে কোন শর্তই গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিয়ে নয়, মাত্য়া, এতে কোন কল্যাণ নেই।

আবূ বকর বলেছেন, তাদের ও জুফর-এর মধ্যে আসলে কোন মত-পার্থক্য নেই এ ক্ষেত্রে যে, 'মাত্য়া' শব্দ দ্বারা নিকাহ সহীহ্ হয় না। কেউ যদি বলে আমি তোমাকে দশ দিন মাত্য়া দেব, তাহলে সেটা কোন বিয়ে হবে না। 'নিকাহ্' শব্দ দ্বারা এই আকদ করা হলে তাতেই মত-পার্থক্য। যদি বলে ঃ আমি তোমাকে দশ দিনের জন্যে বিয়ে করছি, তাহলে জুফার-এর মতে তা সহীহ্ নিকাহ হবে। তবে দশ দিনের শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বাজে শর্ত আরোপ করা হলে তার দ্বারা নিকাহ নষ্ট হতে পারে না। যেমন, যদি কেউ বলে ঃ আমি তোমাকে বিয়ে করছি এই শর্তে যে, আমি তোমাকে দশ দিন পর তালাক দেব, তাহলে বিয়েটা জায়েয হবে, শর্তটা বাতিল হয়ে যাবে, জুফর ও অন্যদের মধ্যে মতের পার্থক্যটা হচ্ছে— এটা নিকাহ্ না মাত্য়া— এই নিয়ে। জমহুর ফিকাহ্বিদরা বলেছেন, এটা মাত্য়া, নিকাহ নয়। এ কথাটি যে সহীহ্ তার প্রমাণ এই যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে যে বিবাহ তাকেই মাত্য়া বলে। তাতে 'মাত্য়া' শব্দ ব্যবহৃত না হলেও তা মাত্য়া হবে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইসহাক ইবনুল হাসান ইবনুল মায়মূন, আবূ নয়ীম, আবদুল আযীয ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয, রুবাই ইবনে সাবুরাতাল জুহানী, তাঁর পিতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ সাবুরাতা বলেছেন, তাঁরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সফরে রওয়ানা হয়েছেন। সকলে তাঁরা আসফান-এ অবস্থান নিয়েছেন। এখানে যাদের সঙ্গে কুরবানীর জন্তু ছিল না, তাদেরকে তওয়াফ করে হালাল হওয়ার জন্যে রাসূল (স) যে আদেশ করেছিলেন, সেই কাহিনী বললেন। বললেন, আমরা যখন হালাল হলাম তখন নবী করীম (স) বললেন, তোমরা এসব মেয়ের সাথে মাত্য়া করে স্বাদ সম্ভোগ কর। আমাদের নিকট একথার অর্থ ছিল, বিয়ে করা। আমরা সে কথা মেয়েদেরকে বললে তারা অস্বীকৃতি জানাল। তবে তাদের ও আমাদের মাঝে একটা সময় নির্ধারণের শর্ত আরোপ করে। আমরা একথা রাসূল (স)-কে জানালাম। তখন তিনি বললেন— তোমরা তাই কর। তখন আমি ও আমার চাচার পুত্র (চাচাতো ভাই) বের হলাম। আমি তার চাইতে বেশি যুবক ছিলাম। আমার নিকট একটি চাদর ছিল, তার নিকট-ও একটি চাদর ছিল। আমরা একটি মেয়েলোকের নিকট

উপস্থিত হলাম। সে আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদর পছন্দ করল এবং পছন্দ করল আমার যৌবন। মেয়েটি বলল, চাদর দুটি প্রায় সমান। তবে এ অধিক যুবক। পরে তার সাথে আমার দশ দিনের মাত্‌য়া সাব্যস্ত হয়। আমি তার নিকট একটি রাত যাপন করলাম। পরের দিন সকাল বেলা আমি মসজিদে হারামে চলে গেলাম। রাসূল (স) তখন রুক্‌ন ইয়ামনী ও মাকামে ইব্‌রাহীমের মাঝে অবস্থান করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِی الْاِسْتِمْتَاعِ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ، اَلَا وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ، فَمَنْ بَقِیَ عِنْدَهٗ مِنْهُنَّ شَیْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَلَا تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا -

হে জনগণ, আমি তোমাদেরকে এ সব মেয়েদের সাথে মাত্‌য়ার সম্পর্ক স্থাপন করে যৌন সুখ সম্ভোগের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানবে, আল্লাহ্‌ এ কাজকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। তাই এখনও যার নিকট এ ধরনের কোন মেয়ে রয়েছে, সে যেন তার পথকে হালাল করে নেয় এবং তাদেরকে যে যা দিয়েছে, তার থেকে তার কিছুই ফিরিয়ে নেবে না।

হযরত সাবুরাতা (রা) এই হাদীস থেকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মাত্‌য়া বা স্ত্রী সুখ-সম্ভোগ বলতে মূলত বিবাহই বুঝেছিলেন। নবী করীম (স) লোকদেরকে এ বিবাহের মেয়াদ নির্দিষ্ট করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তা করতে নিষেধ করেছেন মুবাহ থাকার পর। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, একটি মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে বিবাহ মূলত মাত্‌য়া। একটি হাদীস-ও তার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ্য। ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ কায়স ইবনে আবূ হাজিম আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

আমরা একটি যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সঙ্গে ছিলাম, আমাদের সঙ্গে মেয়েলোক ছিল না। আমরা বললাম, হে রাসূল আমরা কি নিজেদেরকে 'খাসী' বানাব ? তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন এবং রুখসত দিলেন একটি মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে বস্ত্রের বিনিময়ে বিয়ে করার। শেষে রাসূল (স) আয়াত পাঠ করেন ঃ তোমরা হারাম করো না সে সব পবিত্র জিনিস, যা আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন।

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসঊদ (রা) জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'মাত্‌য়া' ছিল মেয়াদী বিবাহ। হযরত জাবির কর্তৃক উমর উবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। হাদীসটি আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি মাত্‌য়া সম্পর্কিত আলোচনায়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলের জন্যে যা তিনি চান হালাল করেন। তোমরা হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর যেমন আল্লাহ্‌ আদেশ করেছেন। আর এ সব মেয়েলোক বিয়ে করা থেকে দূরে থাক। যে ব্যক্তি মেয়াদী বিয়ে করেছে, তাকে আমার নিকট নিয়ে আসা হলে আমি তাকে 'রজম' করব। হযরত উমর (রা) জানিয়ে দিলেন যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের বিয়ে মাত্‌য়া, কোন বিয়ে যদি সে রকমের হয়। অথচ নবী করীম (স) তা করতে নিষেধ করেছেন। তা মাত্‌য়া নামে অভিহিত হবে। এতে মেয়াদী বিয়েও শামিল এই নাম তার উপরও ব্যবহৃত হতে পারে বলে। কেননা মাত্‌য়া তো অল্প সময়ের

সুখ-সম্ভোগের ব্যাপার। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ —'এই দুনিয়ার জীবন তো ভোগ উপকরণ মাত্র' অর্থাৎ খুবই সামান্য সুখ ভোগের ব্যাপার। অবশ্য তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে দেয় দ্রব্যাদিকেও মাত্‌য়া বলা হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ فَمَتِّعُوهُنَّ —'তালাক দেয়া স্ত্রীদের জীবনোপকরণ দাও।' অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ -

তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে প্রচলিত নিয়মে জীবনোপকরণ দিতে হবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৪১)

কেননা তা কম-সে-কম পরিমাণের মহরানা। এ থেকে জানতে পারলাম— যার উপরই মাত্‌য়া শব্দের প্রয়োগ হয়, কিংবা তা হয় জীবনোপকরণ তার লক্ষ্যই হল সামান্য পরিমাণ। বিয়ের আক্‌দ যা দাবি করে, তার তুলনায় এটার পরিমাণ খুবই সামান্য। তাই তালাকের পর যা দেয়া হয়— যা শুধু আক্‌দের কারণে ওয়াজিব হয় না— তা সামান্য জীবনোপকরণ। বিয়ের আকদের কারণে যে মহরানা প্রাপ্য হয়, তার তুলনায়ও মাত্‌য়া খুবই সামান্য। আর নির্দিষ্ট সময়ের বিয়েকেও মাত্‌য়া (বা মাত্‌য়া) বলা হয় এজন্যে যে, তার মেয়াদ খুবই কম। তার সুযোগে সুখ-সম্ভোগের পরিমাণ ও বিয়ের আকদ হলে তার স্থিতিশীলতার তুলনায় খুবই সামান্য। কেননা তা হয় মৃত্যু পর্যন্তকার জন্যে। অথবা বিচ্ছেদ ঘটার কোন কারণ সৃষ্টি হওয়ার সময় পর্যন্তকার জন্যে। তাই 'মাত্‌য়া' শব্দের ব্যবহার নিয়ে কোন মতপার্থক্য হওয়া কাম্য নয়। সম্পর্কটা মাত্‌য়া শব্দ দ্বারা হোক, কি নিকাহ্‌ শব্দ দ্বারা, যদি তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হয়, তাহলে তা হারাম হবে। কেননা তার উপর 'মাত্‌য়া' বা 'মুতয়া' নামের প্রয়োগ হতে পারে সেই দিক দিয়ে, যা আমরা বলেছি।

উপরন্তু দশ দিনের জন্যে বিবাহের আক্‌দকারী বিবাহটিকে মেয়াদী বানাবে কোন-না-কোন শর্তের ভিত্তিতে অথবা শর্ত বাতিল করে দেবে এবং তাকে চিরস্থায়ী বানাবে। যদি তাকে নির্দিষ্ট সময়ের বানায়, তাহলে 'মাত্‌য়া' হবে। তাতে কোন দ্বিমতের অস্তিত্ব নেই। আর যদি তাকে চিরস্থায়ী বানায়, তাহলে তা সহীহ্‌ হবে না। এ কারণে যে, পরে যে সময় বাড়ানো হয়েছে, স্থায়ী করা হয়েছে, মূল আক্‌দটা সেই ভিত্তিতে হয়নি। তাই মেয়েলোকটির যৌনাঙ্গ মুবাহ মনে করা চিরস্থায়ীভাবে জায়েয হবে না। কেননা এটা আক্‌দ ছাড়াই হচ্ছে। যেমন কেউ যদি এক স্তূপ খাদ্যশস্য ক্রয় করে এই বলে যে, তা দশ কে. জি. অথবা বলল— আমি তোমার স্তূপ থেকে দশ কে. জি'র কিনলাম, বিক্রেতা তা-ই বিক্রয় করতে রাযী হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিটা দশ কে. জি'র উপরই হল। অন্য কোন পরিমাণের উপর নয়। অনুরূপভাবে নিকাহ্‌টা যদি হয় দশ দিনের জন্যে সেই দশ দিন পরও সে নিকাহ স্থায়ী হলে বাড়তি দিনগুলো তো এমন যে, তার উপর কোন আক্‌দই হয়নি। তাই এই সময়ের জন্যে স্ত্রীলোকটির যৌনাঙ্গ তার জন্যে মুবাহ হবে না। মূলত নিকাহ্‌কে সময়ভিত্তিক বানানোই জায়েয নয়। বানালে তা সুস্পষ্ট 'মাতয়া' হবে এবং তার ফলে মূল আক্‌দটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই ব্যাপারটা এ রকমের নয় যে, যদি বলে ঃ আমি তোমাকে বিবাহ করছি এই শর্তে যে, দশ দিন পর তোমাকে তালাক দেব। কেননা এ ধরনের বিয়ে জায়েয হবে আর দশ দিন পর তালাক দেয়ার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে বিবাহের আক্‌দটা করেছে চিরদিনের জন্যে। আর তাতে তালাক দিয়ে তা

বিচ্ছিন্ন করার শর্ত করেছে। যেমন যদি দশ দিন পর তালাক না দেয়, তাহলে বিয়ে টিকে যাবে। এ থেকে জানতে পারলাম সে বিয়েটা স্থায়িত্বের নিয়মেই হয়েছে— তবে তালাক দ্বারা তা ছিন্ন করার শর্ত করেছে। এই শর্ত অ-সহীহ্। এ ধরনের শর্ত বিবাহকে নষ্ট করে না। অতএব শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আক্দ সহীহ্ ও জায়েয হবে। দশ দিনের জন্যে বিয়ে করলে তা সে রকমের হবে না। কেননা দশ দিনের পরও তা টিকিয়ে রাখা হলে এই দিনগুলোর জন্যে কোন আক্দ নেই। যেমন কেউ যদি দশ দিনের জন্যে ঘর ভাড়া করে তাহলে চুক্তিটা সেই দশ দিনেরই হবে। তারপরও থাকলে তার জন্যে কোন চুক্তি নেই বলে সে অনধিকার চর্চাকারী হয়ে যাবে। বে-আইনীভাবে দখলকার বলে অভিহিত হবে। কোনরূপ চুক্তি না করেই অবস্থানকারী বলে পরিচিত হবে। সেজন্য সে ভাড়াও দেবে না চুক্তি নেই বলে। যদি বলে— আমি তোমাকে এই ঘর ভাড়া দিলাম এই শর্তে যে, দশ দিন পর এই চুক্তি আমি ভেঙ্গে দেব, তাহলে সে চুক্তিটা সহীহ্ হবে না। অবশ্য ভাড়াটের সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার হবে দশ দিন এবং তারপরও। তবে পরবর্তী সময়ের জন্যে তাকে সমপরিমাণের ভাড়া দিতে হবে। বিয়েও তেমনি। যদি তা দশ দিনের জন্যে হয়, তাহলে দশ দিনের পরের জন্যে কোন আক্দ নেই বলে সেও অনধিকার চর্চাকারী হবে।

যদি বলা হয়, কথাটি যদি এরূপ বলে যে, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম এই শর্তে যে, দশ দিন পর তুমি তালাক হয়ে যাবে, তাহলে তা নির্দিষ্ট সময়ের বিয়ে হবে। কেননা দশ দিন পর সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

জবাবে বলা যাবে, এটা নির্দিষ্ট সময়ের বিয়ে নয়। বরং চিরস্থায়ী বিয়ে। তা কেটে দেবে তালাক। আক্দের সঙ্গেই তালাকের উল্লেখ করা হোক, তার মেয়াদ গত হওয়ায় সে তালাক ঘটানো হোক— এর মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। কেননা বিয়েটা শুরুতেই স্থায়ী বিয়ে হয়েছে, তালাকটাকে ভবিষ্যতের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাই তা আক্দকে সময়ের মধ্যে সীমিত করা হয়নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً -

অতঃপর তোমরা তাদের মহরানা ফরয হিসেবেই দিয়ে দাও।

এ আয়াতে মহরানা দেয়ার আদেশ করা হয়েছে। সেইজন্যে মহরানাকে মজুরী বলা হয়েছে। কেননা তা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সুখ-ভোগের বিনিময়। আর তা-ই মহর বলে প্রমাণিত। এই কথা বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা বিয়ে করে নৈতিক সংরক্ষণে নিজেদেরকে আটক করেছে, যা কথা বলা হয়েছে এভাবে ঃ 'মুহররম' মেয়েদের ছাড়া বাইরের সব মেয়েই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এভাবে যে, 'তোমরা তাদেরকে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে পেতে চাইবে বিয়ের সংরক্ষণে সংরক্ষিত অবস্থায়, উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার হয়ে নয়।'

অথবা যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের পরিবারের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং তাদেরকে প্রচলিত নিয়মে তাদের মহরানা দিয়ে দাও, তখন তারা বিয়ের দুর্গে সংরক্ষিত, উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার নয়।'

এসব কথায় সংরক্ষণশীলতা-নৈতিক পবিত্রতার উল্লেখ হয়েছে নিকাহ্র উল্লেখের পর-পরই এবং মহরানাকে 'কেরায়া' বা 'মজুরী' বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَرِيضَةً সে মহরানা দেয়ার বাধ্যবাধকতার তাগিদ স্বরূপ বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে অমূলক ধারণা-কল্পনা বা ব্যাখ্যার বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে। কেননা ফরয তো তাকেই বলে যা কর্তব্যের দিক দিয়ে উচ্চতর গুরুত্বপূর্ণ।

মহরানায় বৃদ্ধি

আল্লাহ তা'আলা মহরানার উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ -

মহরানা ধার্য ও নির্দিষ্ট করার পর তোমরা পরস্পর রাজি হয়ে যদি কিছু কর, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

মহরানার প্রস্তাব হওয়ার পর পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে কোন পরিমাণে সমঝোতা হলে কোন দোষ না হওয়ার কথা আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

এ আয়াতে فَرِيضَة অর্থ— নির্ধারণ, পরিমাণ ঠিক করা, যেমন মীরাসের ফরায়েয, যাকাতের অংশ ইত্যাদি। পূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করে এসেছি। আল-হাসান থেকে এ আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহরানার কোন অংশ যদি হ্রাস করতে পরস্পর রাযি হও বা তার বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর বা সবটাই হেবা করার ফয়সালা কর, তাহলে তাতে গুনাহ হবে না।

এ আয়াতটি মহরানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা জায়েয হওয়ার-ও একটা দলীল। আল্লাহ্র কথাঃ পরিমাণ নির্ধারণের পর পারস্পরিক রাযি হয়ে যে সিদ্ধান্তে তোমরা পৌঁছবে, তা সহীহ্ হবে। তা বৃদ্ধি করা হোক, কি হ্রাস করা হোক— করতে কোন দোষ নেই। বিলম্বে দেয়ার সিদ্ধান্তও হতে পারে, সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়াও সিদ্ধান্ত হতে পারে। তবে এ আয়াতে প্রধানত বৃদ্ধি করা কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তা সম্পর্কিত হয়েছে উভয় পক্ষের রাযি হওয়ার সাথে। সম্পূর্ণ ক্ষমা করা, হ্রাস করা, বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে পুরুষটির রাযি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়, শুধু স্ত্রীই তা করতে পারে একান্ত নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। কিন্তু পরিমাণ বৃদ্ধি উভয়ের কবুল ছাড়া সহীহ্ হবে না। এই ব্যাপারটি যখন উভয় পক্ষের রাযি হওয়ার সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে বৃদ্ধির ব্যাপারটিই তোলা হয়েছে। কেবল মাফ করে দেওয়া, হ্রাস করা বা বিলম্বিত করার ব্যাপারই নয় বিশেষভাবে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ সাধারণ ও ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। তাই সবকিছুই এর আওতায় আসবে। যদি নির্দিষ্টভাবে কোন একটি বোঝাতে হয়, তাহলে সে জন্যে আলাদা দলীলের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া শুধু উল্লিখিত কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিলে

উভয় পক্ষের রাযি হওয়ার কথাটা বলার কোন ফায়দাই থাকে না, কাজটি উভয় পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট করার অর্থই হচ্ছে— তারা উভয়ে রাযি হয়ে পরিমাণে বৃদ্ধিও করতে পারবে। ব্যবহৃত শব্দের এই দাবি অগ্রাহ্য করা জায়েয হবে না। আর সম্ভাব্যতা কোন একটির মধ্যে সীমিত করলেও সে শব্দের থাকা না থাকা উভয়ই সমান হয়ে যায়।

মহরানার নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর বৃদ্ধিকরণ পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন— বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট পরিমাণের মহরানায় বৃদ্ধি করা জায়েয। তা কার্যকর হবে যদি স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম হয় কিংবা স্বামী মরে যায়। আর সঙ্গমের আগেই তালাক দিলে বৃদ্ধিটা বাতিল হয়ে যাবে। তখন স্ত্রী পাবে আক্‌দের সময়ে নির্দিষ্ট করা পরিমাণের অর্ধেক। জফর ইবনুল হুযাইল ও শাফেয়ী বলেছেন, বৃদ্ধিটা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্যে হেবা। যদি স্ত্রী তা নিজ হাতে নিয়ে নেয়, তাহলে এ দু'জনের মতে তা জায়েয হবে। আর নিজ হাতে যদি না পেয়ে থাকে, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। মালিক ইবন আনাস বলেছেন, বৃদ্ধি করা সহীহ হবে। সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিলে বৃদ্ধির পরিমাণের অর্ধেক ফিরিয়ে নেবে। তা হবে হেবা করা মালের মতো, স্বামী তা নিয়ে দাঁড়াবে। আর স্ত্রীর তা নিজ হাতে নেওয়ার আগেই স্বামী মরে গেলে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে এই বৃদ্ধির কিছুই পাবে না। কেননা তা ছিল একটা দান, যা নিজ হাতে নেয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, উপরোল্লিখিত আয়াত যে বৃদ্ধি করা জায়েয বলে তার কারণ উপরে বলে এসেছি। বৃদ্ধি জায়েয হওয়ার আর একটি প্রমাণ হল, বিয়ের আক্‌দ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মালিকানায় অবস্থিত। তার প্রমাণ এই যে, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের উপর স্বামী 'খুলা' তালাক দিতে পারে। তখন সে তার নিকট থেকে বিনিময় নেবে। বোঝা গেল— স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার উভয়েরই মালিকানাভুক্ত। আর আক্‌দ যখন উভয়েরই মালিকানাভুক্ত, তখন মহরানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা জায়েয হবে, যেমন বিবাহের আক্‌দের শুরুতে তা জায়েয ছিল। জায়েয ছিল এ হিসেবে যে, উভয়ই আক্‌দের মালিক ছিল। কেননা মালিকানার অর্থ ব্যবহার ও দেয়া-না দেয়ার কর্তৃত্ব করা। আর উভয়েরই এই অধিকার সম্পূর্ণ বিধিসম্মত। তার আর একটি প্রমাণ, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যে যখন তা হস্তগত করবে তা জায়েয হবে, এই হস্তগত করার পর হয় তা হেবা হবে ভবিষ্যতের জন্যে— জুফর ও শাফেয়ী যেমন বলেছেন। কিংবা তা মহরানার পরিমাণ বৃদ্ধি হবে, তার নিজের হক্ নেই আক্‌দের উপর, যেমন পূর্বে আমরা বলে এসেছি। ভবিষ্যতের হেবা হওয়া তার জায়েয নয়। কেননা তাকে হেবা মনে করার উভয় চুক্তিতে দাখিল হয়নি। শুধু বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে এই কথার ভিত্তিতে যে, তা যৌনাঙ্গের বিনিময়, যা আক্‌দের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তারা দুজন নিজেদের উপর যে চুক্তি চাপিয়ে নেয়নি, আমরা আক্‌দ হিসেবে তাদের জন্যে তা বাধ্যতামূলক করে দেব, আমাদের জন্যে তা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ —'তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ –

মুসলমানরা তাদের নিজেদের করা শর্ত পূরণে বাধ্য।

অতএব তারা দুজন— স্বামী-স্ত্রী— নিজেদের উপর যদি কোন চুক্তি চাপিয়ে লয়, তাহলে আয়াতটি বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে অপর কারোর চুক্তি তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারে না। হাদীস-ও তা-ই প্রমাণ করে। কেননা আয়াতের দাবি হচ্ছে মূল চুক্তি পূর্ণ করা, যে চুক্তি সে করেছে, অন্য চুক্তি পূরণ তার দায়িত্ব নয়। কেননা অন্য কোন চুক্তি পূরণ তার জন্যে বাধ্যতামূলক করা হলে যে চুক্তি সে করেছে তা অপূরণ থেকে যাবে। নবী করীম (স) মুসলমানদের করা শর্তসমূহ সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতেও শর্ত পূরণ অনিবার্য। শর্ত প্রত্যাহার এবং দুজনকে তার জন্যে বাধ্য করার কোন অর্থ নেই শর্ত পূরণের বাধ্য করা ছাড়া। তাহলে আয়াত ও হাদীস এক সাথেই প্রমাণ করে বিপরীত মতের বাতুলতা। তার দুটি কারণ। একটি শর্ত ও চুক্তি সাধারণ ভাবেই চুক্তি ও শর্ত পূরণে বাধ্যতামূলক করে। আর দ্বিতীয়, আকদ বা চুক্তি কিংবা শর্ত যা নিজেরা করেনি, তা পূরণ বাধ্যতামূলক নিষিদ্ধ। হস্তগত করার পর হেবা দুজনার জন্যে বাধ্যতামূলক করা যখন বাতিল হয়ে গেল, মালিক বানিয়ে দেয়া সহীহ্ হল তখন প্রমাণিত হল যে, স্ত্রী তার মালিক হয়েছে বৃদ্ধির দিক দিয়ে।

একথা প্রমাণিত হয় যে, বৃদ্ধিটাকে 'হেবা' বানানো-ও সম্ভব নয়। কেননা যখনই বৃদ্ধি পাবে, স্ত্রীর তা হস্তগত করা নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। কেননা তা যৌনাঙ্গের বিনিময়, যদি তা হেবা হয়, তাহলে তার জামানত হবে না। আর বৃদ্ধি হলে এবং সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে সে বৃদ্ধি প্রত্যাহৃত হবে। আর যখন 'হেবা' হবে, তাতে তালাকের কোন প্রভাব পড়বে না। যখন দুজনই কোন চুক্তির ভিত্তিতে তাতে প্রবেশ করবে, তখন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। তাতে জামানত দেয়ার চুক্তিতে তাদের দুজনের জন্যে বাধ্যতামূলক করা আমাদের জন্যে জায়েয হবে না। যেমন তারা দুজনই চুক্তিবদ্ধ হবে বিক্রয়ের চুক্তিতে তখন তাদের দুজনের জন্যে 'হেবা'র চুক্তি বাধ্যতামূলক করা জায়েয হবে না। যদি তারা দুজন স্বল্প করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের দুজনের জন্যে ভবিষ্যতে বিক্রয়ের কোন চুক্তি বাধ্যতামূলক করা যাবে না। এতেই এ প্রমাণ রয়েছে যে, বৃদ্ধির চুক্তি হলে 'হেবা'র চুক্তি প্রমাণ করা জায়েয হবে না। যদি 'হেবা' না থাকে আর অন্যকে মালিক বানানো সহীহ্ হয়, তাহলে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বদল হিসেবে বৃদ্ধি সুনির্দিষ্টতা সহকারে আক্‌দের সাথে সংযুক্ত হবে। সেটাকে স্ত্রীর জন্যে 'হেবা' বানানোর ব্যাপারে ইমাম মালিকের কথা, তার পরে তাঁর কথা ঃ সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে বৃদ্ধির অর্ধেক স্বামীর দিকে ফিরে যাবে— এমন পর্যায়ের কথা, যা সুসংবাদ ও সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা তা যদি 'হেবা' হয়, তাহলে বিবাহের আক্‌দ-এর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, মহরানার সাথেও নয়। বৃদ্ধি থেকে কোন কিছু স্বামীর দিকে ফেরত হওয়ায় তালাকের কোন প্রভাব নেই। যদি মহরানায় বৃদ্ধি হয়, তাহলে স্বামীর মৃত্যুর কারণে তার বাতিল হয়ে যাওয়া অসঙ্গত।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে সমস্ত বৃদ্ধিটাই বাতিল হয়ে যাবে। বাতিল হবে এই কারণে যে, মূল আক্‌দের বৃদ্ধিটা ছিল না, পরে তার সাথে যুক্ত করা হয়েছিল মাত্র। তাই তার স্থিতিটা আক্‌দ রক্ষা পাওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। অথবা নির্ভরশীল হবে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হওয়ার উপর। যেমন বিক্রয়ে বৃদ্ধি তার সাথে যুক্ত হবে চুক্তি

রক্ষা পাওয়ার শর্তে। চুক্তি যখনই বাতিল হয়ে যাবে বৃদ্ধিটাও বাতিল হয়ে যাবে। মহরানায় বৃদ্ধিটাও তেমনি।

যদি বলা হয়, আক্‌দে মহরানা তো নির্ধারিত আছে, তার উপর সঙ্গমের পূর্বে তালাক সংঘটিত হলে তার কিছু অংশ বাতিল হয়ে যায় মাত্র। তাহলে বৃদ্ধিটাও তেমন হবে না কেন, যদি বৃদ্ধিটা সহীহ্ হয়ে থাকে ও তার সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, তা তাতে রয়েছে বলেই মনে করতে হবে। তাহলে তারও নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরানার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

জবাবে বলা যাবে, আমাদের মতে আক্‌দে নির্ধারিত পরিমাণ সেই সবকে বাতিল করে দেয়, যদি সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়। কেননা মহরানা নির্ধারিত আক্‌দটাই বাতিল হয়ে গেছে। যেমন বিক্রয়ের বস্তুটি হস্তগত করার পূর্বে ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে গেলে হয়। ভবিষ্যতের মাত্য়া হিসেবে অর্ধেক দেয়া তো ওয়াজিব হবে। ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, সঙ্গমের পূর্বে তালাকদাতা ব্যক্তি— তার স্ত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট মহরানা অর্ধেক দেবে— তা-ই তার মাত্য়া। আবুল হাসান আল-কারখীও তা-ই বলতেন। এই প্রেক্ষিতেই তাঁরা বলেছেন, দুইজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেয়ার সাক্ষ্য দিল, কিন্তু সেই ব্যক্তি— স্বামী— তা অস্বীকার করে, পরে সে সাক্ষী দুজন স্বামীর জন্যে অর্ধেক মহরানার জামিন হল, যা তার উপর চেপেছে। কেননা সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিলে সমস্ত মহরানা-ই পড়ে যাবে। আর পরিমাণ নির্ধারণে যে অর্ধেক স্বামী দিতে বাধ্য হবে, তা যেন নতুন করে চেপে বসা একটা ঋণ, ওদের দুজনের সাক্ষ্যের কারণে তা তার উপর বাধ্যতামূলক হয়েছে। এরূপ অবস্থায় সঙ্গম পূর্ব তালাকের কারণে বৃদ্ধি ও প্রথমের নির্ধারণ উভয়ের পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য থাকে না।

যদি বলা হয়, এই ব্যাখ্যা তো আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার (সঙ্গমের) পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদের জন্যে মহরানা নির্দিষ্ট করেছে, তা হলে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক দিতে হবে'— এর বিরুদ্ধে পড়ে যায়। কেননা তুমি বলেছ যে, সব মহরানাই পড়ে যাবে এবং নতুন করে অর্ধেক তার উপর চেপে বসবে।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতে তালাক অস্বীকৃত হয়নি, কেননা এই তালাকের পর-ও নতুন করে অর্ধেক মহরানা তো দিতে হচ্ছে। তাতে নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক দেয়ার অপরিহার্যতার কথাই বলা হয়েছে কোন পরিচিতি ছাড়া-ই, কোন শর্ত ব্যতিরেকেই। আমরাও তো অর্ধেক মহরানা দিতে হবে বলছি। তাহলে শুরু থেকেও নতুন করে অর্ধেক মহরানা 'মাত্য়া' হিসেবে দেয়া বাধ্যতামূলক বললে তাতে আয়াতের বিরুদ্ধতা হওয়ার কোন কারণই নেই। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে সমস্ত বৃদ্ধিটাই বাদ পড়ে যায়। আমরা নিশ্চিত জানি যে, বিয়ের আক্‌দ যদি মহরানা নির্ধারণ ব্যতীতই সম্পাদিত হয়, তা হলে সমপরিমাণ মহরানা দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা কোন বদল বা বিনিময় ছাড়া স্ত্রী যৌনাঙ্গ ব্যবহারের অধিকার জন্মে না। পরে সঙ্গমের পূর্বে যখন তালাক সংঘটিত হল, তখন তা পড়ে গেল। কেননা আক্‌দে তা নির্দিষ্ট করা ছিল না। বৃদ্ধিটাও তেমনি, কেননা তা মূল আক্‌দে ধার্য ছিল না। তাই সঙ্গম-পূর্ব তালাক তা প্রত্যাহার করবে, যদিও তা মূল আক্‌দের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল।

ক্রীতদাসীদের বিবাহ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ -

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রীদের বিয়ে করতে সমর্থ হয় না, সে যেন তোমাদের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসীদের মধ্য থেকে এমন নারীকে বিয়ে করে, যে মুমিন।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের তাৎপর্য হল স্বাধীনা-স্ববংশজাত মহিলা বিয়ে করতে অসমর্থ হলে ঈমানদার ক্রীতদাসী বিয়ে করা মুবাহ্। কেননা এখানে ব্যবহৃত اَلْمُحْصَنٰتُ শব্দের অর্থ হল স্বাধীনা স্ববংশজাত মেয়ে। এ কথায় এদের ছাড়া অন্যদের বিয়ে করার নিষেধ বর্তমান নেই। কেননা আলোচ্য অবস্থায় ক্রীতদাসী বিয়ে করা মুবাহ হওয়ায় তাদের ছাড়া অন্যদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ নেই। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ وَلَاتَقْتُلُوْآ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ 'দারিদ্রের— অভাব-অনটনের ভয়ে তোমাদের সন্তান হত্যা করো না' কথায় এ প্রমাণ নেই যে, উক্ত অবস্থা দূর হলে সন্তান হত্যা বুঝি মুবাহ হবে। তেমনি আল্লাহ্র কথা ঃ لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً —'তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না— এ কথায় প্রমাণিত হয় না যে, চক্রবৃদ্ধি হারে না হলে সূদ খাওয়া বুঝি মুবাহ হবে। আল্লাহ্র কথা ঃ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَلَابُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ আর যে লোক আল্লাহ্র সাথে অন্য একজন ইলাহ্ ডাকবে— বিশ্বাস ও ইবাদত করবে— তার সে কাজের কোন দলীল নেই (মুমিনুন ঃ ১৭)। এ কথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহ আছে— এই কথার যুক্তি প্রমাণ পেশ করা বুঝি সঙ্গত। আল্লাহ তা থেকে অতীব উর্ধ্বে ও মহান।

এ বিষয়ে আমরা 'উসুলিল ফিকাহ' গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই প্রেক্ষিতেই বলতে হবে, তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য নেই .... আয়াতটিতে যে লোক স্বাধীনা ভদ্র বংশজাত মুসলিম মহিলা বিয়ে করার সামর্থ্য থাকলে তার পক্ষে ক্রীতদাসী বিয়ে করা বুঝি জায়েয নয়— এমন কোন দলীল নেই।

ব্যবহৃত শব্দ طول -এর অর্থ পর্যায়ে আগের দিনের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ, কাতাদাতা ও সুদ্দী প্রমুখ বলেছেন, তার অর্থ ঃ সচ্ছলতা, ঐশ্বর্যশীলতা।

আর আতা, জাবির ইবনে জায়দ ও ইবরাহীম বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, পছন্দ হলে দাসী বিয়ে করা সম্পূর্ণ জায়েয, যদিও সে সচ্ছল অবস্থার লোকও হয়। যখন তার সাথে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেবে। তাই এঁদের মতে طول শব্দের এ স্থানে অর্থ হচ্ছে, তার হৃদয় যেন বিয়ে করা দাসীর দিক থেকে ফিরে না যায় স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার কারণে, তার প্রতি ঝোঁক ও

আকর্ষণ প্রবল হওয়ার দরুন, তার জন্যে মনে ভালোবাসা প্রবল হওয়ার জন্যে। এই অবস্থায়ও দাসী বিয়ে করা তার জন্যে মুবাহ্। আর طول শব্দের অর্থ যেমন সচ্ছলতা, ঐশ্বর্যশীলতা শক্তি-সামর্থ্য হতে পারে তেমনি বিপুল অনুগ্রহও অর অর্থ হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ -

প্রচণ্ড আযাবদাতা, মেহেরবান অনুগ্রহশীল। (সূরা মুমিন ঃ ৩)

বলা হয়েছে, ذى الطول অর্থ, ذول لفضل অনুগ্রহশীল। 'শক্তি সম্পন্ন'-ও তার অর্থ বলা হয়েছে। অনুগ্রহ ও ঐশ্বর্যশীলতা খুব কাছাকাছি অর্থবোধক। তাই আয়াতে বলা শব্দ ذِىْ الطول -এর অর্থ ধনশীলতা, শক্তি-ক্ষমতা। আর অনুগ্রহ ধনের প্রশস্ততাও বোঝায়। তার অর্থ যখন ঐশ্বর্যশীলতা তখন তাতে দুটি দিকের সম্ভাব্যতা রয়েছে। একটি ধন-ঐশ্বর্য অর্জন তার স্বাধীনা স্ত্রী থাকার কারণে। আর দ্বিতীয় ধন-মালের সচ্ছলতা, শক্তির আতিশয্য স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার। আর তার অর্থ যখন طول অনুগ্রহ, তখন তাতে ঐশ্বর্যশীলতা ইচ্ছা থাকা সম্ভব। কেননা অনুগ্রহ তা অনিবার্য করে দেয়। আর দ্বিতীয় হল, অন্তরের প্রশস্ততা, হৃদয়ের উন্মুক্ততা স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার জন্যে এবং দাসী থেকে মন ভিন্ন দিকে ফিরে যাওয়া। তার অন্তরে যদি তার জন্যে প্রশস্ততা না থাকে, বরং তার নিজের দিক কোন নিষিদ্ধ কাজের দিকে অগ্রসর হওয়া আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তাকে বিয়ে করা তার জন্যে জায়েয, যদি সে ঐশ্বর্যশীলও হয়। যেমন আতা, জাবির ইবনে যায়দ ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে এই সব কয়টি তাৎপর্যেরই অবকাশ রয়েছে। তবু এই বিষয়ে আগের ফিকহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে আব্বাস, জাবির, সায়ীদুবনে যুবায়র, শ'বী ও মকহুল থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, দাসী বিয়ে করা যাবে না, যাবে কেবল তখন, যদি স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য না হয়। মাসরুক ও শ'বীও বলেছেন ঃ দাসী বিয়ে করা মৃত রক্ত ও শূকর মাংস খাওয়ার মতো। তা হালাল হয় কেবলমাত্র তার জন্যে, যার বাঁচা সম্ভব নয় এগুলি থেকে কিছু না খেলে। আলী, আবূ জাফর, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব-এর একটি বর্ণনা এবং ইবরাহীম আল-হাসান— জুহরীর বর্ণনা— এরা বলেছেন ঃ পুরুষ দাসী বিয়ে করতে পারে, সে সচ্ছল অবস্থার হলেও। আর আতা ও জাবির ইবনে যায়দ বলেছেন, দাসীর সাথে যিনার আশংকা হলে সে তাকে বিবাহ করবে। আতা থেকে বর্ণিত, স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকলে তার উপর দাসী বিয়ে করা যাবে না। অবশ্য নিজের মালিকানাধীন মেয়ের কথা আলাদা। হযরত উমর, আলী (রা) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও মকহুল অন্যান্যদের মধ্যে স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করবে না। ইবরাহীম বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করা যাবে যদি সে দাসীর গর্ভে তার সন্তান জন্মে থাকে। বলেছেন, স্বাধীনা ও দাসীকে একই আকদে বিয়ে করা হলে দুজনের সকলেরই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস ও মাসরুক বলেছেন, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করলে তাতেই দাসী স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে। ইবরাহীমের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, স্বামী ও দাসী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। তবে এ দুজনার সন্তান থাকলে ভিন্ন কথা। শ'বী বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রী গ্রহণের সামর্থ্য থাকলে দাসীর বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। মালিক ইয়াহ্য়া ইবনে সাঈদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করবে না। তবে

স্বাধীনা স্ত্রী-ই যদি তা চায়, তাহলে জায়েয হবে। তখন স্বাধীনার জন্যে দুইদিন ও দাসীর জন্যে একদিন নির্দিষ্ট করে ভাগ করবে। আবূ বকর বলেছেন, একথা প্রমাণ করে যে, ইমাম মালিক স্বাধীনার উপর দাসী বিয়ে করা জায়েয মনে করতেন না যদি স্বাধীন স্ত্রী রাজি না হয়।

দাসী বিয়ে করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারেই বিভিন্ন মত রয়েছে ফিকাহ্‌বিদদের। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একজন দাসীর অধিক সংখ্যক বিয়ে করা জায়েয নয়। ইবরাহীম, মুজাহিদ ও জুহরী বলেছেন, চারজন দাসী বিয়ে করা জায়েয হবে যদি ইচ্ছা করে। আগের ফিকাহ্‌বিদগণ দাসী বিয়ে করা পর্যায়ে এভাবে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন দেশের ফিকাহ্‌বিদগণ এ পর্যায়েও নানা.মত ব্যক্ত করেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, যে-কোন পুরুষের পক্ষে দাসী বিয়ে করা জায়েয, যদি কোন স্বাধীনা মেয়ে তার স্ত্রী না থেকে থাকে এবং আর স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থেকে থাকলে। আর একজন স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকলেও দাসী বিয়ে করবে না। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, মালিকানাধীন দাসীর ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে ভয় থাকলে সে দাসীকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই, সে সচ্ছল অবস্থার লোক হলেও। মালিক, লায়স, আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, طول অর্থ, ধন-মাল। তাই স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার মতো ধন-মাল পেলে দাসী বিয়ে করবে না। আর সামর্থ্য না পেলেও তাকে বিয়ে করবে না। তবে নিজ সম্পর্কে চরিত্রহীনতার ভয় হলে ভিন্ন কথা।

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ ও সওরী, আওজায়ী, শাফেয়ী বলেছেন, একজন স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা জায়েয হবে না। আর এ ব্যাপারে স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি বা অনুমতিহীনতার মধ্যে তাঁদের মতে কোন পার্থক্য করা যায় না। ইবনে আহব মালিক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করার কোন দোষ নেই। বিয়ে করলে স্বাধীনা ইখতিয়ার পাবে তার স্ত্রী হয়ে থাকা-না থাকার। ইবনুল কাসিম বলেছেন, দাসী স্বাধীনার উপর বিয়ে করা যাবে; এর অর্থ এই যে, এদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং তারপর ফিরিয়ে নেবে। বলেছেন, স্বাধীনা ইখতিয়ার পাবে, ইচ্ছা করলে স্ত্রী হয়ে থাকবে, আর ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে। তিনি বলেছেন, অথচ সে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী, বলেছেন, আমি মনে করি, এদের দুজনের বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে। পরে তাকে বলা যাবে, সে যিনার ভয় পাচ্ছে। বলেছেন, চাবুক দিয়ে তাকে মারা হবে। পরে তা হালকা করা হবে। মালিক বলেছেন, দাস যদি স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করে, তাহলে স্বাধীনাকে ইখতিয়ার দেয়া যাবে না। কেননা দাসীও তো তার স্ত্রী। উসমান আলবত্তী বলেছেন, কোন ব্যক্তি স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করবে, তাতে কোন দোষ নেই।

দাসী বিয়ে করা জায়েয, স্বাধীনা স্ত্রী গ্রহণের শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, যদি স্বাধীনা স্ত্রী তার থেকে না থাকে। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ - فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

তাহলে তোমরা তোমাদের মন যে মেয়েদের পছন্দ করে তাদের মধ্য থেকে দুই-দুই তিন-তিন ও চার-চার বিয়ে কর আর যদি নিরপেক্ষতা-ন্যায়পরতা রক্ষা করতে পারবে না বলে তোমরা ভয় পাও তাহলে মাত্র একজন অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে। (সূরা সিনা ঃ ৩)

এ আয়াত দুটি দিক দিয়ে প্রমাণ করছে যে, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকলেও দাসী বিয়ে করা জায়েয। একটি হল উল্লিখিত সংখ্যক মেয়েলোক সাধারণভাবেই তারা যারাই হোক— বিয়ে করা মুবাহ্‌। তারা স্বাধীনা হোক কি দাসী হোক আর দ্বিতীয় সম্বোধনের ধারাবাহিকতায়ই আল্লাহ্‌ বলেছেন অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে আর একথা জানাই আছে তারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন কথাটি স্বতঃই অ-স্বয়ংসম্পূর্ণ হুকুম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। এখানে একটি সর্বনাম আছে মনে করতে হবে। আর তাহলো তাই যার কথা মূল সম্বোধনে প্রকাশ্যভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তা হচ্ছে নিকাহ্‌র আক্‌দ। এক্ষণে পূর্ণ কথা এ দাঁড়ায়, তোমরা নিকাহ্‌র আক্‌দ কর "মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের তোমাদের মন চায় অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন মেয়ে।" এখানে সঙ্গম উহ্য মনে করা ঠিক হবে না। কেননা পূর্বে তার উল্লেখ হয়নি। তাই এ আয়াতের দলীলেই প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক পুরুষের ইখতিয়ার রয়েছে দাসী বিয়ে করার অথবা স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ অতএব তোমরা বিয়ে কর যে মেয়েলোকই তোমাদের মন চাইবে। তা মুবাহ বিয়ের আক্‌দ হওয়ার শর্তে। অবশ্য তা মনের খুশী ও চাহিদা পূরণে যোগ্য হতে হবে। প্রমাণিত হল, যে মেয়েই মন চাইবে, তার সাথেই বিয়ের আক্‌দ জায়েয হবে। তা যখন এরূপ তখন তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ একটি মুজমাল কথা।

জবাবে বলা যাবে, 'যা তোমাদের খুশী ও চাহিদা অনুযায়ী' আল্লাহ্‌র এ কথাটির দুটি দিক। একটি— তার অর্থ, যা পেয়ে তোমরা সন্তুষ্ট হবে, যা পাওয়ার জন্যে তোমরা আগ্রহী হবে। তবেই দেয়া ইখতিয়ারের ফায়দা পাওয়া সম্ভব হবে। যেমন কেউ বলে তুমি এ ঘরে বস যতক্ষণ তোমার মন বসতে ইচ্ছা করে— চায়। 'খাও তুমি এ খাবার থেকে' যা তোমার মন চায়— এভাবে কথা হলে ইখতিয়ার দেয়ার ফায়দা পাওয়া সম্ভব। কেননা যা মন চায় তা-ই করা তখন সম্ভব হয়। আর দ্বিতীয় দিকটি হল যা তোমাদের জন্যে হালাল হয়— প্রথমটির বক্তব্য হল যাকে চায় তাকে বিয়ে করার ইখতিয়ার দেয়ার অর্থ হবে। আর তা স্বাধীনা মেয়ে ও দাসী মেয়ে সবই সামিল করে। আর তার অর্থ যদি হয়, যা তোমাদের জন্যে হালাল, এরপরই বলে দেয়া হয়েছে মেয়েদের মধ্য থেকে তোমাদের যা খুশী হয় এমন যে কাউকে বিয়ে কর। তা হল সংখ্যার দিক দিয়ে তা দুই-দুই, তিন-তিন বা চার চার। আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারার ভয় হলে একজন অথবা দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত যে মেয়ে। এভাবে মূল কথাটি অস্পষ্টতা বা সংক্ষিপ্ততার পর্যায়ে অতিক্রম করে ব্যাপকতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ সাধারণত্ব ও ব্যাপকতাকে কাজে লাগানো ওয়াজিব, অবস্থার পরিবর্তন যা-ই হোক না কেন। তাছাড়া কথাটি অস্পষ্ট সংক্ষিপ্ত বা স্পষ্ট বিস্তারিত যা-ই হোক, তাকে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা সেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব। যেখানেই এবং যেভাবেই তা কাজে লাগানো সম্ভব, লাগাতে হবে। আল্লাহ্‌র কথা এবং তোমাদের জন্যে এদের বাইরের সব মেয়েকেই হালাল করা

হয়েছে এভাবে যে, তোমরা তাদের পেতে চাইবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে। এ কথা স্বাধীনা ও দাসী— উভয়কেই শামিল করে। এর আর একটি প্রমাণ হল আল্লাহ্‌র কথাঃ

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ - وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

আজ তোমাদের জন্যে সকল পবিত্র জিনিসই হালাল করা হয়েছে। আহলি কিতাবের খাদ্য খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খানা তাদের জন্যে (হালাল) এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্যে হালাল তারা মুমিন সমাজ থেকে হোক, কি তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে হোক। (সূরা মায়িদা ঃ ৫)

الاحصان নামটি ইসলাম বোঝায়। আর আক্‌দ বোঝায় আল্লাহ্ কথা فَاِذَا اُحْصِنَّ দ্বারা। আগের কালের কোন ফিকাহবিদ থেকে বর্ণিত ঃ 'যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।' কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'যখন তারা বিবাহিতা হবে।' আর জানা-ই আছে যে, এখানে এ কথাটি দ্বারা বিবাহ বোঝানো হয়নি। প্রমাণিত হল যে, এখানে সতীত্ব-যৌন পবিত্রতা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। আর তা স্বাধীনা মেয়েলোক ও দাসী সকলের মধ্যেই কাম্য। আর 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের সতীত্ব সম্পন্না মেয়ে' বলতে কিতাবী ক্রীতদাসী বিয়ে করার ব্যাপারে সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যের কথা। আর

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ -

এবং বিয়ে দাও তোমাদের অবিবাহিতা-স্বামীহীনা মেয়েদেরকে এবং তোমাদের গোলাম দাসীদের মধ্য থেকে নেক চরিত্রবানদেরকে। (সূরা নূর ঃ ৩২)

এ-ও সাধারণ হুকুম দাসীদের বিয়ে দেয়া এ হুকুম অনুযায়ী ওয়াজিব। যেমন স্বাধীনা মেয়েদের বিয়ে দেয়। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ -

আর ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক মেয়ের তুলনায়— সে তোমাদেরকে অধিক সন্তুষ্ট করলেও— অতীব উত্তম। (সূরা বাকারাহ ঃ ২২১)

এরূপ কথা তো স্বাধীনা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য সম্পন্ন লোকদেরকেই বলা যায়। আর যে লোক স্বাধীনা মুশরিকা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য পেয়েছে, সে মুসলিম স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যবান অবশ্যই হবে। বোঝা গেল, আয়াতটি বলতে চেয়েছে যে, মুসলিম স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে দাসী বিয়ে করা জায়েয। মুশরিক স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা জায়েয।

এ পর্যায়ে গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে এ কথারও প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, একজন মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য অন্য একজন মেয়ে বিয়ে করা হারাম করে দেয় না। যেমন কন্যা বিয়ে দেয়ার সামর্থ্য মাকে বিয়ে দেয়া হারাম করে দেয় না। একটি মেয়েলোক বিয়ে করার ক্ষমতা তার বোন বিয়ে দেয়াকে হারাম করে না। এ নীতি অনুযায়ী কারোর স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার ক্ষমতা দাসী বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ করে না। বরং এ ব্যাপারে দাসী বিয়ে দেয়া অধিক সহজ দুই বোন, মা ও কন্যা বিয়ে দেয়া অপেক্ষা। আর তা-ই স্বাধীনা মেয়ে দাসীকে একত্রিত করা জায়েয হওয়ার দলীল। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। মা ও কন্যা ও দুই বোন বিয়ের অধীন একত্রিত করা নিষিদ্ধ সকলের মতে। স্বাধীনা মা ও দাসীর তুলনায় মা ও কন্যা একত্রিত করা অধিক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সম্ভবতার কোন প্রভাব নেই দাসী বিয়ের নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে।

এ ক্ষেত্রে বিপরীত মতের লোকেরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছে ঃ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ -

আর তোমাদের মধ্য থেকে যে সচ্চরিত্রবর্তী-সংরক্ষিতা-সতী ঈমানদার মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যশীল নয়, তার জন্যে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন মুমিন যুবতীরা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গের শেষ কথা ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -

এ ব্যবস্থা তার জন্যে যে চরিত্রহীনতার ভয় করে তোমাদের মধ্য থেকে।

আর তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তা তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম।

এ আয়াত স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করতে অক্ষম হওয়াকে— সামর্থ্য না হওয়াকে— এবং যিনার ভয় হওয়াকেও শর্ত করা হয়েছে দাসী বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার জন্যে। তাই এই শর্ত দুইটি একত্রিত না হলে দাসী বিয়ে করা জায়েয হতে পারে না। এ আয়াতটিই ফয়সালাকারী তোমার পাঠ করা আয়াতটি সম্পর্কে, যাতে দাসী বিয়ে করার হুকুম রয়েছে।

এর জবাবে বলা যাবে, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করার ব্যাপারে এ আয়াতে কোন নিষেধ পাওয়া যায় না। এতে শুধু এতটুকু কথাই আছে যে, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করা মুবাহ। আর আমি এ ছাড়া অন্যান্য যে সব আয়াত পাঠ করেছি, তার সব কয়টি আয়াতেই দাসী বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার কথা-ই আছে। তাই এ দুইটির কোন একটিতে এমন কিছুই নেই, যা একটাকে অপরটি বাদ দিয়ে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য করে দেবে। কেননা এর দুটোর সবটাই দাসী বিয়ে মুবাহ পর্যায়েই এসেছে। তার কোনটার ব্যাপারেই নিষেধ আসেনি। কাজেই এ কথা বলা সঙ্গত হবে না যে, এ আয়াতটি অপর আয়াতটিকে— এ মেয়ে অপর মেয়েকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। এসবই একই হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

যদি বলা হয়, এটা আল্লাহ্‌র এ কথাটির মতই, যেখানে বলেছেন ঃ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا -

তবে যদি তা না পায়, তাহলে ধারাবাহিক ও পর পর দুই মাসের রোযা থাকবে পারস্পরিক স্পর্শ হওয়ার আগে। আর তা-ও যদি কেউ না পারে, তাহলে সত্তর জন মিস্‌কীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। (সূরা মুজাদিলাত ঃ ৪)

ফলে এ সবের সম্যক দাবি হল, তা জায়েয হওয়া নিষিদ্ধ হবে তার পূর্ববর্তীটা পাওয়া গেলে।

এর জবাবে বলা যাবে, যেহেতু শুরুতেই দাসমুক্তিকে পার্থক্যপূর্ণ বানানো হয়েছে, অতএব তার দাবি হবে, দাসমুক্তি দানই ফরয, অন্য কিছু নয়। আর দাসমুক্তি সম্ভবপর না হলে রোযা রাখার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তখন তা ছাড়া অন্য কিছু জায়েয হবে না দাসমুক্তি সম্ভব নয় বলে। তারপর বলেছেন, 'যে রোযা রাখতে সক্ষম হবে না, তাকে ষাট জন মিস্‌কীন খাওয়াতে হবে।' আয়াতে উল্লিখিত এ কাজগুলো একের পর এক সুনির্দিষ্টভাবে হতে হবে, যেটা সম্ভব হবে, কাফফারা কেবল সেটার দ্বারা-ই কার্যকর হবে কুরআনের উল্লেখের বিন্যাস ও পরম্পরা অনুযায়ী। এ ছাড়া দাসী বিয়ে করা নিষেধকারী আর কোন আয়াত তোমার নিকট নেই, যার উল্লেখ তুমি করতে পার যে, শর্ত পাওয়া গেলে তাদের বিয়ে করা মুবাহ হবে, আর শর্ত পাওয়া না গেলে তা মুবাহ হবে না। বরং সব কয়টি আয়াত-ই নিকাহ্ মুবাহ হওয়ার কথাই বলছে। তাতে স্বাধীনা নারী ও দাসীদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করা হয়নি। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে লোক মুহ্‌সিন মুমিন মেয়ে বিয়ে করতে সক্ষম হবে না' এতে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করা মুবাহ না হওয়ার কোন দলীল নেই।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক উক্ত আয়াতটির উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যায় আগের দিনের মনীষীবৃন্দের যে বিভিন্ন মত রয়েছে তার-ও উল্লেখ করেছেন। তার পরে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন যে, যে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন, তার-ও উল্লেখ করেছেন। তার পরে বলেছেন, এ মত তার মধ্যকার ফাসাদকে অতিক্রম করে গেছে এবং তাতে ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা দেয়ার সম্ভবতা নেই। কেননা আল্লাহ্‌র কিতাবে নিষিদ্ধ। তার ব্যাখ্যা কেবল সেই দিক দিয়েই দেয়া সম্ভব যা মুবাহ করা হয়েছে। আবূ বকর বলেছেন, 'ইজমার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়' তাঁর এ কথা। এ জন্যে যে, সাহাবায়ে কিরাম তাতে নানা কথা বলেছেন এবং আমরা সে সব কথার উল্লেখ করেছি। দীর্ঘ আলোচনার ভয় না থাকলে আমরা এখানে সেসব কথার সনদসমূহ একের পর এক এখানে উল্লেখ করতাম। ব্যাখ্যার সম্ভাবনা না থাকলে আগের দিনের মনীষিগণ যে যা বলেছেন, তার উল্লেখ করা হতো না। কেননা আয়াতটিতে যা সম্ভাবনা নেই এমন পথে আয়াতটির ব্যাখ্যা দেয়া কারোর জন্যেই জায়েয হতে পারে না। হ্যাঁ, আগের দিনের মনীষীদের

মধ্যে এ বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের কেউ অপর কারোর কথার প্রতিবাদ করেন নি। কেননা মতের ভিন্নতা রয়েছে তা তো অস্বীকার করা যাবে না। এরূপ বিভিন্ন কথা বলার অবকাশ না থাকলে ও ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ না থাকলে প্রত্যেক মতের লোক বিপরীত মতের লোকের কথার অবশ্যই প্রতিবাদ করতেন। প্রত্যেকের মতের প্রতিবাদ না করার রীতি তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও চালু ছিল। তা সত্ত্বেও তা না করার কারণে মনে করতে হবে, তাতে ইজতিহাদের সুযোগ আছে এবং তাঁদের মধ্যে একটা ইজ্‌মা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটার সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। আমরা এই যা বললাম, তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ব্যাখ্যার বিভিন্নতার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা সহীহ্ নয়। আর 'আল্লাহ্‌র কিতাবে কেবল ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়া— যা মুবাহ করা হয়েছে— কোন ব্যাখ্যা দেয়া নিষিদ্ধ' তার এ কথা দ্বারা হয় এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তা 'নস' দ্বারা নিষিদ্ধ কিংবা কোন দলীল দ্বারা। যদি 'নস' থাকার দাবি করা হয়, তাহলে তা পাঠ করতে বলা হবে, তা প্রকাশ করার দাবি জানানো হবে— কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কোন পথ নেই। আর যদি কোন দলীল থাকার দাবি করা হয়, তা হলে তা পেশ করতে বলা হবে। কিন্তু না, তেমন কোন দলীল-ই পেশ করার মত নেই। ফলে বলতে হবে, তাঁর এ দাবি একান্ত নিজস্ব জিনিস। আর বিপরীত পক্ষের কথায় বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই এজন্যে যে, একটি বিশেষ অবস্থায় এবং একটি শর্তের ভিত্তিতে তা মুবাহ বলা-ই হয়ত একটি দলীল তার বিপরীতটা নিষিদ্ধ হওয়ার। যদি এ দিকেই গিয়ে থাকেন, তাহলে এই দলীলটার প্রমাণ হিসেবে আর একটি দলীলের প্রয়োজন দেখা দেবে। আর ইমাম শাফেয়ীর পূর্বে এরূপ কথার দ্বারা কেউ দলীল পেশ করেছেন বলে আমরা জানি না। তা যদি একটা দলীল হয়, তা হয় সাহাবায়ে কিরাম এ বিষয়ে এ দলীল সম্পর্কে উপস্থাপনে সকলের চেয়ে বেশি অধিকারী ছিলেন। বহু সংখ্যক ঘটনায় সাহাবীগণ পারস্পরিক মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের দলীল উপস্থাপনের বহু সম্ভাবনা ও সুযোগ এসেছে, তাতে তাঁরা কিয়াস-এর সাহায্যেও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, ইজতিহাদও করেছেন। সর্ব প্রকারের দলীল পেশ করা সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনায় দলীল পেশ না করা প্রমাণ করে যে, এ ক্ষেত্রে পেশ করার মত কোন দলীল-ই তাঁদের নিকট ছিল না বা উক্ত কথাকে তাঁরা দলীল হিসেবে গ্রহণই করেন নি। তাই ইসমাঈল কিতাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল তিনি পেতে পারেন নি।

দাউদ আল-ইসফাহানী বর্ণনা করেছেন যে, ইসমাঈলের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ নস্ কি? তিনি জবাবে বলেছিলেন, নস্ হচ্ছে তা, যার সম্পর্কে সকলেই একমত। তাঁকে বলা হল কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য হলে তা কি নস্ হবে না? জবাবে বলেছিলেন, কুরআনের সবটাই নস্। বলা হল কুরআনের সব-ই যদি নস্ হবে, তাহলে মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণ মতভেদ করলেন কেন? দাউদ বললেন— এটা প্রশ্নকারীর জুলুম, এ ধরনের প্রশ্ন নিশ্চয়ই করা বা প্রশ্নে এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। এখানে প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাঁর অনেক কম আছে। ইসমাঈল সম্পর্কে দাউদের এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা মুবাহ বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের সে কথা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা শোভা পায় না। কেননা তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে— তিনি বলেছেন,

যে বিষয়ে সকলেই একমত, তা-ই নস্। আবার বলেছেন, কুরআনের সবটাই নস্। আর কুরআনে আমাদের কথার বিপরীত কিছুই নেই। মুসলিম উম্মাহ্ আমাদের কথার বিপরীত কোন ঐকমত্যেও আসেনি। ইসমাল সম্পর্কিত দাউদের এ কথা দুর্বল। তিনি আমানতদার নন, আর যা বলেন, তাতে তিনি বিশ্বাসযোগ্যও নন। বিশেষ করে ইসমাঈলের তাকে সত্যবাদী মনে করা যায় না। কেননা সে তাকে বাগদাদ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে বড় বড় অভিযোগ তুলেছিলেন। আমাদের কথায় ইসমাঈলের বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। তবে একটা দিক দিয়ে হতে পারে। তা হচ্ছে, সে বিশ্বাস করত যে, যা কুরআনে বলা হয়নি, তা সবই নিষিদ্ধ। অথচ আমরা ব্যাখ্যা করে বলেছি যে, ওটা কোন দলীলই নয়। 'উসূলুল ফিকাহ' গ্রন্থে এতদসংক্রান্ত সব কথাই আমরা লিখেছি।

আমাদের কথা যে সত্য তা একটা বড় কারণ হল, যিনার ভয় ও অসামর্থ্য প্রয়োজনীয় নয়। কেননা সত্যিকার প্রয়োজন বলতে বোঝায়, যা হলে প্রাণ ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকে। আর সঙ্গম করতে না পারাটায় প্রাণ ধ্বংসের কোন আশংকা থাকতে পারে না। অথচ তার জন্য দাসী বিয়ে করা মুবাহ্ করা হয়েছে। চরম মাত্রার ঠেকায় পড়া ছাড়াও যখন দাসী বিয়ে করা মুবাহ্, তখন সামর্থ্য থাকা ও না-থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। কেননা এ বিয়েতে অসামর্থ্য হওয়া জরুরী নয়। কেননা বিয়ের ব্যাপারে 'চরম মাত্রায় প্রয়োজনের' কথা বলা যেতে পারে কেবল তখন, যখন প্রাণ বিনষ্ট হওয়ার মতো কঠিন অবস্থা দেখা দেয়ার আশংকা হয় কিংবা ভয় হয় কোন অঙ্গ বিনষ্ট হওয়ার।

আয়াতে বিয়ে মুবাহ্ হওয়ার যে-কথা বলা হয়েছে কথার ধারাবাহিকতায় বলা 'তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমাদের বিপুল কল্যাণ হবে' কথাটি প্রয়োজনভিত্তিক নয়। কেননা মানুষ যে অবস্থায় পড়লে মৃত কিংবা শূকর মাংস খেতে বাধ্য হয়, তখন ধৈর্য ধারণ বা 'সবর' করা (অর্থাৎ তা না খাওয়া) তার জন্য নিশ্চয়ই কল্যাণকর নয়। কেননা তখন 'সবর' করে তা না খেলেও তার দরুন মরে গেলে সে আল্লাহ্‌র নাফরমান ও গুনাহগার হবে। তা হলে তো বিবাহ-ও ফরয হবে না অনুরূপ ঠেকায় না পড়লে। আসল কথা হল, আচরণ বিধি শিক্ষা দান। ব্যাপার যখন এই, সে ধরনের প্রয়োজন ছাড়াও বিয়ে করা যখন জায়েয তখন সামর্থ্য থাকলেও বিয়ে জায়েয, যেমন জায়েয সামর্থ্য না থাকলে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ 'তোমরা পরস্পর থেকে' কথার ধারাবাহিকতায় বলা কথা। এর তাৎপর্য হিসেবে বলা হয়েছে, 'তোমরা সকলেই আদম থেকে— আদমের বংশধর।' এ-ও বলা হয়েছে, তোমরা সকলেই মুমিন। এই কথাটুকু প্রমাণ করে যে, এই কথাটুকু বলা হয়েছে বিবাহ সকলেরই সমান হওয়ার কথা বোঝাবার উদ্দেশ্য। আর তার দরুন স্বাধীনা মেয়ে ও দাসীর সম্পূর্ণ সমান মর্যাদার হওয়া কথা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য যে-যে দিক দিয়ে মর্যাদা পার্থক্যের দলীল পাওয়া যাবে, তাতে সে পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

তবে যিনি বলেছেন, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করলে দাসী-স্ত্রী স্বতঃই তালাক হয়ে যাবে, তার এই কথা অত্যন্ত দুর্বল। একটু বিবেচনা করলেই এই কথার যৌক্তিকতা অপ্রমাণিত হবে। কেননা যেমন বলেছে, প্রকৃত পক্ষেই যদি তা হয়, তা হলে স্বাধীনা বিয়ে করার সামর্থ্য দাসীর বিয়ে ভঙ্গকারী হবে অনিবার্যভাবে। যেমন শা'বী বলেছেন, তায়াম্মুমকারী পানি পেলেই তার

তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়, ওযু করুক আর না-ই করুক। অথচ ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 'যে লোক সামর্থ্যবান হয় না...'আল্লাহ্র এই কথার ব্যাখ্যা করেছেন 'তার মালিকানায় স্বাধীনা মেয়ে তার মালিকানায় না থাকা বা না হওয়া' আর সামর্থ্য থাকা অর্থ, তার বিবাহাধীন স্বাধীনা মেয়ে থাকা বলে। এই ব্যাখ্যা খুবই সঙ্গত। কেননা স্বাধীনা মেয়ে যার স্ত্রী নয়, সে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যবান নয়। কেননা সে তা লাভ করতে পারেনি। তাকে সঙ্গম করতে সে সক্ষম নয়, ফলে তাঁর মতে সামর্থ্য থাকার অর্থ, স্বাধীনা মেয়ে সঙ্গম করার মালিকানা থাকা। এই ব্যাখ্যা উত্তম সেই ব্যাখ্যার তুলনায়, যাতে বলা হয়েছে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য বলে। কেননা ধন-সম্পদের ক্ষমতাই সঙ্গমের মালিকানা হওয়া নিশ্চিত করে না। তা নিশ্চিত হয় তাকে বিয়ে করার পর। তাই সামর্থ্য হওয়া সঙ্গমের মালিকানা থাকা অবস্থায় একটি বিশেষ অবস্থা সেই মাল-সম্পদ পাওয়ার তুলনায় যার দ্বারা তাকে বিয়ে করতে পারে। তার প্রমাণ হল, স্ত্রী সঙ্গমের মালিকানার একটা প্রভাব পাওয়া যায় অপর মেয়ে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ায়। অথচ ধন-মাল থাকায় আমরা সেই বিশেষত্ব দেখতে পাই না। তাই দাসী বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ায় ধন-মাল থাকার গুরুত্ব যখন লক্ষণীয়, তখন ইমাম ইউসুফের ব্যাখ্যা স্বাধীনা মেয়ে সঙ্গমের সামর্থ্য বলে ধন-মালের মালিকানা হওয়ার ব্যাখ্যার তুলনায় অনেক বেশি সহীহ্।

যদি বলা হয়, যিহারের মুকাবিলার মূল্য থাকা যিহারের মালিকানা হওয়ার সমান হয়ে থাকে। তাহলে স্বাধীনা মেয়ের মহরানা দেয়ার মাল মওজুদ থাকা তাকে বিয়ে করার সম্ভব হওয়ার সমতুল্য হবে না কেন?

জবাবে বলা যাবে, এটা ঠিক নয়। কয়েকটি কারণেই তা গ্রহণযোগ্য। তার একটি হচ্ছে তুমি তার এমন অর্থ মনে কর না, যা স্বাধীনা ও দাসী মেয়ে স্ত্রীরূপে একত্রিত করা অনিবার্য করে দেবে। আর যে দলীল দ্বারা অর্থ বা তাৎপর্যের সহীহ্ হওয়া প্রমাণ করে— তাছাড়া বিপরীত মতের আর যে দাবি আছে, তা অগ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য। আর দ্বিতীয়, সে অর্থ গ্রহণ করা হলে কোন মেয়ের মহরানা হাতে থাকলেই তার মা বা বোন বিয়ে করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাকে বিয়ে করার মতই হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা সে রকম হয় না। আর হয় না বলেই তোমার কথার অযৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাছাড়া 'গলা' বিবাহের দৃষ্টান্ত নয়। কেননা رقبه তার গলাকে ফরয করে। তার পাওয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়। অথচ পুরুষটির নিকট তার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে বিয়ে না-ও করতে পারে। অবস্থা যখন এই, তখন গলার মূল্য মালিকানায় থাকা তার বর্তমান হওয়ার সমান হবে যখন তা ফরয হবে। সম্ভাব্যতা অনুযায়ী তাকে মুক্ত করা ফরয হবে। আর বিয়ে ফরয নয় বলে সে পর্যন্ত পৌঁছা মহরানা থাকার কারণে তার জন্যে বাধ্যতামূলকও নয়। এক্ষণে মালিকানায় মহরানা থাকার কোন প্রভাব হতে পারে না দাসী বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ায়। বরং যার নিকট তা আছে, তার নিকট তা না-থাকারই সমান। আমাদের ফিকাহবিদগণ শুধু বলেছেন স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করবে না। কেননা আল-হাসান ও মুজাহিদ নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকলে তার উপর দাসী মেয়ে বিয়ে করা যাবে না। এ হাদীস যদি বর্ণিত না হতো, তাহলে স্বাধীন স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করা

নিষিদ্ধ হতো না। কেননা কুরআনে তা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল নেই। কিয়াস বরং তা মুবাহ প্রমাণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা হাদীসকেই মেনে নিয়েছেন।

আহ্লি কিতাব দাসী বিয়ে করা

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত বিষয়ে মনীষিগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আল-হাসান, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয ও আবূ বকর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবূ মরিয়াম থেকে আহ্লি কিতাব দাসী বিয়ে করা মকরূহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সওরীও সেই মত দিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে আবূ মায়সারাতা বলেছেন, আহ্লি কিতাব দাসী বিয়ে করা জায়েয। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফারও এমত প্রকাশ করেছেন। আবূ ইউসুফ থেকে আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি কিতাবী দাসী বিয়ে করা মকরূহ মনে করেন, যদি তার মনিব কাফির হয়। অবশ্য বিয়েটা জায়েয। সম্ভবত তিনি একথাই মনে করেছেন যে, তার সন্তান তো সেই কাফির মনিবেরই দাস হবে। অথচ সে সন্তান পিতা মুসলিম হওয়ার কারণে মুসলিম হবে। মুসলিম ক্রীতদাস কোন কাফির ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা যেমন মকরূহ, এ-ও ঠিক তেমনি। ইমাম মালিক, আওজায়ী, শাফেয়ী ও লায়স ইবনে সা'দ বলেছেন— না, এ বিয়ে জায়েয নয়।

তবে তা জায়েয হওয়ার দলীল হচ্ছে সেই সব কিছুই, যা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। পূর্ব অলোচনায় যে আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা তো সাধারণ তাৎপর্য পেশ করে এবং স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা জায়েয প্রমাণ করে। কিতাবী দাসী বিয়ে করা জায়েয, একথাও সেই আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। তা যে-কোন মুসলিম মেয়ে বিয়ে করার মতই ব্যাপার। তবে বিশেষভাবে এখানকার আলোচ্য বিষয়ের দলীল হিসেবে উল্লেখ হচ্ছে এ আয়াত ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

এবং তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েরাও ...... (সূরা মায়িদা ঃ ৫)

জারীর, লায়স, মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েরা ....' আল্লাহ্র এ কথার অর্থ হল তাদের পাক-পবিত্র সতীত্ব-সম্পন্ন মেয়েরা। হুশাইম মতরফ শ'বী সূত্রে এ আয়াতাংশের তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সে মেয়েদের পবিত্রতা-সতীত্ব হচ্ছে দৈহিক না-পাকি থেকে তাদের গোসল করা এবং তাদের যৌনাঙ্গকে যিনা থেকে রক্ষা করা। এতে প্রমাণিত হল, احصان নামটি কিতাবী মেয়েদেরকেও বোঝায়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

এবং পরস্ত্রীরা, তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যে মেয়েদের মালিক হয়েছে।

এ আয়াতে দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েদেরকে محصنت থেকে বাইরে গণ্য করা

হয়েছে। বোঝা গেল, محصنت শব্দ তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। অন্যথায় তাদেরকে এ আয়াতে আলাদা করা হতো না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ -

যখন তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হল, তার পর যদি তারা কোন নির্লজ্জতার কাজ— যিনা— করে ......'

এ আয়াতে احصان শব্দটি দাসীদের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। আর যখন জানা গেল যে, محصنت নাম স্বাধীনা ও দাসী কিতাবী মেয়েদেরকেও শামিল করে এবং আল্লাহ্ কিতাবী সংরক্ষিতা মেয়েদের বিবাহকে মুক্ত রেখেছেন এবং 'তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েরা ....' বলে, তখন সে হুকুমটি তাদের মধ্যকার স্বাধীনা ও দাসী সব মেয়েই সাধারণভাবে তাতে গণ্য মনে করতে হবে।

এর জাবাবে ওরা যদি আল্লাহ্র এ কথাটি ঃ وَلَاتَنْكِحُوْا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ -এবং মুশরিক মেয়েরা ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করো না' দলীল হিসেবে পেশ করে এবং এ কিতাবী মেয়েকেও মুশরিক মনে করা হয়, তাহলে এবং অপর আয়াতে যে বলা হয়েছে ঃ 'মুমিন সংরক্ষিতা মেয়েদের বিয়ে করার সামর্থ্য যারা পায় না, তাহলে তোমাদের মুমিন যুবতীদের মধ্যে যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত হবে তাদের বিয়ে কর'— এতে কেবলমাত্র মুসলিম ক্রীতদাসীদের বিয়ে করাই চূড়ান্ত কথা হয়ে দাঁড়ায়। কিতাবীরা তার মধ্যে শামিল হয় না। তাহলে কিতাবী ক্রীতদাসীদের বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ থেকে যায়।

জবাবে বলা যাবে, 'মুশরিক' শব্দটি কিতাবীদের শামিল করে না। তা শুধু মূর্তি-পূজারীদেরই শামিল করে— বোঝায়। তাদের ছাড়া অন্যদের বোঝায় না। কেননা আল্লাহ্ নিজেই তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বলেছেন ঃ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ -

আহ্লি কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির হয়ে গিয়েছিল এবং মুশরিকরা নিজেদের কুফর ও শির্ক থেকে বিচ্ছিন ও বিরত হতে প্রস্তুত ছিল না। (অথবা এর অনুবাদ হবে ঃ আহলি কিতাব ও মুশরিকদের কাফির হওয়া লোকেরা ...) (সূরা বাইয়্যেনাত ঃ ১)

এ আয়াতে 'মুশরিক' শব্দ সংযোজিত হয়েছে আহলি কিতাব-এর উপর। এতে মুশরিক শব্দ মূর্তিপূজারীদের বুঝিয়েছে, অন্য কাউকে নয়। তাই কিতাবী মেয়ে বলতে মুশরিক মেয়েরা বোঝায় না। তাই এ আয়াতটি কিতাবী দাসীদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করা জায়েয নয়। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, 'এবং তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্তদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' এ কথাটি 'এবং তোমরা মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করো না' কথাটিকে কেটে দিয়েছে। কেননা কিতাবী মুক্ত স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। অতএব হয় 'মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করো না' কথাটি কিতাবী মূর্তি-পূজারীদেরও শামিল করবে অথবা তা

কেবলমাত্র মূর্তিপূজারী মেয়েদেরকেই বোঝায়, কিতাবী মেয়েদের শামিল করবে না যদি তা কেবল মূর্তিপূজারী মেয়েদেরকেই বোঝায়, কিতাবী মেয়েদেরকে তাতে শামিল না করে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াবে সেখান থেকে নেমে এসে। তখন তাও ব্যবহৃত হবে অথবা মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হবে মুবাহ হওয়ার পরবর্তী ব্যাপার এবং পরিত্যক্ত বিষয়। কেননা তাতে কিতাবী মেয়েদের বিয়ে করা নিষেধকারী তাতে কিছু নেই। আর এ প্রয়োগ যদি উভয় ধরনের মেয়েদেরকে একত্রিত ও শামিল করে, বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে তা-ই হয়— তাহলে তাঁরা সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, সে কথাটি 'এবং তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের সংরক্ষিতা-পবিত্রা মেয়েরা' কথার উপর বিন্যস্ত। কেননা তাদের মধ্যকার স্বাধীনা মেয়েদের সম্পর্কেও সে শব্দটির ব্যবহারে সকলেই একমত। অবস্থা যখন এই, তখন হয় দুটি আয়াতই একসঙ্গে নাযিল হয়ে থাকবে অথবা কিতাবী দাসীদের বিয়ে করা মুবাহ্ হওয়ার কথা মুশরিক দাসীদের বিয়ে নিষিদ্ধ করার পরবর্তী পর্যায়ের ব্যাপার হবে। অথবা মুশরিক মেয়ে বিয়ের নিষেধ পরবর্তী ব্যাপার হবে কিতাবী মেয়ে বিয়ে করার মুবাহ্ হওয়া থেকে।

যদি দুটি আয়াতই একসাথে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে সে দুটিই একত্রে ব্যবহৃত হবে— মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা নিষেধ। কিতাবী মেয়ে বিয়ে মুবাহ হওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অথবা কিতাবী মেয়ে বিয়ে করার উপর কিতাবী মেয়ে বিয়ে করা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তাই হয় তাহলে তা কিতাবী মেয়ের বিয়ে মুবাহ্ হওয়ার উপর স্থাপিত হবে। তাহলে সমস্ত অবস্থায়ই মুবাহ্ হওয়া ব্যবহৃত অবস্থা যেমনই পরিবর্তিত হোক-না-কেন। আর 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' আয়াতটি মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম হওয়ার পরে নাযিল হয়েছে। কেননা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা নিষেধের আয়াত সূরা আল-বাকারায় রয়েছে এবং কিতাবী মেয়ে বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার আয়াত সূরা আল-মায়েদায় বিধৃত। আর তা সূরা আল-বাকারার পরে নাযিল হয়েছে। অতএব তা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম করণের ফয়সালাকারী হবে— যদি 'মুশরিকাত' নাম কিতাবী মেয়েদেরও শামিল করে। পরে কিতাবী মেয়ে বিয়ে মুবাহ প্রমাণকারী আয়াত যখন তাদের স্বাধীনা মেয়ে ও দাসী মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করেনি, তখন এ সাধারণ কথা তাদের উভয় শ্রেণীর শামিল করে। অতএব উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ একত্রে এ একসাথে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কিতাবী স্বাধীনা মেয়ের উপর মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম হওয়া নিয়ে কোন আপত্তি তোলা যেতে পারে না। যেমন তা নিয়ে কোন আপত্তি তোলা যেতে পারে না তাদের মধ্য থেকে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার উপর।

তবে আল্লাহ 'তোমাদের মুমিন যুবতীদের থেকে' কথাটিতে মুমিন ক্রীতদাসীদের বিশেষ ও আলাদা করে নিয়েছেন। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বিস্তারিত বলে এসেছি, কোন কিছু বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলে তা একথা প্রমাণ করে না যে, যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় নি তার হুকুম বুঝি বিশেষভাবে উল্লেখকৃত থেকে ভিন্নতর কিছু । না, তা নয়।

যদি বলা হয়, 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' আল্লাহ্র এ কথাটি নিকাহ মুবাহ প্রমাণকারী দলীলরূপে পেশ করা সহীহ নয়। তা এই জন্যে যে, احصان। একটা এজমালী ও সার্বজনীন শব্দ। তাতে বিভিন্ন অর্থ শামিল রয়েছে। তা সাধারণত্ব সম্বলিত নয় যে, তার শব্দের দাবির উপরই তা কার্যকর হবে। বরং তা এজমালী, তার হুকুমটা

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। তাই তার যে ব্যাখ্যা 'তওকীফ' সূত্রে বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে, সেদিকেই আমরা চলে যাব। আর আয়াতটির হুকুম তারই মধ্যে সীমিত। যে বিষয়ে ব্যাখ্যা আসেনি, তা এজমালীই রয়ে গেছে। অতএব তার সাধারণত্বকে কোন দলীল বানানো সহীহ্ হবে না। আর সকলেই যখন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, কিতাবী স্বাধীনা মেয়েই তার তাৎপর্য, তখন আয়াতটিকে সেই তাৎপর্যেই ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আর কিতাবী দাসীদের বোঝানোর কোন প্রমাণ যখন পাওয়া যায়নি, তখন তা প্রমাণের জন্য ভিন্ন এক দলীল দাঁড় করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

জবাবে বলা যাবে, আগেরকালের মনীষীদের এক জামা'আত 'কিতাব প্রাপ্তদের সংরক্ষিতা মেয়োরা' এ কথাটির তাৎপর্যে বলেছেন, এখানে তাদের মধ্য থেকে পবিত্রসতী মেয়েদের বুঝিয়েছেন। কেননা احصان -এর অর্থ পবিত্রতা— সতীত্বও হয়, তখন শব্দের সাধারণ তাৎপর্য হিসেবে সকল সতী-পবিত্র চরিত্রের মেয়েদের গণ্য করতে হবে। কেননা এই احصان শব্দ দ্বারা নৈতিক পবিত্রতা ও পবিত্রতাই প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়াও আরও যত প্রকারের সংরক্ষণতা রয়েছে, একথার দলীল পাওয়া যায়নি যে, তাও এর তাৎপর্যের মধ্যে শামিল। মনীষীরা এ বিষয়ে একমত যে, এই احصان -এর শর্তে তার সমস্ত শর্ত পূর্ণ হওয়া জরুরী নয়। তাই এ নামটি যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হয় এবং তা-ই বোঝানো হয়েছে বলে সকলেই একমত হবেন, আমরা তাকেই প্রতিষ্ঠিত করব। তা ছাড়া যা, মুবাহ্ হওয়ার শর্তে তা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে একটি দলীলের অবশ্যই প্রয়োজন হবে।

যদি বলা হয়, احصان শব্দে কেবল স্বাধীনা মেয়ে বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়, তাহলে 'তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' আল্লাহ্‌র এ কথা কেবল স্বাধীন কিতাবীদের বুঝিয়েছে তা তুমি অস্বীকার করছ কেন?

জবাবে বলা যাবে, এখানে ব্যবহৃত الاحصان শব্দ তার সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়া বোঝায় নি, একথা যখন জানাই আছে, তখন الاحصان শব্দটির তাৎপর্য সীমাবদ্ধ করা— কতকে তা ব্যবহৃত হয় আর কতকে ব্যবহৃত হয় না বলে পার্থক্য করা কারোর জন্যেই জায়েয হবে না। বরং এ নামটি যখন কোন একটি দিক দিয়েও তা শামিল করে, তখন তাতে তার সাধারণত্বকে গণ্য করাই কর্তব্য। 'দাসী'কেও احصان শব্দটি যখন শামিল করে সাধারণভাবে কোন কোন দিক দিয়ে তা সতীত্ব ও নৈতিক পবিত্রতার ও অন্যান্য দিক দিয়ে, তখন শব্দের সাধারণত্ব ও ব্যাপকতা তাতে গণ্য করা অবশ্যই জায়েয হবে। আর احصان শব্দ যদি কেবলমাত্র স্বাধীনা মেয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়, অন্যদের শামিল না করে, তাহলে তুমি ব্যতীত অন্য লোকদের জন্যে কেবল নৈতিক পবিত্রতা বোঝাতে সীমাবদ্ধ করা ও অন্য কিছু তাতে গণ্য না করা অবশ্যই জায়েয হবে। আর কোন শব্দের হুকুম যদি সাধারণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তাহলে সে হুকুমকে এজমালী বানানো জায়েয হবে না। অথচ আল্লাহ্ احصان নামটি দাসীর উপরও ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ -

তারা বিবাহ-দুর্গে সুরক্ষিতা হওয়ার পর যদি কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুক্ত নারীদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক।

মনীষীদের কেউ কেউ বলেছেন : এখানে احصن অর্থ, তারা যখন ইসলাম কবুল করবে। অন্যরা বলেছেন : তারা যখন বিবাহিতা হবে। অতএব তাদের জন্যে শাস্তি নির্ধারণের এ সাধারণত্বকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। আর মুমিনদের সংরক্ষিতা মেয়েরা আয়াতের তাৎপর্য احصان-এর সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়ার কথা বলতে চাওয়া হয়নি। বরং নৈতিক ও যৌনাঙ্গের পবিত্রতা ও সতীত্ব বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। আর যে সব মেয়ের স্বামী আছে, তারা হারাম হয়েছে এবং বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিতা মেয়ে বা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদের ছাড়া। কথাটি দ্বারা অর্থাৎ যেসব মেয়েলোকের স্বামী আছে, সাধারণভাবে তারা সকলেই হারাম। তবে তাদের থেকে যাদেরকে আলাদা করা হয়েছে, তাদের কথা আলাদা। 'তোমাদের পূর্বে যারা কিতাব পেয়েছে তাদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' এ কথাটিও তেমনি। এখানে احصان শব্দের উল্লেখ তার সাধারণত্বকে গণ্য করতে নিষেধ করে না। তাদের ক্ষেত্রে যাদের উপর এই নামটি নৈতিক পবিত্রতার দিক দিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে। এ কথাই আগেরকালের মনীষীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

চিন্তা-বিবেচনার দিকদিয়ে বলা যায়, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাসূত্রে কিতাবী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হওয়ার ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আর দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রে যার যার সাথে সঙ্গম জায়েয, বিবাহের মাধ্যমেও তার তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয। যেমন করে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনা মুক্ত মেয়ে বিয়ে করা জায়েয। মুসলিম মেয়ের সাথে সঙ্গম করা যখন দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রে জায়েয, তখন তাকে বিয়ে করা ও সঙ্গম করাও জায়েয। আর দুধ-বোন, স্ত্রীর মা, পুত্রের স্ত্রী এবং পিতার বিবাহিতা মেয়ে— এদের কারোর সাথে দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রেও সঙ্গম করা জায়েয নয়, যেমন তাদেরকে বিয়ে করে সঙ্গম করা হারাম। তাই কিতাবী দাসীর সাথে সঙ্গম করা দক্ষিণ হস্তের মালিকানাসূত্রে যখন জায়েয হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত, তখন বিবাহের মাধ্যমে তার সাথে সঙ্গম করা অবশ্যই জায়েয হবে।— যেমন করে স্বতন্ত্র স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করে তার সাথে সঙ্গম করা জয়েয।

যদি বলা হয়, দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রে কিতাবী দাসীর সাথে সঙ্গম তো জায়েয কিন্তু বিয়ের মাধ্যমে তা করা জায়েয নয় যেমন তার অধীন স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী হিসেবে থাকলে কিতাবী দাসী বিয়ে করা জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, আমরা যা বলেছি তাকে সর্বাবস্থায় বিবাহ করা জায়েয হওয়া 'ইল্লাত' বানাচ্ছি না। আমরা তাকে 'ইল্লাত' বানিয়েছি, তাকে স্বতন্ত্রভাবে বিয়ে করা জায়েয হওয়ার— অন্যদের সাথে একত্রিত করে নয়। যেমন মুসলিম দাসীর সাথে দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রে তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয, তাকে এককভাবে বিয়ে করাও জায়েয। তার অধীন স্বাধীনা স্ত্রী থাকলেও তাকে (দাসীকে) বিয়ে করা জায়েয। কেননা তাকে বিয়ে করলে স্বাধীনা স্ত্রীর সাথে বিয়ের মাধ্যমে তাকে একত্রিত করা জায়েয নয়, যেমন স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করে একত্রিত করা জায়েয নয়, যদি তার বোন দাসী হয় তবুও। আমরা কারণ নির্ধারণে এক সহীহ্, স্থায়ী ও

চলমান নীতি গ্রহণ করেছি। তুমি যা বলেছ তা তার জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। তাকে স্বতন্ত্রভাবে— অন্য কারোর সাথে একত্রিত না করে বিয়ে করা জায়েয হওয়া লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সুনির্দিষ্ট।

দাসীকে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ -

তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে।

আবূ বকর বলেছেন, এ কথার দাবি হচ্ছে, দাসীকে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তাদের আহ্ল'-এর অনুমতিক্রমে বিয়ে কর' প্রমাণ করে যে, তাদের বিয়ে জায়েয হওয়ার শর্ত হচ্ছে অনুমতি লাভ। যদিও বিয়ে ওয়াজিব নয়। একথাটি ঠিক একথাটির মতই, যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ -

যে বাকী মূল্যে পণ্য ক্রয় করল সে যেন তা জানা মাপে ও জানা ওজনে ও জানা মেয়াদ পর্যন্তের জন্যে ক্রয় করে।

'সিল্ম' ওয়াজিব নয়। কিন্তু যখন তা করা হবে, তখন হাদীসে উল্লিখিত এসব শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। বিয়েটাও তদ্রূপ। যদিও তা অনিবার্য ও বাধ্যতামূলক নয়; কিন্তু যখন দাসী বিয়ে করার ইচ্ছা করবে, তখন দাসীর মনিব ও মালিকের অনুমতি না নিয়ে করবে না। নবী করীম (স) থেকে এ তাৎপর্যই বর্ণিত হয়েছে দাসের বিয়ে পর্যায়ে। আবদুল বাকী ইবনে কানে', মুহাম্মদ ইবনে শাযান, মুয়াল্লা, আবদুল ওয়ারিস, আল-কাসিম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে আকীল, জাবির সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন ঃ 'দাস যদি তার মনিবের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করে, তাহলে সে যিনাকার।'

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাবী, আবূ নয়ীম আল ফযল ইবনে দকীন, আল-হাসান ইবনে সালিহ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করবে, সে ব্যভিচারী। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর নাফে'— ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ক্রীতদাসের তার মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করা সুস্পষ্ট যিনা। হুশাইম ইউনুস নাফে' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা)-এর একজন দাস তাঁর অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করলে পুরুষ-নারী উভয়কেই খুব করে পিটিয়ে ছিলেন এবং দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন এবং দাসটি দাসীকে যা দিয়েছিল তা সবই কেড়ে নিয়েছিলেন।

আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবারাহীম ও শা'বী বলেছেন, দাস যদি মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করে, তাহলে ব্যাপারটি তার মনিবের ইখতিয়ারে চলে যাবে। ইচ্ছা করলে অনুমতি দেবে, ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাখ্যান করবে। আতা বলেছেন, মনিবের অনুমতি ব্যতীত দাসের বিয়ে করা যিনা নয়। তবে সুন্নাহ পরিপন্থী। কাতাদাহ খালাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর একটি গোলাম তার মনিবের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করেছিল। পরে ব্যাপারটি হযরত উসামন (রা)-এর সমূখে পেশ হয়। তিনি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং দাসীকে পঞ্চাশ দিলেন ও তিন পঞ্চমাংশ নিয়ে নিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এখানে যা বললাম, তাতে আগের মনীষীদের ঐকমত্য রয়েছে। এদের দুজনের উপর কোন দণ্ড কার্যকর করা হবে না। যদিও ইবনে উমর (রা) থেকে 'হদ্দ' আরোপের কথা বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে, তিনি তাজীর হিসেবে দুজনকে দোররা মেরেছেন, 'হদ্দ' হিসেবে নয়। বর্ণনাকারী তাকে 'হদ্দ' মনে করেছেন। আলী ও উমর (রা) ইদ্দতের মধ্যে বিবাহিতা সম্পর্কে এবং তার উপর 'হদ্দ' না হওয়া সম্পর্কে একমত হয়েছেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউ তাদের থেকে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। যে দাস তার মনিবের অনুমতি ব্যতীতই বিয়ে করেছে, তার ব্যাপার ইদ্দত পালনে রত মেয়ের বিবাহ করার তুলনায় অনেকটা হালকা। কেননা তার বিবাহ সাধারণ তাবেয়ীন ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের অনুমতিপ্রাপ্ত। আর ইদ্দত পালনে রত মেয়েলোকটির বিবাহ কারোর নিকটই অনুমতি প্রাপ্ত নয়। ইদ্দত পালনেরও মেয়েলোকের বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন মজীদের অকাট্য দলীল রয়েছে এ বিষয়ে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পৌঁছার আগে— না-পৌঁছা পর্যন্ত বিয়ের আক্দ করার সংকল্প করো না।
(সূরা বাকারার ঃ ২৩৫)

আর দাসের বিয়ে (মনিবের অনুমতি ছাড়া) হারাম খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীসের ভিত্তিতে। চিন্তা-বিবেচনায়ও তা যুক্তিসঙ্গত।

যদি বলা হয়, মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহকারী ক্রীতদাসকে নবী করীম (স) যিনাকার বলেছেন। অথচ তিনি অপর হাদীসে বলেছেন ঃ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 'যিনাকারের শাস্তি প্রস্তরের আঘাত।'

জবাবে তাকে বলা যাবে, 'যিনাকারের জন্যে প্রস্তর' রাসূল (স)-এর এ কথাটি দাসের ব্যাপারে নয়। কেননা দাস যিনা করলে সঙ্গেসার তার শাস্তি কখনই নয়। তাকে যিনাকার বলা হয়েছে পরোক্ষ অর্থে, যিনাকারের সাথে সাদৃশ্য প্রদর্শন স্বরূপ। কেননা সে এক নিষিদ্ধ সঙ্গমের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নবী করীম (স) এক হাদীসে 'দুই চক্ষু যিনা করে' ও তো বলেছেন । কিন্তু এ তো প্রকৃত অর্থে নয়, পরোক্ষ অর্থে। দাস সম্পর্কে তাঁর উক্ত কথাও তেমনি। তিনি এ-ও তো বলেছেন ঃ যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে সে

عاهر যিনাকার। কিন্তু সঙ্গম করার কথা বলা হয়নি। শুধু বিয়ে করলেই যে যিনাকারী হয় না, তাতো সর্বসম্মত কথা। তাই বোঝা গেল, উক্তরূপ কথা পরোক্ষ অর্থে ও যিনাকারের সাথে সাদৃশ্য স্পষ্টকরণ হিসেবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ -

দাসীদের বিয়ে কর তাদের মালিক-মনিবের অনুমতি নিয়ে।

এ কথা প্রমাণ করে যে, মেয়েলোকের জন্যে জায়েয আছে তার দাসীকে সে বিয়ে দেবে। কেননা اَهْلِهِنَّ শব্দের অর্থ তাদের মালিক-মনিব। আর হাদীসের মনিব-মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করা জায়েয নয়— এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। আর মনিব-মালিকের ছাড়া অন্য কারোর অনুমতি কোন কাজে আসে না, তা গণ্যই হয় না। অবশ্য মালিক-মনিবের পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। তার নিজের ধন-মালে হস্তক্ষেপ-ব্যয় ব্যবহার পূর্ণ জায়েয। এরূপ অবস্থায় কোন দাসের মালিক-মনিব যদি মেয়েলোক হয়, তাহলে তার-ই অনুমতি লওয়া প্রয়োজন হবে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মেয়েলোকের পক্ষে তার নিজের ক্রীতদাসীকে বিয়ে দিতে পারে না, তা জায়েয নয়। সে আর একজনকে এ কাজের জন্যে উকীল বানাবে। কিন্তু এ মত কুরআনের বাহ্যিক অর্থ প্রত্যাখ্যান করে। কেননা আল্লাহ্ মেয়েলোকের নিজের বিয়ে দেয়ার আক্দ করানো এবং তার পক্ষ থেকে অন্য কারোর করানোর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। আর-ও প্রমাণ এই যে, মেয়েলোক যদি তার দাসীকে বিয়ে দেয়ার অনুমতি অন্য কাউকে দেয়, তবে তা-ও জায়েয হবে। কেননা এতে কার্যত সেই মেয়েলোকটিরই বিয়ে দেয়া হল। আর আয়াতের বাহ্যিক অর্থই দাবি করে যে, দাসীর বিয়ে তার মালিক-মুনিবের অনুমতিতে হতে হবে। তাই তার মনিব-মালিক যদি— সে পুরুষ হোক বা হোক মেয়েলোক— অন্য কাউকে উকীল বানায় তাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে তবে তা-ও অবশ্যই জায়েয হবে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থই তার অনুমতি দেয়, তা জায়েয ঘোষণা করে। যদি কেউ তা না-জায়েয বলে, তবে কোনরূপ দলীল ছাড়াই আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা হবে, একটি অর্থে খাস করা হবে। উপরন্তু মেয়েলোক যদি তার দাসীর বিয়ের আকদ ঘটানোর অধিকারী না হয়, তাহলে তার পক্ষে কাউকে উকীল বানানো-ও জায়েয হবে না অন্য একজনকে বিয়ে দেয়ার জন্যে। কেননা কাউকে উকীল বানানো জায়েয হয় যে বিষয়ে তার মালিকত্ব আছে সেই বিষয়ে। তাহলে সে সব চুক্তিতে সে কাউকে উকীল বানাতে পারে না যার হুকুম-আহকাম মুয়াক্কিলের সাথে সংশ্লিষ্ট, উকীলের সঙ্গে নয়। আমাদের মতে তাকেও উকীল বানানো সহীহ যখন সে সেসব চুক্তিতে ভূমিকা পালন করবে যার হুকুম-আহ্কাম উকীলের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুয়াক্কিলের সাথে নয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা ইত্যাদির চুক্তি। তবে বিয়ের আক্দ করার জন্যে যদি কাউকে উকীল বানানো হয়, তাহলে তার হুকুমটা মুয়াক্কিলের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, উকীলের সাথে নয়। যেমন বিয়ের উকীল মহরানা দিতে নিজে বাধ্য হয় না। স্বামীর নিকট স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হস্তান্তর করারও কোন দায়িত্ব তার নয়। তাই মেয়েলোক যদি বিয়ের আক্দ করার

অধিকারী না হয়, তাহলে তার অপর কাউকে বিয়ে দেয়ার জন্যে কাউকে উকীল বানানো-ও জায়েয হবে না। কেননা বিয়ের চুক্তির হুকুমসমূহ উকীলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই তার পক্ষে উকীল বানানো যখন জায়েয— এমতবস্থায় যে, তার হুকুম-আহ্‌কাম তার সাথে সশ্লিষ্ট, উকীলের সাথে নয়। তখন প্রমাণিত হল যে, সে নিজেই আক্‌দ করার অধিকারী। এটাও একটা দলীল এ বিষয়ের যে, স্বাধীনা মেয়ে নিজের বিয়ের আক্‌দ নিজেই করতে পারে, যেমন তার পক্ষে কাউকে সেজন্য উকীল বানানো-ও জায়েয। সে নিজে অভিভাবক হয়ে অন্য কাউকে তার দাসীকে বিয়ে দেয়ার জন্যে উকীল বানাতে পারে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং তাদের মহ্‌রানা যথা নিয়মে তাদেরকে দিয়ে দাও।

একথা প্রমাণ করে যে, দাসীকে যখন বিয়ে দেয়া হবে, তখন তার প্রাপ্য মহ্‌রানাও তাকে দিতে হবে। সে মহ্‌রানা নির্দিষ্ট করা হোক, কি না-ই হোক। কেননা মহ্‌রানা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তার নির্ধারণ ও অনির্ধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর একথাও বোঝা যায় যে, মহ্‌রানা নির্ধারিত করা না হলে সমপরিমাণ মহ্‌রানা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ্‌র কথা بِالْمَعْرُوْفِ যথারীতি, ভালোভাবে। এ শব্দটি সাধারণত ইজতিহাদী বিষয় বোঝায়। বিজয়ী ধারণা, অভ্যাস ও সুপরিচিত রীতিও বোঝায়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং সন্তান যার তার কর্তব্য তাদের রিয্‌ক ও পরিধেয় দেয়া যথানিয়মে।

(সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৩)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ 'এবং দাও তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহ্‌রানা'-এর বাহ্যিক দাবি হচ্ছে, মহ্‌রানা স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা ওয়াজিব। দাসীর ক্ষেত্রে মহ্‌রানা মনিবের প্রাপ্য। তার নিজের নিকট যাবে না। কেননা মনিব-ই তো তার মালিক, তার সাথে সঙ্গম করার নিরংকুশ অধিকারী, সে তা দাসীকে অন্য এক জনের নিকট বিয়ে দিয়ে তার সাথে সঙ্গম করার অধিকার তাকে দিয়েছে। অতএব মহ্‌রানা তারই প্রাপ্য হবে সেই অধিকার অন্যেকে দিয়ে দেয়ার বদল স্বরূপ। যেমন মালিক যদি দাসীকে অন্য কোন খেদমতের জন্য মজুরীর বিনিময়ে দেয়, তাহলে সে মজুরীটা মালিক-ই পাবে, দাসী নয়। বিয়ের মহ্‌রানাও তাই। তার কারণ, দাসী কোন কিছুর মালিক হতে পারে না। অতএব মহ্‌রানাও নিজের হস্তগত করার তার কোন অধিকার হবে না।

উদ্ধৃত আয়াতটির তাৎপর্য দুটি দিক দিয়ে বুঝতে হবে। হয় তার অর্থ দাসীদেরকেই মহ্‌রানা দিয়ে দেয়া মনিবের অনুমতিক্রমে। তাহলে তাকে মহ্‌রানা দেয়ার শুরুতেই সে অনুমতি আছে বলে মনে করতে হবে। যেমন বিয়ে দেয়া তা শর্তভুক্ত ছিল। তাহলে কথাটি এরূপ নেবে ঃ তোমরা দাসীদের বিয়ে কর তাদের মালিক-মনিবের অনুমতিক্রমে এবং তাদের মহ্‌রানা

তাদেরকেই দাও তাদের মনিবের অনুমতিক্রমে। একথা প্রমাণ করে যে, মনিবের অনুমতি ছাড়া তাদেরকে মহারানা দেয়া জায়েয নয়। কথাটি আল্লাহ্‌র এ কথাটির মতই ঃ

وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ -

এবং তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারিণী। (সূরা আহযাব ঃ ৩৫)

এর অর্থ, মেয়েরা সংরক্ষণকারী তাদের নিজেদের লজ্জাস্থান যৌনাঙ্গের। এবং আল্লাহ্‌র কথাঃ

وَالذَّاكِرِيْنَ وَالذّٰكِرَاتِ -

এবং যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী মেয়েরা। (সূরা আহযাব ঃ ৩৫)

এর অর্থ, আল্লাহ্‌র যিকরকারী মেয়েরা। আয়াতের যে সর্বনাম রয়েছে তা প্রমাণ করছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে বিয়ে দেয়ার মালিক নয়। মনিব-ই তাদের নিজেদের অপেক্ষা বড় মালিক তাদেরকে বিয়ে দেয়ার। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّايَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ -

আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত হিসেবে একজন ক্রীতদাসের উল্লেখ করেছেন যে মনিবের মালিকানাধীন, সে নিজে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা নহল ঃ ৭৫)

এ আয়াতে দাসের মালিকানা সাধারণভাবেই অস্বীকার করা হয়েছে। আর এতেই দলীল রয়েছে এ কথার যে, দাসী তার মহরানা পাওয়ার অধিকারী নয়। সে তার মালিকও হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় দিকটি হল, মহরানা দেয়ার কাজটি তাদের প্রতি হবে, এটাই কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। কিন্তু আসল লক্ষ্য মনিবের নিকট দেয়া। যেমন ছোট বয়সের মেয়ে বা দাসীকে পিতা ও মনিবের অনুমতিক্রমে বিয়ে দিলে একথা বলা খুবই সঙ্গত হবে যে, এ দুজনের মহরানা দাও অর্থাৎ কন্যার পিতা বা মনিবকে দিয়ে দাও। কোন ইয়াতীমের যদি ঋণ থাকে কারোর উপর, ইয়াতীম তা হস্তগত করার অধিকারী হয় না বলে তার অভিভাবককে তা দিতে হবে। বলা যাবে ঃ ইয়াতীমকে তার হক দিয়ে দাও। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ -

এবং দাও নিকটাত্মীয়কে তার হক্ এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে (তার হক)।
(সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৬)

এতে এ পর্যায়সমূহের ছোট ও বড় বয়সের সব লোকই এর মধ্যে শামিল। তাই ছোটদের অভিভাবককে দিলে তাদেরকে দেয়া হবে। এরূপ واتوهن 'এবং দাও তাদেরকে' বলে তাদের মনিবকে দেয়ার কথা বুঝিয়েছেন। কেননা সে-ই তার পাওনাদার।

ইমাম মালিকের কোন কোন সঙ্গী বা ছাত্র ধারণা করেছেন যে, দাসী-ই তার মহরানা হস্তগত করার অধিকারী। মনিব যদি তাকে কোন খিদমতের কাজের মজুরীর বিনিময়ে দিয়ে

দেয়, তাহলে মজুরীটা সে-ই পাওয়ার অধিকারী, দাসী নয়। আর মহরানার ক্ষেত্রে তাদের দলীল হল আল্লাহ্র কথা ঃ 'এবং তাদেরকে দাও তাদের মজুরী।' এ আয়াতের তাৎপর্য আমরা পূর্বে বলে এসেছি। বিশেষ করে এ জন্যে যে, মহরানা তো তার জন্যেই ওয়াজিব হয়। কেননা তা তার নিজের যৌনাঙ্গের বিনিময়। অতএব তার প্রাপ্য মজুরীও তারই প্রাপ্য, তাকেই দিতে হবে। কেননা সে যে কল্যাণ করেছে, মজুরী তারই বিনিময়। তার এ হিসেবে যে, তার মনিব তার কল্যাণময় কাজের মালিক, যেমন তার যৌনাঙ্গের মালিক সে-ই। তাই সে যে মজুরী পাওয়ার অধিকারী হবে— অর্থাৎ তার মনিব— সেই-ই তার মহরানা হস্তগত করার অধিকারী হবে, দাসী নয়। কেননা তা মনিবের মালিকানার বিনিময়, তার নিজের মালিকানার বিনিময় নয়। তার নিজের যৌনাঙ্গের সুখ-স্বাদ ভোগের অধিকারী সে— মনিব। তার দেহে শ্রমের যে মুনাফা ও অর্জন, তাও মনিবের প্রাপ্য। উভয় ক্ষেত্রেই আসল চুক্তি সম্পাদনকারী হচ্ছে মনিব। তার দ্বারাই ইজারা ও নিকাহ দুটোই সম্পন্ন হয়, সম্পূর্ণতা পায়। অতএব এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এই মনের লোক বলেছেন, কোন কোন ইরাকী ফিকাহবিদ মনিব নিজে তার দাসীকে তার দাসের নিকট মহরানা ছাড়াই বিয়ে দিতে পারে, তা জায়েয বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু এ মত কুরআন মজীদের ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত। আবূ বকর বলেছেন, আমাদের বিপরীত মতের লোকদের কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত মতের উপর কতই না দৃষ্টতা ! তারা কথার উপর জোর দিয়েছে, কিন্তু শব্দ হারিয়ে ফেলেছে। আমি বলব, তাদের দাবি এমন যে, তা প্রমাণ করার কোন পথ নেই। এ মতের লোক যদি মনে করে থাকে যে, মনিব মহরানা নির্ধারণ না করেই তার দাসীকে তার দাসের নিকট বিয়ে দিলে তা জায়েয হবে, তাহলে বলব, আল্লাহ্র কিতাবই তা জায়েয হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছে ঃ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوْلَهُنَّ فَرِيْضَةً -

তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্যে মহরানা নির্ধারণ করার পূর্বেই তাদেরকে তালাক দাও তাহলে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। (সূরা বাহারাহ ঃ ২৩৬)

এতে মহরানা নির্ধারণ না করা বিয়েতে তালাক হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। কাজেই তার কথা কুরআনের খিলাফ হওয়ার দাবিকে স্বয়ং কুরআন-ই মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। যদি তাদের কথা এই হয় যে, সে মহরানার কথা বলেই না এবং কোনরূপ বিনিময় ছাড়া-ই বিয়ে মুবাহ মনে করে তাহলে বলব, কোন ইরাকী এরূপ কথা বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হলে এ কথার বর্ণনাকারী দুইটি বাতিল কথা পেশ করেছে। একটি কুরআনের উপর দাবি। আর তার কথা যে কুরআনের খেলাফ তা আমরা আগেই বলেছি। আর দ্বিতীয়, তাদের কথা কোন কোন ইরাকী সম্পর্কে কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই এ ধরনের কথা বলেন নি। বরং তাদের কথা হল, মনিব যদি তার দাসীকে তার দাসের নিকট বিয়ে দেয়, তাহলে মহরানা সে দাসীর প্রাপ্য হবে বিয়ের আক্দ হওয়ার কারণেই। কেননা কোনরূপ বিনিময় ছাড়া স্ত্রীর যৌনাঙ্গ মুবাহ হওয়া

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা পরিত্যক্ত হবে যখন তা পাওয়ার অধিকারী হবে স্বয়ং মনিবই। কেননা দাসী তা পেতে পারে না। মনিব-ই তার ধন-মালের একমাত্র মালিক। আর মনিবের জন্যে তার দাসের নিকট কোন ঋণ প্রাপ্য হতে পারে না। তাই এখানে দুটি অবস্থা। একটি— আক্‌দ করার অবস্থা। তখন দাসের উপর মহরানা দেয়া কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। আর দ্বিতীয় অবস্থা, সে প্রাপ্যটা মনিবের দিকে চলে যাবে, মনিব হবে তার প্রাপক। আক্‌দ হয়ে যাওয়ার পর তখন তা পরিত্যক্ত হবে। যেমন কোন ব্যক্তির যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট টাকা পাওনা হয়, তখন সে তাকেই তা আদায় করে দিল। তখন এ মালের দুটি অবস্থা, তা হস্তগত করার অবস্থা। তখন সে তার মালিক হবে অনুরূপ মালের জামানত পেয়ে। পরে তা যার উপর পাওনা তার সমান সমান হয়ে যাবে। যেমন কোন ক্রয় কাজে নিয়োজিত উকীল সম্পর্কে আমরা বলি— ক্রয়কারীর দিকে তা চলে যাবে ক্রয়-চুক্তি হওয়ার দ্বারা। কিন্তু সে তার মালিক হবে না। তাই পরবর্তীতে তার মালিকানা মুয়াক্কিলের দিকে চলে যাবে। এ পর্যায়ে বহু দৃষ্টান্তই রয়েছে উল্লেখ করার মত।

অবশ্য তা বুঝতে সমর্থ হয় সে, যার ফিক্‌হী তাৎপর্য ও নিয়মাদি জানা আছে এবং ফিক্‌হবিদের নিকট শিক্ষা লাভ করেছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ -

বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত, যিনাকার নয় এবং গোপন বন্ধুতাকারীও নয়।

অর্থাৎ— প্রকৃত অর্থ আল্লাহ-ই ভালো জানেন— তোমরা বিয়ে কর পবিত্রতা-নৈতিক সতীত্ব সম্পন্না ও যিনাকার নয় এমন মেয়েদেরকে। আল্লাহ আদেশ করেছেন, এ ধরনের মেয়েদের সাথে সহীহ্ আক্‌দ সহকারে বিবাহ হতে হবে। তাদের সাথে সঙ্গম যেন যিনায় পরিণত না হয়। কেননা এখানে احصان শব্দটি বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'সিফাহ' মানে হচ্ছে যিনা।

ولامتخذات اخدان অর্থাৎ তাদের সাথে সঙ্গম যেন জাহিলিয়াতের লোকদের অভ্যাস অনুযায়ী গোপন বন্ধুতার মাধ্যমে না হয়। ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকদের মধ্যে অনেকেই বাহ্যত যা যিনা, তাকে হারামই মনে করত। তবে গোপনে তা করা হলে তাকে হালাল মনে করত। الخدن অর্থ মেয়েলোকের বন্ধু, যে তার সাথে গোপনে যিনা করে। আল্লাহ্ এ প্রকাশমান ও গোপন— উভয় প্রকারের নির্লজ্জতার কাজকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছেন এবং সহীহ্ শুদ্ধ বিবাহ ছাড়া অন্য উপায়ে সঙ্গম ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য বিয়ের বাইরে দক্ষিণ হস্তের মালিকানাসূত্রে ক্রীতদাসীর সাথে সঙ্গম বৈধ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথা ঃ তোমাদের মুমিন 'যুবতী'তে তাদেরকে দাসী বলেছেন। الفتاة অর্থ যুবতী। স্বাধীনা বৃদ্ধাদেরকে فتاة বলা হয় না। আর যুবতী, দাসী ও বৃদ্ধা— এই সকলকে فتاة -ও বলা হয়। বৃদ্ধাদেরকে فتاة বলা হয় এজন্য যে, দাসী হলে তাকে বড়ত্বের মর্যাদা দেয়া হয় না। আর যৌবন কাল হল মেয়েদের লালিত্য ও নতুনত্বের জাগরণের অবস্থা।

দাসী ও দাসের দণ্ড

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ -

যখন এ দাসীরা বিবাহ্ দুর্গে সংরক্ষিতা হবে, তার পরে যদি কোনরূপ যিনার অপরাধ করে তাহলে তাদের উপর সবংশীয়া বিবাহিতাদের অর্ধেক শাস্তি কার্যকর হবে।

আবূ বকর বলেছেন اُحْصِنَّ শব্দটি اَحْصَنَّ -ও পড়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ اُحْصِنَّ -এর অর্থ 'বিবাহিতা হওয়া'। আর ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ, শ'বী ও ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত ঃ اَحْصَنَّ -এর অর্থ বলেছেন اَسْلَمْنَ বা 'তারা ইসলাম গ্রহণ করলে'। আল হাসান বলেছেন, স্বামী যেমন তাকে সংরক্ষিত করে, তেমনি ইসলাম-ও তাকে সর্ব প্রকারের নির্লজ্জতার কাজ থেকে বিরত রাখে।

দাসীর উপর দণ্ড কার্যকর করতে হলে তা কি— এ বিষয়ে আগের কালের মনীষীদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ فَاِذَا اُحْصِنَّ কথার ব্যাখ্যা করেছে বিবাহ্ বলে। অর্থাৎ তারা যখন বিবাহিতা হবে। এ দাসীর উপর কোন 'হদ্দ' কার্যকর হবে না যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে— বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত। এটা ইবনে আব্বাসের মত। আর যারা اَحْصَنَّ -এর অর্থ 'ইসলাম গ্রহণ করেছে' করেছেন, তাদের মতে ইসলাম গ্রহণের পর যিনা করলে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে। আর বিবাহিতা না হলেও 'হদ্দ' জারী হবে। ইবনে মাসউদ (রা) এ মত দিয়েছেন। তবে যারা اَحْصَنَّ-এর অর্থ اَسْلَمْنَ বা 'ইসলাম গ্রহণ করেছে' বলেছেন, তাদের কথা সত্য থেকে অনেকটা দূরবর্তী। কেননা তাদের মুমিন হওয়ার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। 'পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে' বলা অবান্তর। তাই সে অর্থ হলে পূর্বেই مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ বলা নিষ্প্রয়োজন। কেননা এ কথাটি তো বিবাহের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে। অথচ শুরুতে অন্য একটি কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে 'হদ্দ'। তাই শুরুতে ইসলামের কথা উল্লেখ করাই সঙ্গত ছিল। ফলে কথাটি দাঁড়াল ঃ 'ওরা যখন মুসলিম হল, তারপর যদি কোন নির্লজ্জতার— যিনার কাজ করে, তাহলে তাদের উপর ......। এই তাৎপর্যকে কেউ ঠেকাতে পারে না। যা যদি যথার্থ না হতো, তাহলে উমর ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং পূর্বোল্লিখিত মনীষিগণ কথাটির ওরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দিতেন না। অবশ্য ইসলাম গ্রহণ ও নিকাহ্ করা— দুটোই এক সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের তাৎপর্য হতে পারে। ব্যবহৃত শব্দ সে তাৎপর্য বহন করে। আগের দিনের মনীষিগণ আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তবে 'হদ্দ' কার্যকর হওয়ার জন্যে দাসীর ইসলাম গ্রহণ ও বিবাহিতা হওয়া শর্ত নয়— যদি বিবাহিতা না হয়, তাহলে 'হদ্দ' বাধ্যতামূলক ও অনিবার্য হবে না। কেননা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমা, মালিক-ইবনে শিহাব, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আবূ হুরায়রাতা ও যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স)-কে

প্রশ্ন করা হয়েছিল, দাসী বিবাহিতা না হয়ে যদি যিনা করে তাহলে তার শাস্তি কি হবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, সে যিনা করলে তাকে দোর্‌রা মার। আবার করলে তোমরা তাকে আবার দোর্‌রা মার। তার পরে আবার যিনা করলে তাকে দোর্‌রা মার। তারপর-ও যিনা করলে তাকে বিক্রয় কর। সে বিক্রয় যদি একটি রশির বিনিময়ে হয় তবুও।

সাঈদুল মুকবেরী তার পিতা, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন, প্রত্যেক বার-ই তাঁর সম্মুখে আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও।

অর্থাৎ নবী করীম (স) জানিয়ে দিয়েছেন যে, দাসী বিবাহিতা না হলেও সে যিনা করলে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর করতে হবে।

যদি বলা হয়, তাহলে আল্লাহ তাঁর কথা فَاِذَا اُحْصِنَّ বলে احصان। অর্থাৎ বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিতা হওয়ার শর্ত করলেন কেন? দাসী বিবাহিতা হোক আর না-ই হোক যিনা করলে উভয় অবস্থায়ই তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে?

জবাবে বলা যাবে, স্বাধীনা নারীকে রজম করা যায় না, যদি সে মুসলিম ও বিবাহিতা না হয়। তখন এই দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম ও বিবাহ দ্বারা সংরক্ষিতা হলেও যিনার অপরাধে স্বাধীনা নারীর এ অপরাধের জন্যে ধার্য শাস্তির অর্ধেকের বেশি কখনই কার্যকর করা যাবে না। যদি তা-ই হতো, তাহলে احصان। থাকার ও না-থাকার পার্থক্যের দরুন অনেক কিছু ধারণা করে নেয়া সম্ভব হতো। তাই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, محصنه বিবাহিতা হলেই যিনার অপরাধে তাকে 'রজম' করা হবে। আর যদি محصنه বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিতা না হয়, তাহলে অর্ধেক 'হদ্দ' কার্যকর হবে। এ কারণে কল্পনা-ধারণা-অনুমানকে আল্লাহ্ দূর করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তার উপর সর্বাবস্থায়ই অর্ধেক শাস্তি ছাড়া আর কিছু কার্যকর করা যাবে না। তার 'হদ্দ' সম্পর্কে বলতে গিয়ে احصان-এর শর্ত করা এটাই ফায়দা। আর احصان। থাকা অবস্থায় স্বাধীনা মেয়ের 'হদ্দ'-এর অর্ধেক যখন তার উপর কার্যকর করার কথা বলা হল, আমরা জানতে পারলাম যে, এখানে দোররার কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। কেননা রজম দণ্ডের অর্ধেক হয় না। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ -

তাদের উপর 'মুহসেনা' মেয়েদের জন্যে ধার্য শাস্তির অর্ধেক শাস্তি কার্যকর হবে।

এ কথায় احصان। বলে মেয়ের স্বাধীনতা— সম্ভ্রান্ততা বুঝিয়েছেন। সেই احصان। বিবাহ দুর্গে-সংরক্ষিতা হওয়া'— যার দরুন 'রজম' বাধ্যতামূলক হয়, তা বোঝানো হয়নি। কেননা তা বোঝাতে চাওয়া হলে 'তাদের উপর অর্ধেক রজম' বলতে হতো, কিন্তু তা বলা সহীহ্ হতে পারে না। 'রজম'কে ভাগ করা যায় না। আর দাসীর জন্যে স্বাধীনা মেয়ের শাস্তির অর্ধেক বিশেষভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যদি তারা যিনার অপরাধ করে এবং বোঝা গেল যে, দাস এক্ষেত্রে দাসীদের অবস্থার সম্মুখীন হবে। কেননা 'হদ্দ' কম হওয়ার তাৎপর্য হল দাসত্ব। দাস-ও দাসীর মতই দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ -

আর যারা মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে পবিত্র চরিত্রের মেয়েদের। (সূরা নূর ঃ ৪)

এখানে পবিত্র চরিত্রের মেয়েদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে দাসীদের সম্পর্কেও সচ্চরিত্র মেয়েদের সংক্রান্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে যদি তাদের সম্পর্কেও লোকেরা চরিত্রহীনতার মিথ্যা অভিযোগ তোলে। কেননা المحصنة অর্থনৈতিক পবিত্রতা, সতীত্ব, স্বাধীনতা ও ইসলাম। এখানে তাৎপর্যগতভাবে নারীদের সম্পর্কিত হুকুম পুরুষদের জন্যেও নির্ধারিত করা হয়েছে।

তা একথাও প্রমাণ করে যে, কোন হুকুমের যদি বহু কয়টি তাৎপর্য হয়, তাহলে যেখানেই তা পাওয়া যাবে, সেখানে হুকুম কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হবে। হ্যাঁ, যদি কোথাও কোন একটি বা বহু কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখার দলীল পাওয়া যায়, তাহলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

তাহলে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে এবং তাদের মহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও।

একথা প্রমাণ করে যে, কোন মুস্তাহাব কাজের হুকুমের সাথে ওয়াজিব কাজকে সংযোজন করা জায়েয। কেননা আয়াতের প্রথমে যে বিবাহ করতে বলা হয়েছে, তা কাজ হিসেবে মুস্তাহাব, ফরয নয়। এর পরই মহরানা দিয়ে দেবার হুকুম করা হয়েছে। তা দেয়া ওয়াজিব বা ফরয। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ - (النساء : ٣)

এবং এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা খালেসভাবে দিয়ে দাও। (সূরা নিসা ঃ ৪)

এ আয়াতেও মুস্তাহাব কাজের সাথে সংযোজন করা হয়েছে ওয়াজিব কাজ।

এমনিভাবে ওয়াজিব-ফরয কাজের সাথে মুস্তাহাব কাজকেও সংযোজিত করা জায়েয। যেমন আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى -

এ আয়াতে বলা ন্যায়পরতা ওয়াজিব; কিন্তু ইহসান— ভালো আচার-আচরণ করা মুস্তাহাব। প্রথম কথাটির সাথে সংযোজন করা হয়েছে দ্বিতীয় কথাটি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ -

একথা তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্য থেকে যিনার আশংকা বোধ করবে।

ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র, দহাক ও আতীয়াতুল আওফা বলেছেন, আয়াতের الْعَنَتَ শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনা। অন্যান্যরা বলেছেন الْعَنَتَ অর্থ হচ্ছে, দ্বীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে বিরাট ও সাংঘাতিক ক্ষতি। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ 'তোমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি যাতে, তা-ই ওরা কামনা করে।' আর আল্লাহ্‌র لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ কথাটি প্রত্যাবর্তিত فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ -এর দিকে। এটা শর্ত, দাসী বিয়ে করা যে তরক করবে এবং স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করাকে গ্রহণ করবে, তার জন্যে এটা পছন্দনীয়, দাসীর পরিবর্তে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করাকে একমাত্র পন্থা হিসেবে যে গ্রহণ করবে এ জন্যে যে, তার সন্তান যেন অন্য কারোর গোলাম না হয়। সে লোক যদি যিনার আশংকায় পড়ে যে, অবিলম্বে বিয়ে না করলে তার দ্বারা যিনা হয়ে যেতে পারে, নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলতে পারে বলে যদি ভয় হয়, তাহলে তার জন্যে দাসী বিয়ে করা মুবাহ। এতে ঘৃণা বা অপছন্দের কোন কারণ নেই। তা করলেও কোন দোষ নেই, না করলেও নেই। তারপরে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমাদের মহাকল্যাণ হবে।' একথা বলে স্পষ্ট করা হয়েছে মূলতই দাসী বিয়ে না করাই ভালো। এ আয়াতটুকু যিনার ভয় না থাকলেও যিনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলে দাসী বিয়ে করা পছন্দনীয় নয়। আর যদি একান্তই যিনা হয়ে যাওয়ার ভয় তীব্র হয়ে পড়ে, তাহলে দাসী বিয়ে করা মুবাহ— যদি তার অধীন স্ত্রী হিসেবে কোন স্বাধীনা মেয়ে না থেকে থাকে। এরূপ অবস্থায়ও দাসী বিয়ে না করাই ভালো। আর যিনার ভয় হলে তখন ধৈর্য ধারণ করাই কল্যাণবহ। আসলে যিনা ভয় হলেও দাসী বিয়ে না করাই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয়। কেননা দাসী বিয়ে করলে তার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে তো দাসীর মনিবের দাস হয়ে যাবে। আর দক্ষিণ হস্তের মালিকানায় দাসীর সন্তান হওয়া অপছন্দনীয় নয়। কেননা স্বাধীন পুরুষের ঔরসে দাসীর গর্ভে সন্তান হলে সে-ও স্বাধীনই হবে। নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, তা আয়াতের অর্থের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন। তা হল, দাসী বিয়ে করা মকরুহ।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ইবনে জাবির আস্-সকতী মুহাম্মাদ ইবনে উকাবাতা ইবনে হুরম আস্-সেদূসী, আবূ উমাইয়্যাতা ইবনে ইয়ালা, হিশাম ইবনে উরওয়াতা, তাঁর পিতা আয়েশাতা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَنْكِحُوا الْاَكْفَاءَ وَاَنْكِحُوهُنَّ وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَالزِّنْجَ فَاِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ -

তোমরা কুফুতে বিয়ে কর এবং তোমাদের কন্যাদেরকেও কুফুতে বিয়ে দাও এবং তোমাদের বিয়ের জন্যে উত্তম মেয়ে বাছাই কর। কালো থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ। কেননা তাদের দেহাকৃতি বিকৃতিপূণ।

রাসূল (স)-এর কথা ঃ তোমরা কুফুতে বিয়ে কর— প্রমাণ করে যে, দাসী বিয়ে করা অপছন্দনীয়। কেননা দাসী স্বাধীন পুরুষের জন্যে কুফু নয়। আর তাঁর কথা ঃ 'তোমাদের বীর্যের জন্যে উত্তম মেয়ে বাছাই কর'— কথা তো তা-ই প্রমাণ করে। যেন তাঁর সন্তান অন্য কারোর মালিকানাভুক্ত দাস হয়ে না যায়, অথচ তার বীর্য তো স্বাধীন মানুষের বীর্য। সে যদি দাসী বিয়ে করে, তাহলে তার বীর্য দাসত্বে পরিণত হবে। অপর এক হাদীসে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانَّ عِرْقَ السُّوْءِ يُدْرِكُ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ -

তোমরা তোমাদের বীর্যপাত ঘটাবার জন্যে উত্তম মেয়ে বাছাই কর। কেননা খারাপ মূল অবশ্যই জাগ্রত হয়ে ধরা পড়বে কিছুকাল পরে হলেও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ -

আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্পষ্ট কথা বলে দিতে চান এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়ম-নীতি জানিয়ে দিতে চান ও তোমাদের নিকটবর্তী হতে— তোমাদের তওবা কবুল করতে চান।

এর প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্-ই ভালো জানেন। আমাদের পক্ষে যা যা জানা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সব তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা জরুরী, আল্লাহ সেই সব-ই আমাদের জন্যে বলে দিতে চান বলেই এসব কথা বলছেন তিনি। বলছেন দুটি উপায়ে, একটি হল 'নস' আর দ্বিতীয় হল দলীল প্রমাণ— 'নস' যা বোঝায়, যা প্রমাণিত করে। আর ছোট বড় সব ব্যাপারেই আল্লাহ্ আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। দিয়েছেন হয় প্রত্যক্ষ 'নস'-এর মাধ্যমে, না হয় দলীলের মাধ্যমে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - (القيامه : ١٩)

অতঃপর তা প্রকাশ করে বলা আমাদের কাজ।

অন্যত্র বলেছেন ঃ

هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ -

এ হচ্ছে জনগণের জন্যে সুস্পষ্ট কথন, প্রকাশ ও বিশ্লেষণ। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৮)

বলেছেন ঃ

مَافَرَّطْنَا فِىْ الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ -

কুরআনে কোন কথা বলা-ই আমরা ছেড়ে দিইনি। (সূরা আল-আন'আম ঃ ৩৮)

বলেছেন ঃ

وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিয়ম-নীতি জানিয়ে দিচ্ছেন।

কোন কোন লোক বলেছেন, আল্লাহ্‌র এসব কথা প্রমাণ করে যে, আমাদের জন্যে যা হারাম, তা তিনি হারাম করেছেন। যে সব মেয়েলোক আমাদের জন্যে মুহররম, তা-ও বলে দিয়েছেন আলোচ্য আয়াতের পূর্বের দুটি আয়াতে। তা আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্যেও হারাম ছিল, আগের নবীগণের উম্মতদের জন্যেও হারাম ছিল।

অন্যরা বলেছেন, এ থেকে বোঝায় না যে, সব নবী-রাসূলের প্রতি নাযিল হওয়া শরীয়ত বুঝি এক ও অভিন্ন। বরং তার অর্থ হল — আগের উম্মতগণের নিয়ম-নীতি তিনিই বলতে পারেন, তাঁরই অধিকার আছে তা বলার। আমাদের জন্যে যা কল্যাণকর, তা তাদেরকে তিনিই বলে দিয়েছেন।

বিভিন্ন নবী-রাসূলের শরীয়তে ইবাদত ইত্যাদি বিভিন্ন ছিল মোটামুটিভাবে। কিন্তু মানবীয় কল্যাণের দিক দিয়ে তা সবই অভিন্ন।

অন্যান্য মনীষী বলেছেন, এর অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী হক পন্থী লোকদের নিয়ম-নীতি বলে দিচ্ছেন। যেন তোমরা বাতিল ও অকল্যাণকর নিয়ম-নীতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পার এবং প্রকৃত হক যা তোমরা পছন্দ করতে ও ভালোবাসতে পার। আল্লাহ্‌র কথা وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ এবং 'তোমাদের উপর তওবা করবেন' এ কথাটুকু প্রমাণ করে যে, হাদীসবিদদের মাযহাব বাতিল। কেননা এ কথা দ্বারা আল্লাহ্‌ জানিয়েছেন যে, তিনি আমাদের উপর তওবা করতে চান আর ওরা ধারণা করে বসেছেন যে, পাপ কাজে পৌনপুনিকতাই চান, তাদের নিকট থেকে তওবা ও ইস্তিগফার পেতে চান না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ -

এবং আল্লাহ্‌ চান যারা মনের কামনা-লালসার অনুসরণ করে .....

কোন কোন লোক বলেছে, বাতিলপন্থী সব লোকের কথাই বলেছেন এ কথাটুকুর মাধ্যমে। কেননা তারা নিজের নফসের কামনা-বাসনা ও লালসাকে অনুসরণ করে। তাতে সত্য দ্বীনের সাথে সঙ্গতি রক্ষিত হল, কি তা বিরুদ্ধতা করা হল, তার এক বিন্দু পরোয়া করে না। লালসা-কামনার সাথে হক-এর সংঘর্ষ হলে, বা বৈপরীত্য দেখা দিলে তারা সত্যকে গ্রহণ না করে বরং লালসা চরিতার্থ করার দিকেই ঢলে পড়ে।

মুজাহিদ বলেছেন, এ থেকে যিনার কথা বলতে চেয়েছেন। আর সুদ্দী বলেছেন, এতে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَنْ تَمِيْلُوا مَيْلًا عَظِيْمًا -

তোমরা বিরাট ভাবে ঝুঁকে পড়বে।

অর্থাৎ সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে খুব বেশি বেশি গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ ঝুঁকে পড়ার জন্যে তাদের ইচ্ছা হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি— তাদের শত্রুতা পোষণের দরুন অথবা তাদের প্রীতি ও ভালোবাসার আকর্ষণে। এবং আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে তাদের প্রতি প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভের দরুন। তাই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা ওসব লোকের ইচ্ছার পরিপন্থী।

আয়াতটি প্রমাণ করে যে, লালসা-কামনার অনুসরণের ইচ্ছা ও সংকল্প নিন্দিত ব্যাপার। তবে তা যদি সত্য দ্বীনের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়, তবে ভিন্ন কথা। তখন তা নিন্দিত হবে না। তখন মনের ইচ্ছার অনুসরণ বরং প্রশংসার্হ এবং কল্যাণময়। কেননা তার লক্ষ্য হয় পরম সত্যের অনুসরণ। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিকে নফসের কামনা-লালসার অনুসরণকারী বলা হয় না। বরং সে আসলে সত্যেরই অনুসারী— নফসের খাহেশের অনুকূল হোক, কি প্রতিকূল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا -

আল্লাহ চান, তিনি তোমাদের বোঝা হালকা করে দেবেন। আর মানুষ তো সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।

আয়াতের تخفيف -এর অর্থ দায়িত্বভার হালকা ও বহনযোগ্য করা। বোঝা চাপানোর বিপরীত। যেমন অপর আয়াতে রাসূল (স) সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ -

নবী-রাসূল তাদের উপর থেকে তাদের বোঝা ও শৃঙ্খল— যা তাদের উপর চেপে বসেছিল— নামিয়ে দেয়।

(সূরা আরাফ ঃ ১৫৭)

আল্লাহ্র কথা ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতা বিধান করতে চান, তিনি তোমাদের প্রতি কঠিনতা ও কঠোরতা করতে চান না। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৫)

বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

এবং তিনি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেন নি। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

আল্লাহ্র কথা ঃ

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ -

আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা বা কষ্টের কারণ সৃষ্টি করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। (সূরা মাযিদা ঃ ৬)

এ সব আয়াতে আল্লাহ্ মুসলমানদের পথে সংকীর্ণতা, দুর্বহ বোঝা ও অসুবিধা সৃষ্টি করতে চান না বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এ কথা-ই নবী করীম (স) নিজের ভাষায় বলেছেন এভাবে ঃ

جِئْتُكُمْ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ -

আমি তোমাদের নিকট একমুখিতা, একাগ্রতা-ক্ষমা-সহিষ্ণুতা-সহজতা নিয়ে এসেছি।

তার ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ্ একদিকে যেমন কোন কোন মেয়েলোক আমাদের জন্যে হারাম করেছেন, তেমনি অপর দিকে সেই মুহররম মেয়েলোক বাদে অন্যান্য মেয়েলোককে আমাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন। তা কখনও বিয়ের মাধ্যমে হালাল করেছেন, কখনও করেছেন দক্ষিণ হস্তের মালিকানাসূত্রে। অন্যান্য হারাম জিনিস পর্যায়েও একথা। সেখানে আমাদের জন্যে যা হারাম করেছেন, সেই জাতীয় দ্বিগুণ-তিনগুণ জিনিস আমাদের জন্যে হালাল করেছেন। হারাম জিনিস থেকে আমাদেরকে বিপুলভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছেন বহু জিনিস হালাল করে।

এ পর্যায়ের হাদীস আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের সে সব জিনিস হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের রোগের নিরাময়তা রাখেন নি।

অর্থাৎ কেবলমাত্র হারাম জিনিসেই তোমাদের রোগের আরোগ্য রেখে দেন নি। বরং হারাম জিনিসসমূহ থেকে তিনি আমাদের জন্যে মুক্তি ও স্বাধীনতা ব্যবস্থা করে দেন আমাদের জন্যে বহু প্রকারের খাদ্য ও ঔষধাদি হালাল করে দিয়ে। এর উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন ক্ষতি ও অসুবিধার মধ্যে না পড়ি দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে, যা আমাদের জন্যে হারাম করেছেন তার কারণে। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দুইটি জিনিসের মধ্যে যেটা অধিক সহজ সেটাই গ্রহণ করেছেন।

ফিকাহবিদগণ যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন এবং তাতে ইজতিহাদকে কার্যকর করেছেন, তাতে হালকার দিকে পরিণতি গ্রহণেরই দলীল হচ্ছে এসব আয়াত। যারা জবরদস্তির

মত গ্রহণ করেছে, তাদের মত যে বাতিল, তা এসব আয়াত থেকেই প্রমাণিত। ওরা বলেছে যে, আল্লাহ্ বান্দাকে এমন কাজে দায়িত্ব দেন যা করার সাধ্য বান্দার নেই। অথচ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের বোঝা হালকা করতে চান ও চরম মাত্রার দুর্বহ বোঝা কখনই আমাদের উপর চাপান না।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিক্রয়ের ইখতিয়ার

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে যদি তোমাদের সম্মতিভিত্তিক ব্যবসায় হয় (তাহলে খেতে দোষ নেই)।

আবূ বকর বলেছেন, অন্য লোকের মাল বাতিল পন্থায় খাওয়া এবং নিজের মাল বাতিল উপায়ে খাওয়া সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ হয়েছে এ আয়াতে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ أَمْوَالَكُمْ 'তোমাদের মাল' কথাটি অন্য লোকের মাল ও নিজের মাল— এ সবই শামিল করে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ 'এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' এতে নিজের ও অন্যের— সকলকেই হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও 'তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় খেয়ো না।' এতে নিজের ও অপরের— সকলেরই মাল বাতিল পন্থায় খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। নিজের মাল বাতিল পন্থায় অন্য লোকের মাল খাওয়া পর্যায়ে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি, যেমন সুদ্দী বলেছেন, তা হল সূদ খাওয়া, জুয়া খেলা, মালে কম দেয়া— নিকৃষ্ট মাল দিয়ে উৎকৃষ্ট মালের মূল্য গ্রহণ এবং জুলুম করে পরের ধন নিয়ে নেয়া। এই আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন সাহাবায়ে কিরাম কারোর ঘরে কিছু খাওয়ার ব্যাপারেও কুণ্ঠা বোধ করছিলেন। পরে সূরা আন-নূর-এর আয়াত নাযিল হয়ে তা দূর করে দেয়। সে আয়াতটি হল ঃ

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيْقِكُمْ -

অন্ধ, খঞ্জ, রোগী ও তোমাদের নিজেদের জন্যে কোন দোষ হবে না যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতা-দাদার, তোমাদের মা, তোমাদের ভাই-বেরাদর, তোমাদের বোন, তোমাদের চাচা, তোমাদের ফুফু, তোমাদের মামা, তোমাদের খালাদের ঘর; কিংবা

যে সব ঘরের চাবি তোমাদের দখলে আছে কিংবা তোমাদের বন্ধুর ঘর থেকে তোমরা যদি খাও। (সূরা নূর ঃ ৬১)

আবূ বকর বলেছেন, সম্ভবত ইবনে আব্বাস ও আল-হাসানের কথার তাৎপর্য হল— প্রথমোক্ত আয়াতটি নাযিল হলে লোকেরা কারোর ঘরে কিছু খাওয়ায়ও কুণ্ঠাবোধ করতেন। এ জন্যে নয় যে, আয়াতটি খেতে নিষেধ করেছে। কেননা হেবা ও সাদকা তো কোন সময়ই নিষিদ্ধ হয়নি এ আয়াতটির দ্বারা। অন্যদের নিকট থেকে খাওয়াকেও হারাম করা হয়নি। তবে অন্যদের ঘরে থেকে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে খাওয়াকে অপছন্দ করেন। এই শেষে উদ্ধৃত আয়াতটি তা দূর করে দেয়। শ'বী, আল-কামা, আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আয়াতটি মুহ্‌কাম, মনসূখ হয়ে যায়নি। কিয়ামত পর্যন্ত তা মনসূখ হবে না। রুবাই' আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কুরআনের কোন আয়াতই তা মনসূখ করেনি।

অন্য লোকের মাল খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণার আর একটি আয়াত হল ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ -

তোমরা তোমাদের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না এ ভাবে যে, তোমরা তা শাসকদের নিকট সোপর্দ করে দেবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৮)

নবী করীম (স)-এর কথা হল ঃ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرَىءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ -

কোন মুসলিম ব্যক্তির মাল তার নিজের মনের খুশীতে না দেয়া পর্যন্ত হালাল হবে না।

অন্য লোকের মাল খাওয়ার নিষেধ একটি বিশেষ পরিচিতির বন্ধনে আবদ্ধ তা বাতিল পন্থায় খাওয়া। অ-সহীহ্ চুক্তির মাধ্যমে মাল ও দল বদল বা হস্তান্তর করে খাওয়া এর মধ্যেই গণ্য। যেমন সহীহ্ নয় এমন ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য গ্রহণ। যেমন কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা এবং সে জিনিসটি খারাপ বা পঁচা পাওয়া, যা ব্যবহার করা যায় না। যেমন পঁচা ডিম বা ফল। তার মূল্য খাওয়ার বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া হবে। তেমনি যে জিনিসের কোন মূল্য হয় না, তার মূল্য গ্রহণ করা। যা ব্যবহার করা যায় না, তার মূল্য নেয়া, যেমন, বানর, শূকর, মাছি— এ ভাবে আরও যে সব জিনিস ব্যবহারযোগ্য নয়, তার মূল্য নেয়া। এই সবের মূল্য গ্রহণ ও তা থেকে ফায়দা লাভ বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া পর্যায়ে গণ্য। তেমনি মরণোত্তর কান্নাকাটি বা সঙ্গীত গাওয়ার বদলে মজুরী গ্রহণ। তেমনি মৃতের, মদের, শূকরের মূল্য নেয়া। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অ-সহীহ্ বিক্রয় কার্য করে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। বিক্রেতার উচিত গৃহীত মূল্য ক্রয়কারীকে ফেরত দেয়া।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিশারদগণ বলেছেন, এসব জিনিসের ব্যবসায়ে মুনাফা হলে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তার উপর চুক্তি হলে এবং সেই মুনাফা হস্তগত করা হয়ে থাকলে তা সাদকা করে দেয়া তার কর্তব্য। কেননা সেই মুনাফা নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না'— এই সবই স্বীয় আওতার মধ্যে শামিল করেছে। হারাম চুক্তিসমূহও এই পর্যায়ে গণ্য।

যদি বলা হয়, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ কি হেবা ও সাদকা গ্রহণ ও ভক্ষণ হারাম করে এবং সঙ্গী-সাথীর নিকট থেকে মাল গ্রহণ কি মুবাহ্ করে ?

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ সেসব চুক্তি হালাল করেছেন এবং অন্য লোকের মাল গ্রহণ মুবাহ করেছেন, তা সবই উক্ত আয়াতটির আওতা-বহির্ভূত। কেননা মাল ভক্ষণের নিষেধটা শর্তযুক্ত। আর তা হচ্ছে বাতিল উপায়ে মাল ভক্ষণ। তাই আল্লাহ যা মুবাহ ও হালাল করেছেন, তা বাতিল উপায় নয়। বরং তা হক্ উপায়ে। অতএব এই মাল মুবাহ হয় কি কারণে, সে দিকে আমাদেরকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। মুবাহ হলে তাকে কোনক্রমেই বাতিল বলা যাবে না। তা উক্ত আয়াতের আওতায় পড়বে না। আর যদি নিষিদ্ধ ও হারাম হয়, তা হলে তা অবশ্যই আয়াতের দাবি অনুযায়ী বাতিল গণ্য হবে।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ -

তবে যদি ব্যবসায় হয় তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে .....

এর দাবি হচ্ছে সর্বপ্রকারের ব্যবসায়— যা দুই পক্ষের সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে।

ব্যবসায় একটা নাম। পারস্পরিক বিনিময়ের চুক্তি হিসেবে তা সংঘটিত হয়। তার মাধ্যমে মুনাফা লাভ-ই হয় লক্ষ্য। আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -

আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসায়ের পথ দেখাব, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দান করবে ? .... তা হল তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের প্রতি ....। (সূরা সফ ঃ ১০-১১)

এ আয়াতে ঈমানকে ব্যবসায় বলা হয়েছে পরোক্ষ অর্থে। মুনাফা লাভের ব্যবসায়ের সাথে তার সাদৃশ্য স্থাপনের লক্ষ্যে। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ -

তোমরা আশা করছ এমন একটি ব্যবসায় যা কক্ষণই ধ্বংস হবে না। (সূরা ফাতির ঃ ২৯)

যেমন আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে আত্মহননকে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়েছে এ আয়াতেঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ......

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্রয় করেছেন মুমিনদের নিকট থেকে তাদের নিজেদের সত্তা ও তাদের ধন-মালকে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের জন্যে জান্নাত হবে। (সূরা তওবা ঃ ১১১)

এ আয়াতেও আত্মদানকে ক্রয় বা বিক্রয় বলা পরোক্ষভাবে। সরাসরি ও প্রত্যক্ষ অর্থে নয়। আল্লাহ্‌র বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

আর তারা নিশ্চয়ই জেনেছে কে তাকে ক্রয় করেছেন, পরকালে তার প্রাপ্য কোন অংশই নেই। তারা যার বিনিময়ে তা খরীদ করেছে তা অত্যন্ত খারাপ জিনিস, যদি তারা জানত, তবে কতই না ভালো হতো। (সূরা বাকারাহ ঃ ১০২)

এ আয়াতেও যে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থে নয়, পরোক্ষ অর্থে। যেসব ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিময় লাভ হয়, সেই সবের চুক্তির সাথে এসব ক্রয়-বিক্রয়ের সাদৃশ্য দেখানোই এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি ঈমানকেও ব্যবসায় বলা হয়েছে সে ভাবেই। কেননা এর বিনিময়ে বিপুল সওয়াব ও বস্তুগত বিনিময় পাওয়া যাবে। তাই তাতে 'তবে তোমাদের সম্মতিক্রমে যদি ব্যবসায় হয়' কথার অন্তর্গত ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা দেয়া ও হেবা ইত্যাদির চুক্তিও এরূপই হয়ে থাকে। তাতে বিনিময়ের শর্ত থাকে বলে। কেননা জনগণের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এ সব কিছুতে বিনিময় দেয়া ও নেয়া হয়।

বিবাহকে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় বলা হয় না। কেননা তাতে সাধারণ নিয়ম ও অভ্যাস অনুযায়ী তাতে বিনিময় লক্ষ্যভূত নয়। সে বিনিময় হচ্ছে মহরানা। মহরানা পাওয়াই বিবাহের মূল লক্ষ্য নয়। তাতে মূল লক্ষ্য থাকে স্বামী-স্ত্রীর সার্বিক কল্যাণ, সুখ, বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন অনুযায়ী জীবন যাপন এবং মর্যাদা ও সম্মান সহ কালাতিবাহন এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছু। এ কারণে এ অর্থে তাকে ব্যবসায় বলা যায় না। আরও এ জন্যে যেমন বলেছি— যাতে বিনিময় হয়, কেবল তাকেই ব্যবসায় বলা যায়।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ বলেছেন, ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার দাসী কিংবা দাসকে বিয়ে দেয় না, সে মুকাতি বা চুক্তি করে না এবং মালের বিনিময়েও তাকে মুক্ত করে না। সে নিজেও বিয়ে করে না। আর সে যদি দাসী হয়, তাহলে সে নিজেকেও বিয়ে দেয় না। কেননা তার যাবতীয় কাজ ব্যবসায়ের মধ্যে সীমিত। এসব চুক্তিও ব্যবসায় পর্যায়ের নয়। তাঁরা এ-ও বলেছেন, সে নিজেকে মজুরীর বিনিময়ে লাগাতে পারে, তার নিজের গোলামকেও নিয়োগ করতে পারে। অথচ তার হাতে ব্যবসায়ের পণ্য নেই। কেননা ইজারার কারবারও ব্যবসায়েই গণ্য। মুজারিবা ও শিরকাতে ইমাম পর্যায়েও তাঁরা এই কথা বলেছেন। কেননা তাদের দুজনার কার্যক্রম ব্যবসায়ের মধ্যে সীমিত, অন্য কিছুতে নয়। আর ক্রয়-বিক্রয় যে ব্যবসায় পর্যায়েরই কাজ সে বিষয়ে লোকদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

বিশেষজ্ঞগণ البيع। 'বিক্রয়' শব্দের তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কি করে তা হয় ? হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, কেউ যদি অপর একজনকে বলে ঃ 'তোমার এই গোলামটি আমার নিকট এক হাজার টাকায় বিক্রয় করো।' জবাবে সেই লোক যদি বলে,

---

১. শরীকানা ব্যবসায় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অনুবাদকের গ্রন্থ 'ইসলামের অর্থনীতি' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে।

'হ্যাঁ, তোমার নিকট বিক্রয় করলাম,' তাহলে প্রথম ব্যক্তির সে কথা গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। তাঁদের মতে বিক্রয়ের প্রস্তাব ও তা কবুল করার কথা অতীত বোঝায় এমন শব্দ দ্বারা বলতে হবে। ভবিষ্যৎ বোঝায় এমন শব্দে বললে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হবে না। কেননা 'আমার নিকট বিক্রয় কর' প্রস্তাবনা মাত্র। বিক্রয় করার আদেশ মাত্র। বিক্রয় চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার কথা এটা নয়। আর বিক্রয়ের আদেশটা বিক্রয় হয়েছে বোঝায় না। তেমনি কেউ যদি বলে ঃ 'আমি তোমার নিকট থেকে ক্রয় করছি,' তবে তাতে ক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে না। কথাটি তো ক্রয়ের আগাম সংবাদ দান— 'ক্রয় করব' বোঝায়। শব্দটি ভবিষ্যৎ সূচক। অনুরূপভাবে বিক্রেতার কথা ঃ তুমি আমার নিকট থেকে ক্রয় কর' এবং 'আমি তোমার নিকট বিক্রয় করব'— প্রভৃতি চুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার কথা বোঝায় না। তা শুধু খবরদান— ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার। ফিকাহবিদগণ বলেছেন, কিয়াস বলে, বিবাহও তেমনই ব্যাপার। তবে তাঁরা ভালো মনে করে বলেছেন, যদি কেউ বলে ঃ 'আমার নিকট তোমার কন্যা বিয়ে দাও.' জবাবে লোকটি বলে ঃ 'হ্যাঁ, তোমার নিকট বিয়ে দিয়েছি'— এতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। পরবর্তীতে স্বামীর তা কবুল করে নেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। তার দলীল হচ্ছে সহল ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদীস। যে মেয়েটি নিজেকে রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছিল, রাসূল (স) তা কবুল করেন নি। তখন অপর এক ব্যক্তি বলেছিল ঃ 'ও মেয়েটিকে আপনি আমার নিকট বিয়ে দিন'। পরে নবী করীম (স) লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, সে মেয়েটিকে কি দেবে সেই বিষয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন ঃ 'হ্যাঁ, তোমার নিকট মেয়েটিকে আমি বিবাহ দিলাম তোমার নিকট কুরআনের যে ইল্‌ম আছে তার বিনিময়ে।' লোকটির কথা 'আমার নিকট বিবাহ দিন' এবং তার জবাবে রাসূলের কথা ঃ 'তোমার নিকট মেয়েটিকে বিবাহ দিয়েছি'— তিনি এ কথাটির দ্বারা বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত করে দিলেন। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস উল্লেখ্য। সেটিও এ বিষয়েই বর্ণিত। যেহেতু বিবাহে প্রস্তাবনা ও তারই মত— অভ্যাসে প্রবেশ করাই আসল লক্ষ্য নয়, লোকেরা 'আমাকে বিবাহ দিন' ও 'তোমাকে বিবাহ দিয়েছি' এই দুটি কথার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য করে না। বিবাহে এটাই প্রচলিত অভ্যাস। তাই 'তোমাকে বিবাহ করলাম' এবং 'আমার নিকট তোমাকে নিজেকে বিবাহ দাও' এ দুটি কথা অভিন্ন।

বিক্রয়ে অভ্যাস হচ্ছে— শুরুতেই প্রস্তাবনা হিসেবে তাতে প্রবেশ করা। তাই তা প্রস্তাবই হবে মাত্র। চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে না। তাই লোকেরা কিয়াসের সাহায্যেই তা গ্রহণ করেছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ প্রচলিত আদত-অভ্যাস সম্পর্কে বলেছেন, লোকেরা তার দ্বারা মালিক বানিয়ে দেয়ার উপস্থাপন ও চুক্তি সংঘটনই বুঝে। তাই তাতেই চুক্তি সংঘটিত হবে। আর তা হল কোন বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন, পরে তার জন্যে অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ এবং পণ্যটা গ্রহণ করা— একেই তারা চুক্তি বানিয়েছে তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা ও একজনের অপর জনের নিকট কাঙ্ক্ষিত বস্তু সমর্পণ করা হয় বলে। তা এজন্যে যে, কোন কিছুর অভ্যাস চলতে থাকা সেই বিষয়ে মুখে বলার মতই গ্রহণীয়। কেননা 'কথা'র উদ্দেশ্য হল মনের ভাবটা জানিয়ে দেয়া। অন্তরের বিশ্বাসকে ভাষা দেয়া। আর তা অভ্যাস থেকেই যখন জানা যায় যার উপর চুক্তি হয়েছে তা হস্তান্তর করা সহ, তখন তারা সেটাকেই চুক্তি বলে ধরে নিয়েছে। যেমন কেউ অন্য কাউকে কোন কিছু হাদিয়া দেয়, সে তা হস্তগত করে। তখন তা 'হেবা' হিসেবে

কবুল হয়ে যায়। নবী করীম (স) কয়েকটি ছাগল যবেহ্ করে বললেন ঃ যার ইচ্ছা এ থেকে গোশ্‌ত কেটে নিতে পারে। তখন এই কেটে নেয়াটা 'হেবা' কবুলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল মালিক বানানোর প্রস্তাবনায়। এই যেসব দিকের আমরা উল্লেখ করলাম, তা-ই হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতি, যার শর্ত করা হয়েছে ঃ 'তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায় হয়' কথাটিতে।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, তখন কেউ বলে ঃ আমার নিকট এ জিনিসটি এত'র বিনিময়ে বিক্রয় কর, জবাবে সে বলে ঃ হ্যাঁ, তোমার নিকট বিক্রয় করেছি' — এতেই বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হ্যাঁ, 'তোমার নিকট তাকে বিবাহ দিয়েছি' না বলা পর্যন্ত বিবাহ সহীহ্ হবে না। অথবা অপর জন বলবে ঃ আমি তাকে বিয়ে দেয়াকে কবুল করেছি। কিংবা প্রস্তাবকারী বলবে ঃ 'আমার নিকট তাকে বিয়ে দাও,' আর কনের অভিভাবক বলবে ঃ হ্যাঁ, তাঁকে আমি তোমার নিকট বিবাহ দিয়েছি।'। তাহলে স্বামীর 'আমি কবুল করেছি' বলার প্রয়োজন পড়বে না।

আমাদের ফিকাহবিদদের কথা হিসেবে যা উল্লেখ করেছি, তার প্রেক্ষিতে যদি বলা হয়, দুইজন প্রস্তাবক যদি কোন পণ্যের উপর প্রস্তাব দেয়, পরে ক্রয়কারী মূল্য পরিমাণ বলে এবং তা বিক্রেতার নিকট দিয়ে দেয় এবং বিক্রেতাও পণ্যটি তার নিকট হস্তান্তর করে, তবে এটা বিক্রয়। তবে তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায় হিসেবে বিক্রয় জায়েয হবে না। কেননা বিক্রয় চুক্তির একটা বিশেষ ধরনের ও শব্দের কথা রয়েছে। তা হল প্রস্তাবনা ও মুখের কথার দ্বারা কবুল করা কিন্তু এখানে যা বলা হল, তাতে তা নেই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 'মুনাবিযা', 'মুলামিসা' ও প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বিক্রয়[১] নিষিদ্ধ করেছেন। আর তুমি এ পর্যায়ের যে সব বিক্রয়ের উল্লেখ করেছ, নবী করীম (স) তা সবই বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা তাতে 'বিক্রয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, তুমি যা ধারণা করেছ, ব্যাপার তা নয়। আর নবী করীম (স) যা নিষিদ্ধ করেছেন, আমাদের ফিকাহবিদগণ তার অনুমতি দেন নি, তা জায়েয বলেন নি। তা এ জন্যে যে, 'মুলামিসা' বিক্রয়ে চুক্তিটা সম্পন্ন হয় স্পর্শ করার মাধ্যমে। আর যার নিকট যা আছে তা অপর পক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করার মাধ্যমে 'মুনাবিযা' বিক্রয় সম্পন্ন হয়। আর প্রস্তর খন্ড রেখে দেয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় 'হাসাত' বিক্রয়। এ সব কার্যকলাপ দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার কারণের সৃষ্টি হয় মাত্র। এসব বিক্রয় চুক্তিকৃত হয় বাজি ধরার মাধ্যমে। অথচ যে সব কারণের সাথে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়াকে সম্পর্কিত করেছেন তার সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। তবে আমাদের ফিকাহবিদগণ যার অনুমতি দিয়েছেন তা হল, একটা মূল্যের উভয়ই প্রস্তাব করবে, যার উপর বিক্রয়টা ঠেকবে। পরে তার ক্রেতা মূল্য নির্ধারণ করবে এবং বিক্রেতা

১. একজন অপরজনকে বলবে ঃ তোমার নিকট যা আছে তা আমার দিকে নিপেক্ষ কর, আমি আমার নিকট যা আছে তা তোমার দিকে নিক্ষেপ করব— এ কথার দ্বারা যে ক্রয়-বিক্রয় হয়, হাদীসের পরিভাষায়, তা 'মুনাবিযা'। একজন অপরজনকে বলবে ঃ আমি তোমার নিকট আমার বস্ত্র বিক্রয় করব তোমার বস্ত্রের বিনিময়ে; কিন্তু কেউ কারোর বস্ত্রের দিকে দেখবে না, শুধু স্পর্শ করবে, হাদীসের পরিভাষায় তা 'মুলামিসা— অনুবাদক।

ক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তর করবে, পণ্য তার নিকট দিয়ে দেবে। মূল্য বিক্রয়ের প্রাপ্য হক্। তা দেয়া তার বিধান। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ই যখন চুক্তির কারণ সৃষ্টি করল, একে অপরের প্রাপ্ত হস্তান্তর ও হস্তগত করল, তখন উভয়ের সম্মতি সুসম্পন্ন হল, যার উপর এসে চুক্তিটা ঠেকল প্রস্তাবনা, কাপড় ছোঁয়া, কংকর নিক্ষেপ ও রাখা থেকে। এগুলো চুক্তির আসল কারণ নয়। তার নিয়ম-বিধানও নয়। ফলে চুক্তিটা বাজির সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ল। অতএব তা জায়েয হবে না। আর বাজির ভিত্তিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার এটাই হল মূল কথা। যেমন যদি কেউ বলে ঃ 'আমি ও জিনিসটি তোমার নিকট বিক্রয় করেছি যখন যায়দ এসে যাবে।' এবং কাল যখন সে আসবে প্রভৃতি। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতি ভিত্তিক ব্যবসায় হয়' সর্বপ্রকারের ব্যবসায়ে তা সাধরণ ও ব্যাপক এবং তা মুবাহ। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ 'আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসায়) হালাল করেছেন'। এ আয়াতও সাধারণভাবে সকল প্রকারের বিক্রয় মুবাহ করেছে। তবে অপর কোন দলীলের দ্বারা কোন বিক্রয় হারাম করা হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা। কেননা 'ব্যবসায়' নামটি সাধারণ, ব্যাপক 'বিক্রয়'-এর তুলনায়। এ জন্যে যে, 'ব্যবসায়' বলতে ইজারা হেবা— যা বিনিময়ের ভিত্তিতে হয় এবং সর্বপ্রকারের বিক্রয় শামিল করে। তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের মাল পারস্পরিক বাতিল পন্থায় খেয়ো না'-তে দুটি তাৎপর্য নিহিত আছে। একটি, যে চুক্তি এমন শর্ত ভিত্তিক যার হুকুম বের করার জন্যে ব্যবসায় বিশ্লেষণ আবশ্যক— তা নিষিদ্ধ। আর তা হচ্ছে ঃ 'তোমরা বাতিল পন্থায় পারস্পরিকভাবে তোমাদের মাল খেয়ো না।' এ কথাটি কোন মাল খাওয়াকে বাতিল পন্থায় খাওয়া প্রমাণ করার প্রয়োজন করে দেয়, যার উপর ব্যবহৃত শব্দের হুকুম প্রযোজ্য হতে পারে। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছে, সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের ব্যবসায়। তাতে সবই সাধারণভাবে শামিল। তাতে অস্পষ্টতা বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষতা কিছু নেই। কোন শর্তও তাতে নেই। আমরা সোজাসুজিভাবে তার বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়েই বুঝতে পারি যে, ব্যবসায় বলতে যা বোঝায়, তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য আল্লাহ্ কুরআনে 'নস্' দ্বারা কিছু জিনিস এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাহ দ্বারা আরও কিছু জিনিস এর বাইরে রেখেছেন। তাই মদ্য, মৃত লাশ, রক্ত, শূকর মাংস ও কুরআনে উল্লিখিত সব হারাম জিনিসই এ পর্যায়ে গণ্য। তার বিক্রয় জায়েয় নয়, কেননা 'তাহ্‌রীম' শব্দের ব্যবহার এসব জিনিসকেই শামিল করে। ফায়দা লাভের সব দিক-ই এর মধ্যে রয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدُ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا -

আল্লাহ্ ইয়াহুদীর উপর লানত করেছেন। কেননা তাদেরই উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু ফাঁকির পথ গ্রহণ করে তা বিক্রয় করেছে ও তার মূল্য খেয়েছে।

মদ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَاَكْلَ ثَمَنِهَا وَلَعَنَ بَائِعَهَا وَمُشْتَرِيْهَا -

যিনি মদ্য হারাম করেছেন, তিনিই তা বিক্রয় করাও হারাম করেছেন, তার মূল্য খাওয়াও হারাম করেছেন এবং তার বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْعَبْدِ الْآبَقِ وَبَيْعِ
مَالَمْ يُقْبَضْ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ -

রাসূলে করীম (স) ধোঁকাবাজির বিক্রয়, পালিয়ে যাওয়া দাস বিক্রয়, যা হস্তগত করা হয়নি তা বিক্রয় এবং হাতে নেই তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন।

এ ভাবে অজানা জিনিস বিক্রয় এবং ধোঁকার চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় হারাম করেছেন। এই সব ক্রয়-বিক্রয় 'তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসায় হয়'-এর আওতার বাইরে বিশেষীকৃত।

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ -

আয়াতাংশ দুভাবে পাঠ করা হয়েছে। এক ধরনের পাঠের ফল হল কথার এই রূপ ঃ 'যদি সে মাল ব্যবসায় হয় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে।' ব্যবসায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সংঘটিত হলে সে মাল খাওয়া নিষেধের আওতা-বাহির্ভূত হবে। কেননা বাতিল পন্থায় মাল ভক্ষণ কখনও ব্যবসায় পথে হয়, ব্যবসায় পথ ছাড়া অন্য পথেও হয়। এতে সমস্ত কথা থেকে ব্যবসায়টাকে আলাদা করা হয়েছে। বলেছেন যে, তা বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া নয়।

অন্য ধরনের পাঠের ফল হবে ঃ তবে যদি ব্যবসায় সংঘটিত হয় .... এ পর্যায়ে বাতিল পন্থায় মাল খাওয়ার নিষেধ ব্যাপক অর্থে হবে, তার আওতার বাইরে কিছুই থাকবে না। তাকে বলা হয় "اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع"। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকারী বাদ দেয়া। কিন্তু ব্যবসায় যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হয়, তবে তা মুবাহ্ হবে।

যারা বলেছেন উপার্জন হারাম, তাদের কথা যে বাতিল, তা এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। কেননা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হওয়া ব্যবসায় আল্লাহ মুবাহ করেছেন। 'আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন'— আল্লাহ্‌র এই কথাটি তা-ই প্রমাণ করে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ -

যখন নামায শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান কর। (সূরা জুম'আ ঃ ১০)

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ -

এবং অন্যান্য লোকেরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দুনিয়ায় চলাফেরা করছে এবং আরও অন্যান্যরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছে। (সূরা মুজাম্মিল ঃ ২০)

এ আয়াতে ব্যবসায় ও জীবিকার সন্ধানে দুনিয়ায় চলাফেরা করার কথা আল্লাহ্‌র পথে

জিহাদ ও যুদ্ধ করার সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নিকট এই দুটিই পছন্দনীয়।

ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছা-স্বাধীনতা

ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছা-স্বাধীনতা পর্যায়ে মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, আল-হাসান ইবনে জিয়াদ ও মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, কথার মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি হয়ে গেলে পরে দুজনের— ক্রেতা ও বিক্রেতার— কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকে না মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে না গেলেও। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকেও এইরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। সওরী, লায়স, উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান ও শাফেয়ী বলেছেন, দুই পক্ষ যখন কোন চুক্তি করে তখন তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকে। আল-আওজায়ী বলেছেন, দুজনের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকে— তবে তিন প্রকারের বিক্রয়ে থাকে না। তা হল গনীমতের প্রবৃদ্ধিমূলক বিক্রয়, মীরাসে অংশীদারিত্ব ও ব্যবসায়ে শরীকানা। যখন তারা ভেতরে পৌঁছে যাবে, তখন তা বাধ্যতামূলক হবে। তখন তাদের আর কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকবে না।

দুজনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সময়টা হয় তখন, যখন তাদের দুজনের প্রত্যেকেই অপর জনের আড়ালে চলে যাবে। লায়স বলেছেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ কথা শেষ করে দুজনের কোন একজনের দাঁড়িয়ে যাওয়া।

যারা এই ইচ্ছা-স্বাধীনতাকে অনিবার্য বলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, মজলিসের কথার মধ্যে যদি ইখতিয়ার দেয়া হয় এবং তার পরে ওরা গ্রহণ করে, তাহলে বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

ইবনে উমর থেকে মজলিসের মধ্যেই ইখতিয়ার থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। আবূ বকর বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক ভাবে বাতিল পন্থায় খেয়ো না, তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসায় হয়, তাহলে ভিন্ন কথা'— দাবি করে যে, দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়া ও একত্রিত হওয়ার কোন গুরুত্ব নেই। শরীয়ত ও অভিধানের দৃষ্টিতে তার নাম ব্যবসায় নয়। পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় সংঘটিত হওয়ার ফলে ক্রয় করা জিনিস ভক্ষণকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন। তাতে ইখতিয়ার অনিবার্য করা হলে তা প্রতিবন্ধক হবে এবং তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বাইরে কোন দলীল ছাড়া এক বিশেষীকরণ মাত্র। আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ (কার্যকর) কর। (সূরা মায়িদা ঃ ১)

এ আয়াত প্রত্যেক চুক্তিকারীর উপর তার চুক্তি পূরণ ও কার্যকরকরণে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। মূলত তা একটি চুক্তি, দুজনের প্রত্যেকেই তা পূরণ করাকে নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। অতএব তা পূরণ করা তার কর্তব্য। এর মধ্যে ইচ্ছা স্বাধীনতা

প্রয়োগের অধিকার প্রমাণ করা হলে সে চুক্তি পূরণ বাধ্যবাধকতার অস্বীকৃতি হবে। আর তা আয়াতের দাবির পরিপন্থী। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা প্রমাণ করে ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -

তোমরা যখন কোন ঋণের লেন-দেন করবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে তখন তোমরা তা লিপিবদ্ধ কর। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

শেষে বলা হয়েছে ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ -

তবে যদি উপস্থিত ব্যবসায় হয় যা তোমাদের মধ্যে আবর্তিত হয়, তা না লিখলে তোমাদের কোন গুনাহ্ হবে না। তবে যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন সাক্ষী রাখবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

পরে সাক্ষী রাখা না হলে মূল্যের নিশ্চয়তা সহকারে রিহন গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তা বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের সময় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই করণীয় রূপে আদিষ্ট। কেননা আল্লাহ্‌র কথা হচ্ছে ঃ 'পরস্পর ঋণের লেন-দেন চুক্তি যখন করবে, তখন লিখবে।' পারস্পরিক লেন-দেন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময়ই তা লিখতে এবং লেখার ব্যাপারে পরম নিরপেক্ষতা রক্ষার আদেশ দেয়া হয়েছে। যার উপর ঋণটা চাপছে, তাকে বলা হয়েছে বর্ণনা বলে দিতে। আর এতেই দলীল রয়েছে একথার যে, পারস্পরিক ঋণ লেন-দেনের চুক্তিই তার উপর ঋণ চাপিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্‌র এই কথাটি দ্বারা ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا -

যার উপর হক্‌টা ধার্য হচ্ছে, সে-ই যেন বর্ণনা লেখায় এবং সে যেন তার রব্ব আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাতে একবিন্দু কম করে না লেখায়। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

পারস্পরিক ঋণের লেন-দেনের চুক্তি যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তার হক ধার্য হওয়ার কারণ না হতো, তাহলে 'যার উপর হক ধার্য হয়, সেই যেন বর্ণনা লেখায়' একথা কখনই বলা হতো না এবং তাতে কম না করতেও বলা হতো না। কেননা তার জন্যে তা কিছুই নয়। কেননা ইচ্ছা-স্বাধীনতা প্রমাণিত হওয়া বিক্রেতার যিম্মায় ঋণ প্রমাণিত হওয়ার পরিপন্থী। আর পারস্পরিক ঋণের লেন-দেনে তার উপর হক চাপিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র কথা 'যার উপর হক ধার্য হয় সে যেন বর্ণনা লেখায়' প্রমাণ করে যে, কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা নেই এবং যে চুক্তি হয়েছে, তা চূড়ান্ত, অবশ্য পূরণীয়। পরে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ -

এবং তোমরা দুইজন সাক্ষী বানাও তোমাদের পুরুষদের থেকে ......(সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

ঋণ বাবদ দেয়া ধন-মালের সংরক্ষণ এবং গ্রহীতার অস্বীকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ অথবা সে যদি ফেরত না দিয়েই মরে যায়, তাহলেও দেয়া ঋণ উদ্ধার করা এভাবেই সম্ভব হতে পারে। পরে বলেছেন ঃ

وَلَاتَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ط ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا .....

তা ছোট হোক কি বড় মেয়াদ পর্যন্তকার দলীল লিখতে তোমরা ক্লান্তি বোধ ও উপেক্ষা প্রদর্শন করো না। আল্লাহ্‌র নিকট তা অত্যন্ত ন্যায় বিচারমূলক সাক্ষ্যের জন্যে শক্তিপ্রদ এবং তোমরা সংশয়ে পড়বে না— তার অতি নিকটবর্তী ব্যবস্থা। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

যদি সেই দুজনার ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকত দুজনার কথাবার্তা চূড়ান্ত করার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে, তাহলে সাক্ষী বানানোটা কোন সতর্কতার ব্যাপার হতে পারতো না এবং সাক্ষ্যের জন্যেও তা শক্তিপ্রদ হতো না। কেননা তখন পাওনা বা ঋণ প্রমাণের জন্যে সাক্ষীর সাক্ষ্যের পক্ষে কিছুই করার থাকে না। তারপর বলেছেন ঃ

وَاَشْهِدُوْا اِذَاتَبَايَعْتُمْ -

তোমরা যখন ক্রয়-বিক্রয় কর, তখনও সাক্ষী বানাও। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

কেননা এ সাক্ষ্য সময়ের জন্যে। ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সময় সাক্ষী বানানোর এই আদেশ দুজনের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার উল্লেখ নেই। পরে সফরকালে ঋণের লেন-দেন রিহ্‌ন রাখার আদেশ করা হয়েছে নিজ বাড়ীতে উপস্থিতিকালীন লেন-দেনে সাক্ষী বানানোর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে। এ ক্ষেত্রেও যদি ইচ্ছা-স্বাধীনতার অবকাশ থাকে, তা হলে রিহ্‌ন রাখার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা যে ঋণ ফেরতযোগ্য নয়, যা ধার্যই হয়নি, তাতে রিহন রাখার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই এ আয়াত প্রমাণ করল যে, এই যে ঋণ দেয়া-নেয়ার চুক্তি কালে ও ক্রয়-বিক্রয়ে সাক্ষী রাখা এবং মালের সংরক্ষণে কখনও সাক্ষী বানানো ও কখনও রিহ্‌ন রাখার হুকুম, তাতে চুক্তি পণ্যের মালিকানা ক্রয়কারীর জন্যে এবং মূলের মালিকত্ব বিক্রেতার জন্যে অনিবার্য করে দিয়েছে— তাদের জন্যে কোনরূপ ইচ্ছা-স্বাধীনতা ছাড়াই। কেননা ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকা সাক্ষী বানানো ও রিহ্‌ন-এর অস্বীকৃতি এবং ঋণের অঙ্গীকারের পরিপন্থী ব্যাপার।

যদি বলা হয়, সাক্ষী-বানানো ও রিহন রাখার আদেশ দুটির যে কোন একটি তাৎপর্যে পরিণতি পাবে। হয় সাক্ষীদ্বয় মূল চুক্তি কালে উপস্থিত থাকবে এবং তাদের দুজনের উপস্থিতিতেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন তাদের সাক্ষ্য বিক্রয়ের শুদ্ধতা প্রমাণ করবে ও মূল্য সুনিশ্চিত ও অনিবার্য করবে। অথবা তারা দুজন পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক ঋণের লেন-দেনের চুক্তি করবে, পরে দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং পরে সাক্ষীদ্বয়ের নিকট তার অঙ্গীকার ঘোষণা করবে। পরে প্রয়োজনের সময় সাক্ষীদ্বয় তাদের এই অঙ্গীকার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে এই বলে যে, তারা নিজেদের মধ্যকার লেন-দেন সম্পর্কে আমাদের নিকট অঙ্গীকার

করেছে। অথবা ঋণের বিনিময়ে রিহন রাখবে যা তাদের ঋণের লেন-দেনের প্রমাণ করবে। তা হলেও ব্যাপারটি সহীহ্ হবে।

জবাবে বলা যাবে, প্রথম কথা, যে-দুটি দিকের উল্লেখ করেছ, তার দুটিই আয়াতের পরিপন্থী। তাতে সাক্ষী ও রিহন রাখার মূলে নিহিত সতর্কতা সম্পূর্ণ বাতিল ও অর্থহীন প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ তো বলেছেন ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -

তোমরা যখন পারস্পরিক ঋণের লেন-দেন করবে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার জন্যে, তখন-ই লিপিবদ্ধ কর। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

পরে বলেছেন ঃ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ 'দুইজন সাক্ষী রাখো'— এই সাক্ষী বানাবার হুকুম লেন-দেন-এর উপর যখন তা ঘটবে তখন, কোন বিলম্ব ছাড়া-ই সতর্কতাস্বরূপ। আর তুমি ধারণা করেছ যে, সাক্ষী বানাবে দুজনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে। দুজনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে পণ্যটা ধ্বংস-ও তো হয়ে যেতে পারে, তা ঋণটাই বাতিল হয়ে যাবে অথবা গ্রহীতা তা অস্বীকার করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, তার পরে সাক্ষী বানাবে। মরেও তো যেতে পারে। তা হলে বিক্রেতা সাক্ষী বানিয়ে তার মালের সংরক্ষণ পর্যন্ত পৌছতেই পারবে না। অথচ আল্লাহ বলেছেন ঃ 'এবং সাক্ষী বানাও যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করবে।' এ কারণে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সময়ই সাক্ষী বানানোর কাজটি হতে হবে। এটাই উত্তম। আল্লাহ্ তো ক্রয়-বিক্রয় করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষী বানাতে বলেন নি। ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকার অবকাশ কুরআনে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে প্রমাণ করবে যা কুরআনে বলা-ই হয়নি। আর আয়াতে যে হুকুম মূলতই নেই তা বাড়িয়ে দেয়া কখনই জায়েয হতে পাবে না।

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষী বানানোর কাজটি তারা দুজন যদি না করে, তাহলে আল্লাহ সাক্ষী বানিয়ে যে সতর্কতার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। ক্রেতা সাক্ষী বানাবার পূর্বে মরেও যেতে পারে। অথবা সে ঋণের ব্যাপারটাই অস্বীকার করে বসবে। তাতে ইচ্ছা-স্বাধীনতা এই সতর্কতার মূল তাৎপর্যটাই প্রত্যাখ্যাত বানিয়ে দেবে। স্বাক্ষী বানিয়ে মালের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে।

এ থেকে প্রামাণিত হয় যে, প্রস্তাবনা ও কবুলের দ্বারাই বিক্রয় সংঘটিত হবে, তাতে দুজনে কারোরই কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকবে না।

যদি বলা হয়, বিক্রয় কালেই যদি তিনদিনের ইচ্ছা-স্বাধীনতার শর্ত উভয়েই করে, তাহলে তো তার উপর সাক্ষী বানানো সহীহ হবে এই ইচ্ছা-স্বাধীনতার শর্তসহ। আর তাতে পাঠ করা আয়াত, লিখিত দলীল, সাক্ষী বানানো ও রিহন রাখা— কোন কিছুরই প্রতিবন্ধক হবে না তা ইচ্ছা-স্বাধীনতার শর্তের উপরই হয়েছে বলে। তার উপর সাক্ষী বানানোও সহীহ্ হবে। অনুরূপভাবে মজলিসের ইখতিয়ারও সাক্ষ্য ও রিহন কোনটিরই বিপরিত হবে না।

জবাবে বলা যাবে, যে আয়াত সাক্ষী রাখার কথা বলা হয়েছে তা এমন বিক্রয়কে শামিলই

করে না যাতে ইখতিয়ারের শর্ত থাকবে। তাতে কেবলমাত্র চূড়ান্ত বিক্রয়ের কথা-ই বলা হয়েছে।

তবে ইচ্ছা-স্বাধীনতার শর্ত জায়েয মনে করেছি একটি দলীলের ভিত্তিতে, তার দ্বারা আয়াতের আওতাভুক্ত পারস্পরিক ঋণমূলক লেন-দেন থেকে আলাদা করে নিয়েছি এবং তা আমরা ব্যবহার করেছি ইখতিয়ারের শর্ত নেই— এমন সব বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। তাই আমাদের জায়েয মনে করা ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তিকৃত বিক্রয়ে এমন কিছুই নেই যা আয়াতের হুকুমের ব্যবহার নিষেধ করে। কেননা তাতে সাক্ষী বানিয়েও রিহন রেখে সতর্কতাবলম্বনের কথা রয়েছে। যে সব বিক্রয়ে ইখতিয়ারের শর্ত রাখা হয়নি তার চুক্তিকারীর অঙ্গীকার এবং ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তিকৃত বিক্রয় আয়াতের হুকুম বহির্ভূত। আয়াতে সে বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। পূর্বেই আমরা বলে এসেছি। ফলে ইখতিয়ার থাকবে না। বিক্রয় সম্পূর্ণতা পাবে। অতপর দুজনের জন্যে পছন্দনীয় হবে অঙ্গীকারের উপর সাক্ষী বানানো, ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নয়। প্রত্যেক বিক্রয়েই ইখতিয়ার আছে বলে যদি আমরা মনে করি, তাহলে বিক্রয়টা সম্পূর্ণ হবে আমাদের বিরোধীদের মতানুযায়ী। তাহলে আয়াতে এমন সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে তার দাবি অনুযায়ী তার হুকুম ব্যবহৃত হতে পারে। উপরন্তু বিক্রয়ে সম্মতি না থাকলেও ইখতিয়ার প্রমাণ করা বিক্রয়ের পরিপক্কতা বিরোধী; কিংবা তা ভঙ্গকারী। তারা দুজন যদি বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন করে ইখতিয়ারের শর্ত ছাড়া-ই, তাহলে তাদের দুজনের প্রত্যেকে চুক্তি অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে পণ্যের মালিক বানিয়ে দেবে। তাহলে তাতে ইখতিয়ার আছে বলে প্রমাণ করার কোন অর্থ থাকতে পারে না তার প্রতি সম্মতি থাকা সত্ত্বেও এবং সম্মতি থাকা তো ইখতিয়ার থাকার পরিপন্থী। লক্ষ্যণীয়, যারা বলেছেন, মজলিসে ইখতিয়ার আছে, যখন সে তার প্রতিপক্ষকে বলে তুমি গ্রহণ কর, তারপর সে তা গ্রহণ করল এবং তাতে সম্মত হল, এই ব্যাপারটিই তো তাদের ইখতিয়ার থাকার বিপরীত, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। অথচ তাতে বিক্রয় কার্যকর রাখার ব্যাপারে তাদের দুইজনের সম্মতির অধিক তো কিছুই নেই। তারা দুইজন মিলে যে চুক্তিটা করল সেই মূল কাজেই তো তাদের সম্মতি রয়েছে, এটা প্রমাণিত। তাই দ্বিতীয়বার সম্মতির কোন প্রয়োজন পড়ে না। কেননা শুরুতে তাদের চুক্তি করার সম্মতি থাকার পর অপর এক সম্মতির শর্ত করা জায়েয হলে তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সম্মতি হওয়ার শর্ত করা জায়েয হতো। আর তৃতীয় ও চতুর্থ বারের ইখতিয়ার চালু করতে তাদের সম্মতি প্রতিবন্ধক হয় না।

তাই এ সব যখন বাতিল হয়ে গেল তখন বিক্রয়ে দুজনের সম্মত হওয়াই সহীহ্ প্রমাণিত হল। আর তা-ই ইখতিয়ারকে বাতিল করে এবং বিক্রয়কে সম্পূর্ণতা দেয়। বিক্রয়ে শর্ত করার ইখতিয়ার সহীহ্ এজন্যে যে, ইখতিয়ারের শর্ত করায় তার মালিকানা থেকে তার জিনিস বের করার সম্মতি পাওয়া যায়নি। কেননা সে নিজের জন্য ইখতিয়ারের শর্ত করেছে। আর সেই কারণেই তাতে ইখতিয়ার প্রমাণ করা জায়েয হয়েছে।

যদি বলা হয়, তাহলে তুমি তো দেখার ইখতিয়ার ও পণ্যের ত্রুটি পেলে ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার প্রমাণ করছ মূল বিক্রয়ে সম্মতি থাকা সত্ত্বেও। এ দিক দিয়ে তাদের সম্মতি

ইখতিয়ার প্রমাণিত হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়নি। তেমনি মজলিসের ইখতিয়ারেরও প্রতিবন্ধক হবে না তাদের দুজনের সম্মতি।

জবাবে বলা যাবে, দেখার ইখতিয়ার ও ত্রুটি পেলে পণ্য ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার মজলিসের ইখতিয়ার নয় কোন দিক দিয়ে। কেননা দেখার ইখতিয়ার দুজনের প্রত্যেকের জন্যে মালিকানা হওয়া নিষিদ্ধ করে না যে বিষয়ে প্রতিপক্ষের সাথে তার চুক্তি হয়েছে তাদের প্রত্যেকের তাতে সম্মতি থাকার কারণে। তাই মালিকানা অস্বীকৃতিতে এ ইখতিয়ারের কোন প্রভাব নেই। বরং ইখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও মালিকানা রয়েছে এজন্যে যে, তাদের প্রত্যেকের তাতে সম্মতি রয়েছে। অথচ মজলিসের ইখতিয়ার থাকার পক্ষপাতীদের কথা অনুযায়ী— তাদের প্রত্যেকের জন্যে মালিকানা হওয়ার প্রতিবন্ধক, যাতে সে তার প্রতিপক্ষকে মালিক বানিয়েছে তাকে মালিক বানাতে তাদের প্রত্যেকের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও। শুরুতেই আক্দ করার সময় সম্মতি এবং বলেছিল আমি রাযি, তুমি গ্রহণ কর— তার প্রতিপক্ষও রাযি হয়ে গেল— এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা যায় না। তাই দেখার ইখতিয়ার ও ত্রুটির সময় ফেরতের ইখতিয়ার থাকা এবং এ দুটি ইখতিয়ারের কোন একটিও না-থাকার মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই তাতে মালিকত্ব হওয়ার ব্যাপারে। তার পরে দুটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ইখতিয়ারের দিক দিয়ে এবং তা মালিকত্বের প্রতিবন্ধক হয় না। তা হয় শুধু পণ্যের অবস্থা না জানার কারণে, অথবা তার কোন অংশ হারিয়ে যাওয়ার কারণে যা এই আক্দ হওয়ার কারণ।

এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আক্দ করতে সম্মত হওয়াই মালিকানার মূল কারণ— তাদের দুজনের প্রত্যেকেরই মালিকানা হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর এবং তদ্দরুন ইখতিয়ার বাতিল হওয়ার পর। আমরা জানলাম যে, বিচ্ছিন্ন হওয়াটায় সম্মতির কোন প্রমাণ নেই। সম্মতি না থাকারও কোন প্রমাণ নেই। কেননা মজলিসে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও স্থিত থাকা সমান, তার কোনটাই সম্মতি না থাকা প্রমাণ করে না। তাই এ-ও জানলাম যে, মালিকানা সংঘটিত হয়েছে শুরুতেই আক্দ করতে সম্মত হওয়ার। বিচ্ছিন্নতার দ্বারা নয়। কেননা মূলগতভাবে বিচ্ছিন্নতার সাথে মালিক বানানো সম্পর্কিত নয়, আক্দ সহীহ্ করাও নয়। বরং মৌলনীতিতে এ কথা রয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতার প্রভাব রয়েছে বহু সংখ্যক চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার উপর। যেমন হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রয়ের চুক্তি করা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, সিল্‌ম বিক্রয়ে মূলধন হস্তগত করার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হওয়া। ঋণ দ্বারা ঋণ করা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তার কোন একটি নির্ধারণ করার পূর্বে। বিচ্ছিন্নতা যখন মৌলিকভাবে বহু সংখ্যক চুক্তিতে প্রভাবশালী দেখতে পাচ্ছি, তখন তার প্রভাব চুক্তি বাতিল করাতেও রয়েছে তাকে জায়েয প্রমাণ না করে। মৌলিকভাবে চুক্তি সহীহ্করণে বিচ্ছিন্নতাকে প্রভাবশালী পাবে না। তা জায়েয করণেও নয়। প্রমাণিত হল যে, মজলিসে ইখতিয়ার গণ্য করা এবং চুক্তি সহীহ্করণে বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপার মৌলনীতি বহির্ভূত। তা ছাড়া তাতে কুরআনের বিরুদ্ধতাও রয়েছে। সুন্নাহ থেকে ও মুসলিম উম্মাহ্ ঐকমত্য থেকে প্রমাণিত যে, একটি চুক্তির সহীহ্ হওয়ার শর্ত হচ্ছে চুক্তির মজলিস থেকে দুই পক্ষের বিচ্ছিন্ন হওয়া সহীহ্ হস্তগতকরণে না করেই। তাই কারবারের চুক্তিতে যদি মজলিসের ইচ্ছা-স্বাধীনতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় পারস্পরিক হস্তগতকরণ ও চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও, তাহলে অবশিষ্ট ইখতিয়ার সম্পূর্ণ হবে না। তাই যখন তারা

দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাহলে এই বিচ্ছিন্নতার দ্বারা বিচ্ছিন্নতার বাতিল হওয়া সহীহ্ হবে না তার সহীহ্ হওয়ার পূর্বে। তাই তারা দুজন যখন মুসলিম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল— অথচ চুক্তি এখনও সহীহ্ হয়নি— তাহলে এ বিচ্ছিন্নতার দ্বারা তা সহীহ্ হওয়া জায়েয হবে না। তাই তার সহীহ্ হওয়ার যা কারণ তা-ই তার বাতিল হওয়ারও কারণ হবে। মজলিসের ইখতিয়ার না-থাকার প্রমাণ হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর কথা। তিনি বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةِ نَفْسِهِ -

কোন মুসলিম ব্যক্তির মাল হালাল হবে না। হালাল হবে শুধু তার নিজ মনের খুশীতে দিলে।

এতে মুসলিম ব্যক্তি নিজ মনের খুশীতে কোন কিছু দিলে তাহা অপর মুসলমানের জন্যে জায়েয হবে— অন্যথায় জায়েয হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেই মনের খুশী তো পাওয়া গেছে তার বিক্রয়ের চুক্তিকরণের মাধ্যমে। তাই হাদীসের দাবি অনুযায়ী তা গ্রহণ করা হালাল হবে। হাদীসটি যেমন একথা প্রমাণ করছে তেমনি কুরআনের আয়াত-ও তা প্রমাণ করছে। তা হল ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ -

তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় হয় (তাহলে বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া হবে না)।

তার আর একটি প্রমাণ হল, নবী করীম (স) খাদ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তাতে দুটি সা' (صاع) প্রচলিত না হবে। একটি صاع বিক্রেতার ও অপরটি ক্রেতার। নবী করীম (স) এ হাদীসের মাধ্যমে খাদ্য বিক্রয় মুবাহ্ ঘোষণা করেছেন, যদি তাতে দুটি صاع প্রচলিত হয়। তাতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। তাই এর ভিত্তিতে তার বিক্রয় জায়েয হওয়া অনিবার্য হল, যদি তার পরিমাপ বিক্রেতা সেই মজলিসেই করে যেখানে দুজনে বসে বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। নবী করীম (স) আর-ও বলেছেন ঃ

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ -

যে ব্যক্তি কোন খাদ্য ক্রয় করল, তার এই ক্রয় সম্পন্ন হবে না তা হস্তগত না করা পর্যন্ত।

হস্তগত করার পর তার বিক্রয় জায়েয হল বলে ঘোষণা করেছেন। এতে দুই পক্ষের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন শর্তের উল্লেখ নেই। তাই হাদীসের এ ফয়সালার কারণেই চুক্তি গ্রহণের মজলিসে তা হস্তগত হলেই তার বিক্রয়টা জায়েয হবে। আর তা বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকাকে অস্বীকার করে। কেননা যে কাজে বিক্রেতার ইখতিয়ার নেই, তাতে ক্রেতার হস্তক্ষেপ জায়েয হবে না।

এ কথা নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا وَلَهُ ثَمَرَةٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

যে ব্যক্তি কোন গোলাম বিক্রয় করল, সে গোলামের মাল থাকলে তা বিক্রেতার হবে। তবে ক্রেতা তার শর্ত করে থাকলে ভিন্ন কথা। তেমনি যে ব্যক্তি খেজুর বাগান (বা গাছ) বিক্রয় করল, তাতে ফল রয়েছে, তাহলে এই ফল-ও বিক্রেতারই হবে। অবশ্য ক্রেতা তার শর্ত করে থাকলে ভিন্ন কথা।

এ হাদীসে ফল ও গোলামের মাল ক্রেতা পাবে বলা হয়েছে যদি ক্রেতা তা পাওয়ার শর্ত করে থাকে। এতেও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটি অনুল্লেখিতই রয়েছে। মূল— যার উপর চুক্তি হয়েছে, তার মালিকানা না হলে ক্রয়কারী তার মালিক কোনক্রমেই হতে পারে না। তাই কেবল চুক্তির কারণেই ক্রয়কারী মালিকানা প্রমাণিত হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসও তা-ই প্রমাণ করে। হাদীসটি হল, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لَنْ يَجْزِىَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ -

সন্তান পিতার কোন কাজেই আসে না। অবশ্য সন্তান যদি পিতাকে অপর কারোর মালিকানাধীন পায়, তাহলে সে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে পারে।

ফিকাহ্‌বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ক্রয় করার পর নতুন করে ও ঘটা করে পিতাকে মুক্ত করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। যখনই সন্তানের মালিকানা সহীহ্ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে স্বতঃই মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে। এ হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স) পিতার মুক্তিকে ক্রয়ের পর-ই অনিবার্য করে দিয়েছেন বিচ্ছিন্নতার কোন শর্ত ছাড়া-ই।

একটু বিবেচনা করলেই প্রমাণিত হবে, মজলিস তো দীর্ঘও হয়, হয় সংক্ষিপ্তও। তাই মজলিসের ইখতিয়ারের ভিত্তিতে মালিকানা হওয়ার কথা বললে তা বাতিল হওয়াই অনিবার্য করে দেবে। কেননা যে মজলিসের ইখতিয়ারের সাথে তাকে ও মালিকানা হওয়াকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার মেয়াদ তো অজানা-ই রয়ে গেছে। যেমন যদি তা সে চূড়ান্তভাবে বিক্রয় করে দেয় এবং দুজনেরই ইখতিয়ার থাকার শর্ত করা হয় মজলিসে অমুকের বসা থাকা পর্যন্ত, তাহলে বিক্রয়টা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যে মজলিসের ইখতিয়ারের সাথে চুক্তি সহীহ্ হওয়াকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার মেয়াদ তো জানা নেই।

মজলিসে ইখতিয়ার থাকার পক্ষপাতী লোকেরা দলীল হিসেবে আর একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি ইবনে উমর, আবূ বুরজাহ ও হুকাইম ইবনে হাজাম (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স) থেকে; তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا -

ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়।

নাফে' ইবনে উমর (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اذْ اتَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَائِعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا اَوْ يَكُوْنُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَاِذَا كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ -

দুই ক্রেতা-বিক্রেতা যখন কোন বিক্রয়ে একত্রিত হয়, তখন তাদের দুজনার প্রত্যেকেরই ইখতিয়ার থাকে তার বিক্রেতার নিকট থেকে— যতক্ষণ তারা দুজন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, অথবা তাদের বিক্রয়টাই ইখতিয়ার ভিত্তিক। যদি ইখতিয়ার ভিত্তিক হয়, তাহলে তা অনিবার্য হবে।

যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিস কারোর নিকট বিক্রয় করতে সে তাকে ইখতিয়ার দিত না এবং তা কম না করার-ই ইচ্ছা করত— এ কথা জানতে পারলে উবনে উমর (রা) উঠে দাঁড়াতেন, কিছুক্ষণ চলতেন, আবার ফিরে আসতেন।

এ কথার পক্ষপাতি লোকেরা এ কথার দ্বারা দলীল পেশ করতেন যে, বিক্রেতা ক্রেতা দুজনেরই ইখতিয়ার আছে, যতক্ষণ তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। ইবনে উমরই এ হাদীসটির বর্ণনাকারী। তিনি রাসূলের কথার মর্ম বুঝেছেন দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে উমর (রা)-এর যে কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা একথা প্রমাণ করে না যে, তা-ই বুঝি তার মাযহাব— অর মত। কেননা তিনি হয়ত বিক্রেতার সম্পর্কে ভয় পোষণ করতেন যে, সে হয়ত মজলিসের ইখতিয়ার থাকার পক্ষপাতী হবে। তাই সে কাজটি করে সে বিষয়ে সতর্কতার ব্যবস্থা করতেন তার সাথে দোষত্রুটি থেকে সম্পর্কহীনতা দেখাবার জন্যে। এ ব্যাপারে হযরত উসমানের নিকট একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। তিনি সে মামলায় তার মতের বিপরীত রায় দেন, তিনি সম্পর্কহীনতা জায়েয করেন নি। তবে ক্রেতাকে যদি সে বলে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা হবে।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে সেই বর্ণনা যা তাঁর মতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। সেই বর্ণনাটি ইবনে শিহাব হামজা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

مَا اَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ حَيًّا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ -

আমি যে চুক্তি-ই জীবন্ত পেয়েছি, তাই ক্রেতার মাল।

এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি মনে করতেন, পণ্যটা ক্রেতার মালিকানায় চুক্তির বলেই চলে যেত এবং ক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যেত। আর তাতে ইখতিয়ার নিঃশেষ হয়ে যেত।

নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'বিক্রেতা-ক্রেতা দুজনের ইখতিয়ার থাকে তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত। কোন কোন বর্ণনার ভাষা এইরূপ ঃ

اَلْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا -

ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত।

এর নিগূঢ় তাৎপর্য দাবি করে পারস্পরিক বিক্রয়ের অবস্থা। আর তা হচ্ছে বাজির অবস্থা। তাই তারা দুজন বিক্রয়কে চূড়ান্ত করে এবং পরস্পর সম্মত থাকে, তাহলে বিক্রয়টা হয়েছে বলতে হবে। তাহলে তারা দুজন প্রকৃতপক্ষে ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। যেমন দুইজন অনুমানকারী এই নাম লাভ করে অনুমান করার অবস্থায়। কিন্তু কাজটা শেষ হয়ে গেলে সাধারণভাবে এ নামে তারা দুইজন অভিহিত হয় না। ..... এইজন্যে দুই অনুমানকারীর কথা বলা হল, শব্দের যথার্থ অর্থ— যেমন বলেছি— যদি হতো, তাহলে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে দলীল পেশ করা সহীহ্ হবে না।

যদি বলা হয়, এরূপ ব্যাখ্যা হাদীসের সুবিধাটুকুই প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। কেননা চুক্তিতে সম্মতি প্রাপ্তির পূর্বে দুই বাজিধারীর কারোর চুক্তি সংঘটনে ইখতিয়ার থাকা ও তা পরিত্যক্ত হওয়া স্পষ্ট হয় না।

জবাবে বলা যাবে, বরং তাতে বড় ফায়দা রয়েছে। এরূপ অবস্থায় কেউ ধারণা করতে পারে যে, বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে যে, আমি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, তার পক্ষে ক্রেতার কবুলের পূর্বে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। যেমন মালের বদলে দাস মুক্তি দান। মালের বদলে খুলা' তালাক দেয়া। এখানে মনিবও স্বামীর পক্ষে দাস ও স্ত্রীর পক্ষে তা গৃহীত হওয়ার পূর্বে মত ফেরানো সম্ভব হয় না। এ দিয়ে নবী করীম (স) স্পষ্ট করে তুললেন যে, বিক্রয়ের হুকুম হচ্ছে অপর জনের কবুল করার পূর্বে দুজনের প্রত্যেকেরই অধিকার থাকে মত ফেরানোর এবং তা দাসমুক্তি ও স্ত্রীকে খুলা তালাক দেয়ার মধ্যে পার্থক্যকারী।

যদি বলা হয়, দুজনের মধ্যে চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দুজন প্রস্তাবককে দুই ক্রেতা বিক্রেতা বলা যায় কি করে?

জবাবে বলা যাবে, তা সঙ্গত বিক্রয়ের সংকল্প করলেই তাতে বিক্রয়ের প্রস্তাবনা প্রকাশ করলেই। যেমন হত্যার সংকল্পকারী দুই ব্যক্তিকে আমরা দুই যুদ্ধকারী— একে অপরকে হত্যাকারী বলি, যদিও তখন পর্যন্ত তাদের কারোর দ্বারা হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি। যেমন ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র— যাকে যবেহ্ করার হুকুম হয়েছিল— যবীহ্ (যবেহ্কৃত) বলা হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত তাকে যবেহ্ করা হয়নি। তবু তা বলা হয় এজন্যে যে, তাকে যবেহ্ করার সংকল্প করে যবেহ্র প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

তারা— এক তালাক দেয়া স্ত্রীরা— যখন তাদের শেষ মেয়াদে পৌঁছবে, তখন হয় তাদেরকে ভালো ভাবে রেখে দাও, নতুবা ভালোভাবে বিচ্ছিন্ন করে দাও।

(সূরা তালাক ঃ ২)

এর অর্থ, মেয়াদ কাছাকাছি পৌঁছা। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, পরে তারা তাদের মেয়াদ প্রান্তে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩২)

এখানে প্রকৃতই মেয়াদ শেষে পৌঁছা বোঝানো হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, দুই প্রস্তাবকারীকে দুই ক্রেতা-বিক্রেতা বলা খুবই সঙ্গত, যখন তারা চুক্তি বর্ণিত ভাবে ঘটাবার সংকল্প করে। আর বিক্রয় কাজ যা সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাদের দুজনকে বাস্তবতার দৃষ্টিতে ক্রেতা-বিক্রেতা বলা হবে না। সমস্ত ব্যাপারেই তেমনটা হয়ে থাকে। কাজটা শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে সেই নামে অভিহিত করা হয় না, সেই কাজের দরুন তাদেরকে যে নাম দেয়া হয়েছিল। তবে প্রশংসাসূচক বা নিন্দাসূচক নামের কথা আলাদা, যেমন পূর্বে এই গ্রন্থের শুরুতে বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিতেই বলা হয় তারা দুজন ক্রেতা-বিক্রেতা, তারা দুজন ক্রয়-বিক্রয় বাতিলকারী এবং তারা দুজন চুক্তিকারী।

এই নাম যে সে দুজনের জন্যে প্রকৃতই কোন নাম নয়— চুক্তিটা হয়ে যাওয়ার পর এ নাম আর থাকে না, তার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাদের দুজনারই বিক্রয় চুক্তি হয়ে যাওয়া পণ্য তা নষ্ট ও ভঙ্গ করে দেয়ার অধিকার আছে এবং তা সহীহ্। আর তারা যখনই তা করবে তখন তারা ক্রেতা-বিক্রেতা নয়, বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গকারী। কিন্তু একই সময় তারা দুজন ক্রেতা-বিক্রেতা হবে ও সেই সাথে তা ভঙ্গকারী ও বিনষ্টকারীও হবে তা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সে দুজনার জন্যে ক্রেতা-বিক্রেতা নাম ব্যবহার প্রথম প্রস্তাবনা ও আসল চুক্তি সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তেই হয়। আর চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর তাদের জন্যে এ নাম এ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, তারা তাই ছিল, যদিও এই মুহূর্তে তারা সে কাজে লিপ্ত নয়। এখনকার এই নাম ব্যবহার তাই প্রকৃত নয়, বরং পরোক্ষ ব্যবহার। ব্যাপার যখন এই, তখন তার বিবেচনা আসল অবস্থার দৃষ্টিতেই হবে। আর তা হচ্ছে বিক্রয় কাজে দুজনারই লিপ্ত থাকা। বিক্রেতা বলবে যে, আমি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। তাতে সে অপর পক্ষের কবুল করার আগেই নিজের পক্ষ থেকে বিক্রয় শব্দটি ব্যবহার করেছে। আর এ-ই হচ্ছে সেই অবস্থা, যখন তাদেরকে مُتَبَائِعَانِ দুই 'ক্রেতা-বিক্রেতা' বলা হয়। আর ঠিক তখনই তাদের জন্য ইখতিয়ার থাকে— তাদের প্রত্যেক জনের জন্যে। বিক্রেতার ইখতিয়ার হল, সে বিক্রয় করবে না, বিক্রয়ের কথা ভেঙ্গে দেবে অপর জনের কবুল করার আগেই। আর ক্রেতার জন্যে ইখতিয়ার আছে কবুল করা না-করার— বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে المتبائعان। 'ক্রেতা-বিক্রেতা' কথাটি যে এই অবস্থাকেই বোঝায়, তা তোমার নিকট অবশ্যই প্রমাণিত হবে এই প্রেক্ষিতে। দুজনের একজন বিক্রেতা, সে-ই পণ্যের মালিক সে বিক্রেতা হয় যখন সে অপর জনকে বলে ঃ আমি বিক্রয় করেছি। এভাবে দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা রাখা বা ভাঙ্গার ইখতিয়ার রয়েছে কেননা একথা জানা-ই আছে যে, ক্রেতা বিক্রেতা নয়। বোঝা গেল, ক্রেতার কবুল করার আগেই সে বিক্রেতা হয়ে আছে।

নবী করীম (স)-এর কথা ঃ اَلْمُتَبَا يِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا । এর ব্যাখ্যা পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ কথার অর্থ ঃ বিক্রেতা যখন বলবে আমি তোমার নিকট বিক্রয় করেছি, তখন ক্রেতার 'আমি গ্রহণ করেছি' বলার পূর্বেই বিক্রেতা ফিরে যেতে পারে তার উক্ত কথা থেকে। আর ইমাম আবূ হানীফারও এই মত। আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত, ওরা দুজনই প্রস্তাবকারী মাত্র। একজন যখন বলল ঃ আমি তোমার নিকট দশ টাকায় বিক্রয় করলাম তখন ক্রেতা তা কবুল করতে ও না-করতে— উভয়ই পারে সেই একই মজলিসে থাকা কালে আর বিক্রেতারও তার নিজ কথা থেকে ফিরে যাওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে ক্রেতার তা কবুল করার পূর্বেই। আর বিক্রয় কবুল হওয়ার আগেই দুজনার যে-কোন একজন দাঁড়িয়ে গেলে তাদের জন্যে ইখতিয়ার ছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। তা প্রয়োগের কোন অধিকার একজনেরও থাকবে না। ইমাম মুহাম্মাদ কথার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার তাৎপর্য বলেছেন। আর তা যথার্থও। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ -

কিতাব প্রাপ্ত লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে অকাট্য প্রমাণ তাদের নিকট পৌঁছার পরে।
(সূরা বাইয়্যেনাত ঃ ৪)

বলা হয়, জনতা অমুক বিষয়ে পরামর্শ করেছে। পরে তারা অমুক কথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এর অর্থ কোন মতে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাতে সম্মত হওয়ার পরে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া— ভিন্ন ভিন্ন মতের হয়ে যাওয়া, যদিও তারা সেই মজলিসেই একত্রিত ছিল।

কথায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটি একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল বস্‌রী আবূ দাউদ, কুতায়বা, লায়স, মুহাম্মাদ ইবনে আজলাম, আমর ইবনে শুয়ায়ব, তাঁর পিতা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَسْتَقِيْلَهُ -

ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার আছে যতক্ষণ তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তবে কারবারটাই যদি ইখতিয়ারের হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তার জন্যে তার সঙ্গী থেকে সে তা কবুল করতে পারে— এ ভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হালাল নয়।

ক্রেতা-বিক্রেতা ইখতিয়ার সম্পন্ন যতক্ষণ তারা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়— এতে কথার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়া বোঝায়। লক্ষণীয়, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তার সঙ্গী তা কবুল করতে পারে এই ভয়ে তাকে ছেড়ে যাওয়া তার জন্যে হালাল নয়'— এ হচ্ছে দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কথার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং কথার দ্বারা চুক্তি সংঘটন সহীহ্ হওয়ার পর। আর সেই চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া। সে তো ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপার।

এ ব্যাপারটি দুটি দিক দিয়ে প্রমাণ করে যে, চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর আর ইখতিয়ার থাকে না। তার একটি হল, তার মজলিসের ইখতিয়ার থাকলে তা ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে বলার কোন প্রয়োজন হতো না। বরং সে স্বীয় ইখতিয়ার বলেই— যার এর মধ্যে তার আছে— ভেঙ্গে দিতে পারত। আর দ্বিতীয় হল, الاقالة —চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া সহীহ্ হওয়ার পর-ই এবং দুজনের প্রত্যেকেরই মালিকানা লাভ হওয়ার পর-ই তা বলা যেতে পারে। এ থেকেও ইখতিয়ার না থাকা-ই প্রমাণিত হয় এবং বিক্রয়টা সহীহ্ হওয়া প্রমাণিত-প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাসূলের কথা 'তার জন্য সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হালাল নয়' প্রমাণ করে যে, তারা দুজন মজলিসে আসীন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ চুক্তি ভঙ্গ করার দাবি করলে তা ভেঙ্গে দেয়াই পছন্দনীয় এবং তার দাবির জবাবে এগিয়ে না আসা-ই মকরূহ— অপছন্দনীয়। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর এই হুকুম উল্টে যাবে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর চুক্তি ভঙ্গের দাবির জবাব না দেয়া তার জন্যে মকরূহ— অপছন্দনীয় হবে না। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে সে দাবি প্রত্যাখ্যান করা মকরূহ হবে।

তার আর একটি প্রমাণ হল আবদুল বাকী ইবনে কানে' বর্ণিত হাদীস, যা তিনি আলী ইবনে আহমাদুল আজদী, ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জারারাতা, হুশায়ম, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْبَيِّعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا اِلَّا اَنْ يَّفْتَرِقَا اِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ -

দুটি বিক্রয় এমন যে, তাদের মধ্যে কোন বিক্রয় নেই। আছে শুধু এই যে, তারা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের বিক্রয় আলাদা।

আবদুল বাকী মুয়ায ইবনুল মুসান্না, আল-কানবী, আবদুল আযীয ইবনে মুসলিমুল কাসলামী, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার, ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَفْتَرِقَا -

প্রত্যেক দুটি বিক্রয়ে কোন বিক্রয় নেই সে দুটির মধ্যে, শেষ পর্যন্ত তারা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক দুটি বিক্রয় সে দুটিতে কোন বিক্রয় হয় না, হয় বিচ্ছিন্নতার পর। এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি প্রস্তাবনার অবস্থায় দুই বিক্রয়ের মধ্যে কোন বিক্রয় হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তা এ জন্যে যে, সে দুটিতে যদি তারা বিক্রয়-ক্রয় করত, তাহলে নবী করীম (স) তাদের এ বিক্রয়-ক্রয়কে অস্বীকার করতেন না চুক্তি সহীহ্ ও তাদের দুজনার মধ্যে তা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও। কেননা নবী করীম (স) অস্বীকার করতেন না যা সংঘটিত ও প্রমাণিত হতো। তাই আমরা জানতে পারলাম যে, দুই প্রস্তাবনাকারী বলতে সে দুজনকে বুঝিয়েছেন, যারা ক্রয়-বিক্রয়ের সংকল্প গ্রহণ করেছে এবং বিক্রেতা ক্রেতার জন্যে বিক্রয়কে অনিবার্য করেছে এবং ক্রেতা তা ক্রয়ের সংকল্প গ্রহণ করেছে। সে বিক্রেতাকে বলেছে ঃ আমার নিকট বিক্রয় কর। তা সত্ত্বেও তাদের দুজনার মধ্যে

কোন বিক্রয় হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কথা ও কবুলের মাধ্যমে। কেননা তার কথা ঃ 'আমার নিকট বিক্রয় কর' কথাটি চুক্তি কবুল ছিল না, তা বিক্রয় সংক্রান্ত কোন শব্দও ছিল না। তা ছিল একট আদেশ মাত্র। পরে যখন বলল ঃ আমি কবুল করেছি। তখনই বিক্রয় সংঘটিত হল। আর এই হচ্ছে সেই বিচ্ছিন্নতা, যা নবী করীম (স) বোঝাতে চেয়েছেন পূর্বে উল্লেখ করা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে।

যদি বলা হয়, প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে বিক্রয় ঘটানোর অবস্থায় বিক্রয়কে অস্বীকার করাই যে নবী করীম (স)-এর লক্ষ্য, তা আমি অস্বীকার করিনি। বরং তিনি শুধু অস্বীকার করেছেন তাদের দুজনের মালের বিক্রয় তাদের দুজনের মাঝে হওয়াকে মজলিসের ইখতিয়ার অবস্থায়।

এর জবাবে বলা যাবে, এটা ভুল কথা এদিক দিয়ে যে, ইখতিয়ার প্রমাণ করালে তা থেকে বিক্রয় নামটি অস্বীকার করা অনিবার্য হয় না। দেখা-ই যায়, বিচ্ছিন্নতার পর তারা দুজন যে ইখতিয়ারের শর্ত করেছে, তাতেও নবী করীম (স) তাদের মধ্যে বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। আর তাতে ইখতিয়ার প্রমাণ করা তা থেকে বিক্রয় নামটি অস্বীকার করার কারণ ছিল না। কেননা তিনি বলেছেন ঃ প্রতি দুটি বিক্রয়ে পক্ষদ্বয়ের মাঝে কোন বিক্রয় হয় না তাদের দুজনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, তবে ইখতিয়ারের বিক্রয় ভিন্নতর। এতে ইখতিয়ারের বিক্রয়কে বিক্রয়ই বলেছেন। এমতাবস্থায় 'প্রতি দুইটি বিক্রয়ে তাদের মধ্যে বিক্রয় নেই যতক্ষণ না তারা দুজন বিচ্ছিন্ন হচ্ছে' কথাটি দ্বারা তিনি যদি প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণকালীন অবস্থা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাদের দুজনার মাঝে বিক্রয় সংঘটিত হওয়াকে কখনই অস্বীকার করতেন না মজলিস কেন্দ্রিয় ইখতিয়ারের কারণে। যেমন তিনি ইখতিয়ার শর্ত ভুক্ত হওয়া কালেও তা অস্বীকার করেন নি। বরং তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাকে 'বিক্রয়' বানিয়েছেন। একথা প্রমাণ করে যে, 'প্রতি দুটি বিক্রয়ে দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত কোন বিক্রয় হয় না' একথাটির দ্বারা বিক্রয়ের প্রস্তাবনাকারীদ্বয়কে বুঝিয়েছেন। এর ফায়দা এই পাওয়া গেছে যে, 'তুমি আমার নিকট থেকে ক্রয় কর' এ কথা কিংবা ক্রেতার 'আমার নিকট বিক্রয় কর' কথা-ই বিক্রয় নয়, যতক্ষণ না তারা দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বিক্রেতা এই বলে যে, আমি বিক্রয় করেছি এবং ক্রেতা বলবে ঃ আমি কিনে ফেলেছি। তা হলে তাদের দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়াটা বিক্রয় কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবং তাতে শর্তাধীন কোন ইখতিয়ার না-থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য তা বিক্রয় হবে প্রস্তাবনা ও কবুলের পর কথা-বার্তায় দুজন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে না গেলেও। রাসূলের কথা 'ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকে' কথাটি অধিকভাবে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়, যেমন পূর্বে আমরা বলেছি। আর কুরআনের বাহ্যিক স্পষ্ট কথার বিরুদ্ধে সম্ভাব্যতা তুলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা কখনই জায়েয হতে পারে না। বরং হাদীসের তাৎপর্য কুরআনের আনুকূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, তার বিপরীত অর্থে প্রয়োগ সঙ্গত হতে পারে না।

একটু চিন্তা-বিবেচনা করলেই যেমন বলেছি প্রমাণিত হবে যে, সকলের ঐকমত্য হচ্ছে এ কথায় যে, বিবাহ, খুলা তালাক ও দাসমুক্তি— যা মালের বিনিময়ে হয় এবং ইচ্ছামূলক হত্যার

সন্ধি-সমঝোতা দুই পক্ষের চুক্তিতে যখন সাব্যস্ত হয় তখন প্রস্তাবনা ও তা কবুলের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয় এবং তাতে এমন ইখতিয়ার থাকে না দুজনের এক জনের পক্ষেও। অর্থাৎ এতে যে প্রস্তাবনাও হয়, যার দ্বারা চুক্তি সহীহ্ হয়, তা শর্তাধীন ইখতিয়ার ছাড়া-ই হয়।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ -

এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।

এ পর্যায়ে আতা ও সুদ্দী বলেছেন; পরস্পরকে হত্যা করো না।

আবূ বকর বলেছেন, এ ধরনেরই আর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

وَلَا تُقَتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ -

তোমরা তাদেরকে মসজিদে হারাম-এর নিকট হত্যা করো না, যতক্ষণে তারা তোমাদেরকে সেখানে হত্যা না করবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৯১)

এর-ও অর্থ, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না। আরবরা বলে ঃ 'কাবার রব্ব-এর কসম, আমরা হত্যা করেছি।' একথা তারা বলে যখন তাদের কেউ হত্যার কাজ করে। বলা হয়েছে, এ কথার সৌন্দর্য এখানে যে, মুসলমানরা যেহেতু একই দ্বীনের অনুসারী, এজন্যে তারা একই অভিন্ন ব্যক্তি সত্তার মত। এই দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।' আর একথার লক্ষ্য হল এই বলা যে, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ اِذَا اَلِمَ بَعْضُهُ تَدَاعَىْ سَائِرُهُ بِالْحُمّٰى وَالسَّهَرِ -

মুমিন লোকরা একটি অভিন্ন ব্যক্তিসত্তার মতই। তার কোন অংশ বেদনা যন্ত্রণায় আক্রান্ত হলে তার সমগ্র দেহই জ্বরাক্রান্ত ও অনিদ্রায় জর্জরিত হয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -

মুমিনরা একটি প্রাচীরের মত। তার একাংশ অপর অংশকে শক্ত ও দৃঢ় করে।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র কথাটির তাৎপর্য হল বাতিল উপায়ে তোমাদের ধন-মাল খেয়ে পরস্পরকে হত্যা করবে না। অন্যান্য হারাম করা জিনিসও খাবে না। কথাটি এ রকমেরই, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

তোমরা যখন ঘরসমূহে প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের প্রতি সালাম করবে।

(সূরা নূর ঃ ৬১)

কথাটির অর্থ এ-ও হতে পারে যে, তোমরা মাল চাইতে গিয়ে বা তা লাভ করতে গিয়ে নিজেদেরকে হত্যা করবে না। তা এ ভাবেও হতে পারে যে, নিজেকে ধোঁকায় ফেলে দিল, যার পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ল। এ-ও হতে পারে যে, তোমরা ক্রোধের অবস্থায় নিজেদেরকে হত্যা করো না বা বিশ্রামহীনতার কারণে নিজেদেরকে মেরে ফেলো না। আর আসলে এই সব অর্থই এ আয়াতের বক্তব্য হতে পারে। কেননা ব্যবহৃত শব্দে সেই সম্ভাবনা পুরোপুরি বিদ্যমান। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا -

আর যে লোক সীমালংঘন করে ও জুলুমমূলকভাবে কাজ করবে, তাকে আমরা অবশ্য জাহান্নামে পৌঁছে দেব।

এ আয়াতে সীমালংঘনকারী সম্পর্কে এই কঠোর কথা বলা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি সে বাতিলপন্থায় মাল খাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাণী হত্যা করেছে বিনা কারণে। তার ফলেই এইরূপ কঠোর হুকমকি (وعيد) তাদের জন্যে নাযিল হয়েছে— এই দুটি খাসলাতের কারণেই। আতা বলেছেন, এই কথাটি বিশেষভাবে আত্মহত্যার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ হারাম; কেউ কেউ বলেছেন, সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত নিষিদ্ধ কাজের উল্লেখ হয়েছে সেই সব কাজকে সামনে রেখেই এই কথাটি বলা হয়েছে। কারুর কারুর মতে কথাটি এ কথার প্রসঙ্গে ঃ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জোরপূর্বক মেয়েলোকদের উত্তরাধিকারী হবে— তা তোমাদের জন্যে হালাল নয়।

কেননা এ কথার পূর্ববর্তী কথা এইরূপ কঠোর হুমকির কাছাকাছি। কিন্তু প্রকাশ্য দিক হচ্ছে তা বাতিল পন্থায় মাল ভক্ষণ ও হারাম আত্মহত্যার দিকে ফিরে যায়। উক্ত কঠোর হুমকির বাণীর সাথে দুটি গুণবাচক শব্দের উল্লেখ হয়েছে— একটি সীমালংন আর দ্বিতীয়টি জুলুম। ফলে ভুলবশত করা ও বিভ্রান্তিতে পড়ে করা কাজ এবং শরীয়তের বিধানে ইজতিহাদ করতে গিয়ে ইচ্ছামূলক ও নাফরমানী স্বরূপ যা করা হয়, তা এর বাইরে পড়েছে। জুলুম ও সীমালংঘন দুটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অর্থের দিক দিয়ে দুটি খুবই কাছাকাছি, তার কারণ একই কথা বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ পেলে তা খুবই উত্তম ও সুন্দর হয়।

কামনা-লালসা নিষিদ্ধ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর যে যে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দান করেছেন, তোমরা তার কামনা ও লালসা করো না (তা পাওয়ার জন্যে তোমরা লালায়িত হবে না)।

সুফিয়ান ইবনে আবূ নুজাইহ্ মুজাহিদ, উম্মে সালমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—

আমি বললাম ঃ 'হে রাসূল! পুরুষরা লড়াই করে, মেয়েরা লড়াই করে না। আর সে জন্যেই পুরুষদেরই উল্লেখ করা হয়, মেয়েদের কোন উল্লেখ নেই।'

এর পরই আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ তোমরা পাওয়ার লিপ্সা করো না সে জিনিস, যা আল্লাহ তোমাদের কতকের উপর অপর কতকের অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ দান করেছেন।

আরও নাযিল হয়েছে ঃ ...... إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 'মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান মেয়েরা ....।

কাতাদাতা আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন; বলেছেন ঃ

لَا يَتَمَنَّ أَحَدٌ الْمَالَ وَمَا يُدْرِيهِ لَعَلَّ هَلَاكَهُ فِي ذٰلِكَ الْمَالِ –

তোমাদের কেউ যেন ধন-মালের কামনা না করে, তাকে কোন জিনিস জানিয়ে দেবে, তার ধ্বংসই হয়ত সেই ধন-মালে নিহিত রয়েছে।

সাঈদ কাতাদাতা সূত্রে وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ আল্লাহ্‌র এই কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, জাহিলিয়াতের সময়ের লোকেরা মেয়েদেরকে মীরাসের কোন অংশ দিত না। বাচ্চাদেরও দিত না। তারা মীরাস দিয়ে যেত তাদের ভালোভাসার লোকদেরকে। কিন্তু ইসলামের যুগে যখন মেয়েলোককে তার অংশ ও বাচ্চাকে তার অংশ দেয়া হল এবং একজন পুরুষকে দুইজন মেয়েলোকের অংশের সমান দেয়া হতে লাগল; তখন মেয়েরা বলতে শুরু করল, মীরাসে আমাদের অংশ যদি পুরুষদের অংশের সমান হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। আর পুরুষরা বলতে লাগল, আমরা নিশ্চয়ই আশা পোষণ করি যে, পরকালেও আমাদেরকে মেয়েদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যেমন মীরাসে আমাদেরকে অতিরিক্ত দেয়া হয়েছে, তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ –

পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে তাদের উপার্জন থেকে এবং মেয়েদের জন্যেও অংশ রয়েছে তাদের উপার্জন থেকে।

মেয়েরা বলতে লাগল, মেয়েদের জন্যে তাদের নেক আমলের অনুরূপ দশগুণ পাওয়া যথেষ্ট, যেমন করে পুরুষদের দেয়া হয়। আল্লাহ বললেন ঃ

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ – إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا –

তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী।

আল্লাহ আমাদের কতককে কতককের উপর যে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দিয়েছেন, তার লোভ করতে ও পেতে চাইতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কেননা আল্লাহ যদি জানতেন যে, একজনকে তিনি যা দিয়েছেন তা অপরজনকে দেয়াই কল্যাণকর তাহলে তিনি তা অবশ্য দিতেন। কেননা যে কার্পণ্য করেছে তিনি তাকে দিতে অস্বীকার করেন না, বরং তিনি যা দিয়েছেন তার অধিক দিতে অস্বীকার করেন।

আয়াতে যে নিষেধ এসেছে, আসলে তা হচ্ছে হিংসা থেকে নিষেধ। আর হিংসা হল, একজনের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত তার থেকে বিলীন হয়ে তার নিজের দিকে আসার কামনা করা। যেমন আবূ হুরায়রাতা (রা) বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلَا يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ اَخِيْهِ وَلَا تَسْئَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْتَفِيَ مَافِيْ صَحْفَتِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَازِقُهَا -

একজন যেন তার ভাইর দেয়া বিয়ে-প্রস্তাবের উপর নিজের বিয়ে-প্রস্তাব না দেয় এবং কেউ যেন নিজের ভাইর পণ্য মূল্য বলার উপর আর একটা মূল্যের কথা পেশ না করে। কোন মেয়েলোক যেন তার বোনের তালাক দাবি না করে— এই উদ্দেশ্যে যে, তার পাত্রে যা আছে, তা সে নিজে পুরোপুরি কাছিয়ে-গুটিয়ে নিয়ে নেবে। কেননা আল্লাহ্-ই হচ্ছেন তার রিযিকদাতা।

এ হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন, এক বিয়ে প্রস্তাব সম্পর্ক চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পূর্বে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে না বসে, যখন কনে তার প্রতি আস্থাবান ও বিয়েতে সম্মত হয়েছে। এবং একজনের দরাদরির উপর আর একজ দরাদরি শুরু না করে তেমনি ভাবে।

এই প্রেক্ষিতে বিচার্য, একজনের যা হয়েছে, যে জিনিসের মালিক হয়েছে ঠিক সেই জিনিসের মালিক হওয়ার জন্যে কামনা-লালসাকারী সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়? রাসূল (স) বলেছেন, কোন মেয়ে যেন তারই অপর এক বোনের তালাকের দাবি না করে তার হক দূরে নিক্ষেপ করে তা নিজের জন্যে লাভ করার উদ্দেশ্য।

সুফিয়ান জুহরী সালেম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاحَسَدَ اِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوْ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

দুই জিনিসের কামনায় হিংসা হয় না। একটি— আল্লাহ্ তাকে ধন-মাল দিয়েছেন। সে দিন-রাত তা থেকে ব্যয় করছে। আর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন দিয়েছেন, সে দিন-রাত তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আবূ বকর বলেছেন, কামনা লালসা দুই প্রকারের। একটি— অন্য ব্যক্তির প্রাপ্ত নিয়ামত বিলীন হয়ে যাক— এটা হিংসা। এই কামনা নিষিদ্ধ। আর দ্বিতীয়, অন্য ব্যক্তির যেমন আছে তেমনি তারও হোক এই রূপ কামনা। অন্য ব্যক্তির প্রাপ্ত নিয়ামতের বিলীনতা সে কামনা করে না। তাই কামনা নিষিদ্ধ নয়, যদি তার দ্বারা কল্যাণ লক্ষ্য হয়। যৌক্তিকতার দিক দিয়েও তা সঙ্গত। নিষিদ্ধ কামনা বাসনার একটি দিক হচ্ছে যা ঘটা সম্ভব নয়, তার কামনা করা। যেমন মেয়েলোক তার কামনা করবে পুরুষ হওয়ার। অথবা কামনা করবে খিলাফত ও ইমামত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করার ও এই ধরনের অন্যান্য জিনিস, যা হবে না ও হয় না বলে জানা-ই আছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে; তা থেকে এবং মেয়েদের জন্যে অংশ রয়েছে যা তারা নিজেরা অর্জন করেছে। এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। একটি, প্রত্যেকের জন্যে সওয়াবের অংশ রয়েছে। তার ব্যাপারাদির উত্তম ব্যবস্থাপনার দরুন তার জন্য করা হয়েছে তাতে তার জন্যে মহানুভবতা করা হয়েছে। ফলে সে তা পেয়েছে। এবং পরিণামে সে উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। অতএব এই ব্যবস্থাপনার বিপরীত কিছু পাওয়ার কামনা করো না। কেননা প্রত্যেকের জন্যই তার নিজের অংশ রয়েছে। তাতে কিছু মাত্র কম করা হবে না, ত্রুটিপূর্ণও করা হয় না। আর দ্বিতীয়, প্রত্যেকেরই জন্যে তার উপার্জনের প্রতিফল রয়েছে। ফলে সে যেন অন্য একজনের পাওয়া জিনিসের কামনা করে তার আমল নিষ্ফল করে দিয়ে তা বিনষ্ট না করে, হারিয়ে না ফেলে।

এ পর্যায়ে আরও বলা হয়েছে, পুরুষ ও নারী প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ রয়েছে। আল্লাহ্‌র দেয়া বৈষয়িক যে নিয়ামত সে উপার্জন করবে, তা থেকে সে পাবে। অতএব আল্লাহ্ তার ভাগে যা দিয়েছেন তাই পেয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاسْـئَـلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ -

আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ চাও।

এর তাৎপর্যে বলা হয়েছে, অন্য জনের যা আছে, তুমিও যদি তা পাওয়ার প্রয়োজন বোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ্‌র নিকট চাও— তিনি যেন তার মতো তোমাকেও তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। অন্যের যেটা আছে সেটাই পেতে চাইবে না। তবে সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিতে সেটা পাওয়াই যদি জরুরী শর্ত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

আল-আসাবা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -

এবং প্রত্যেকেরই জন্যে আমরা আসবা বানিয়ে দিয়েছি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গেছে তা থেকে।

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাত বলেছেন, আয়াতের মাওয়ালী বলতে এখানে 'আসাবা' বোঝানো হয়েছে। সুদ্দী বলেছেন, মাওয়ালী অর্থ উত্তরাধিকারী। বলা হয়েছে ঃ الموالى শব্দের মূল وَلِيُّ الشَّيْءِ يَلِيْهِ একটি জিনিসে ওলী সেই জিনিসের নিকটবর্তী ও ঘনিষ্ঠ। আর তা হল অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অভিভাবকত্ব সম্পৃক্ত হওয়া।

আবূ বকর বলেছেন, المولى শব্দটি বহু কয়টি অর্থের সমন্বয়। তার কয়েকটি দিক রয়েছে। المولى অর্থ, ব্যক্তির পিতার দাসত্ব মুক্তিদাতা। তার মুক্তি লাভে নিয়ামত দাতা। একারণেই مولى النعمه বলা হয়েছে। দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত দাস তার প্রতি অবদান রাখার কারণে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অভিভাবকত্ব তার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে। এই কথাটি ঠিক

তেমন, যেমন পাওনাদারকে আরবীতে 'গরীম' (উত্তমর্ণ বা পাওনাদার বলা হয়) কেননা তার পাওনা অবশ্য দেয়, তার দাবি; হক্ এর দাবিদার সে। আর যার নিকট পাওনা চাওয়া হয় তাকেও আরবী ভাষায় 'গরীম'ই বলা হয়। কেননা পাওনা পাওয়ার জন্যে দাবিটা তার-ই প্রতি হয়ে থাকে, তার ঋণ অবশ্য পরিশোধ্য। আর المولى অর্থ 'আসাবা' মাওলা অর্থ, حليف সন্ধি সম্পৃক্ত। কেননা সে কিরার চুক্তিতে সে তার ব্যাপার নিয়ে মাতুব্বরি করে। চাচার পুত্রকেও المولى বলা হয়। কেননা দুজনের মধ্যে বংশীয় নিকটবর্তিতা থাকার দরুন সাহায্য-সহযোগিতা খুবই অগ্রসর ও তৎপর থাকে। অভিভাবকও المولى। কেননা সে-ই ব্যক্তির বড় পৃষ্ঠপোষক। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ -

তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদের মাওলা। আর কাফিরদের কেউ মাওলা নেই। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১১)

চাচার বংশকে 'মাওয়ালী' বলা হয়েছে। ক্রীতদাসের মালিককেও 'মাওলা' বলা হয়। কেননা মালিকত্ব, হস্তক্ষেপ, পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে সে তার নিকটবর্তী থাকে। 'মাওলা' শব্দের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। এ এক বহু বহু অর্থ সমন্বিত শব্দ। এর সাধারণত্বকে গণ্য করা সহীহ্ হবে না। এই কারণে আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মাওলার জন্যে অসিয়ত করেছে, অথচ তার রয়েছে উচ্চ দিকের 'মাওয়ালী' ও নিম্ন দিকের 'মাওয়ালী'। তার অসিয়ত বাতিল হবে। কেননা একই অবস্থায় এই উচ্চ ও নিম্নস্থ মাওয়ালী ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে শামিল হয় না। আর তাদের দু শ্রেণীর কোনটি অপরটির তুলনায় উত্তমও নয়। এই কারণে তার সে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু مولى -র সব কয়টি অর্থের মধ্যে এখানে 'আসাব' অর্থটিই অধিক উত্তম। কেননা ইসরাঈল আবূ হুসায়ন আবূ সালেহ আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ مَّاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِلْمَوَالِى الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا اَوْضِيَاعًا فَاَنَا وَلِيُّهُ -

আমি মুমিনদের প্রসঙ্গে অনেক উত্তম সাহায্যকারী। যে লোক মরে গেল ও মাল রেখে গেল, তার এই মাল আসাবাদের মধ্যে বন্টন হবে। আর যে লোক দুর্বহ বোঝা রেখে গেল কিংবা রেখে গেল ধ্বংসোম্মুখ অসহায় সন্তান বংশধর, আমি-ই হচ্ছি তার ওলী— অভিভাবক।

মা'মার ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা-ইবনে-ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَمَا اَبْقَتِ السِّهَامُ فَلَاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

তোমার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করে দাও। যে অংশ অবশিষ্ট থেকে যাবে তা পুরুষ আসাবাদের জন্যে হবে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে 'মাওয়ালী' বলতে আসাবাদের বুঝিয়েছেন। রাসূলের কথা ঃ 'পুরুষ আসাবাদের জন্যে'— কথাটি বের হয়ে এসেছে وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ থেকে।

ওরা আসাবা, আয়াতে 'মাওয়ালী' যাদের বলা হয়েছে।

ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতানৈক্য নেই যে, নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের অংশ দিয়ে দেয়ার পর যে অংশ অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্ত হবে, তা মৃতের নিকটবর্তী আসাবারা পাবে। আর 'আসাবা' হচ্ছে সে সব পুরুষ লোক, যাদের সাথে মৃতের নিকটাত্মীয়তা বংশের ছেলে ও পিতার দিক দিয়ে প্রমাণিত হবে। যেমন দাদা ও পিতার দিকের ভাই, চাচা ও তার ছেলেরা— তাদের পরবর্তী। যারা পুত্র সন্তান ও পিতার দিক দিয়ে সম্পর্কিত হয়। তবে বোনরা আসাবা হয় কেবলমাত্র কন্যাদের সাথে। এই আসাবারা মীরাস পাবে সর্বাধিক নিকটবর্তী যে, তার পরে সর্বাধিক নিকটবর্তী— এই নিয়মে। নিকটবর্তী থাকলে দূরবর্তী পাবে না। তবে মৃতের সঙ্গে যারা কোন মেয়েলোকের সম্পর্কের দিক দিয়ে সম্পর্কিত হয়, সে যে 'আসাবা' হবে না, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

দাসমুক্তির দিক দিয়ে যে মাওলা, সে মুক্ত দাসের 'আসাবা' হবে, হবে তার সন্তানের জন্যে। মুক্তিদাতার পুরুষ সন্তানরাও তাদের থেকে আসাবা হবে মুক্ত দাসের— যখন তাদের পিতা মরে যাবে এবং তার পৃষ্ঠপোষকতার (ولاء) সম্পর্ক সেই পুরুষ ছেলেদের জন্যে হবে, তার মেয়ে সন্তানদের জন্যে নয়। (ولاء) দ্বারা কোন মেয়েলোক আসাবা হবে না। হবে শুধু সে যে মেয়েলোক মুক্ত করেছে কিংবা যে মেয়েলোক মুক্ত করেছে তাকে যে পুরুষ মুক্ত করেছে সে। দাসমুক্তির মাধ্যমে এই আসাবা নীতি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'প্রত্যেকের জন্যে আসাবা মাওয়ালী বানিয়েছি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গেছে তা থেকে'-এর তাৎপর্য থেকেও তা প্রমাণিত হয়, যখন আসাবা হবে, তার পক্ষ থেকে 'আকীলা' দেয়া হবে, যেমন তার চাচার পুত্ররা তার পক্ষ থেকে 'আকীলা' দেবে।

যদি বলা হয়, মৃত ব্যক্তি দাসমুক্তির মাওলার নিকটাত্মীয়দের থেকে নয়। তার পিতা-মাতার দিক থেকেও নয়, তাহলে?

জবাবে বলা যাবে, মৃতের সাথে সম্পর্কশীল কোন ওয়ারিস যদি তার সঙ্গে থাকে যেমন কন্যা ও বোন, তাহলে তার এই অংশে শরীক হওয়া জায়েয হবে। তখন সে আসল অংশ পাবে, যদিও সে মৃতের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে থেকে নয়। কেননা ওয়ারিসদের মধ্যে এমন হবে যার সম্পর্কে এ কথা বলা সঙ্গত হবে যে, সে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া। তখন কোন কোন ওয়ারিস পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের মীরাস পেয়ে গিয়ে থাকবে।

নিম্নস্তরের ওলীর উচ্চ স্তরের ওলী থেকে মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ জুফার, মালিক, সওরী, শাফেয়ী ও সমগ্র

শরীয়তবিদগণ বলেছেন, নিম্ন পর্যায়ে মাওলা উচ্চ পর্যায়ে মাওলা থেকে মীরাস পাবে না। আবূ জাফর আত-তাহাভী আল-হাসান ইবনে জিয়াদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, বলেছেন, নিম্ন পর্যায়ের মাওলা উচ্চ পর্যায়ের মওলা থেকে মীরাস পাবে। সেখানে একটি হাদীসকে ভিত্তি করা হয়েছে যা হাম্মাদ ইবনে সালামাতা ও হাম্মাদ ইবনে জায়দ, অহব ইবনে খালিদ, মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমুত-তায়েফী, আমর ইবনে দীনার, আওসাজাতা মাওলা ইবনে আব্বাস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ একটি ব্যক্তি তার দাস মুক্ত করে দিল। মুক্তিদানকারী মরে গেল, সে তার আযাদ করা দাস ছাড়া আর কোন উত্তরাধিকারী রেখে গেল না। তখন রাসূল (স) তার মীরাস তার আযাদ করা গোলামকে দিয়ে দিলেন।

আবূ জাফর বলেছেন, এ হাদীসের প্রতিবাদকারী কোন হাদীস নেই। তাই তার হুকুম অবশ্যই কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবূ বকর বলেছেন, তার মীরাস মুক্ত গোলামকে দিয়ে দেয়া ঠিক মীরাস হিসেবে না-ও হতে পারে। বরং তার প্রয়োজন ও দারিদ্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই তা দেয়া হয়েছে। কেননা তা এমন মাল ছিল, যার কোন ওয়ারিস ছিল না। ফলে তা অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদের মধ্যেই বন্টন করা ছাড়া আর কোন ব্যবহার পথ ছিল না।

যদি বলা হয়, যেসব কারণে মীরাস দেয়া ওয়াজিব হয়, তা হল الولاء —বংশ ও বিবাহ। বংশের দিক দিয়ে সম্পর্কশীলরা তো পারস্পরিক মীরাস দেওয়া-পাওয়া চলছিলই। স্বামী-স্ত্রীও তাই। তারপর الولاء মীরাস পাওয়ার কারণ হবে উচ্চ শ্রেণীর জন্যে নিম্ন শ্রেণী থেকে। তেমনি নিম্ন শ্রেণীর জন্যে উচ্চ শ্রেণীর জন্যে।

আবূ বকর বলেছেন, এটা জরুরী বা ওয়াজিব নয়। কেননা বংশ সম্পর্কশীলদের মধ্যে এমন কোন লোক আছে যে অন্যের ওয়ারিস হয়। কিন্তু সে নিজে যখন মরবে তখন তার ওয়ারিস সে হবে না। কেননা মেয়েলোক যদি একটি বোন রেখে যায় বা একটি কন্যা ও তার ভাইর পুত্র, তাহলে কন্যা পাবে অর্ধেক। আর অবশিষ্ট সব পাবে ভাইর পুত্র। তদস্থলে ভাইর পুত্র যদি মরে যায় এবং রেখে যায় একটি কন্যা কিংবা একটি বোন ও তার নিজের ফুফু, তাহলে ফুফু কিছুই পাবে না। ভাইর পুত্র ফুফুর মীরাস পাবে সে অবস্থায়, যখন ফুফু ভাইর পুত্রের ওয়ারিস হবে না।

বন্ধুত্বের সম্পর্কে মীরাস

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

তোমাদের কিরা-কসম যাদেরকে সম্পর্কযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ করেছে, তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দাও।

তালহা ইবনে মুসাররিফ সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতটির প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, সেকালে মুহাজির আনসারের মীরাস পেত, তার

যবীল আবহামরা পেত না। তা তারা পেত তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কায়েম করা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে। পরে যখন ঃ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ এবং প্রত্যেকের জন্যেই আমরা মাওয়ালী বানিয়েছি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয় যা রেখে গেছে তা থেকে— আয়াতটি নাযিল হল তখন মুহাজিরদের মীরাস পাওয়া মনসূখ হয়ে যায়। এরপর পড়েছেন তোমাদের কিরা-কসম যা চুক্তিবদ্ধ করেছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। এটা সাহায্য ও বন্ধন ভিত্তিক মীরাস যা দেয়ার জন্যে মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে। এর ফলে মীরাস চলে যায়।

আলী ইবনে আবূ তাল্‌হা ইবনে আব্বাস থেকে উক্ত আয়াত পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। দুই ব্যক্তি পরস্পর চুক্তি করত যে, তাদের মধ্যে যে-ই আগে মরবে, অপরজন তার মীরাস পেয়ে যাবে— তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا -

যবীল আরহামরা পরস্পর পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী আল্লাহ্‌র কিতাবে মুমিন ও মুহাজিরদের থেকে। তবে তোমরা যদি তোমাদের ওলীদের প্রতি কোনরূপ ভালো আচরণ কর তবে তা ভিন্ন কথা। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৬)

বলেছে, তবে লোকেরা যদি তাদের চুক্তিবদ্ধ ওলীদের জন্যে কোন অসিয়ত করে তাহলে তা জায়েয হবে এবং মৃতের সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ থেকে তা দিয়ে দিতে হবে। আয়াতে যে 'মারুফ' ভালো আচরণের কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য এই।

আবূ বশর সাইদ ইবনে যুবায়র থেকে 'যাদেরকে তোমাদের কিরা-কসম চুক্তিবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দাও' আল্লাহ্‌র এই কথাটির পর্যায়ে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে চুক্তি করত, সে মরে গেলে অপরজন তার ওয়ারিস হবে। আবূ বকর সিদ্দিক (রা) এক ব্যক্তির সাথে এইরূপ চুক্তি করেছিলেন। সেই ব্যক্তি মরে গেলে তিনি তার ওয়ারিস হয়েছিলেন। সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন ঃ এ আয়াত তাদের সম্পর্কে যারা কোন কোন পুরুষকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করত এবং তাদেরকে ওয়ারিস বানাত। তখন আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেন যে, তাদের জন্যে অসিয়ত কর। আর মীরাস ফিরিয়ে দিলেন যবীল আরহাম ও আসাবা মাওয়ালীদের প্রতি।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা আগের দিনের মনীষীদের যে মতের উল্লেখ করেছি তার আলোকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের যুগেও পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধতা ও মাওয়ালাত-এর ভিত্তিতে মীরাস বণ্টনের কাজ চলেছিল। পরে— বিশেষজ্ঞরা যেমন বলেছেন— আল্লাহ্‌র কথা আল্লাহ্‌র কিতাবে যবীল আরহামের কতক অপর কতক থেকে অধিক নিকটবর্তী— দ্বারা সে ব্যবস্থা মনসূখ হয়ে যায়। আর অন্যান্যরা বলেছেন, আসলে তা মনসূখ হয়নি। তবে যবীল আরহামকে চুক্তির মাওয়ালাত অপেক্ষা উত্তম ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র। তাই নিকটাত্মীয়

বর্তমান থাকলে তাদের মীরাস মনসূখ মনে করতে হবে। আর নিকটাত্মীয়রা আসলে যেমন, তেমন কেউ অবশিষ্ট ও বেঁচে না থাকলে তাদের অংশ থেকে যাবে ও তারা তা পেয়ে যাবে।

মাওয়ালাতের মাওয়ালীর মীরাসের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফার বলেছেন, যে লোক কোন ব্যক্তির হাতেই ইসলাম কবুল করেছে এবং তার সাথে মাওয়ালাতের চুক্তি করেছে, পরে সে মরে গেছে অথচ তার সে ছাড়া আর কেউ ওয়ারিস নেই, তখন তার মীরাস সেই পাবে। মালিক ইবনে শাবরামাতা, সওরী, আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, তার মীরাস পাবে মুসলিম জনগণ। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ বলেছেন, যদি সে দুশমনদের দেশ থেকে আসে, তারপর তার হাতে ইসলাম কবুল করে থাকে। তখন তার ولاء তার জন্যে যার সাথে সে মাওয়ালাতের সম্পর্ক স্থাপন করবে। যিম্মীদের কেউ যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে তার ولاء সর্ব সাধারণ মুসলমানদের জন্যে। লায়স ইবনে সায়াদ বলেছেন, যে লোক কোন ব্যক্তির হাতে ইসলাম কবুল করবে, সে তারই মাওলা হয়েছে এবং তার মীরাস সে পাবে যার হাতে সে ইসলাম কবুল করেছে, যদি তাকে ছাড়া সে আর কোন ওয়ারিস রেখে না গিয়ে থাকে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াত অনুযায়ী মীরাস পাবে সে, যার সাথে তার মাওয়ালাতের চুক্তি হয়েছে। আমাদের ফিকাহবিদগণ-ও তাই বলেছেন। কেননা তা ইসলামের প্রথম যুগে একটি প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর বিধান ছিল। আয়াতের 'নস্‌ হিসেবে তা এখনও রয়েছে ও থাকবে। পরে বলেছেন ঃ 'যবীল আরহামরা কতক অপর কতক অপেক্ষা নিকটবর্তী আল্লাহ্‌র কিতাবে মুমিন ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে।' এই কথায় যবীল আরহামকে চুক্তিবদ্ধ মাওয়ালী অপেক্ষা উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী বানিয়েছেন। তাই যবীল আরহাম কেউ জীবিত না থাকলে তাদের মীরাস মাওয়ালীরা পাবে। এটাই আয়াতের চূড়ান্ত ফয়সালা। কেননা তাদের জন্যে যা ছিল, তা-ই যবীল আরহামকে দেয়া হয়েছিল। তাদের পাওয়া গেলে তারাই তা পাবে। আর তাদের কেউ যখন থাকবে না বা পাওয়া যাবে না, তখন মাওয়ালীদের দেয়া হবে। অতএব আয়াতটির মনসূখ হওয়ার কোন কথা না কুরআনে আছে, না সুন্নাতে-হাদীসে। এক্ষণে এই বিধান অটাক্য ও প্রতিষ্ঠিত, কাজে ব্যবহারোপযোগী। যবীল আরহাম না থাকলে মীরাস ওদের জন্যেই কার্যকর হবে। নবী করীম (স) থেকে এই বিধানের বর্তমান ও কার্যকর থাকা সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা পাওয়া গেছে। যবীল আরহামের অনুপস্থিতিকালে তাদেরকে মীরাস দেয়ার হুকুম এখনও কার্যকর হবে। সে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দায়ূদ ইয়াজীদ ইবনে খালেদ আর-রমলী ও হিশাম ইবনে আম্মার আদ-দিমাশকী ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামজা— আবদুল আযীয ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মওহবকে উমর ইবনে আবদুল আযীয-কায়সাতা ইবনে যুয়াইব— তামীমুদ্দারী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে রাসূল! এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির হাতে ইসলাম কবুল করেছে, এ বিষয়ে সুন্নাত কি ? বললেন, সেই ব্যক্তি— যার হাতে সে ইসলাম কবুল করেছে— তার জন্যে তার নিজের জীবন ও মরণে সব লোকের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী ও আপনজন।

রাসূল (স)-এর কথা ঃ সেসব লোকের তুলনায় তার জীবন ও মৃত্যুতে অধিক নিকটবর্তী— এর দাবি হল, তার মীরাস পাওয়ার দিক দিয়ে-ও সে সকলের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী হবে।

কেননা মৃত্যুর সে দুজনের মধ্যে মীরাস ছাড়া আর কোন কিছুতে পৃষ্ঠপোষকতা ও বন্ধনের সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকেনি। আয়াতের প্রত্যেকের জন্যেই আমরা মাওয়ালী বানিয়ে দিয়েছি— এর তাৎপর্য এই। আয়াতে 'মাওয়ালী' অর্থ ওয়ারিস, উত্তরাধিকারী। হানাফী ফিকাহবিদদের এই মত হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

হাদীসটি উমর ইবনে মাসউদ (রা), আল হাসান, ইবরাহীম থেকে এ পর্যায়ে বর্ণনা এসেছে। আর মা'মার জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তার নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করল, সে অপর এক ব্যক্তিকে নিজের 'মাওলা' বা পৃষ্ঠপোষক (অভিভাবক) বানাল। এতে কি কোন দোষ আছে? রেওয়ায়েতে তিনি বললেন, না এতে কোন দোষ নেই। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এ কাজের অনুমতি দিয়েছেন।

কাতাদাতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন লোকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করল, তার অপরাধসমূহের তারা দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং তার নিজের মীরাস তাদের জন্যে হারাম করে দিল। রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান বলেছেন, একজন কাফির যখন ইসলাম কবুল করে কোন মুসলিম ব্যক্তির হাতে শত্রু দেশে অথবা মুসলমানদের দেশে, তাহলে তার মীরাস সে পাবে, যার হাতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবূ আসেম আল-নবীল ইবনে জুরাইয, আবুয যুবায়র জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) লিখেছেন ঃ

عَلٰى كُلِّ بَطْنٍ عُقُوْلُه -

প্রত্যেক গর্ভের উপরই (গর্ভের দিক দিয়ে সম্পর্কশীল লোকদের উপর) তার আকিলা বর্তিবে।

এবং বলেছেন ঃ لَايَتَوَلّٰى مَوْلٰى قَوْمٍ اِلَّا بِاِذْنِهِمْ কোন জনগোষ্ঠীর মালিক সেই জনগোষ্ঠীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ধারণ করতে পারবে না। এই হাদীসটিতে দুটি তাৎপর্য সমন্বিত। একটি, 'মাওয়ালাত'— পরস্পরের মাওলা পৃষ্ঠপোষক অভিভাবক হওয়া জায়েয। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, লোকদের অনুমতি ছাড়া 'মাওলা' হতে পারে না। তার অর্থ, তাদের অনুমতি 'মাওলাত' পৃষ্ঠপোষক অভিভাবকত্ব হতে পাবে। আর দ্বিতীয়, সে তার এই অভিভাবকত্ব অন্য একজনের নিকট হস্তান্তরিত করতে পারে, যদিও তা অপছন্দনীয়, মকরূহ— প্রথমোক্ত লোকদের অনুমতি ছাড়া। নবী করীম (স)-এর উক্ত কথার তাৎপর্য 'মাওয়ালাতের মাওলা পৃষ্ঠপোষকতার ধারক' ছাড়া আর কোন বক্তব্য হতে পারে না। কেননা দাস মুক্তির 'অলা' ولاء হস্তান্তরিত হতে পারে না, জায়েয নয়। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ -

'অলা' একটা মাংসপিন্ড, বংশের মাংসখন্ডের মতই।

অবশ্য বিপরীত মতের দলীল হিসেবে কেউ মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর বর্ণিত একটি

হাদীসের বর্ণনাকে পেশ করতে পারে। তিনি আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইবনে বশর ও ইবনে নুমাইর ও আবূ উসামা, যাকারিয়া সাদ ইবনে ইবরাহীম— তার পিতার যুবায়র ইবনে মুতয়িম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا حِلْفَ فِىْ الْإِسْلَامِ، وَاَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ اِلَّا شِدَّةً -

ইসলামে কোন কিরা-কসমের স্থান নেই। তবে জাহিলিয়াতের যুগের প্রত্যেকটি কিরা-কসমকেই ইসলাম অধিকতর দৃঢ় ও শক্ত করে দিয়েছে।

এই হাদীস তো ইসলামের যুগের সব কিরা-কসমই বাতিল প্রমাণ করে এবং এর ভিত্তিতে পারস্পরিক মীরাস দেওয়া-পাওয়া চলতে পারে না।

এর জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইসলামের কিরা-কসম নেই তার অর্থ সম্ভবত সেই কিরা-কসম যা জাহিলিয়াতের যুগে করা হচ্ছিল। তখনকার কিরা-কসম এভাবে হতো যে, তার দ্বারা তারা সক্রিয় চুক্তি করত। সে চুক্তিতে একজন অপর জনকে বলত ঃ 'আমার ধ্বংস তোমার ধ্বংস, আমার রক্ত তোমার রক্ত— তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার ওয়ারিস হব। এ কিরা-কসমে এমন কিছু ব্যাপার ছিল, যা ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তাতে অন্যকে পূর্ব সমর্থন করার, তার জন্যে রক্ত দেয়ার এবং যা তাকে ধ্বংস করবে, তা তাকেও ধ্বংস করবে, তখন সে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, তা হক হোক, কি বাতিল। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের কিরা-কসম ও চুক্তিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। সেই সাথে মজলুমকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করা, ইনসাফ ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করা এবং তাতে নিকটাত্মীয়তা ও অনাত্মীয়তার দিকে লক্ষ্য না দেয়া ওয়াজিব করে দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ন্যায়পরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও, আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষ্যদাতা হয়ে— তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হলেও বা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হলেও, সে ধনী হোক, কি গরীব, আল্লাহ তাদের দুজনার তুলনায় অনেক বেশি নিকটবর্তী, অতএব ন্যায়-বিচার করার ব্যাপারে তোমরা খাম-খেয়ালীর অনুসরণ করো না।

(সূরা নিসা ঃ ১৩৫)

এ আয়াতে আল্লাহ্ ন্যায়পরতা ও সুবিচারের আদেশ দিয়েছেন, তা আপন ও পর— নিকট ও দূর নির্বিশেষ হতে হবে। আল্লাহ্‌র হুকুমের ব্যাপারে সকলের প্রতি পূর্ণ সাম্য ও সমতা রক্ষা করতে আদেশ করেছেন। এর দ্বারা জাহিলিয়াতের যুগের নিকটবর্তী ও কিরা-কসমভুক্তদের অপর লোকের উপর সে জালিম হোক, কি মজলুম সাহায্য করার রীতিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। নবী করীম (স)-ও ইরশাদ করেছেন ঃ

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْمَظْلُوْمًا -

তোমরা তোমার ভাইর সাহায্য কর, সে জালিম কি মজলুম।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, মজলুমকে সাহায্য করার আদেশ তো বুঝলাম। কিন্তু জালিমকে কিভাবে সাহায্য করব, বোঝা গেল না। জবাবে তিনি বললেন ঃ

أَنْ تَرُدَّهُ عَنِ الظُّلْمِ -

তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।

জাহিলিয়াতের কিরা-কসমে আপন বংশের লোকের পরিবর্তে কিরা-কসমমূলক চুক্তিকারী লোকই মীরাস পেত। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ ও উৎখাত প্রসঙ্গেই রাসূলে করীম (স) বলেছিলেনঃ 'ইসলামে কিরা-কসম নেই।' যে কিরা-কসম সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে করা হয় দ্বীন বা আদেশ কিংবা শরীয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রেখে— চুক্তিকারী নিজের সম্পর্কে যা বাধ্যতামূলক করে নেয়, তার। এ কথাকেই অস্বীকার করা হয়েছে যা নিকটবর্তী লোকদেরকে মীরাস না দিয়ে চুক্তিকারীকে দেয়ার পন্থা করে দেয়। 'ইসলামে কিরা-কসম নেই' বলে রাসূলে করীম (স) এ কথা-ই বুঝিয়েছেন। তাঁর কথার শেষাংশ ঃ 'জাহিলিয়াতের প্রত্যেকটি কিরাকেই ইসলাম অধিক শক্ত করে দিয়েছে'-এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, তা বৈধ ও অকার্যকরকরণে ইসলাম অধিক কঠোরতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছে। 'তা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে'। যেন তিনি বলেছেন, ইসলামে এ ধরনের কোন কিরা-কসমের এক বিন্দু স্থান নেই— তা আদৌ জায়েয নয়, তাতে মুসলমানদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার যত কথাই থাকুক-না-কেন। তাই জাহিলিয়ত যুগের কিরা-কসমের তো কোন কথাই উঠতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন ঃ 'মাওয়ালাত' দ্বারা যে পারস্পরিক মীরাস দেওয়া-পাওয়া হতো তার সম্পর্কে এ কথাই চূড়ান্ত। যে লোক তার সমস্ত মাল সম্পত্তি এ মাওয়ালাতের ভিত্তিতে অন্যকে দেয়ার অসিয়ত করবে এমন অবস্থায় যে, তার ওয়ারিস কেউ নেই তবে তা জায়েয হবে বলে হানাফী ফিকাহবিদগণ মত দিয়েছেন। এটাই ছিল আগের ফিকাহবিদদের মত। তা এইজন্যে যে, মাওয়ালাতের চুক্তির ভিত্তিতে অন্য কারুর জন্যে তার মীরাস দেয়া যখন জায়েয এবং বায়তুলমাল থেকেও যখন তা আলাদা করে গোপন করে রাখা হবে, তখন সে তা মৃত্যুর পরে অন্য কাউকে দেয়ার অসিয়ত করে যেতে পারে, যাকে সে দিতে চাইবে। কেননা 'মাওয়ালাত' দুইজনের পারস্পরিক চুক্তি ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে স্থিরকৃত হয়ে থাকে। আর তার পক্ষ থেকে যতক্ষণ আকিলা দেয়া হবে না, ততক্ষণ তার 'অলা'র ভিত্তিতে অন্য কাউকে দেয়া তার জন্যে জায়েয। তার কথা ও কবুলের মাধ্যমে যে অসিয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়, এটা সেই রকমেরই হয়ে যায়। ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাহারও সে করতে পারে। অবশ্য তাতে এক ধরনের অসিয়ত বিরোধী কাজ হবে। তা এভাবে যে, তা যদিও তার কথার দরুনই সে তা গ্রহণ করবে, কিন্তু গ্রহণ করবে মীরাস হিসেবে। যেমন মৃত ব্যক্তি যদি কোন যিহম সম্পর্কের ব্যক্তি রেখে যায়, তাহলে সে মাওয়ালাতের ওলীর পরিবর্তে মীরাস পাওয়ার অধিকার তার-ই হবে অনেক বেশি। কারোর জন্যে অসিয়ত করা হলে সে যেমন সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে পায়, মাওয়ালাতের 'ওলী' তা থেকেও পাবে না যদি তার নিকটাত্মীয় বা দাসমুক্তির 'অলা' সম্পর্কের কেউ ওয়ারিস থাকে।

তাবু মাওয়ালাতের 'অলা কতকটা অসিয়তের মতোই যখন তার ওয়ারিস কেউ থাকবে না। আর অপর একদিক দিয়ে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যাপার।

স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্যে বাধ্যতামূলক

আল্লাহ্র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

পুরুষরা— স্বামীরা মেয়েদের— স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্বশালী। আল্লাহ্ কতককে অপর কতকের উপর যে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন সেই কারণে এবং একারণে যে, পুরুষরা— স্বামীরা তাদের ধন-মাল থেকে ব্যয় করে।

ইউনুস আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আহত করেছে। তখন তার ভাই রাসূল করীম (স)-এর নিকট কিসাসের দাবি করলো। তখন আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। পুরুষরা— স্বামীরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন। নবী করীম (স) বললেন— আমরা একটা জিনিসের ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসের হল।

জরীর ইবনে হাজিম আল হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করল। তখন রাসূল (স) তার উপর বিচার করার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন ঃ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ —তোমাদের উপর কিসাস বাধ্যতামূলক। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ -

আর কুরআন নিয়ে তাড়াহুড়া করো না যতক্ষণ না তার ওহী তোমার প্রতি পূর্ণরূপে নাযিল হওয়া চূড়ান্ত হয়। (সূরা ত্ব-হা ঃ ১১৪)

এরপর নাযিল হয়েছে— 'স্বামীরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্বশালী'।

আবূ বকর বলেছেন, প্রথমোক্ত হাদীসটি প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রী মধ্যে (ছোটখাটো ব্যাপারে) কোন কিসাস হতে পারে না, যতক্ষণ হত্যাকান্ড পর্যায়ের ঘটনা না ঘটছে। জুহরী থেকেও সেই বর্ণনা-ই এসেছে। আর দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে বলা যায়, এটা সম্ভব যে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করায় স্বামী তাকে চপেটাঘাত করেছে আর বিদ্রোহাত্মক আচরণ স্ত্রীর দিক থেকে স্বামীর বিরুদ্ধে হলে আল্লাহ জায়েয করেছেন স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে মারা। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ -

যে সব স্ত্রী থেকে বিদ্রোহমূলক আচরণের ভয় করবে, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং শয্যায় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন করে রাখ আর (প্রয়োজন হলে) তাদেরকে মার।

যদি কেউ বলে, স্ত্রীকে স্বামীর মারাটা যদি বিদ্রোহাত্মক আচরণের দরুন হয়, তাহলে নবী করীম (স) সেজন্য কিসাস করা ওয়াজিব বলতেন না।

জবাবে বলা যেতে পারে, নবী করীম (স) উক্ত কথাটি বলেছিলেন এ আয়াতটির নাযিল হওয়ার পূর্বে, যাতে স্ত্রীর বিদ্রোহাত্মক আচরণ হলে তাকে মারা মুবাহ করেছেন। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'স্বামীরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন .... তাদেরকে মার' পর্যন্ত নাযিল হয়েছে পরবর্তীকালে। তাই এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কিসাসের কোন প্রশ্নই উঠে না। 'স্বামীরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন' কথাটিতে স্বামীকে অধিকার দেয়া হয়েছে স্ত্রীদের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের, গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু রাখা, সংরক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করণের। তার কারণ হল, আল্লাহ পুরুষকে মেয়েলোকের উপর বিবেক-বুদ্ধি, বুঝ-সমঝ, ব্যয় নির্ধারণ ইত্যাদির দিক দিয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। আর এ জন্যেও যে, স্ত্রী ও পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর উপর অর্পণ করেন নি, করেছেন পুরুষ তথা স্বামীর উপর।

বোঝা গেল, আয়াতটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে। একটি, মর্যাদা ও জ্ঞান বুদ্ধিতে মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের অগ্রাধিকার দান। পুরুষরাই ঘর— সংসারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। এ কথাই প্রমাণ করে যে, স্বামীর অধিকার আছে স্ত্রীকে তার ঘরে রাখার, ঘরে থাকতে বাধ্য করার এবং বাইরে ঘুরা-ফিরা করা থেকে বিরত রাখার। আর অপর দিকে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর আনুগত্য করা, তার আদেশ পালন করা— যতক্ষণ তা আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী বা কোন গুনাহের কাজের আদেশ না হবে, আর স্ত্রীরও সেই সাথে গোটা পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পুরুষকে পালন করতে হবে বলে স্পষ্ট বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

এবং এজন্যে যে, তারা তাদের ধন-মাল থেকে ব্যয় করবে।

যেমন, অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং সন্তান যার— সন্তানের পিতা যে, তার উপর দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীদের রিযিক ও পোশাকাদি প্রচলিত নিয়মে দেয়া। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৩)

এবং আল্লাহ্র কথা ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ -

যেন সচ্ছলতা সম্পন্ন ব্যক্তি তার সচ্ছলতা থেকে ব্যয় করে (পরিবারের জন্যে)।

(সূরা তালাক ঃ ৭)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে তাদের রিযিক পাওয়ার ও তাদের পোশাক পাওয়ার প্রচলিত নিয়মে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'এজন্যে যে, তারা তাদের ধন-মাল থেকে ব্যয় করবে' মহ্রানা ও জীবন-যাত্রার ব্যয় উভয়কেই শামিল করে। কেননা এ দুটোই স্বামীকে দিতে হবে।

এরপর আল্লাহ্র কথা ঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -

নেক চরিত্রবর্তী স্ত্রীরা আল্লাহনুগত, আল্লাহ্র সংরক্ষণের অধীন স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সার্বিক সংরক্ষণকারিণী।

প্রমাণ করে যে, মেয়েলোকদের মধ্যে নেক চরিত্রবতী মেয়েলোক আছে। আর قٰنِتٰتٌ -এর অর্থ কাতাদাহ বলেছেন, 'অনুগত, আল্লাহ্র এবং তাদের স্বামীরা এর মূল। قُنُوْتٌ -এর আসল অর্থ স্থায়ী আনুগত্যশীলতা। বেতেরের নামাযে যে কুনুত-এর দো'আ পড়া হয়, তাকে কুনুতের দো'আ বলা হয় এজন্যে যে, তা পড়ার জন্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তা পড়তে হয়। আর حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ পর্যায়ে আতা ও কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ তাদের স্বামী যেসব ধন-মাল রেখে ঘরের বাইরে চলে গেছে তারা তার সংরক্ষণকারী এবং তার নিজের ও অন্যান্য যে সব জিনিসের রক্ষণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত সে সবের সে সংরক্ষণ করবে। بما حفظ اللهَ পর্যায়ে আতা বলেছেন, এর অর্থ যেহেতু আল্লাহ্ মহ্রানা এবং স্বামীর উপর তাদের খরচাদি বহনের দায়িত্ব অর্পণ করে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন, তার বিনিময়ে তারা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। অন্যান্যরা এর তাৎপর্য বলেছেন; তারা যেহেতু নিজেরাই নেক চরিত্রবর্তী, আল্লাহ্র অনুগত এবং আল্লাহ্র সংরক্ষণ ও তওফীকের দরুন আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন, আর আল্লাহ্ তার বিশেষ অনুগ্রহে ও সাহায্যে তাদেরকে এ কাজে সহায়তা করেছেন, এ জন্যে। আবু মাগ্শার সাঈদুল মুকবেরী, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَاِذَا اَمَرْتَهَا اَطَاعَتْكَ وَاِذَا غِبْتَ عَنْهَا خَلَفَتْكَ فِىْ مَالِكَ وَنَفْسِهَا -

সর্বোত্তম মেয়েলোক সেই স্ত্রী, যার দিকে তাকালে সে তোমাকে উৎফুল্ল করবে, যখন তাকে কোন কাজের আদেশ করবে সে তোমার আনুগত্য করবে এবং তুমি যখন তার নিকট উপস্থিত থাকবে, তখন সে তোমার মাল-সম্পদে ও তার নিজের ব্যাপারে তোমার খলীফা— প্রতিনিধি— হয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

এ কথা বলার পর রাসূল (স) পাঠ করলেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

বিদ্রোহাত্মক আচরণ নিষিদ্ধ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ -

আর যেসব স্ত্রীদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের তোমরা ভয় পাবে (আশংকাবোধ করবে) তাদের তোমরা বোঝাবে— উপদেশ নসীহত করবে এবং শয্যায় তাদেরকে পরিহার করবে ....।

আয়াতের تَخَافُوْنَ শব্দের দুটি অর্থ। একটি হল, তোমরা জানতে পারবে। কেননা একটা জিনিসের ভয় করার অর্থ, সে জিনিসটির সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে জানা। 'তোমরা জানবে' এর পরিবর্তে 'তোমরা ভয় পাবে' বলা সঙ্গত হয়েছে যেমন আরব কবি আবূ মহজন সকফী বলেছেন ঃ

وَلَا تَدْفِنَنِّىْ بِالْفَلَاةِ فَاِنَّنِىْ - اَخَافُ اِذَا مَامِتُّ اَنْ لَا اَذُوْقُهَا-

তুমি আমাকে শূন্য খাঁখাঁ করা প্রান্তরে সমাধিস্থ করবে না, কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমি যখন মরব, তখন মৃত্যু স্বাধ আস্বাদন করতে পারব না।

خِفْتُ 'আমি ভয় করি' কথাটির আর একটি অর্থ, আমি ধারণা করি। আরবী ভাষা বিশারদ ফররা তা বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেছেন, এ ভয় তা যা শান্তি ও নিরাপত্তার বিপরীত। যেন বলা হয়েছে ঃ তোমরা তাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণকে ভয় করবে তোমাদের সে বিষয়ে জানান দানকারী অবস্থার কথা জানতে পেরে। আর اَلنُّشُوْزُ-এর পর্যায়ে ইবনে আব্বাস, আতা ও সুদ্দী বলেছেন, এর অর্থ, স্বামীর যেসব কথা মানা ও আনুগত্য করা কর্তব্য তাতে তার আনুগত্য করা, তার আদেশ মান্য করা। نُشُوْزُ শব্দের আসল অর্থ, স্বামীর বিরুদ্ধতা করে তার উপরে উঠতে চাওয়া। এর উৎপত্তি হয়েছে نَشَزَ الْاَرْضُ থেকে। অর্থাৎ জমি উচ্চ হয়ে উঠেছে।

আর আল্লাহ্র কথা فَعِظُوْهُنَّ 'তাদের ওয়ায কর' অর্থ, আল্লাহ্র এবং তার আযাবের কথা বলে তাদেরকে ভয় দেখাও— ভীত কর।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ ইবনে আব্বাস, ইকরামা, দহাক ও সুদ্দী বলেছেন, এর অর্থ, কথা বলা ত্যাগ করা। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, তার সাথে সঙ্গম পরিহার করা। মুজাহিদ, শবী ও ইবরাহীম বলেছেন ঃ 'এক শয্যায় শয়ন পরিহার করা।'

আর وَاضْرِبُوْهُنَّ ইবনে আব্বাস বলেছেন, শয্যায় স্ত্রী যদি স্বামীর কথা শুনে— আনুগত্য করে. তাহলে স্ত্রীকে মারার কোন অধিকার স্বামীর নেই। মুজাহিদ বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি তার সাথে শয্যায় একত্রিত হওয়া থেকে বিদ্রোহ করে, তাহলে স্বামী তাকে বলবে ঃ 'তুমি আল্লাহ্কে ভয়

কর এবং ফিরে এস।' মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আন-নফীলী ও উসমান ইবনে আবূ শায়বা প্রমুখ, হাতিম ইবনে ইসমাঈল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তাঁর পিতা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, নবী করীম (স) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আরাফার ময়দানের উপত্যকা-গর্ভে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন ঃ

اتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْ النِّسَاءِ فَانَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ، وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং তাদের যৌনাঙ্গ তোমরা হালাল বানিয়ে নিয়েছ আল্লাহ্‌র কলেমার দ্বারা। আর তোমাদের জন্যে তাদের উপর অধিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন কাউকে দলিত-মথিত করতে দেবে না, যাকে তুমি পছন্দ কর না। যদি তারা তাই করে, তাহলে তোদেরকে মারবে কোনরূপ যখম না করে এবং তাদের জন্যে তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে, তোমরা তাদের রিযিক ও পরিধেয় দেবে প্রচিলত নিয়মে।

ইবনে জুরাইয আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আঘাতহীন মার হতে পারে মিসওয়াক দিয়ে বা তার মতো কোন জিনিস দিয়ে। সাঈদ কাতাদাহ থেকে বলেছেন, অ-বীভৎস মার। বলা হয়েছে, রাসূল (স) আমাদের জন্যে বলেছেন, মেয়েলোকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পার্শ্বঅস্থি। তা বাঁকা, তাকে সোজা করতে চাইলে তা তুমি ভেঙ্গে ফেলবে। বরং তাকে থাকতে দাও, তার দ্বারা সুখ-ভোগ কর। আল-হাসান বলেছেন ঃ 'তাদেরকে মার, যেন কোরূপ যখম বা চিহ্ন না পড়ে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই,' আবদুর রায্যাক, মা'মার আল-হাসান ও কাতাদাতা ঃ 'তোমরা তাদের নসীহত কর এবং শয্যায় তাদেরকে পরিহার কর'-এর তাৎপর্য বলেছেন, স্বামী যখন তার বিদ্রোহের ভয় করবে, তাকে ওয়ায করবে— বোঝাবে, নসীহত করবে। তা মানলে তো ভাল-ই। অন্যথায় তাকে শয্যায় পরিহার করবে। এতেও যদি আনুগত্যশীলা না হয়, তা হলে মারবে। কিন্তু সে মা'র সাংঘাতিক হতে পারবে না। তার পরে বলেছেন ঃ

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا -

তারপর যদি তারা আনুগত্যশীলা হয়, তাহলে তোমরা তাদের উপর চড়াও হওয়ার কোন পথ তালাশ করতে পারবে না।

অর্থাৎ অন্য কোন অপরাধের কারণে তাদেরকে মারধর করতে পারবে না।

সালিসদ্বয় কিভাবে কাজ করবে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا -

তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ ফাটল বা মনোমালিন্য দেখা দেয়ার ভয় পাও, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর।

এ আয়াতটি কাদেরকে লক্ষ্য করে পেশ করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র ও দহাক বলেছেন, তারা হচ্ছে শাসন ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তি, যাদের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পেশ করা যাবে। সুদ্দী বলেছেন, এ দুজন হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন মেয়েলোক।

আবূ বকর বলেছেন, 'তোমরা যেসব মেয়েলোকের বিদ্রোহাত্মক আচরণের ভয় পাও' কথায় স্বামীকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হয়েছে। আয়াতটির সন্নিবেশ ও ধারাবাহিকতাই তা প্রমাণ করে। তা হল ঃ তাদেরকে শয্যায় পরিত্যাগ কর ..... আলোচ্য আয়াতের কথা ঃ 'তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ ফাটল ও মানোমালিন্যের ভয় পাও' কথায় উত্তম কথা হচ্ছে এ সম্বোধন শাসককে করা হয়েছে, যে পক্ষদ্বয়ের উপর নজর রেখে মীমাংসা করে দিতে সক্ষম এবং সীমালঙ্ঘন ও জুলুম থেকে উভয়কে বিরত রাখার ক্ষমতা রাখে। পূর্ববর্তী কথায় স্বামীকে বলা হয়েছে স্ত্রীকে নসীহত করার ও তাকে আল্লাহ্র ভয় দেখানোর জন্যে এবং পরে শয্যায় তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্যে— যদি বিরত না হয়— আদেশ করা হয়েছে। তার পারেও সেই বিদ্রোহাত্মক আচরণে স্থিত থাকলে তাকে মারবার হুকুমও দেয়া হয়েছে। মারার পর স্বামীর বিচারকের নিকট বিচার চাওয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থায় গ্রহণ বৈধ করা হয়নি। বিচারকের নিকট মামলা দায়ের হলে সে যেন জালিম ও মজলুমের মাঝে ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং তার ফয়সালা পক্ষদ্বয়ের উপর ক্ষমতাবলে কার্যকর করে।

শু'বা আমর ইবনে মুররা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি কুরআনে কথিত সালিসদ্বয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তাতে কি হয়েছে? আমি বললাম, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ফাটলে যে দুইজন সালিস নিয়োগের কথা কুরআনে বলা হয়েছে, তাদের সম্পর্কেই জানতে চেয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যখন সম্পর্কের বক্রতা, মতপার্থক্য, মনোমালিন্য ও বিবাদ দেখা দেবে, তখন দুই জনের পক্ষ থেকে দুইজন সালিস নিয়োগ করতে হবে। তারা প্রথমে মূল বিবাদ সৃষ্টিকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে নসীহত করবে। সে যদি তাদের উপদেশ মেনে নেয়, তাহলে ভালই। অন্যথায় অপর জনের নিকট যাবে। সে তাদের কথা শুনলে নিজেই অপরজনের নিকট গিয়ে নিজেদের বিবাদীয় বিষয় মিটমাট করে নেবে। আর তা-ও না হলে সালিসদ্বয় নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা জায়েয হবে এবং পক্ষদ্বয় মেনে নিতে বাধ্য হবে।

আবদুল ওহ্‌হাব আইয়ূব, সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে খুলা তালাকের দাবিদার স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তাকে তালাক না চাওয়ার জন্যে নসীহত করতে হবে। ফিরে গেলে বিপদ মিটে গেল। অন্যথায় তাকে পরিত্যাগ করবে। তাতে না ফিরলে তাকে মারবে। তাতেও না বিরত হলে তার ব্যাপারটি শাসন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করবে। শাসন কর্তৃপক্ষ স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে আর একজন সালিস নিযুক্ত করবে। স্ত্রী-পক্ষ থেকে নিযুক্ত সালিস বলবে, এই এই কর। আর স্বামীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত সালিসও যা যা করণীয় তা করতে তাকে বলবে, এ দুজনের মধ্যে যে অধিক জালিম, তার ব্যাপারটি শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরবে। সে তাকে জোরপূর্বক মীমাংসায় রাযি হতে বাধ্য করবে— যেন পরিবার সংস্থা ভণ্ডুল ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তা সত্ত্বেও স্ত্রীই যদি বিদ্রোহাত্মক আচরণে উঠে পড়ে লেগে থাকে, তাহলে স্বামীকে তারা আদেশ করবে খুলা তালাক দিয়ে দিতে।

আবূ বকর বলেছেন, ইন্নীন, মজবুব ও ঈলা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এ নীতিই অনুসৃত হবে। এ ব্যাপারটি যে বিচারক-শাসকের নিকট সোপর্দ হবে এবং দুজনের মধ্যে মীমাংসা করার দায়িত্বশীল হবে, সে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী করণীয় কাজের নির্দেশ করবে। যদি তাদের দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং স্বামী যদি স্ত্রীর বিদ্রোহাত্মক আচরণের দাবি করে আর স্ত্রী দাবি করে তার উপর স্বামীর জুলুম ও স্ত্রীর অধিকার আদায়ে স্বামীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও লঙ্ঘনের দাবি করে, তাহলে স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নিয়োগ করবে। তারা দুইজন একসাথে দুজনের ব্যাপারটি সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করবে এবং স্বামী ও স্ত্রী সম্পর্কে তাদের দুজনার রায় ও সিদ্ধান্ত শাসন ক্ষমতাসীনের নিকট পেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা স্বামী ও স্ত্রী— উভয়ের পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নিয়োগের কথা বলেছেন, তা এজন্যে যে, তারা দুজনের কোন একজনের নিকট অপরিচিত হলে কোন পক্ষপাতিত্বের কারণ না ঘটে এবং পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলে সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। দুজনের পক্ষ থেকে দুজন সালিস হলে সে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। প্রত্যেক সালিস-ই স্বীয় মুয়াক্কিলের বক্তব্য স্পষ্ট করে পেশ করতে পারবে। তাহলে 'স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর' কথাটি এ-ও প্রমাণ করে যে, দুইজন দুই জনের পক্ষের উকীল হিসেবে কাজ করবে। কথাটির ধরন এরূপ যেন বলা হয়েছে, একজন পুরুষ স্বামীর পক্ষ থেকে ও আর একজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত কর। এ কথা বাতিল প্রমাণ করে এ মতকে যে, দুজন সালিসই ইচ্ছা হলে একত্রে ও ইচ্ছা হলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বামী ও স্ত্রীর নির্দেশ ছাড়াই কোন সিদ্ধান্ত নেবে। ইসমাঈল ইবনে ইসহাক মনে করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর সঙ্গীগণ সালিসদ্বয়ের কাজ কি হবে, তা জানতেন না।

আবূ বকর বলেছেন, এটা তাঁদের উপর সম্পূর্ণ মিথ্যা আরোপ। অথচ মানুষের সব চাইতে মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জবান সংযতকরণ ও সংরক্ষণ। বিশেষ করে মনীষীবৃন্দের কোন কথা বর্ণনা করতে হলে তা যথাযথভাবেই বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

—৩/৫৩

মানুষে যে কথাই উচ্চারণ করে, তার নিকট তার সর্বক্ষণ প্রস্তুত একজন সংরক্ষক উপস্থিত থাকে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৮)

বস্তুত যে লোক জানে যে তার কথার জন্যে তাকে পাকড়াও করা হবে, তাকে সেজন্যে জবাবদিহি করতে হবে, সে অবশ্যই কম কথা বলবে, যা জানে না তা বলবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে শরীয়তের ঘোষণা হচ্ছে দুই পক্ষ থেকে দুই জন সালিস নিয়োগ করা। কুরআন মজীদে এই বিধান স্পষ্ট ভাষায় নেয়া হয়েছে। তাহলে সে কথা এ মনীষিগণের অজানা থাকতে পারে কিভাবে। অথচ এটা কুরআনী ইলমের ব্যাপার। দ্বীন ও শরীয়তের অকাট্য ব্যবস্থা। তবে তাঁদের মত হচ্ছে, সালিসদ্বয় দুইজনের উকীল হবে। একজন স্বামীর পক্ষের আর অপর জন স্ত্রীর পক্ষের। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে তা-ই বর্ণিত। ইবনে উয়াইনাতা, আইয়ূব, ইবনে সীরীন, উবায়দাতা সূত্রে বর্ণিত, হযরত আলী (রা)-এর নিকট একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী উপস্থিত হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের পক্ষে কিছু সংখ্যক লোক ছিল। হযরত আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুইজন পুরুষ ও নারীর ব্যাপারটি কি ? তারা বলল, এ দুজনের মধ্যে ফাটল ও বিবাদ দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে আর একজন সালিস নিযুক্ত কর। তারা সংশোধন ও মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের দু'জনের মধ্যে মিল-মিশ করে দেবেন। হযরত আলী (রা) বললেন, এ দুজনের কর্তব্য কি, তা কি তারা জানে? তোমরা দুইজন সালিস। তোমাদের কর্তব্য হল, ওরা দুজন মিলিত হতে চাইলে দুজনকে মিলিয়ে দেবে। আর যদি তোমরা মনে কর যে, তারা বিচ্ছিন্ন হতেই দৃঢ় সংকল্প, তাহলে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। স্ত্রী বলল, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মীমাংসায় রাজি আছি। স্বামী বলল, বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। তখন আলী (রা) বললেন, তুমি মিথ্যা বললে। আল্লাহ্‌র নামে শপথ! তুমি আমার নিকট থেকে চলে যেতে পারবে না, যতক্ষণ স্ত্রীলোকটির মত অঙ্গীকার না করবে। তখন আলী (রা) জানালেন, সালিসদ্বয়ের কথা হবে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি অনুযায়ী। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হানাফী ফিকহবিদগণ বলেছেন, স্বামী রাজি না হলে সালিসদ্বয় তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে না। তা এজন্যে যে, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি খারাপ আচরণ করার কথা স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং দুই জন সালিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে শাসক স্ত্রীকে তালাক দিতে স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণের কথা স্বীকার করে নেয়, তাহলে শাসক তাকে স্বামীর নিকট থেকে খুলা তালাক নিতে বাধ্য করতে পারবে না। তার নেয়া মহরানা ফেরত দিতেও বলতে পারবে না। দুইজন সালিস নিয়োগের পূর্বেই যখন অবস্থা এরূপ, তখন তাদেরকে নিযুক্ত করার পরও এরূপই হবে। স্বামীর সম্মতি ও তার দায়িত্ব দেয়ার পূর্বে তাদের দুজনের দিক থেকে তালাক ঘটিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। আর স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তার নিয়ে নেয়া মহরানা ফেরত দিতেও তাকে বলা যাবে না। এ কারণে আমাদের হানাফী ফিকহবিদগণ বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি ছাড়া তাদের দুজনের মধ্যে 'খুলা' তালাক ঘটানো জায়েয হবে না। হানাফী ফিকহবিদগণ এ-ও বলেছেন যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি ছাড়া দুজনকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া সালিসদ্বয়ের জন্যে জায়েয নয়। কেননা শাসক-বিচারকই তা করতে পারে না।

তাহলে সালিসদ্বয় তা কি করে করতে পারে ? সালিসদ্বয় তো দুইজন উকীল মাত্র। একজন স্বামীর নিয়োজিত আর অপর জন্য স্ত্রী কর্তৃক নিয়োজিত। স্বামী তার উকীলকে খুলা তালাক দেয়ার বা দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়ার জন্যে কোন দায়িত্বশীল বানায় নি।

ইসমাঈল বলেছেন, উকীল তো বিচারক নয়। বিচার কার্যের দায়িত্ব তার উপর অর্পন করা না হলে সে কি করে বিচার করতে পারে ? হ্যাঁ, সে অস্বীকার করলেও তার উপর সে দায়িত্ব দেয়া যায় বটে।

কিন্তু এ কথা ভুল। কেননা যা বলা হয়েছে, তা উকীল বানানোর পরিপন্থী নয়। কেননা উকীল তো সে-ই যার উপর কোন কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। যে কাজের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে সে কাজ তো সে অবশ্যই করতে পারে। তাই সালিসদ্বয়ের তাদের দুজনের প্রতি কোন আদেশদান উকীল হওয়ার সীমালংঘনকারী কোন ব্যাপার নয়। দুজনের মধ্যে সৃষ্ট যে কোন বিবাদ ও ঝগড়া মিটমাট করার জন্যে দুই ব্যক্তিকে সালিস নিযুক্ত করাই যেতে পারে। তারা দুজন তাদের দুজনের মধ্যের মীমাংসা কার্য সম্পাদনের জন্যে উকীল হয়ে কাজ করবে। তারা তাদের দুজনের উপর অবশ্যই হুকুম চালাতে পারে। তারা যদি কোন কাজের আদেশ করে, তাহলে তা পালন করা দুজনের পক্ষেই বাধ্যতামূলক হবে। যেমন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাটল ও বিবাদ দেখা দিলে পারিবারিকভাবে দুজন 'হাকাম'— সালিস নিযুক্ত করার জন্যে কুরআনেই বলা হয়েছে। তাতে তাদের দুজনের আদেশ ওকালতীর তাৎপর্য-বহির্ভূত কোন ব্যাপার হয়ে যাবে না। দুই ব্যক্তির মধ্যকার ঝগড়া মিটমাট করার জন্যে সালিস নিযুক্তকরণ এক হিসাবে বিচারক নিয়োগের মতোই। আর বর্ণিত একটি দিক দিয়ে উকীল নিয়োগও সেই রকমেরই ব্যাপার। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্ট ফাটল ও বিবাদে নিযুক্ত সালিসদ্বয় নিছক ও খালেস ওকালতীর দৌলতেই কর্তৃত্ব চালাতে পারে— যেমন উকিল নিয়োগের সমস্ত ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

ইসমাঈল বলেছেন, উকীলকে সালিস বা বিচারক বলা হয় না। কিন্তু ব্যাপারটি তিনি যা মনে করেছেন, তা নয়! এখানে উকীলকে 'হাকাম' বলা হয়েছে অর্পিত ওকালতের দায়িত্বকে তাগিদপূর্ণ করার জন্যেই। তার কথা ঃ হাকামদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর উপর হুকুম চালাতে পারে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করলে সেরূপ করা যাবে না। স্বামী-স্ত্রীর উপর কোন আদেশ কার্যকর করা তাদের দুজনের জন্যে জায়েয হবে না, যদি তারা দুজন অস্বীকার ও অমান্য করে। কেননা তারা দুজন উকীল মাত্র। বিচারক তাদের দুজনের ব্যাপারটি বিচার-বিবেচনা করার জন্যে আদেশ দিতে বাধ্য। তাদের দুজনের ব্যাপারে হক এর প্রতিবন্ধক বিষয়াদি তাদেরকে জানিয়ে দেবে। ফলে তারা দুজন সালিস হওয়া থেকে পরিবর্তিত হয়ে বিচারকে পরিণত হবে যেমন করে তারা দুজন দুজনের ব্যাপার ভালো করে জানতে পেরেছে। ফলে তাদের দুজনের কথা তাদের ব্যাপারে অবশ্যই গ্রহণীয় হবে, যখন তারা দুজন একত্রিত হবে। জালিমকে অপর জনের উপর জুলুম করতে নিষেধ করা হবে। এ কারণে উকীল দুইজনকে 'দুইজন বিচারক' নাম দেয়া খুবই সমীচীন হবে। কেননা তাদের দুজনের কথা দুজনের জন্যে অবশ্যই কবুল করে নিতে হবে। তাই সে নামে দুজনের অভিহিত হওয়া খুবই সঙ্গত। কেননা স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই দেয়া দায়িত্ব অনুযায়ী তারা দুজন যদি খুলা তালাক দেয়,— তা তাদের দুজনের রায় ও সিদ্ধান্তের উপর অর্পিত ব্যাপার ছিল, মীমাংসা করার চেষ্টা করার জন্যে নিয়োজিত ছিল, তাই

তারা দুজন 'হাকাম' অভিধায় অভিহিত হয়েছে। কেননা 'হাকাম' নাম তো মীমাংসার চেষ্টা বোঝায় যে বিষয় সামনে আনা হয়েছে সেই বিষয়ে এবং বিচারের রায় পরম সত্যতা সহকারে কার্যকর করার জন্যে। তা যখন তাদের রায়-এর উপর অর্পিত ছিল ও একত্রিত রাখা বা বিচ্ছিন্নকরণের হুকুম কার্যকর করা তাদের দায়িত্ব ছিল, তখন যা তারা কার্যকর করবে, তা হবে। তাই এ বিবেচনায় তারা দুজন 'হাকাম' অভিধায় অভিহিত হল। তাই তাদের দুজনের কাজ যখন বিচারকে বিচার কার্যের মতো হল কল্যাণ ও মীমাংসার চেষ্টা করার দিক দিয়ে তখন তাদেরকে 'দুজন হুকুমদাতা' বলা খুবই সঙ্গত। তা সত্ত্বেও তারা দুজন কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর দুজন উকীল। কেননা স্বামী স্ত্রীর উপর খুলা বা তালাক পর্যায়ের কোন হুকুম কার্যকর করা তাদের দুজনের আদেশ ছাড়া কখনই সঙ্গত হতে পারে না।

তার ধারণা, হযরত আলী (রা) উপরোক্ত ঘটনায় স্বামীর উপর ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। কেননা সে কুরআনের ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়নি। তাকে উকীল নিযুক্ত করতেও রাজি করান নি। তিনি তাকে পাকড়াও করেছেন আল্লাহ্র কিতাবের ফয়সালা মেনে নিতে রাজি হয়নি বলে! কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়, যেরূপ বলা হয়েছে। কেননা স্বামী যখন বলল বিচ্ছেদ নয়। আলী (রা) বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। স্ত্রী যেমন করে অঙ্গীকার করেছে তুমিও তেমন অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে যেতে পারবে না। এ কথার মাধ্যমে হযরত আলী (রা) স্বামীর প্রতি যে রুঢ়তা দেখিয়েছেন তা শুধু এ জন্যে যে, বিচ্ছেদের জন্যে উকীল নিয়োগ না করার জন্যে মাত্র। তিনি উক্ত কথার দ্বারা তাকে বিচ্ছেদের জন্যে উকীল বানাতে বলেছেন। স্বামী কুরআনের ফয়সালা মেনে নিতে তো অস্বীকৃতি জানায়নি তাই তার প্রতি সে কারণে রুঢ়তা দেখানোর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সে শুধু বলেছিল, আমি বিচ্ছেদে সম্মত নই। যদিও স্ত্রী 'হাকাম' নিয়োগ করে তাতে সম্মতি দিয়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিচ্ছেদের রায় কার্যকর হতে পারে কেবল তখন, যদি স্বামী সেজন্যে কাউকে উকীল বানায়। অন্যথায় নয়।

আর আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا –

তারা স্বামী-স্ত্রী দুজন যদি মীমাংসা চায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের দুজনের মধ্যে মিটমাট করে দেবেন।

এ থেকে আমরা জানলাম যে, 'হাকাম'দ্বয় তাদের ফয়সালা শুনিয়ে দেবে। তখন সালিস দুজন যদি প্রকৃত সত্যের ইচ্ছুক হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক ও যথার্থ হুকুম বা ফয়সালা দেয়ার তওফীক দেবেন।

বলা হয়েছে, এ কথাটি উকীলদ্বয়ের প্রসঙ্গে বলা হয়নি। কেননা তাদের কোন একজনের জন্যেও জায়েয নয় যা করার আদেশ করা হয়েছে তা লঙ্ঘন করা। আর যা বলা হয়েছে তা ওকালতের তাৎপর্য পরিপন্থী নয়। কেননা উকীলদ্বয় যদি একত্রিত রাখা বা বিচ্ছিন্নকরণের মধ্যে যা-ই সমীচীন মনে করবে কল্যাণ ও মীমাংসার চেষ্টা ব্যাপদেশে তা করার জন্যেই তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই তাদের এর মধ্যে যা-ই তারা সিদ্ধান্ত করবে তা করার জন্যে ইজতিহাদ

করবে— তা-ই তাদের কর্তব্য। আর জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের দুজনকে মীমাংসা করার তওফীক দেবেন যদি তাদের নিয়ত খালেস হয়। এরূপ অবস্থায় উকীল ও 'হাকাম' হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেননা তাদের প্রত্যেকের উপর কল্যাণ ও মীমাংসার দিক দিয়ে যা-ই তাদের উপর অর্পিত হয়েছে তা-ই তারা করবে। আল্লাহ্ এই যে গুণের কথা বলেছেন, এই গুণ তার সাথে অবশ্যই জড়িত থাকবে।

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আবূ সালমাতা, তায়ূস ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা সকলেই বলেছেন, 'হাকাম' দ্বয় যে ফয়সালাই করবেন, তা-ই জায়েয ও সঙ্গত বিবেচিত হবে। আমরাও তাই মনে করি। কিন্তু তার কথার সমর্থনে এতে কোন দলীল নেই। কেননা তারা এ কথা বলেন নি যে, 'হাকাম'দ্বয়ের বিচ্ছিন্নকরণও 'খুলা' তালাক পর্যায়ে কাজ স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া-ই সঙ্গত ও জায়েয; বরং বলেছেন যে, 'হাকাম'দ্বয় স্বামী-স্ত্রীর উকীল নিয়োগে সম্মত হওয়া ছাড়া বিচ্ছিন্নকরণের অধিকারী নয়। তা ছাড়া 'হাকাম'দ্বয় উকীলও হতে পারে না। তার পরে তারা যে ফয়সালা দেবে, তা অবশ্যই কার্যকর ও জায়েয হবে। স্বামীর সম্মতি ছাড়া 'হাকাম' দ্বয় দুজনকে খুলা তালাকেই বা রাজি করাতে পারে কিভাবে ? এবং স্ত্রী মালিকানা থেকে নিয়ে নেয়া মহরানা-ই বা বের করতে পারে কিভাবে ? অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

> তোমরা স্ত্রীদের মহরানা তাদেরকেই একনিষ্ঠভাবে দিয়ে দাও। তারা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছা ও খুশীতে যদি তার কোন অংশ তোমাদেরকে দেয়, তাহলে তোমরা তা সুস্বাদু সুখাদ্য হিসেবে ভোগ কর।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

> তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু ফেরত নেবে— তা তোমাদের জন্যে হালাল নয়। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় পায়, তাহলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা— সমাজের লোকেরা— যদি ভয় পাও যে, তারা দুজন আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যে বিনিময় দেবে তা গ্রহণে রাজি হলে দুজনের কোন দোষ বা গুনাহ্ হবে না।

এ আয়াতে যে 'ভয়'-এর কথা বলা হয়েছে, তার-ই বাস্তব তাৎপর্য স্বরূপ বলা হয়েছে ঃ তাহলে তোমরা স্বামীর দিক থেকে একজন 'হাকাম' ও স্ত্রীর দিক থেকে একজন 'হাকাম' নিযুক্ত কর।

স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তার কোন কিছুই ফেরত নিতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। অবশ্য দুজন সম্পর্কে ভয়ের সঞ্চার হলে তারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না এই ভয়ের উদ্রেক হওয়ার শর্তে স্ত্রীর বিনিময় দিয়ে তালাক গ্রহণ জায়েয করে দেয়া হয়েছে এবং স্বামীর জন্যেও তা গ্রহণ করা হালাল করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় 'হাকাম'দ্বয় খুলা বা তালাক ঘটিয়ে দেবে তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে, তা কি করে জায়েয হতে পারে ? অথচ আল্লাহ স্পষ্ট-অকাট্যভাবে স্বামীর দেয়া কোন কিছু স্ত্রীর নিকট থেকে ফিরিয়ে নেয়া হালাল নয় বলেছেন। হ্যাঁ, তারা তাদের মনের খুশীতে কিছু দিলে তা ভিন্ন কথা। তাই স্বামীর উকীল নিয়োগ ছাড়া-ই 'হাকাম'দ্বয় তাদের মধ্যে খুলা তালাক ঘটিয়ে দিতে পারে বলা কুরআনের ঘোষণার সুস্পষ্ট পরিপন্থী সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে যদি তোমাদের দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ের মাধ্যমে হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ আয়াতে মালের মালিকের সম্মতি ছাড়া তার মাল ভক্ষণ করা প্রত্যেকের জন্যেই হারাম করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না শাসকের নিকট তা তুলে দিয়ে ....

এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, শাসক বা অন্যান্য কেউ-ই কারোর মাল তার সম্মতি ছাড়া নিয়ে নিতে পারে না, তা হালাল নয়।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ -

কোন মুসলিম স্বীয় খুশী মনে কিছু না দিলে মুসলিম ব্যক্তির কোন মাল নিয়ে নেয়া হালাল নয়।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

فَمَنْ قُضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ بِشَيْئٍ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ -

আমি যদি কারোর ভাইর হক্ তার জন্যে দিয়ে দেই তাহলে আগুনের— জাহান্নামের— একটি খন্ডই আলাদা করে তাকে দেই।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, শাসকের পক্ষেও স্ত্রীর মাল নেয়া ও তা স্বামীকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। স্বামীর উপর তার উকীল বানানো ব্যতিরেকে ও তার সম্মতি-সন্তুষ্টি ছাড়া তালাক চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তার হতে পারে না। কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার এটাই ফয়সালা ঃ শাসক তা ব্যতীত কোন হক প্রত্যাহার করতে ও তা অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারে না। অতএব 'হাকাম'দ্বয় নিযুক্ত হয় মীমাংসা ও মিলমিশ করিয়ে দেয়ার জন্যে, দুজনের মধ্যে কে জালিম তা প্রমাণ করার জন্যে। সাঈদ কাতাদাতা থেকে তা-ই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র কথা ঃ তোমরা সে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ও বিবাদের ভয় পেলে ...... দুজন 'হাকাম' বা সালিস পাঠাতে বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে তাদের মধ্যে সন্ধি ও মীমাংসা করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাত্র। তারা যদি তাদের মধ্যে সন্ধি করানো সম্ভব মনে করে, জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখা সম্ভব মনে করে, তবে তাই করবে। দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কোন অধিকার তাদের নেই। আতা থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতের ধরনে প্রমাণ রয়েছে এ কথার যে, 'হাকাম'দ্বয়ের কোন অধিকার নেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়ার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্র এ কথাটি ঃ 'তারা দুজন সন্ধি ও মিলমিশ ঘটাতে চাইলে আল্লাহ তাদের দুজনের মধ্যে মিলমিশ ঘটিয়ে দেয়ার তওফীক দেবেন।' আল্লাহ বলেন নি যে, তারা দুজন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে তা ঘটানোর তওফীক তাদেরকে দেবেন। 'হাকাম'দ্বয়কে বলা হয়েছে দুজনের মধ্যে যে জন জালিম তাকে ওয়ায করতে— উপদেশ দিতে ও নসীহত করতে। তারা জুলুম বন্ধ করতে বলবে এবং সে বিষয়ে শাসককে জানিয়ে দেবে, যেন শাসক জালিমের হাত ধরে ফেলতে পারে। স্বামী-ই যদি জালিম হয়, তার এ জুলুমের প্রতিবাদ করতে হবে। তারা দুজন স্বামীকে বলবে, তোমার স্ত্রীকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া তোমার জন্যে হালাল নয়, তুমি তাকে তোমার নিকট থেকে খুলা' তালাক নিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেও তা করতে পার না। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি জালিম হয়, তাহলে 'হাকাম'দ্বয় তাকে বলবে, তোমার জন্যে বিনিময় দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া হালাল হয়েছে এবং তা গ্রহণ করতে স্বামী প্রস্তুত। কেননা 'হাকাম'দ্বয় স্ত্রী বিদ্রোহাত্মক আচরণের প্রমাণ পেয়েছে। সে দুজনের প্রত্যেকের জন্যে যখন সেই হুকুম-ই নির্দিষ্ট যা করার জন্যে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তখন বিচ্ছেদ ঘটানো ও খুলা তালাকের পথ প্রশস্ত করার কোন ইখতিয়ার তাদের কারোরই থাকতে পারে না। কেননা আগেই বলেছি, ওরা দুজন উকীল মাত্র। স্বামী-স্ত্রী দুজনই 'খুলা' তালাকে রাজি হলে তা তারা ঘটিয়ে দিতে পারে, তাদের পক্ষে তা করা জায়েয। আর তারা একত্রিত ও অবিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলে তা থাকার ব্যবস্থা করে দেয়াই তাদের কর্তব্য। এটাই তাদের করা মীমাংসা হবে। ফলে এক অবস্থায় তারা দুজন সাক্ষী আর অপর অবস্থায় তারা দুজন মীমাংসাকারী আর তৃতীয় এক অবস্থায় তারা দুজন ভাল কাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজের নিষেধকারী। আর চতুর্থ অবস্থায় তারা দুজন উকীল, যখন একত্রিত রাখা বা বিচ্ছিন্নকরণ— এর মধ্যে কোন একটির দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হবে। স্বামী স্ত্রীর উকীল বানানো ছাড়া-ই দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে বা 'খুলা' তালাকের উপায় করে দেবে বলে যারা মত দিয়েছে, তাদের মত অত্যন্ত নির্মম এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান-বহির্ভূত।

শাসন ক্ষমতার মধ্যস্থতা ছাড়া-ই খুলা' তালাক হওয়া

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক, আল-হাসান ইবনে সালিহ্ ও শাফেয়ী বলেছেন, সরকারী প্রশাসনের সংস্পর্শ ছাড়া-ই খুলা' তালাক ঘটানো সম্পূর্ণ জায়েয। উমর, উসমান ও ইবনে উমর (রা) থেকেও এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। আল-হাসান ও ইবনে সীরীন বলেছেন, সরকারী প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়াও যে তা জায়েয, তার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا -

স্ত্রীরা নিজেদের খুশীতে ইচ্ছুক হয়ে মহরানা থেকে কিছু ফিরিয়ে দিলে তা তোমরা সুখাদ্য সুস্বাদু হিসেবে খেতে পার। (সূরা নিসা ঃ ৪)

এ আয়াতটির বাহ্যিক তাৎপর্যই তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয করে দেয়। খুলা' তালাকে স্ত্রী তো তার নেয়া মহরানা-ই স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়। তা নেয়া এবং তা নিয়ে স্ত্রীকে খুলা' তালাক দেয়া জায়েয। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ -

স্ত্রী যা বিনিময় হিসেবে দেয়, তা তার দেয়া ও স্বামীর তা গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

এ কাজে প্রশাসনের মধ্যস্থতার কোন উল্লেখ আয়াতে করা হয়নি। তাই বিবাহের আক্‌দ ও তার মত অন্যান্য বহু প্রকারের চুক্তিই যেমন সরকারী মধ্যস্থতায় ও মধ্যস্থতা ছাড়া-ই জায়েয, খুলা' তালাকের চুক্তিও তেমনি জায়েয। কেননা এ সবই চুক্তি, আর এই চুক্তিসমূহের মধ্যে কোন একটির বিশেষ বিশেষত্ব নেই। তা সরকারের মধ্যস্থতায়ই হতে হবে, এমন কোন শর্ত করা হয়নি।

পিতা-মাতার খিদমত ও সদ্ব্যবহার করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَانًا -

তোমরা আল্লাহ্‌র দাস হয়ে থাক, তাঁর সাথে একবিন্দু জিনিস শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তওহীদ স্বীকারের আদেশের পাশাপাশি পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ ও তাদের কল্যাণ সাধনের আদেশ করেছেন। তার ইবাদত করার যেমন আদেশ করেছেন, তেমনি পিতা-মাতার সাথেও ভাল আচরণ করার আদেশ করেছেন। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্‌র শোকর করার আদেশের পাশাপাশি পিতা-মাতার শোকর করারও আদেশ করেছেন। বলেছেন ঃ

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ -

তুমি আমার শোকর কর, তোমার পিতা-মাতারও। পরিণতি তো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

পিতা-মাতার হক্ যে অনেক বড় ও বিরাট এবং তাদের কল্যাণ সাধন ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার যে একান্তই কর্তব্য তা উদ্ধৃত আয়াত দুটিই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا -

তুমি তাদেরকে উহ্ বলো না, তাদেরকে ধিক্কার দিও না, গাল-মন্দ বল না এবং তাদের প্রতি সম্মানজনক কথা বল। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৩)

এ পর্যায়ের শেষ পর্যন্তকার কথা স্মরণীয়। অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا -

এবং মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের অসিয়ত করেছি, হুকুম দিয়েছি।
(সূরা আনকাবুত ঃ ৮)

আর কাফির পিতা-মাতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا -

কাফির পিতা-মাতা দুজনই যদি তোমার উপর জোর খাটায় তোমাকে বাধ্য করতে চায় আমার সাথে শিরক করার জন্যে যার বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনে নিও না। তবু দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে উত্তম সংস্পর্শ রক্ষা করে চল। (সূরা লুকমান ঃ ১৫)

আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَحْلِفُ اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى مِثْلِ جَنَاحِ الْبَعُوْضَةِ اِلَّا كَانَتْ وَكْتَةٌ فِىْ قَلْبِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

কবীরা গুনাহ্ সমূহের মধ্যেও অতিবড় গুনাহ হল আল্লাহ্ সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও সর্বাত্মক কিরা-কসম। যাঁর মুষ্ঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর নামের শপথ যে, কেউ যদি কিরা-কসম করে, তা মাছির ডানার সমান হলেও তার দিলের উপর কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে একটি চিহ্ন পড়ে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব— মারুফ কাজে, আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে নয়। কেননা ঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য ও হুকুম পালন করা যেতে পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ সাঈদ ইবনে মনসূর আবদুল্লাহ ইবনে অহব আমর ইবনুল হারিস দররাজ আবুস্ সামাহ আবুল হায়সাম, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইয়ামেনের এক ব্যক্তি হিজরত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামার নিকট উপস্থিত হল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ামেনে তোমার আপনজন কেউ আছে কি? লোকটি বলল, আমার পিতা-মাতা আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তারা দুজন তোমাকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছে কি? বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি ফিরে চলে যাও

এবং তাদের দুজনের অনুমতি চাও, তারা যদি তোমাকে অনুমতি দেয়, তাহলে তুমি তাদের খেদমতে প্রাণপণে লেগে যাও (অথবা জিহাদ কর) আর তা না দিলে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাক।

এ কারণে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে শরীক হওয়া জায়েয নয় যখন শত্রুর সাথে জিহাদে যাবে। তা তার জন্যে যার ঘরের বাইরে যাওয়া শোভন। তাঁরা বলেছেন, যদি সে জিহাদ শত্রুর সাথে না হয়, শুধু বাহির হওয়াই ফরয, তার জন্যে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া-ই বাইরে যাওয়া ফরয। ব্যবসায়েও এ ধরনের কাজের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে যাওয়া প্রসঙ্গে তারা বলেছেন, যদি তাতে যুদ্ধের ব্যাপার না থাকে, তাহলে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া-ই বাইরে যাওয়া জায়েয। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদ-যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছেন যদি সে ফরয আদায়ের কাজে অন্য লোকেরা অগ্রসর হয়ে থাকে। কেননা তাতে নিহত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। আর তার ফলে পিতা-মাতার মনে মারাত্মক আঘাত লাগতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মুবাহ কার্যকলাপে— যাতে নিহত হওয়ার বাহ্যত কোন কারণ নেই— বাইরে যেতে নিষেধ করার কোন অধিকার পিতা-মাতার থাকতে পারে না। এ কারণে সে কাজে পিতা-মাতার অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আর আল্লাহ্ যেহেতু পিতা-মাতার হককে খুব বড় ও তাগিদপূণ করে পেশ করেছেন, এ জন্যে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, কাফির পিতাকে হত্যা করা পুত্রের উচিত নয়, যদি সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীও হয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তুমি তাদের জন্যে উহ্-ও বলো না।' বলেছেন ঃ 'পিতা-মাতা যদি তোমার উপর জোর খাটায় আমার সাথে শিরক করার জন্যে যে বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই— তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না, তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে ভালো আচরণ অবশ্যই করবে।' তারা যখন কুফর-এর উপর দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ করছে, সেই অবস্থায়ও তাদের সাথে ভাল আচরণ করার জন্যে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। তাদের দুজনের উপর অস্ত্র না চালানো, তাদেরকে হত্যা না করা 'মারূফ' পর্যায়ের কাজ। অবশ্য তা না করে যদি কোন উপায়ই না থাকে, তাহলে তা করা যাবে, যেমন তাকে হত্যা না করলে সে-ই হয়ত সন্তানকে হত্যা করবে। সে অবস্থায় পুত্রের পক্ষে পিতাকে হত্যা করা জায়েয। কেননা তা না করলে সে নিজের হত্যার ব্যবস্থাই যেন করল। অথচ সে অবস্থা থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারত। আর অন্যকে সুযোগ দেয়া তাকে হত্যা করার— এটা নিষিদ্ধ, যেমন নিষিদ্ধ আত্মহত্যা করা। এরূপ অবস্থায় পুত্র পিতাকে হত্যা করতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হিন্‌জিলা ইবনে আবূ আমের পাদ্রীকে নিষেধ করেছিলেন তার পিতাকে হত্যা করতে, অথচ সে মুশরিক ছিল। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তির পিতা-মাতা কাফির অবস্থায় মরে, তাদেরকে সে গোসল করাবে, তাদের পেছনে পেছনে কবরস্থানে যাবে ও তাদেরকে দাফন করবে— যদি তারা খৃষ্টান হয়। হিন্দু হলে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হবে। কেননা এতটা কাজ নিশ্চয়ই 'মারূফ' পর্যায়ের, যা করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ই দিয়েছেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং পিতা-মাতার সাথে ইহসান করতে হবে'— এর প্রকৃত তাৎপর্য কি এবং এ কথাটি কাকে বলা হয়েছে ?

জবাবে বলা যাবে, এর তাৎপর্য ঃ তোমরা পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার ও তাদের কল্যাণ কামনা কর। অথবা হতে পারে ঃ 'তোমরা পিতা-মাতার সাথে শুভ শুভ আচরণ কর, যেমন তা হওয়া উচিত।'

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَبِذِى الْقُرْبٰى এবং নিকটবর্তী লোকদের সাথেও এটা সেলায়ে রেহমী রক্ষা করার আদেশ। নৈকট্য সম্পন্ন লোকদের প্রতি কল্যাণ করার এটা আদেশ। এ পর্যায়ে আলোচ্য সূরা আন্-নিসার শুরুতে والارحام পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলে এসেছি।

আল্লাহ্ সূরাটির সূচনা করেছেন আল্লাহর তওহীদ ও ইবাদতের কথা দিয়ে। কেননা তা-ই হচ্ছে সেই মূল, যার উপর সমস্ত শরীয়ত ও নবুয়্যত প্রতিষ্ঠিত। তা লাভ করতে পারলেই দ্বীনের সমস্ত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। পরে পিতা-মাতার প্রতি যে কল্যাণময় ব্যবহার ও আচরণ করা কর্তব্য তার কথা বলেছেন। তাদের হক্ আদায় করার ও তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করার আদেশ করেছেন। তারপরে নৈকট্য সম্পন্ন প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। সে তোমার নিকটবর্তী মুমিন ব্যক্তি, তার নৈকট্যের কারণে তোমার উপর হক রয়েছে। তার সাথে মাওয়ামেলাত ও সাহায্য-সহযোগিতার ঋণের কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর কথা। সে বংশীয় সম্পর্কের দিক দিয়ে দূরবর্তী হলেও মুমিন হওয়ার কারণে সে তোমার প্রতিবেশি হওয়ায় হক্‌দার হয়েছে। আর ইসলামী মিল্লাতের সংরক্ষণের দাবিতে সে তোমার সাথে একাত্ম। তার সাথে তোমার আন্তরিক নিষ্ঠার চুক্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও দহাক— এঁরা সকলেই বলেছেন, এক প্রতিবেশী তোমার নিকটে বাস করে, বংশের দিক দিয়েও নিকটাত্মীয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তিন প্রকারের এবং প্রতিবেশীর তিনটি হক্ রয়েছে। তা হল প্রতিবেশী হওয়ার হক, নিকটাত্মীয়তার হক ও ইসলামের হক। আর এক প্রকারের প্রতিবেশীর দুটি হক। একটি প্রতিবেশী হওয়ার হক আর একটি মুসলিম হওয়ার হক। আর এক প্রকারের প্রতিবেশীর শুধু প্রতিবেশী হওয়ার হক থাকে। সে মুশরিক আহ্‌লি কিতাব।

আল্লাহ্‌র কথা وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ পার্শ্ববর্তী সঙ্গী। এ পর্যায়ে ইবনে আব্বাস থেকে দুইটি বর্ণনার একটিতে এবং সাঈদ ইবনে যুবায়র, আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাতা, সুদ্দী, ও দহাক থেকে বর্ণিত, সে হচ্ছে সফর সঙ্গী। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, ইবরাহীম ও ইবনে আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত, সে হচ্ছে স্ত্রী। ইবনে আব্বাস থেকে অপর বর্ণনাটিতে বলা হয়েছে, সে হচ্ছে সেই লোক, যে তোমার কল্যাণ কামনায় অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার নিকট এসে থাকছে। কেউ কেউ বলেছেন, সে নিকটবর্তী ঘরের প্রতিবেশী। তার সাথে বংশীয় সম্পর্ক নিকটের হোক বা দূরের। অবশ্য যদি সে মুমিন হয়।

আবূ বকর বলেছেন, ব্যবহৃত শব্দের এসব অর্থই হতে পারে। তাই এসব অর্থই তার থেকে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। দলীল ছাড়া তার একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ সহীহ্ নয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ -

জিবরাঈল সব সময়ই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত ও নসীহত করেন। তার ফলে আমার মনে এ ধারণার উন্মেষ হল যে, সে সম্ভবত তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দেবে।

সুফিয়ান আমর ইবনে দীনার— নাফে' ইবনে যুবায়র ইবনে মুতয়িম-আবূ শুরায়হ আল-হুজারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهٗ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ -

যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন তার মেহ্‌মানকে সম্মান করে। আর যে লোক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন ভালো কথা বলে। অন্যথায় যেন সে চুপ করে থাকে।

উবায়দুল্লাহ আল-অসাফী আবূ জাফর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مَا اٰمَنَ مَنْ اَمْسٰى شَبْعَانَ وَاَمْسٰى جَارُهٗ جَائِعًا -

যে লোক সন্ধ্যা ও রাত্রি যাপন করল পরিতৃপ্ত হয়ে এবং তার প্রতিবেশী থাকল ক্ষুধার্ত, অভুক্ত, সে কখনই ঈমানদার হতে পারে না।

উমর ইবনে হারুন আল-আনসারী, তার পিতা, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ سُوْءُ الْجِوَارِ وَقَطِيْعَةُ الْاَرْحَامِ وَتَعْطِيْلُ الْجِهَادِ وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَظِّمُ الْجِوَارَ وَتُحَافِظُ عَلٰى حِفْظِهِ وَتُوْجِبُ فِيْهِ مَاتُوْجِبُ فِي الْقَرَابَةِ -

কিয়ামতের একটা বড় লক্ষণ হল খারাপ সম্পর্কের প্রতিবেশী, রিহম সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, জিহাদ বন্ধ হওয়া। আরবরা জাহিলিয়াতের জামানায় প্রতিবেশীর সম্পর্ককে খুব বড় করে দেখত, তার সংরক্ষণে সহযোগিতা করত এবং নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে যা কর্তব্য মনে করত, প্রতিবেশীর প্রতিও সেই কর্তব্য মনে করত।

কবি জুহায়র বলেছে ঃ

وَجَارُالْبَيْتِ وَالرَّجُلُ الْمُنَادِيْ : اَمَامَ الْحَيِّ عَقْدُهُمَا سَوَاءٌ -

ঘরের প্রতিবেশী ও ঘোষক ব্যক্তি— গোত্রের সম্মুখে এ দুজনের চুক্তি অভিন্ন।

ঘোষক ব্যক্তি বলতে সভা-সম্মেলনে যে তোমার সঙ্গী তাকে বুঝিয়েছে। আর তা-ই গোত্রের মজলিস।

কোন কোন মনীষী الصاحب بالجنب বলে তাকে বুঝিয়েছেন, যে তোমার ঘরের সঙ্গে মিলিয়ে ঘর বেঁধেছে। আল্লাহ্ তার কথা বিশেষভাবে বলে তার হক্ সম্পর্কে তাগিদ করেছেন, যে ঘরের সঙ্গে মিলিত ঘরের বাসিন্দা তার হক যে এরূপ নয় তার থেকে ভিন্নতর। আবদুল বাকী ইবনে কানে আবূ আমর ও মুহাম্মদ ইবনে উসমান আল-কুরাশী, অরবাক আহ্মাদ ইবনে ইউনুস, ইসমাঈল ইবনে মুসলিম, আবদুস সালাম ইবনে হরব, আবূ খালিদ আদদালানী, আবূল উলা আল-আজদী, হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান আল-হুমাইরী একজন সাহাবী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاَجِبْ اَقْرَبَهُمَا بَابًا فَاِنَّ اَقْرَبَهُمَا بَابًا اَقْرَبُهُمَا جُوَارًا ، وَاِذَا سَبَقَ اَحَدُهُمَا فَابْدَأْ بِالَّذِيْ سَبَقَ -

দুইজন আহ্বানকারী এক সঙ্গে আহ্বান করলে দুজনের মধ্যে যার দুয়ার তুলনামূলকভাবে নিকটবর্তী তার আহ্বানে সাড়া দাও। কেননা তুলনামূলকভাবে যার ঘরের দুয়ার নিকটবর্তী সে নিকটতর প্রতিবেশী। আর সে দুজনের মধ্যে আগে-পরে হলে আগের জনের ডাকে সাড়া দাও।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী। আবদুল বাকী ইবনে কানে' আল-হাসান ইবনে শুবায়ব আল-মামরী, মুহাম্মাদ ইবনে মুসাফফা, ইউসুফ ইবনুস্ সফর, আল আওজায়ী, ইউনুস, জুহরী, আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে, রাসূল (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি অমুক গোত্রের মহল্লায় অবস্থান নিয়েছি, সেখানে আমার জন্যে কঠোর ও শক্ততম হচ্ছে আমার প্রতিবেশীর মধ্যে অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি। তখন নবী করীম (স) আবূ বকর, উমর ও আলী (রা)-কে পাঠালেন, তারা যেন সে মহল্লার মসজিদের দুয়ার দেশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করেন যে, তোমরা জেনে রাখো, চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশ বিস্তার্ণ। আর —

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بِوَائِقَهُ -

যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতায় তার প্রতিবেশী ভীত-সন্ত্রস্ত সে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

বলেছেন, আমি জুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ বকর, চল্লিশ ঘর বলতে কি বুঝিয়েছেন? বললেন, এদিকে চল্লিশ ঘর ওদিকে চল্লিশ ঘর। আল্লাহ্ তা'আলা সমাজবদ্ধ জীবন বানিয়েছেন মদীনা নগরে প্রতিবেশ গড়ে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَايُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلاً -

মুনাফিক লোকেরা, যাদের মনে রোগ ও দোষ রয়েছে এবং যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, তারা যদি নিজেদের এ কাজ থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে আমরা তোমাকে দায়িত্বশীল বানাব। অতঃপর এ শহরে তোমার সাথে তাদের প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করা কঠিনই হবে। (সূরা আহযাব ঃ ৬০)

এ আয়াতে আল্লাহ্ রাসূলের সাথে তাদের একত্র বাসকে প্রতিবেশ বানিয়ে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ যেসব কল্যাণের উল্লেখ করেছেন, তা কয়েকটি দিক দিয়ে হতে পারে। এক সমাজের দরিদ্র ব্যক্তি যখন ক্ষুধা ও বস্ত্রহীনতার কঠোর কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়, ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়, তখন তার প্রতি দয়ার্দ্রতা, সহানুভূতিশীলতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন। আর একটি হচ্ছে উত্তম সামষ্টিক জীবন ও প্রতিবেশীকে কষ্ট ও পীড়ন থেকে বাঁচানো, যেসব জুলুম মানুষকে গ্রাস করে তা থেকে রক্ষা করা। সেই সাথে উত্তম চরিত্রতা মহনুভবতা, শুভ সুন্দর কর্মশীলতা। এই প্রতিবেশের কারণে আল্লাহ্ শুফয়ার হক্ আদায় করা জরুরী করে দিয়েছেন আর তাহলে কারোর প্রতিবেশীর ঘর বা জমি বিক্রয় হলে তা ক্রয় করার অধিকার প্রতিবেশীরই সর্বাধিক।

প্রতিবেশীর শুফয়া পর্যায়ে বিভিন্ন মত

আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফার বলেছেন, পণ্যদ্রব্যে শরীক পথের শরীকের অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্ন। পরে পথের শরীক ব্যক্তি সংলগ্ন প্রতিবেশীর অপেক্ষা বেশি অধিকার সম্পন্ন। এ দুজনের পর সংলগ্ন প্রতিবেশীর অধিকার। ইবনে শাবরামাতা, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ এই মত প্রকাশ করেছেন। আর মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ

لَاشُفْعَةَ اِلَّا فِىْ مَشَاعٍ ، وَلَا شُفْعَةَ فِيْ بِئْرٍ لَا بِيَاضَ لَهَا وَلَا تَحْتَمِلُ الْقَسْمُ –

অবিভক্ত ও সম্মিলিত জিনিস ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্র শুফয়ার হক্ হয় না। আর যে কূপে উন্মুক্ত স্থান নেই— যা বিভক্ত হওয়ার যোগ্য নয়, তাতেও শুফ্য়া স্বীকৃত নয়।

প্রতিবেশীর শুফয়া'র হক রয়েছে, তা আগের কালের বিপুল সংখ্যক মনীষী থেকে বর্ণিত। উমর ও আবূ বকর ইবনে আবূ হাফসা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, কাযী শুরাইহ্ বলেছেন, তিনি উমর (রা) লিখেছিলেন, আমি প্রতিবেশীর জন্যে শুফ্য়ার পক্ষে রায় দিচ্ছি। আসিম শবী শুরাইহ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

اَلشَّرِيْكُ اَحَقُّ مِنَ الْخَلِيْطِ وَالْخَلِيْطُ اَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ اَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ –

শরীফ ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিসের মিশ্রে একত্রিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্ন এবং বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিসে একত্রিত ব্যক্তি প্রতিবেশী অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্ন। আর প্রতিবেশী তাদের ছাড়া অন্যান্যের মধ্যে অধিক অধিকার সম্পন্ন।

আইয়ূব মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ বলা হতো যে, একটি জিনিসে শরীক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকৃতির মিশ্রে একত্রিত ব্যক্তির অপেক্ষা শুফয়া'র অধিক হকদার। আর বিভিন্ন প্রকৃতির মিশ্রে শরীক ব্যক্তি অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিক অধিকারসম্পন্ন।

ইবরাহীম বলেছেন, শরীক যদি কেউ না থাকে, তাহলে প্রতিবেশী শুফ্‌য়া পাওয়ার বেশি অধিকারী। তায়ূসও এরূপ মতই দিয়েছেন। ইবরাহীম ইবনে মায়সারাতা বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয আমাদের নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন, সীমাসমূহ সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পর 'শুফ্‌য়া'র অধিকার থাকে না। তায়ূস বলেছেন ঃ প্রতিবেশী বেশি অধিকার রাখে। প্রতিবেশীর শুফ্‌য়া পাওয়ার অধিকার প্রমাণ করে সেই হাদীস, যা হুসায়ন আল-মুয়াল্লিম আমর ইবনে শুয়ায়ব, আমর ইবনুশ্‌ শরীদ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বললাম ঃ আমার একখন্ড জমি আছে, তাতে কেউ শরীক নয়। শরীক আছে যত আমার প্রতিবেশী। তখন তিনি বললেন ঃ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ —প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে অধিক অধিকরী। আবূ হানীফা বর্ণনা করেছেন, আবদুল করীম আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরিমাতা, রাফে' ইবনে খদীজ (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সাদ তাঁর একখানি ঘর পেশ করলেন। বললেন, এ ঘরখানি নিয়ে নও। আমি তাতে দিয়ে দিলাম অনেক বেশি তুমি যা আমাকে দেবে তার তুলনায়। কিন্তু তুমিই তা পাওয়ার বেশি অধিকারী। কেননা আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ 'প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে বেশি অধিকারসম্পন্ন।' আবূ যুবায়র জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, রাসূলে করীম (স) প্রতিবেশীর দাবিতে 'শুফয়া' পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন। আবদুল মালিক ইবনে আবূ সুলায়মান, আতা, জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে অধিক হক্‌দার, তার জন্যে অবশ্যই অপেক্ষা করা যাবে— করা হবে, যদি সে অনুপস্থিত থাকে, যখন তাদের দুজনের পথ অভিন্ন হয়। ইবনে আবূ লায়লা নাফে' ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে— যতটা ছিল— অধিক হকদার। কাতাদাতা, আল-হাসান, সামুরাতা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

جَارُالدَّارِاَحَقُّ بِشُفْعَةِ الْجَارِ -

ঘরের প্রতিবেশী প্রতিবেশীর শুফয়ায় অধিক হক্‌দার।

কাতাদাতা আনাস থেকে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

جَارُالدَّارِ اَحَقُّ بِسَالدَّارِ -

ঘরের প্রতিবেশী ঘর পাওয়ার অধিক হকদার।

সুফিয়ান মনসুর, আল-হিকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী ও আবদুল্লাহ (রা) কে যিনি বলতে শুনেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা দুজন বলেছেন ঃ রাসূল (স) প্রতিবেশী সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন। ইউনুস আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূল (স) প্রতিবেশী পর্যায়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন। এভাবে গোটা মুসলিম সমাজ-ই ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাসূল (স) থেকে এরূপ বর্ণনায় সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন, যা ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অতএব এ কথাকে যে লোক অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করবে, সে রাসূল (স) থেকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত অগ্রাহ্যকারী বলে চিহ্নিত।

উক্ত মতের বিপরীত মতের ধারক একটি হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চেয়েছে। হাদীসটি আবূ আসিম আন-নবীল মালিক, জুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فَلَا شُفْعَةَ -

রাসূলে করীম (স) শুফয়াকে অবিভক্ত সম্পত্তিতে কার্যকর করেছেন। কিন্তু তা বিভক্ত হয়ে যখন সামীনা দাঁড়িয়ে যায়, তারপর আর কোন শুফ্য়া নেই।

এ হাদীসটি মালিক থেকেও বর্ণনা করেছেন আবূ কুতাই লাতাল মাদানী ও আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয আল-মাজেশুন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও এ হাদীসটি 'মুত্তাসিল' হিসেবে এরাই বর্ণনা করেছেন। তার আসল সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে মক্তু হিসেবে বর্ণনা করেছেন মায়ান অকী', আল-কা'নবী ইবনে অহব। এঁদের সকলের সনদ সূত্র হচ্ছে মালিক, জুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব— তাতে আবূ হুরায়রার নাম উল্লেখ করা হয়নি, মুয়াত্তা ইমাম মালিককেও তা এমনিভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। তা যদি মুত্তাসিল হিসেবেও বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে তার দ্বারা সেসব হাদীসের উপর আপত্তি তোলা যেতে পারে না, যা নবী করীম (স) থেকে অন্তত দশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন প্রতিবেশীর জন্যে শুফয়া আছে বলে। কেননা তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তার উপর আপত্তি তোলা যেতে পারে না। সেসব দ্বারা আপত্তি উত্থাপনের বহু কয়েকটি দিক থাকলেও— যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি— তাতে প্রতিবেশীর জন্যে 'শুফ্য়া' প্রমাণকারী হাদীসসমূহের বিপরীত কোন কিছুই নেই। কেননা তাতে খুব বেশি যা বলা আছে তা হল— নবী করীম (স) শুফয়ার ফয়সালা করেছেন সেসব সম্পত্তিতে, যা বিভক্ত হয়নি। বিভক্তির সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর 'শুফ্য়া'র কোন অবকাশ নেই।

বর্ণনাকারীর কথা ঃ নবী করীম (স) অবিভক্ত সম্পত্তিতে শুফয়ার ফয়সালা করেছেন।—এ হাদীস ব্যবহারে সকলেই একমত এ বিষয়ে যে, শুফয়া শরীকের জন্যে প্রমাণিত। তা সত্ত্বেও তা হচ্ছে নবী করীম (স)-এর কৃত ফয়সালার বর্ণনা, তা কোন সাধারণ নীতির ব্যাপার নয়। কোন সাধারণ সিদ্ধান্তেরও বর্ণনা তা নয়। রাসূল (স)-এর কথা ঃ সীমাসমূহ দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর 'শুফয়া'র কোন অবকাশ নেই'— এটা হাদীসের বর্ণনাকারীরও কথা হতে পারে। কেননা সে কথাটি নবী করীম (স)-এর বলে উল্লেখ করা হয়নি। তিনি সেটা সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিয়ে ফেলেছেন তা-ও তো বলা হয়নি। কথাটি রাসূল (স)-এর হতে পারে, হতে পারে হাদীসটির বর্ণনাকারীর—এই যখন সম্ভাবনা, বর্ণনাকারী হয়ত তা হাদীসের মূল কথার মধ্যে 'মুদরাজ' করে দিয়েছেন। বহু সংখ্যক হাদীসেই এরকমটা হয়ে থাকে। তাই ও কথাটি স্বয়ং রাসূল করীম (স)-এর তা জোর করে আমাদের বলা উচিত নয়। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোন কথা নবী করীম (স)-এর নামে চালিয়ে দেয়া খুবই অসমীচীন। কাজেই আমরা পূর্বে যা বলেছি, তার উপর কোন আপত্তি তোলা যায় না।

আরও একটি হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে তারা পেশ করেছে। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' হামেদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুরদাফ, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর আল-কাওয়ারীরী, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জিয়াদ, মামার, জুহরী, আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ রাসূল (স) শুফ্‌য়া'র ফয়সালা করেছেন অবিভক্ত সম্পত্তিতে। যখন তা (বিভক্ত হয়ে) সীমাসমূহ দাঁড়িয়ে যাবে এবং পথ অন্য দিকে ফিরে যাবে, তখন আর শুফয়া'র প্রশ্ন উঠবে না।

এ হাদীসেও প্রতিবেশীর শুফয়ার হক্ অস্বীকৃতির কোন কথা নেই। দুটি দিক দিয়ে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি এসব হাদীসে বিভক্তি বন্টনের পর সীমা দাঁড়িয়ে গেলে ও পথ ভিন্ন দিকে ফিরে গেলে শুফয়া না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল, সংলগ্ন প্রতিবেশী ছাড়া অন্যের জন্যে শুফয়া অস্বীকৃত হয়েছে। কেননা পথ ভিন্ন দিকে ফিরে গেলে সংলগ্ন প্রতিবেশী হওয়ার অবস্থা শেষ হয়ে যায়। কেননা তখন প্রতিবেশী ও তার মধ্যে অন্য একটি পথ হয়ে গেলে। আর দ্বিতীয়, কথাটি যখন আমরা তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করব, তখন শব্দের দাবি হবে, সীমা দাঁড়িয়ে গেলেও পথ ফিরে গেছে শুফয়া পাওয়া যাবে না। আর সীমা দাঁড়িয়ে যাওয়া ও পথ ফিরে যাওয়া সম্পত্তির বণ্টন হলেই হয়ে থাকে। তার অর্থ হল, সম্পত্তি বন্টন হয়ে গেলে আর শুফ্‌য়া হবে না। হানাফী ফিকহবিদগণ তা-ই বলেছেন যে, সম্পত্তি বণ্টন হয়ে গেলে শুফয়া হবে না। প্রথমোদ্ধৃত হাদীসটিও সেই কথাই বলেছে। আবদুল মালিক ইবনে আবূ সুলায়মান, আতা, জাবির, নবী করীম (স) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, প্রতিবেশী তার নৈকট্যের দরুন অধিক হকদার হবে শুফ্‌য়া'র, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে— যদি সে অনুপস্থিতও থাকে, যখন তাদের দুজনের পথ অভিন্ন থাকবে।

এ দুটি হাদীস জাবির সূত্রে ও নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ দুটিকে পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে করতে পারে না। কেননা এ দুটিকেই এক সাথে কাজে লাগানো সম্ভব। আমরা যে দিকটির উল্লেখ করেছি সে দিক দিয়েও দুটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে, দুটি অনুযায়ী-ই কাজ করা সম্ভব। অথচ আপত্তিকারী আমাদের বিরোধী মতের লোকেরা এ দুটি হাদীসকে পরস্পর বিরোধীরূপে দাঁড় করিয়েছে এবং একটির দ্বারা অন্যটিকে ফেলে দিয়েছে। আর এ কথাটি বিশেষ কোন কারণেও বলা হতে পারে। পরে বর্ণনাকারী তাকে রাসূল (স)-এর কথা হিসেবে শামিল করে বর্ণনা করেছেন। আর সে কারণটির তিনি উল্লেখই করেন নি। যেমন দুই ব্যক্তি তার নিকট মামলা দায়ের করেছে। একজন তার প্রতিবেশী আর অপরজন তার সাথে শরীক। তখন শরীক ব্যক্তির জন্যে শুফ্‌য়া'র হুকুম কার্যকর হবে, প্রতিবেশীর জন্যে হবে না। এ-ও বলেছেন, সীমা দাঁড়িয়ে গেলে প্রতিবেশী থাকা অবস্থায় বণ্টিত অংশের মালিক শুফয়া পাওয়ার অধিকারী হবে না। যেমন উসামা ইবনে যায়দ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لَا رِبَا اِلَّا فِى النَّسِيْئَةِ —সূদ হয় কেবল বিলম্বিত ঋণ ফেরত দানে। অথচ সব ফিক্‌হবিদদের মতে উক্ত কথাটি একটি কারণের ভিত্তিতে বলা কথা, নবী করীম (স)-এর কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণনাকারী এ কথাটি কারণ উল্লেখ না করেই শামিল করে বর্ণনা করে বসেছেন। হতে পারে, স্বর্ণ ও রৌপ্য যখন একটি দ্বারা অন্যটি বিক্রয় করা হবে, তখন এ দুইটি ভিন্ন

ধরনের ধাতু সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বলে দিয়েছেন ঃ রিবা শুধু ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করার ক্ষেত্রেই ধার্য হয়। এটা প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট কথা ছিল— যেমন আমরা বলেছি। উপরন্তু প্রতিবেশী হওয়ার দরুন শুফ্য়া হওয়া সক্রান্ত হাদীসমূহ এবং শুফ্য়া না হওয়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহ যদি সমান সমানও হয়, তবু ইতিবাচক হাদীসসমূহ নৈতিবাচক হাদীসসমূহের তুলনায় অধিক গ্রহণীয় হবে। এটাই নিয়ম। কেননা আসলে তা ওয়াজিব নয়। শরীয়তের কোন দলীলই তা ওয়াজিব করতে পারে। পরন্তু শুফয়া অস্বীকৃতির হাদীস মূল অবস্থার প্রেক্ষিতে এসেছে। আর তা প্রমাণকারী হাদীস তার উপর এসেছে। অতএব তা-ই অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী হবে।

যদি বলা হয়, হাদীসে প্রতিবেশী বলে শরীককেই বুঝিয়েছে, তা-ও তো সম্ভব ?

জবাবে বলা যাবে, আমরা এ পর্যায়ে যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তার অধিকাংশই এ ব্যাখ্যার পরিপন্থী। কেননা তাতে এ কথা রয়েছে ঃ

جَارُالدَّارِ احَقُّ لِشُفْعَةِ دَارِه -

ঘরের প্রতিবেশী সেই ঘরের শুফ্য়া পাওয়ার অধিক হক্দার।

কিন্তু শরীক ব্যক্তিকে তো 'ঘরের প্রতিবেশী' বলা হয় না। আর হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসে يُنْتَظَرُ بِه وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَاكَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدً - —'সে জন্যে তার অপেক্ষা করা হবে যদি সে অনুপস্থিত থাকে এবং তাদের দুজনার পথ অভিন্ন হবে।'— এই কথাও বলা হয়েছে। এ কথা পণ্যে শরীক ব্যক্তির সম্পর্কে বলা কখনই সঙ্গত হতে পারে না। তাছাড়া, শরীককে কখনও প্রতিবেশী বলা হয় না। কেননা শরীকদারীর দৌলতে যদি প্রতিবেশী হওয়ার নাম পাওয়ার অধিকার হয়, তাহলে প্রত্যেক জিনিসের শরীকরাই প্রতিবেশী গণ্য হবে। যেমন একজন ক্রীতদাসের মালিকানায় কয়েকজনের শরীক হওয়া, একটি গরু বা মহিষের বা ঘোড়ার মালিকানায় একাধিক ব্যক্তির শরীক হওয়া— কিন্তু তাতে প্রতিবেশী হওয়ার অভিধায় অভিহিত হওয়া যায় না। বোঝা গেল ও প্রমাণিত হল যে, শরীককে কখনই প্রতিবেশী বলা যেতে পারে না। প্রতিবেশীর হক্ তো একটা স্বতন্ত্র ও বিশেষ ব্যাপার। শরীকের হক্ থেকে তার ভাগ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। প্রত্যেকের মালিকত্ব অন্য সব লোকের মালিকত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে।

আর হ্যাঁ, শরীকদারীর দরুনও শুফ্য়া'র হক পাওয়া যেতে পারে। কেননা তা সম্পত্তির বন্টনের ফলে প্রতিবেশী হওয়ার অধিকারী বানায়। এ পর্যায়ের দলীল হচ্ছে, সমস্ত জিনিসের শরীকদারী শুফয়া অনিবার্য করে দেয় না। কেননা বন্টনের দরুন তার দ্বারা প্রতিবেশীর অবস্থান অর্জিত হয় না। তাই তা প্রমাণ করল যে, কোন জমিনে শরীকদারীর দরুন শুফয়া পাওয়ার অধিকার হতে পারে তার বন্টনকালে যদি প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ ঘটে। যদিও শরীক প্রতিবেশী অপেক্ষা শুফ্য়া'র অধিক হক্দার হয় সেই বিশেষত্বের কারণে, যা সে অর্জন করতে পারে, বন্টনের দরুন প্রতিবেশীর হক সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও। তার দলীল হচ্ছে, সকল জিনিসে শরীকদারী শুফ্য়া ওয়াজিব করে দেয় না। কেননা তার দ্বারা প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ লাভ হয় না। যেমন আপন সহোদর ভাই— একই পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে,— বৈমাত্রেয় ভাইর

অপেক্ষা মীরাস পাওয়ার অধিক হক্‌দার। যদিও বৈমাত্রের ভ্রাতৃত্ব ও আসাবা হয়ে মীরাস পছওয়ার অধিকারী বানায়, যখন আপন সহোদর ভাই থাকবে,না। একথা জানা আছে যে, মার দিক দিয়ে নৈকট্যের দম্নন আসাবা হওয়ার সুযোগ দেয় না যখন সেখানে পিতার০দিকের নৈকট্যের অনুপস্থিতি হবে। তবে তা পিতার দিকের নৈকট্যের আসাবা হওয়া অধিক তাগিদপূর্ণ। শরীকও থেষ্ঠনি। শরীকদারীর দরুন শুফ্‌য়া'র অধিকারী হয় বন্টনের মাধ্যমে প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ লছভের দরুন। আর শরীক তো প্রতিবেশীর তুলনায় উত্তম অর্চিত বিশেষত্বের দরুন— যেমন আসাবা হওয়া সম্পর্কে আমরয় বলেছি। যে তাৎপর্যের দরুন শুফ্‌য়া ওয়াজিব হয়, তা হল প্রতিবেশী হওয়া। আর যে তাৎপর্যের দরুন শরীকদারীর০মাধ্যমে শুফ্‌য়া ওয়াজিব হয়, তা শরীকের জন্যে চিরদিঁ"র যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিবেশীও তা হতে পারে। তাতে জ্বালা-যন্ত্রণা হতে পারে তার প্রত্যেক্ষকারী হওয়ার কারণে, তার ব্যাপারাদি সম্পর্কে অবহিতির কারণে, তার অবস্থা জানতে পারার কারণে। তাই তার জন্যে শুফ্‌য়া হওয়া ওয়াজিব। কেননা সেখানে সেই তাৎপর্য বিদ্যমান, যার কারণে শরীকের জন্যে শুফ্‌য়া ওয়াজিব হয়।

কিন্তু সে তাৎপর্য অসংলগ্ন প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কেননা তার ও তার মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার ও খবরাখবর জানার প্রতিবন্ধক একটা পথ রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَابْنِ السَّبِيْلِ মুজাহিদ ও রুবাই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, এর অর্থ পর্যটক, মুসাফির— বিদেশে গমনকারী। কাতাদাতা ও দহাক বলেছেন—এর অর্থ মেহমান বা অতিথি।

আবূ বকর বলেছেন, এর অর্থ হল পথিক— পথ চলায় রত ব্যক্তি। এ কথাটি ঠিক তেমনি, যেমন পানির পাখিকে বলা হয় 'পানি-পুত্র'। কবি বলেছেন ঃ

وَرَدْتُ اعْتِسَافًا وَالثُّرَيَّا كَأَنَّهَا : عَلَى قِمَّةِ الرَّأْسِ ابْنُ مَاءٍ مُحَلِّقُ -

যে লোক উক্ত শব্দের অর্থ মেহমান বা অতিথি বলেছেন, তার কথাও যথার্থ। কেননা মেহমানও অতিক্রমকারী, অস্থায়ী অবস্থানকারী। 'পথ-পুত্র' বলে পথ অতিক্রমকারীর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়েছে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে عابرسبيل পথ-চতিক্রমকারী। শাফেয়ী বলেছেন, পথ-পুত্র সে, যে বিদেশ ঢ়াত্রার ইচ্ছা রাখে, অথচ তার নিকট পাথেয় নেই। আমরা }লব, তা ভুল অর্থ। কেননা বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করলেই সে পথ-পুত্র হয়ে যায় না। যেমন তাকে মুসাফির— পরিভ্রমর্ণারী বা পথ অতিক্রমকারী বলা যায় না।

আল্লাহ্‌র কথা!ঙ্ক وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ 'এবং যার মালিক হয় তোমাদের দক্ষিণ হস্ত'। অর্থাৎ যে সদাচরণ ও মহনুভবতা প্রদর্শনের আদেশ করা হয়েছে আয়াতের শুরুতে, তা এদের-ও প্রাপ্য। সুলায়মান আত্‌তায়মী কাতাদাতা, আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর সাধারণ ও সর্বসময়ের অসিয়ত ছিল নামাযের ও তোমাদের দক্ষিণ হস্তের

মালিকানাভুক্তদের সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত এই কথা তাঁর বুকের মধ্যে গরগর ধ্বনির সৃষ্টি করেছে এবং তাঁর জিহ্বাও শুকিয়ে গেছে। উম্মে সালমা (রা)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমাস তালহা ইবনে মতরফ আবূ উমারাতা, আমার ইবনে শারাহবীল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْاِبِلُ عِزٌّ لِاَهْلِهَا، وَالْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ، وَالْمَمْلُوْكُ اَخُوْكَ فَاَحْسِنْ اِلَيْهِ فَاِنْ وَجَدْتَهُ مَغْلُوْبًا فَاَعِنْهُ -

ছাগলে বিপুল প্রবৃদ্ধি হয়। উটে তার মালিকের উজ্জত ও সম্মান হয়। আর অশ্বের ললাটে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে কল্যাণ অংকিত। মালিকানাভুক্ত ব্যক্তি তোমার ভাই। অতএব তার প্রতি ভালো আচরণ কর। তাকে যদি পরাজিত বিপর্যস্ত দেখতে পাও, তাহলে তাকে সাহায্য কর।

মুররা ইবনে শারাহবীল আল-হামাদানী হযরত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ الْاُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَاَتْبَاعًا ؟ قَالَ بَلٰى، فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ اَوْلَادِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ -

খারাপ মালিকত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। বলা হল, হে রাসূল! আপনি কি আমাদের নিকট একথা বলেন নি যে, এই মুসলিম উম্মতের মালিকানাধীন ও অনুসারী লোক অন্যান্য সব উম্মতের তুলনায় অনেক বেশি হবে? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, বলেছিলাম। অতএব তোমরা তাদেরকে সম্মান দাও যেমন সম্মান দাও তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা নিজেরা যা খাও, তাদেরকেও তা-ই খেতে দাও।

আমাশ মারুর ইবনে সুয়াইদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ হযরত আবূ যার গিফারী যখন রবযায় অবস্থান করেছিলেন তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছে ঃ

اَلْمَمَالِيْكُ هُمْ اِخْوَانُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَوَّلَكُمْ اِيَّاهُمْ، فَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبِسُوْنَ -

তোমাদের মালিকানাভুক্ত লোকেরা তোমাদের ভাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বিশেষভাবে তাদের উপর কর্তৃত্বের হকদার বানিয়েছেন। অতএব তোমরা তাদেরকে তাই খেতে দাও যা থেকে তোমরা খাও এবং পরতে দাও যা থেকে তোমরা পরিধান কর।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

যে সব লোক কার্পণ্য করে ও লোকদেরকে কার্পণ্য করতে বলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তা লুকিয়ে রাখে .....

البخل এর অভিধানিক অর্থ বলা হয়েছে ঃ দেয়ার কষ্টকরতা। বলা হয়েছে البخل অর্থ, যা নিষেধ করায় কোন ফায়দা নেই এবং অ-ব্যয় করায় কোন ক্ষতি নেই তা নিষেধ করা— না দেয়া, ব্যয় না করা। বলা হয়েছে, البخل অর্থ যা কর্তব্য, তা না করা। এর অনুরূপ অর্থের শব্দ হচ্ছে الشح —লোভ এবং এর বিপরীত অর্থের শব্দ হল দানশীলতা। দ্বীনী নাম পর্যায়ে তাঁর অর্থ বোঝা হয়েছে কর্তব্য না করা— তা থেকে বিরত থাকা। বলা হয়, এ শব্দটির দ্বীনী ব্যবহার কেবল এভাবেই সহীহ্ হতে পারে যে, তা যে করল, সে নিষেধ করে একটা বড় অপরাধ করল। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ -سَيُطَوَّ قُوْنَ مَابَخِلُوْبِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

যারা আল্লাহ্র দেয়া অনুগ্রহ নিয়ে কার্পণ্য করে, মনে করো না তা তাদের জন্যে খুব বেশি কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্যে খুবই খারাপ ও ক্ষতিকর। তারা যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলার বেষ্টনী বানানো হবে।

আল্লাহ্র হক্ নিয়ে যারা কার্পণ্য করে, এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে অত্যব্ব কঠোর শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ এই পর্যায়ে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যখন তারা প্রাপ্ত রিযিক নিয়ে কার্পণ্য করছিল এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর গুণ পরিচিতি পর্যায়ে যে ইল্ম তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তা তারা গোপন করে রাখছিল— প্রকাশ করছিল না। এ-ও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে যাদের এরূপ পরিচিত ছিল তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যারা আল্লাহ্র নিয়ামত গোপন করে রেখেছিল এবং তা অস্বীকার করেছিল। আর তা আল্লাহ্র প্রতি কুফর করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের স্বীকৃতি ওয়াজিব। আর তার অস্বীকারকারী কাফির। কুফর মূলত আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহকে গোপন বা অপ্রকাশিত করে রাখা অর্থে ব্যবহৃত। তা লুকিয়ে রাখা এবং তা অস্বীকার করা একথা প্রমাণ করে যে, যে লোক আল্লাহ্র যে নিয়ামত পেয়েছে তা বলা— তার স্বীকারোক্তি করা তার জন্যে জায়েয। তবে তা অহংকার

ও গৌরব হিসেবে নয়, বরং শুধু স্বীকারোক্তি হিসেবে মাত্র যে, সে আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেয়েছে এবং নিয়ামত দাতার শোকর হিসেবে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -

আর তোমার রব্ব এর দেয়া নিয়ামতের কথা তুমি বল— বর্ণনা কর। (সূরা দোহা ঃ ১১)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ وَلَا فَخْرَ -

আমি আদম সন্তানদের সরদার— না, গৌরব করছি না। আমি গোটা আরবের মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী— সেটাও আমার গৌরব নয়।

এ হাদীসে নবী করীম করীম (স) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের কথাই বলেছেন। জানিয়েছেন যে, তিনি যে এই খবর জানাচ্ছেন, তা গৌরব অহংকার হিসেবে নয়।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بِنْ مَتّٰى -

আমি মতি পুত্র ইউনুস অপেক্ষা উত্তম, একথা কোন বান্দাহ্‌র বলা উচিত নয়।

নবী করীম (স) তার উম্মতের অপেক্ষা অধিক উত্তম ছিলেন; কিন্তু তা গৌরব অহংকার স্বরূপ বলতে তিনি নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى -

তোমরা নিজেদের পবিত্রতা-নির্দোষিতা-পরিশুদ্ধতার কথা বলে বেড়িও না, যে লোক তাক্‌ওয়া অবলম্বন করল, আল্লাহ্ তার সম্পর্কে খুব বেশি ভালো জানেন। (সূরা নজম ঃ ৩২)

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রসংশা করতে শুনতে পেলেন। বললেন, লোকটি যদি তোমার কথা শুনতে পেত, তাহলে তুমি তার পিঠ কেটে দিতে। মিকদাদ (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে হযরত উসমানের প্রসংশা করেছে তার সম্মুখে। তখন লোকটির মুখের উপর মাটি নিক্ষেপ করলেন। বললেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ -

তোমরা যখন প্রশংসাকারী লোক দেখবে, তাদের মুখের উপর মাটি নিক্ষেপ করবে।

এ-ও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَاِنَّهُ الذَّبْحُ -

তোমরা পারস্পরিক প্রশংসা থেকে দূরে থাক। কেননা এ কাজ যবেহ করার মতই।

অবশ্য তারীফ প্রশংসা সম্পর্কে এসব কথার প্রয়োগ হবে যদি তা গৌরব ও অহংকারস্বরূপ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র নিয়ামতের উল্লেখস্বরূপ হলে তা কোনরূপ ক্ষতিকর হবে না বলেই আশা করি। তবে সর্বোত্তম নীতি হল, লোকদের প্রশংসায় মন যেন মাতোয়ারা হয়ে না উঠে এবং তাকে যেন খুব একটা গুরুত্ব না দেয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ لِلّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –

যারা লোক দেখানো ভাবে নিজেদের ধন-মাল ব্যয় করে, তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়।

এর তাৎপর্য— আল্লাহ্-ই ভালো জানেন ঃ যারা নিজেরা কার্পণ্য করে ও অন্য লোকদেরকে কার্পণ্য করার পরামর্শ দেয়, আর যারা লোক দেখানোভাবে নিজেদের ধন-মাল ব্যয় করে, তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা অপমানকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। এ কথা প্রমাণ করে যে, যে বান্দাহ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, তাতে সে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারবে না, সে কাজের কোন সওয়াবও সে পাবে না। কেননা যা লোক দেখানোর ছলে করে সে তো দুনিয়াই তার কাজের বদলা পেয়ে যায়। যেমন তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, মুখে মুখে প্রশংসার খৈ ফুটে অর্থাৎ যা পাওয়ার জন্যে কাজ করা হয়েছিল, তা তো পেয়েই গেছে। আর দুনিয়ার যে কাজের বিনিময় চাওয়া হবে, সে কাজের জন্যে আল্লাহ্র নৈকট্য তা অর্জিত হতে পারে না। যেমন হজ্জের উপর মজুরী গ্রহণ। বেতন নিয়ে নামায পড়ানো এবং এ ধরনের অন্যান্য যে সব কাজ মূলত আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়ার মাধ্যমে, তা যদি উপস্থিতভাবে বিনিময় পেয়ে করা হয়, তাহলে সে কাজ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোনক্রমেই করা উচিত নয়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বিনিময় পেয়ে এ সব কাজ করা হলে পরকালে তার কোন সওয়াব অধিকার না হওয়াই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল। বরং এসব কাজে মজুরী গ্রহণ-ই না জায়েয, সম্পূর্ণ বাতিল পন্থা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ –

ওরা যদি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনতে ও আল্লাহ্র দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করত, তাহলে ওদের কি আসতো-যেতো?

এ আয়াত এক শ্রেণীর হাদীসবিদদের মতকে বাতিল প্রমাণ করছে। কেননা তারা যদি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে ও আল্লাহ্র জন্যে অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ না হয়, তাহলে তাদের সম্পর্কে উক্ত কথা বলা সঙ্গত হতে পারে না। কেননা তাদের অক্ষমতা সুস্পষ্ট। তা হল তাদেরকে যে কাজের আহ্বান জানানো হয়েছে তা গ্রহণ করতে তারা অক্ষম, কোন শক্তিই তাদের নেই। যেমন অন্ধ লোক সম্পর্কে বলা যায় না ওরা দেখলে ওদের কি আসতো যেতো? রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায় না, ও সুস্থ সবল হলে কি দোষ হতো? এ পর্যায়ে সবচেয়ে সুস্পষ্ট অকাট্য দলীল হচ্ছে, ওদেরকে ঈমান আনার ও সমস্ত ফরমাবরদারী কাজ করার যে

দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে পর্যায়ে ওদের সব ওযর-অক্ষমতাকে আল্লাহ্ কেটে দিয়েছেন। ওরা সে কাজ করতে আসলেই সক্ষম।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا -

আজকের দিন কাফির ও রাসূলের নাফরমানরা মনে মনে কামনা করবে, কতই না ভালো হতো যদি জমিন তাদেরকে সমান করে দিত, এবং তারা আল্লাহ্র নিকট কোন কথা গোপন করবে না।

আল্লাহ্ এ আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেখানে তারা আল্লাহ্র নিকট তাদের অবস্থার কোন কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তারা যা কিছু করেছে, তা-ও আল্লাহ্র নিকট অজানা থাকবে না। কেননা তারা জানে যে, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত, তাদের সব গোপন তত্ত্ব আল্লাহ্র জানা। তাই তারা সব কিছু অকপটে স্বীকার করবে। কিছুই গোপন রাখবে না।

বলা হয়েছে এর অর্থ, তারা তাদের গোপন তত্ত্বসমূহ সে দিন গোপন রাখবে না, যেমন করে দুনিয়ায় তারা সব কিছু গোপন করে রাখতো।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা সে দিন বলবে ঃ আল্লাহ্র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

জবাবে বলা যাবে, এর কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি, পরকাল এমন একটি স্থান যেখানে খুব হালকা শব্দের আওয়াজ শোনা যাবে। এমন স্থান, সেখানে তারা মিথ্যা বলবে, বলবে আমরা কোন খারাপ কাজ করছিলাম না, আল্লাহ্র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। আর তা এমন স্থানও, যেখানে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করবে, তারা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনার জন্যে। একথা আল-হাসান থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا 'ওরা আল্লাহ্র নিকট কোন কথা গোপন রাখবে না'— এটা ওদের কামনা ও বাসনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের নির্লজ্জতার কথা আগেই বলে দেবে।

এ-ও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে, ওরা তাদের কথা গোপন রাখতে সক্ষম হবে না। কেননা ওদের সব কিছুই আল্লাহ্র নিকট প্রকাশমান, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়। তাহলে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, ওরা সেখানে গোপন করার কাজে সক্ষম হবে না। কেননা আল্লাহ্ই সব প্রকাশ করে দেবেন।

এ-ও বলা হয়েছে, ওরা গোপন করতে ইচ্ছুক হবে না। কেননা ওরা যে বিভ্রান্তিতে সমাচ্ছন্ন হয়েছিল তা ওদেরকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা যে গোপন করেছে তা থেকে ওদেরকে তা বের-ও করবে না।

নাপাক শরীর নিয়ে মসজিদে যাতায়াত

আল্লাহ্‌র বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটেও যাবে না, যতক্ষণ না জানবে তোমরা কি বলছ এবং নাপাক শরীরেও নয়— পথ অতিক্রমকারী অবস্থা ছাড়া— যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এ আয়াতে ব্যবহৃত السكر। শব্দের তাৎপর্য কি, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবরাহীম ও কাতাদাতা বলেছেন, মদ্যপানের নেশা ও মাতালাবস্থা। মুজাহিদ ও আল-হাসান বলেছেন, মদ্যপান হারামের আয়াত দ্বারা এ আয়াত মনসূখ হয়ে গেছে। দহাক বলেছেন, এর তাৎপর্য হচ্ছে বিশেষ নিদ্রাচ্ছন্নতা, ঘুমের নেশা।

যদি বলা হয়, কারোর নেশাবস্থায় নেশাকে নিষেধ করা কিভাবে সঙ্গত ও সম্ভব হতে পারে! তখন তো সে বালকের মত— বুদ্ধি-বিবেকহীন।

জবাবে বলা যাবে, হতে পারে السكر। বলে সেই অবস্থা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যাতে বিবেক-বুদ্ধি এতটা বিলুপ্ত হওয়ার ব্যপার ঘটেনি যাতে শরীয়ত পালনের দায়িত্বের বাইরে চলে গেছে বলে মনে করা যাবে। আর এ-ও হতে পারে যে, ফরয নামায তাদের নিকটবর্তী হওয়া কালে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়তে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এ-ও সঙ্গত যে, তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়ার কাজটি করে থাকলে তাদেরকে তা সুস্থ অবস্থায় আবার পড়তে আদেশ করা হয়েছে। আর এ-ও হতে পারে যে, আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় এ সব-ই তার বক্তব্য ছিল।

যদি বলা হয়, যে লোক আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন السكر। কে ভিত্তি করে এভাবে যে, তার উপর অর্পিত শরীয়ত পালনের দায়িত্ব দূর হয়ে যায়নি, তাহলে এ অবস্থায় নামায পড়া কি করে নিষিদ্ধ হতে পারে, অথচ এই অবস্থায়ও নামায পড়া তার জন্যে ফরয— এ বিষয়ে সব মুসলমানই সম্পূর্ণ একমত ?

জবাবে তাকে বলা যাবে, আল-হাসান ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, এ আয়াতটি মন্‌সূখ। এ-ও হতে পারে যে, আয়াতটি হয়ত মন্‌সূখ নয়। বরং এতে রাসূল (স)-এর সঙ্গ বা জামা'আতের সাথে নামায পড়ার দিকেই তাকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, اَلسُّكْر -এর তাৎপর্যে সহীহ্‌ কথা হচ্ছে, তা মদ্যপানের ফলে সৃষ্টি মত্ততা। তা দুটি দিক দিয়ে। একটি, নিদ্রোন্বিত ব্যক্তি ও নিদ্রা যার চক্ষুদ্বয়কে বন্ধ করে রেখেছে তাকে কখনও سكران 'নেশাগ্রস্ত' বলা হয় না। মদ্যপানে যে লোক মত্ত হয়, তাকেই নেশাগ্রস্ত

বলা হয় আসলের দিক দিয়ে। তাই শব্দটির সেই আসল অর্থই গ্রহণ করা উচিত। তা না করে তার কোন পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। অবশ্য তার কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। আর দ্বিতীয় হল, সুফিয়ান আতা ইবনুস-সায়েব, আবূ আবদুর রহমান আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক আনসার বংশীয় ব্যক্তি বহু কয়জন লোককে দাওয়াত করল, তারা একত্রিত হয়ে মদ্যপান করল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আতফ (রা) মাগরিবের নামাযে এগিয়ে গেলেন। নামাযে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরা পাঠ করলেন। কিন্তু তা তাঁর নিকট জড়িয়ে গেল— ঠিকভাবে সূরাটি পড়তে পারলেন না নেশাগ্রস্ততার কারণে। তখন নাযিল হল ঃ 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটও যাবে না' আয়াত।

আর জাফর ইবনে মুহাম্মদ-আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আল মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা, আতাউল খুরাসানী, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

তোমাকে লোকেরা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ঃ হে নবী, আপনি বলে দিন, সে দুটিতে অতি বড় গুনাহ্ ও জনগণের ফায়দাও আছে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২১৯)

এবং সূরা আন-নিসার উপরোক্ত আয়াত ঃ 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না' এ দুটি আয়াতকে মনসূখ করে দিয়েছে এ আয়াতটি ঃ 'মদ, জুয়া, বলিদানের স্থান ও তীর দ্বারা ভাগ্য জানা ....।'

আবূ উবায়দ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ্ মুআবিয়া ইবনে সালিহ্, আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, তাতে বড় গুনাহ্ ....' এবং 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না, যতক্ষণ না জানবে তোমরা কি বলছ .....

—এ দুটি আয়াত পর্যায়ে বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা নামাযের সময় হলে মদ্য পান করত না। রাত্রে এশার নামায পড়া হয়ে গেলে তারা তা পান করত।

আবূ উবায়দ বলেছেন, আবদুর রহমান সুফিয়ান— আবূ ইস্‌হাক— আবূ মায়সারাতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ -

হে আল্লাহ্ মদ সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন।

তারপরে নাযিল হল, 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না, যতক্ষণ না জানবে তোমরা কি বলছ।'— এভাবে গোটা হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

আবূ উবায়দ বলেছেন, হুশায়ম মুগীরা, আবূ রুজাইন সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আমি সূরা আল-বাকারার আয়াত ও সূরা আন্-নিসার আয়াত নাযিল হওয়ার পর-ও মদ্যপান করেছি। তারা নামযে উপস্থিত হওয়ার সময় পর্যন্ত মদ্যপান করত। ঠিক নামাযের

সময়টায় তারা ত্যাগ করত। পরে সূরা আল-মায়িদার আয়াতে মদ্যপান সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, এরা সকলেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, اَلسُّكْرُ অর্থ 'মদের মত্ততা'— নেশাগ্রস্ততা। ইবনে আব্বাস ও আবূ রুজাইন জানিয়েছেন, নামাযের সময় মদ্যপান নিষেধের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা এ নামাযের সময় মদ্যপান ত্যাগ করত। নামাযের সময় এড়িয়ে অন্য সময় তারা মদ্যপান করত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা 'মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না' কথা থেকে তারা মদ্যপান নিষিদ্ধ— সেই অবস্থায় যখন তারা মাতাল হয়ে আছে নামাযের ফরয ও বাধ্যতামূলক হওয়ার কথা বুঝেছিল। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না' আল্লাহ্ এ কথাটি নামাযের সময়ে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। ফলে এর অর্থ দাঁড়াল ঃ 'তোমাদের দ্বারা মদ্যপান হবে না যখন তোমরা নামাযের সময় মাতাল অবস্থার হতে পারে। যার দরুন তোমরা মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে পার।' তার অর্থ তারা যখন নামায দ্বারা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী হবে, তখন তোমরা আদিষ্ট তা ত্যাগ করার জন্যে। এ কথাই আল্লাহ্ বলেছেন তাঁর ভাষায় ঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى -

তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না।

আমরা জানলাম, নামাযের সময়সমূহে মাতাল অবস্থায় থাকার সময়ও তাদের উপর থেকে ফরয নামায মনসূখ হয়ে যায়নি। যেমন ওযু না থাকা অবস্থায় নামায পড়তে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। বলেছেন ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ ....

তোমরা যখন নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে, তখন তোমাদের মখমণ্ডল ধৌত কর ....

(সূরা মায়িদা ঃ ৬)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ -

পবিত্রাবস্থা ছাড়া আল্লাহ্ কোন নামায কবুল করেন না।

এবং যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاجُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

এবং নাপাক অবস্থায়ও নয়— পথ অতিক্রমকারী হলে ভিন্ন কথা— যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে ....।

এ আয়াতে 'তাহারাত' পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নামায পড়তে নিষেধ করা হয়নি। আর কোন লোকের নাপাক শরীর হওয়া বা বে-ওযু হওয়া ফরয পরিত্যক্ত হওয়ার কোন

কারণ হয় না। সংশ্লিষ্ট অবস্থায় সেই কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে মাত্র। তা সত্ত্বেও তাকে আগে-ভাগে 'তাহারাত' অর্জন করার আদেশ করা হয়েছে। তেমনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তা প্রমাণ করল যে, মদ্যমান নিষিদ্ধ, যা নামাযের পূর্বে মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে। অথচ নামায তার উপর যথারীতি ফরয হয়েই আছে।

এ ব্যাখ্যা প্রমাণ করে একটি হাদীস, যা ইবনে আব্বাস ও রুজাইন থেকে বর্ণিত। আয়াতটি বাহ্যত এবং তার কথার ধরন তারই দাবি করে যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি।

এ ব্যাখ্যা মাতাল অবস্থায় নামায নিষিদ্ধ হওয়া পর্যায়ে আগের দিনের মনীষীদের যে মতের উল্লেখ করেছি, তার পরিপন্থীও নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, তাদেরকে মদ্যপান করতে নিষেধ করা হয়েছে, যার ফলে নামাযের সময়ে তাদের নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে হতে পারে। তাহলে তো তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। অবস্থা যদি এই হয় যে, তারা মদ্যপান করল, ফলে নামাযের সময়ে তদ্দরুন তারা মাতাল হয়ে পড়ল, তাহলে নামায পড়তে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, আদেশ করা হয়েছে সুস্থ অবস্থায় পুনরায় নামায পড়ার জন্যে। অথবা এই নিষেধটা কেবল নবী করীম (স)-এর সাথে মিলিত হয়ে বা জামা'আতের সাথে নামায পড়া কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। এসব অর্থ ও তাৎপর্যই সহীহ্ এবং সঙ্গত। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এ সব অর্থই ধারণ করতে সক্ষম।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ –

যতক্ষণ না তোমরা জানবে তোমরা কি পড়ছ।

এ কথা প্রমাণ করে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সেই অবস্থায়, যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যখন সে কি বলছে ও পড়ছে তা বুঝতে পারে না। যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বলা কথা বুঝতে পারা যায় সেই অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়নি। এ কথা আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সত্যতা-যথার্থতার সাক্ষ্য দেয়। আমরা দেখিয়েছি যে, নিষেধটা মদ্যপানের উপর আরোপিত, নামায পড়ার উপর নয়। কেননা যে মাতাল অবস্থায় জানা যায় না কি বলছে, তা এ অবস্থার উপর আরোপিত হয় না। যেমন পাগল, নিদ্রাচ্ছন্ন ও বুদ্ধি–বিবেচনাহীন বালক। যে বুঝতে পারে কি বলছে, এ নিষেধটা তার প্রতিও নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতটিতে নামায পড়া মুবাহ্ যখন জানবে কি পড়ছে বা বলছে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতটি মূলত মদ্যপান করতেই নিষেধ করছে। নামায পড়তে নিষেধ করছে না। সেই অবস্থায় যখন কি বলছে তা বুঝতে পারে না। কেননা যে মাতাল অবস্থা বুদ্ধি-বিবেক বিলুপ্ত করে, তা-ই বুঝিয়ে দেয় যে, যে নেশাগ্রস্ততা প্রসঙ্গে এ হুকুম তা হল, সে বুঝতে পারে না কি বলছে। আর তা ইমাম আবূ হানীফার কথা সহীহ্ প্রমাণ করে। তাঁর কথা, যে নেশাগ্রস্ত অবস্থা দণ্ডনীয়, তা হল, তখন পুরুষ বা নারীর পার্থক্য বোধ থাকে না — বুঝতে পারে না কি বলছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

যতক্ষণ না জানবে কি বলছ।

প্রমাণ করে যে, নামাযে কুরআন পাঠ ফরয। কেননা সে লোককে সে অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে যখন যথাযথভাবে কুরআন পাঠ সম্ভব হয় না। কুরআন পাঠ যদি নামাযের 'রুকন' না হতো, ফরয না হতো, তাহলে তা পড়তে না পারার দরুন নামায পড়তে নিষেধ করা হতো না।

যদি বলা হয়, এ কথার এমন দলীল নেই যা নামাযে কুরআন পাঠ ফরয প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যতক্ষণে না জানবে কি বলছ' প্রমাণ করে যে, সে অবস্থায় যা বলছে তা বুঝতে পারে না, তখন নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, কুরআন পড়ার কথা তো বলা হয়নি। বলা হয়েছে, যা বলে তা না-জানার কথা। তা সকল প্রকারের কথা প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। আর মত্ততার দরুন যার এরূপ অবস্থা, তার পক্ষে নামাযে 'হুযুরি কলব' হওয়া সম্ভব হয় না। নামাযের সব 'রুকন' সঠিকভাবে আদায় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। যার এরূপ অবস্থা তাকেই নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা নামাযের নিয়ত করা ও নামাযের অন্যান্য কাজ যথাযথভাবে আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই সাথে এ-ও জানা যায় না যে, সে পবিত্র না ওযুহীন।

জবাবে বলা যাবে, এই যে তুমি বললে, এরূপ অবস্থা যার তার পক্ষে সমস্ত শর্তসহ নামায আদায় করা সম্ভব হয় না; একথা ঠিক। তবে তার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে— বলার বিষয়টি। নামাযের অন্যান্য বিষয় ও অবস্থার উল্লেখ করা হয়নি। অন্য কোন অবস্থারও উল্লেখ হয়নি, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'কথা' বলতে সেই কথা বোঝানো হয়েছে যা নামাযে বলা হয়। আর তা হচ্ছে কুরআন পাঠ। তাই কুরআন পাঠ সম্ভব হবে না নেশাগ্রস্ততার যে অবস্থায়, সেই অবস্থায় নামায পড়াও নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কুরআন পড়তে না পারার কারণে। তাতে প্রমাণিত হল যে, নামাযে কুরআন পড়া ফরয, একটি অন্যতম শর্ত। এ কথাটি ঠিক اقيموا الصلوة 'নামায কায়েম কর' কথাটির মতই। এ থেকে বোঝা গেল যে, নামাযে 'কিয়াম' ফরয। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -

'রুকূ'কারীদের সাথে এক সাথে রুকূ' কর প্রমাণ করে যে, নামাযে রুকূ' ফরয।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

এবং নাপাক শরীরে— পথ অতিক্রমকারী হলে ভিন্ন কথা— যতক্ষণ গোসল না করবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন কথা উদ্ধৃত হয়েছে। আল-মিনহাল ইবনে আমর জুর আলী (রা) সূত্রে এ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তবে যদি মুসাফির— বিদেশ পর্যটনকারী হয় ও কি দিয়ে তায়াম্মুম করবে তা না পায় এবং নামায পড়ে .....।

কাতাদাতা আবূ মজলজ ইবনে আব্বাস সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। মুজাহিদও তাই বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মসজিদে চলাচলের স্থানে কথা বলা হয়েছে। আতা ইবনে ইয়াসার ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতটি ব্যাখ্যা পর্যায়ে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা, অন্যান্য তাবেঈনের মধ্যে থেকে আমর ইবনে দীনারও এ কথাই বলেছেন।

মসজিদে নাপাক শরীরে যাতায়াত সম্পর্কে আগের মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বল্লেছেন ঃ আমাদেরই একজন নাপাক শরীরে মসজিদে পথ অতিক্রমকারী হিসেবে যাতায়াত করত। আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন, নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ গোসল ফরয হলে ওযু করে মসজিদে যেতেন ও সেখানে বসে তারা কথা-বার্তা বলতেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, যার শরীর নাপাক, সেই অবস্থায় সে যেন মসজিদে না বসে। তবে সে পথ অতিক্রম করে যেতে পারে। আল-হাসান থেকেও এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ থেকেও বর্ণনা এসেছে। তবে শরীক আবদুল করীম আল-জজরী আবূ উবায়দা সূত্রে যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তা সহীহ্। বলেছেন, নাপাক শরীর ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দিয়ে য়াতায়াত করতে পারে। তবে সে মসজিদে বসবে না। মা'মার আবদুল করীম, আবূ ওবায়দা, আবদুল্লাহ্ সূত্রে এ কথা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়, মা'মার ছাড়া আর কেউ-ই এই কথাটি যে মূলত আবদুল্লাহ্র— তা বলেনি। অন্যান্যরা কথাটি তাবেঈর— এই হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও আল-হাসান ইবনে জিয়াদ বলেছেন ঃ মসজিদে পবিত্র শরীর ছাড়া প্রবেশ করবে না। সেখানে বসে কোন চুক্তি করতে চাওয়া হোক বা অতিক্রম করেই যাওয়া হোক, তার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। মালিক ইবনে আনাস ও সওরীও এ মত প্রকাশ করেছেন। লায়স বলেছেন, নাপাক শরীরে মসজিদের মধ্যে যাতায়াত করতে পারে। তবে কারোর ঘরের দরজা যদি মসজিদের মধ্যে খোলে ও যাতায়াতের অন্য কোন পথ না থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। শাফেয়ী বলেছেন, যাতায়াত করতে পারে, তবে বসবে না। নাপাক শরীরে মসজিদের মধ্যে দিয়া অতিক্রম করা জায়েয নয় একথার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জিয়াদ, আফলাতা ইবনে খলীফা, জামরাতা বিনতে দাজাজাতা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আসলেন। তাঁর সাহাবীগণের ঘরের মুখ মসজিদে উন্মুক্ত হতো। তিনি বললেন, তোমরা এ ঘরসমূহের মুখ মসজিদের বিপরীত দিকে উন্মুক্ত কর। পরে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু লোকেরা এই আশায় রাসূলের আদেশ মত কিছুই করলেন না যে, হয়ত এ ব্যাপারের জন্যে কোন রুখসত নাযিল হবে। পরে রাসূল (স) তাদের নিকট গিয়ে আবারও বললেন ঃ তোমরা এই ঘরসমূহের মুখ মসজিদের বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দাও। কেননা কোন হায়য অবস্থার ও নাপাক অবস্থার লোকের মসজিদে আসা আমি হালাল মনে করি না। তিনি এ কথায় অতিক্রম করা ও বসার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। ও-দু অবস্থার লোকদের জন্যে তা সমান।

আর দ্বিতীয়ত রাসূল (স) ঘরের দরজাসমূহ বিপরীত দিকে ফেরাতে বলেছেন। যেন লোকেরা মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত না করে— যখন তাদের শরীর নাপাক হবে। কেননা শুধু বসতে নিষেধ করাই যদি তাঁর ইচ্ছা হতো, তাহলে ঘরসমূহের মুখ বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিতে বলতেন না এবং 'আমি হায়য অবস্থার ও নাপাক শরীরের লোকদের জন্যে মসজিদ হালাল মনে করি না'— এই কথাটি বলারও কোন কারণ হতো না। তাই বোঝা গেল, ঘরসমূহের মুখ বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিতে বলার কারণ হল লোকেরা যেন নাপাক শরীর নিয়ে মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য না হয়। কেননা ঘরসমূহের দরজা মসজিদের মধ্যে খুললে অন্য কোন দিকে বের হওয়ার পথ নেই।

সুফিয়ান ইবনে হামজা কাসীর ইবনে জায়দ, মুতালিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নাপাক শরীরে কেউ মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করবে; কিন্তু সেখানে বসবে না, রাসূল (স) কাউকেই তার অনুমতি দিতেন না। অবশ্য হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-এর জন্যে অনুমতি ছিল। তিনি নাপাক শরীরে মসজিদের প্রবেশ করতেন ও তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতেন। কেননা তাঁর ঘর-ই ছিল মসজিদের মধ্যে। ফলে এ হাদীস জানিয়ে দিল যে, নবী করীম (স) মসজিদের মধ্য দিয়ে নাপাক শরীরে যাতায়াত করা ও বসাকে সাহাবীদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা)-এর জন্যে বিশেষ অনুমতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা সহীহ। তা হাদীস বর্ণনাকারীর কথা। তাঁর কারণ ছিল এই যে, তার ঘরটাই ছিল মস্‌জিদের মধ্যে। নবী করীম (স) প্রথমোক্ত হাদীসে ঘরসমূহের দরজা মসজিদের বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করেছিলেন। তাঁদের ঘর মসজিদে খোলে বলে তাঁদের জন্যে মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত মুবাহ্‌ করে দেননি। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-র জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অন্য কারো জন্যে করা হয়নি। ঠিক যেমন হযরত জাফর (রা)-এর জন্যে জান্নাতে দুইখানি কক্ষ হওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, অন্যান্য শহীদদের জন্যে তা করা হবে বলা হয়নি। হযরত হানজালা (রা)-কে ফিরিশতা গোসল দিয়েছিলেন নাপাক শরীরে শহীদ হয়েছিলেন বলে। হযরত দাহীয়া কলবী (রা)-এর আকৃতিতে হযরত জিবরাঈল নাযিল হলেন, এ বিশেষত্ব কেবল তাঁর-ই ছিল। যেমন হযরত যুবায়র (রা)-এর জন্যে রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দেয়া হয়েছিল বিশেষ কারণে, যখন তিনি উকুনের যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হযরত আলী (রা) ছাড়া নাপাক শরীরে মসজিদে প্রবেশ করা আর সকলের জন্যেই নিষিদ্ধ হয়েছিল— অতিক্রম করার জন্যে হোক বা অন্য কোন কারণে।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন সাহাবী মসজিদে নাপাক শরীরে যাতায়াত করতেন, সেটা কোন দলীল হতে পারে না তা জায়েয হওয়ার জন্যে। কেননা বর্ণনায় বলা হয়নি যে, তা রাসূল করীম (স) জানতেন এবং তিনি তাঁকে নিষেধ করেন নি। এমনিভাবে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীগণ জানাবাত হলে ওযু করে মসজিদে যেতেন ও সেখানে বসে কথাবার্তা বলতেন, বিপরীত মতের কোন সমর্থন তাতে নেই। কেননা নবী করীম (স) তাঁদেরকে তা করার অনুমতি দিয়েছিলেন এমন কথা বলা হয়নি। তাছাড়া তা রাসূলে করীম (স)-এর নিষেধ করার আগের ব্যাপারও হতে পারে। যদি এই সবই রাসূল (স)

থেকে সহীহ্ প্রমাণিত-ও হয়। তাছাড়া নিষেধের হাদীস অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য এ জন্যে যে, তার দ্বারা বড় জোর মুবাহ প্রমাণ হতে পারে, আর নিষেধ তার পরের ব্যাপার। তাই বলা যায়, ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, জানাবাতেব অবস্থায় মসজিদে বসা মসজিদের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই নিষিদ্ধ। সে অবস্থায় মসজিদের মধ্যে দিয়ে পথ অতিক্রম করাও নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় মসজিদের তা'জীমের জন্যে। মসজিদে বসা নিষিদ্ধ হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ হল শরীর নাপাক হওয়া। মসজিদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা কালেও তো এই 'ইল্লাত' বর্তমান। অপর কারোর মালিকানার অধীন স্থানে তার অনুমতি ছাড়া বসা যেমন নিষিদ্ধ— সেখানে অতিক্রম করা ও বসার হুকুম অভিন্ন। অনুরূপভাবে মসজিদে নাপাক শরীরে বসা যখন নিষিদ্ধ, তখন তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করাও নিষিদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। এ সব ক্ষেত্রেই নিষেধের 'ইল্লাত' হচ্ছে শরীর নাপাক হওয়া।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

এর ব্যাখ্যায় যারা বলেছেন, মসজিদের মধ্য দিয়ে নাপাক অবস্থায় অতিক্রম করা মুবাহ; এ পর্যায়ে আলী ইবনে আব্বাস (রা)-এর যে ব্যাখ্যা এসেছে এর তাৎপর্য হল, যে মুসাফির শরীর নাপাক হওয়ার কারণে তায়াম্মুম করবে— এই ব্যাখ্যা উত্তম— সে ব্যাখ্যা অপেক্ষা যেখানে মসজিদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না'— উক্ত অবস্থায় মূল নামায পড়ার কাজটি করতেই নিষেধ করেছে। মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করা হয়নি। কেননা ব্যবহৃত শব্দের তা-ই প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ, সম্বোধনের লক্ষ্যই তাই। কাজেই এখানে মসজিদের কথা বলা হলে তা হবে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ থেকে বিচ্যুতি— পরোক্ষ ও অপ্রকৃত অর্থের দিকে ঝুকে পড়া। তাতে নামায তার আসল তাৎপর্য থেকে সরে যাবে, তখন একটা জিনিসের নাম হিসেবে অন্য একটি জিনিসের নাম ব্যবহারের মতোই হবে পাশাপাশি হওয়ার দরুন অথবা তাতে সেই কারণ সংঘটিত হবে যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ - (الحج : ٤٠)

এখানে صلوات অর্থ, صلوات -এর স্থান। আর নিয়ম হচ্ছে, শব্দটির প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ সম্ভব হলে তা বাদ দিয়ে পরোক্ষ ও অপ্রকৃত অর্থ গ্রহণ জায়েয নয় কোন দলীল না পাওয়া পর্যন্ত। আর এখানে প্রকৃত অর্থ বাদ দেয়ার কোন দলীল নেই। কুরআন পাঠের ধারাবাহিকতায় এমন জিনিস রয়েছে যা বুঝিয়ে দেয় যে, এখানে প্রকৃত নামায-ই বোঝানো হয়েছে। 'যতক্ষণ না তোমরা জানবে কি বলছ' কথাটিও তাই। মসজিদের এমন কোন শর্ত নেই যা না হলে সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হতে পারে নেশাগ্রস্ত হওয়ার দরুন সে শর্ত পূরণ না করার কারণে।

নামাযে কুরআন পাঠ শর্ত, কোন ওযরে তা করতে না পারার দরুন নামায পড়ার কাজটা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এখানে আসল নামাযই বুঝিয়েছেন। তাই এর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা-ই হবে তার আসল ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا বলেছেন, 'পথ অতিক্রমকারী' অর্থ বিদেশী মুসাফির। কেননা মুসাফিরকেই পথ অতিক্রমকারী বলা হয়। এই নামটা যদি সেই অর্থে না হতো তা হলে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) এরূপ ব্যাখ্যা দিতেন না এ আয়াতের। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত নাম যার উপর প্রয়োগ হয় না, তা দিয়ে আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া কারোর জন্যেই জায়েয হতে পারে না। মুসাফিরকে পথ অতিক্রমকারী বলা হয়েছে এজন্যে যে, সে তো পথের উপরই রয়েছে। যেমন পথ-পুত্র বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সফরকালে তায়াম্মুম করে নামায পড়া মুবাহ করেছেন নাপাক শরীর হলেও। এ কারণে আয়াত থেকে দুটি তাৎপর্য পাওয়া যায়। একটি হল— নাপাক শরীরে পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয। আর দ্বিতীয়, তায়াম্মুম জানাবাত দূর করে না। কেননা কুরআনে তায়াম্মুমকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে নাপাক শরীরে পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয। আর দ্বিতীয়, তায়াম্মুম জানাবাত দূর করে না। কেননা কুরআনে তায়াম্মুমকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে নাপাক শরীর নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা উত্তম। এ ব্যাখ্যা থেকে যাতে মসজিদে পথ অতিক্রমকারী বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا 'যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে। তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয হওয়ার শেষ সীমা। আর এই শেষ সীমা যে এই নিষেধের আওতার মধ্যে গোসল ওয়াজিব হওয়ার সময়টা শামিল সহ, তা নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। পানি পাওয়ার পর গোসল পূর্ণ না হওয়া অবস্থায়ও নামায পড়া তার জন্যে জায়েয হবে না। কোনরূপ ক্ষতির আশংকা ছাড়াই পানি ব্যবহার সম্ভব হলে এই হুকুম। এ থেকে বোঝা যায় শেষ সীমাটা মোটামুটি পূর্ববর্তীর মধ্যে গণ্য।

আল্লাহ্‌র বলেছেন ঃ

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ -

তোমরা রোযা সম্পূর্ণ কর রাত্র পর্যন্ত। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৭)

এখানে শেষ সীমা— রাত— রোযা পূর্ণ করবে আদেশের বাইরে গণ্য। কেননা রাত্রির শুরুটা প্রবেশ করলেই রোযার আওতা থেকে বাইরে চলে যাওয়া হয়। আর اِلٰى যেমন শেষ সীমা নির্ধারণ করে, তেমনি حَتّٰى শব্দটিও।

এ একটি মৌলনীতি। তা প্রমাণ করে যে, শেষ সীমা কখনও পূর্ব কথার আওতা-ভুক্ত হতে পারে, আবার কখনও তা তার বাইরে গণ্য হয়। কোথায় তা আওতার মধ্যে পড়বে আর কোথায় তার বাইরে গণ্য হবে, তা দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। 'জানাবাত' সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম তার তাৎপর্য রোগী মুসাফির সংক্রান্ত হুকুম প্রসঙ্গে সূরা আল-মায়িদার তাফসীরে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করব যখন আমরা সেখানে পৌছব ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا -

তোমরা ঈমান গ্রহণ কর— তোমাদের নিকট যা রয়েছে তার সত্যতা ঘোষণাকারী আমরা যা নাযিল করেছি তার প্রতি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করে দেয়ার পূর্বেই।

এ আয়াতটি তালাক সংক্রান্ত একটি বিষয়ে আমাদের ফিকাহবিদের কথাকে প্রমাণ করে। সে বিষয়টি হল, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল ঃ তুমি তালাক অমুকের উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই। এ কথার পর তাৎক্ষণিকভাবেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, সে লোক এসে পৌছুক, কি না-ই পৌছুক।

তাঁদের কারোর কারোর মত এই বর্ণিত হয়েছে যে, সেই ব্যক্তির এসে পৌঁছার পূর্বে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা অমুকের আসার পূর্বে এই কথাটি বলা যায় না, অথচ সে আসেনি। আসলে হানাফী ফিকাহবিদদের কথাই সহীহ্। উপরোক্ত আয়াতই তা প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'হে কিতাব পাওয়া লোকেরা। তোমাদের নিকট রক্ষিত কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী হিসেবে আমরা যা নাযিল করেছি, তার প্রতি ঈমান আন— আমরা যে মুখমন্ডলসমূহ বিকৃত করে দেব, তার পূর্বেই।' মুখমন্ডলসমূহ বিকৃত করার পূর্বেই ঈমান আনার এ আদেশ সহীহ্, যদিও মুখমণ্ডল বিকৃত করার এই কথিত ব্যাপারটি আদৌ ঘটে নি। অথচ এ ঈমানটা ছিল মুখমণ্ডল বিকৃত করার পূর্বে; কিন্তু লোকেরা সে বিকৃতি দেখতে পায় নি। যেমন আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا -

দাস মুক্ত করতে হবে দুজনের পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে ..... (সূরা মজাদিলা ঃ ৩)

দাস মুক্ত করার এই আদেশ সহীহ্ যদিও তাদের দুজনের স্পর্শ করার ঘটনা ঘটে নি।

যদি বলা হয়, উপরোক্ত কথাটি ছিল ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহ্র কঠোর হুমকি, ভীতি প্রদর্শন অথচ তারা ইসলাম কবুল করে নি, আর যা বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা ঘটে নি।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, এ হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের পর কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী ইসলাম কবুল করেছে বটে। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, সালাবাতা ইবনে সাইয়া, জায়দ ইবনে সানাতা, আসাদ ইবনে সাইয়া, আসাদ ইবনে উবায়দ ও মুখাইরীক প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য। উক্ত ভীতি প্রদর্শনটা ছিল তাৎক্ষণিক, তাদের সকলের ইসলাম গ্রহণ না করার সাথে সম্পর্কিত। আর এ-ও সম্ভব যে, এ ভীতিটা পরকালে সংঘটিতব্য হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। কেননা ইসলাম গ্রহণ না করলে এ আযাবটি দুনিয়ায়-ই যে তাৎক্ষণিভাবে ঘটবে তা বোঝাবার মত কোন শব্দ আয়াতে নেই।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ -

তুমি কি ওদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ, যারা নিজদিগকে পবিত্র নির্দোষ যাহির করে?

আল-হাসান, কাতাদাতা ও দহাক বলেছেন, আয়াতটি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে। তারাই বলত, আমরা তো আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয় পাত্র। তারাই বলত, জান্নাতে যাবে কেবলমাত্র

তারাই, যারা ইয়াহুদী হয়েছে কিংবা খ্রিস্টান। আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতে লোকদের কতকের অপর কতককে নির্দোষ ও পবিত্র বলার কথা বলা হয়েছে। যারা দুনিয়ায় স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে তেমনটা করত।

আবূ বকর বলেছেন, আত্মপবিত্রতা ও নির্দোষিতা-নিষ্পাপতা প্রচার করতে এ কারণেই নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَاتُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ -

তোমরা নিজেদের নির্দোষিতা-নিষ্পাপতা প্রচার করে বেড়িও না। (সূরা নযম ঃ ৩২)

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ 'তোমরা যখন কৃত্রিম প্রশংসাকারী দেখবে, তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।'

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه -

আল্লাহ্ ও-লোকদেরকে যে নিজের অনুগ্রহ দান করেছেন, ওরা কি সে জন্যে লোকদেরকে হিংসা করে?

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, দহাক, সুদ্দী ও ইকরামা থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে 'লোকদেরকে' বলে বিশেষভাবে নবী করীম (স)-কে বুঝিয়েছেন। কাতাদাতা বলেছেন, তারা আরববাসী। অন্যান্যরা বলেছেন, তারা নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ। আর এই কথাটিই উত্তম ও যথার্থ। কেননা কথার শুরুতে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। ওরা এর পূর্বে নিজেদের নিকট রক্ষিত কিতাবে নবী করীম (স)-এর নবুয়ত-রিসালাত, তাঁর বিশেষ গুণ পরিচিত ও তাঁর নবুয়্যতের অবস্থার কথা পাঠ করত। ওরাই আরবদেরকে ওয়াদার সূরে বলত; তিনি এলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। কেননা ওরা এই ধারণা করে বসেছিল যে, আরবরা নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান আনবে না, ফলে তারা নিহত হবে। ওরা তো এই কথাই মনে করে বসেছিল যে, শেষ নবী বনী ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি যখন ইসমাঈল-বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ওরা আরবদের হিংসা করতে শুরু করল। নবী করীম (স)-এর প্রতি কুফর করল এবং তারা তাঁর সম্পর্কে আগে-থেকে যা জানতো, তা অস্বীকার করতে শুরু করল। এ কথাই আল্লাহ্ বলেছেন এ আয়াতে ঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِه -

পূর্বে তারা ভবিষ্যতে যারা কুফরি করবে তাদের উপর নিজেদের বিজয়ী হওয়ার আগাম কথাবার্তা বলত। কিন্তু পরে যখন এসে-ই গেল যা তারা চিনতে পেরেছিল, তারা তার প্রতি কুফরী করল। (সূরা বাকারাহ ঃ ৮৯)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ -

আহ্লি কিতাবদের বহু সংখ্যক লোক অন্তর দিয়ে কামনা করত— তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর তারা যদি তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করতে পারত, এটা একান্তভাবে তাদের হিংসার পরিণাম মাত্র। (সূরা বাকারাহ ঃ ১০৯)

আরবদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের শত্রুতা ছিল প্রকাশ্যে রাসূলে করীম (স)-এর আগমনের পর এবং তা ছিল তাদের প্রতি তাদের পরম হিংসার কারণে। কেননা তারা বড় আশা করে বসেছিল যে, শেষ নবী তাদের বংশেই জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। অতএব আয়াতটির স্পষ্ট তাৎপর্য হচ্ছে, তারা রাসূল (স) এবং আরবদের বিরুদ্ধে হিংসায় জ্বলছিল। 'হিংসা' হচ্ছে অন্য একজনের নিকট যেসব নিয়ামত ও কল্যাণ রয়েছে তার বিলুপ্তি ও বিনাশ কামনা করা। এজন্যে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তুমি খুশী করতে পার, কিন্তু নিয়ামতের হিংসুককে খুশী করতে পার না। সে খুশী হতে পারে কেবল তখন, যদি তোমার নিকট রক্ষিত নিয়ামত বিলীন হয়ে যায়। অবশ্য 'গেবতা' নিন্দার্হ নয়। কেননা 'গেবতা' বলা হয় অনুরূপ নিয়ামত লাভের কামনা-বাসনা। অন্যের যা আছে তার বিলুপ্তি ও বিলীনতার কোন কামনা তাতে থাকে না। বরং তার নিকট সে নিয়ামত ও কল্যাণ থাকুক, তাতেই তার আনন্দ ও উল্লাস।

আল্লাহ্র কথা ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا -

যখনই তাদের চামড়া পেকে যাবে, তাদেরকে সে চামড়ার পরিবর্তে অন্য চামড়া দিয়ে বদল করে দেব।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, তাদের দেহের চামড়া জ্বলে যাওয়ার পর সে চামড়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাদের নতুন চামড়া বানিয়ে দেবেন। এই মত যাঁদের, তাঁরাই বলেছেন, চামড়া মানুষের অংশ নয়, গোশ্ত ও অস্থিও নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ হচ্ছে সেই রূহ, যা এই দেহসংস্থাকে কেন্দ্র করে অবস্থান করে। যিনি বলেছেন যে, চামড়া মানুষের কতকাংশ আর মানুষ হচ্ছে সেই সত্তা যা এ সবের দ্বারা পূর্ণত্ব পায়, তিনি বলেন, তা নিত্য নতুনত্ব পাচ্ছে, অ-জ্বলন্ত অবস্থায় তা যেমন ছিল, তেমনিই তা হয়ে যায়। যেমন একটি অঙ্গুরীয় গলিয়ে অপর একটি অঙ্গুরীয় নির্মাণ করা হয় একই ধাতু দিয়ে; কিন্তু তবু সেটা পূর্বেরটার থেকে ভিন্নতর একটি আংটি হয়ে যায় বা যেমন, কেউ তার জামা কেটে 'কাবা' বানাল। এটা আগের জামা থেকে ভিন্নতর একটি পোশাক হয়ে গেল।

কেউ কেউ বলেছেন, পরিবর্তনটা হয় শুধু পোশাকের, যা তারা পরেছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত দূরবর্তী। কেননা পরিধেয় বস্ত্রকে কখনও চামড়া বলা হয় না।

আমানত আদায়ের নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا -

আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার যোগ্য ব্যক্তির নিকট প্রত্যর্পণ করে দাও।

আমানত আদায়ের এ আদেশ কাদেরকে দেয়া হয়েছে— তাফসীরকারগণ এ পর্যায়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কারা, যাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে? জায়দ ইবনে আসলাম, মক্‌হুল ও শহর ইবনে হাওশব থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, এ আদেশ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালকদের প্রতি। শাসক গোষ্ঠীর প্রতিই এই নির্দেশ। ইবনে জুরাইয বলেছেন, আয়াতটি উসমান ইবনে তালহার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ্ আদেশ করেছেন যে, কাবার চাবিসমূহ তার নিকট রক্ষিত ছিল, তার কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, অতএব তা তার নিকটই ফিরিয়ে দিতে হবে। ইবনে আব্বাস উবায় ইবনে কাব (রা), আল-হাসান ও কাতাদাতা বলেছেন, আয়াতটির প্রয়োগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হবে, যার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়েছিল। অবশ্য এ কথাটি উত্তম। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করছেন' এমন একটি সম্বোধন, যা শরীয়ত পালনের বাধ্য সব লোকের প্রতিই প্রযোজ্য সাধারণ তাৎপর্য হিসেবে। তাই কতক লোককে বাদ দিয়ে অপর কতক লোক সম্পর্কে তা প্রযোজ্য বলা ঠিক নয়— কোন দলীল ছাড়া। আমি মনে করি, যাঁরা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, হুকুমটি রাষ্ট্র পরিচালকদের প্রতি, তাঁরা নির্ভর করেছেন পরবর্তী কথার উপর। তা হল ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ -

আর তোমরা যখন লোকদের মধ্যে শাসনকার্য চালাবে— বিচার করবে, তখন অবশ্যই ন্যায়পরতা ও সুবিচার নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করবে, বিচারের রায় দেবে।

এ কথাটি তো নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র পরিচালকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। তাই সম্বোধনের শুরু কথাগুলিও অবশ্যই তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়ে থাকবে।

কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে তেমন নয়। কেননা এটা হতে পারে যে, সম্বোধনের প্রাথমিক কথা সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, আর শেষ পর্যায়ের সংযোজিত কথা বিশেষভাবে শাসক গোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর এর বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। কুরআনে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

আবূ বকর বলেছেন, মানুষের নিকট বিশ্বাস করে যা-ই গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা-ই তার নিকট আমানত। এ আমানতদারের কর্তব্য হচ্ছে, তা তার মালিকের— রক্ষকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। গচ্ছিত রাখা সব জিনিসই আমানত, যে তা রাখল তার কর্তব্য তা সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়া, যে তা তার নিকট রেখেছিল। সে আমানত যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে

আমানতদারকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না— এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের ফিক্‌হবিদগণ সম্পূর্ণ একমত।

আগের দিনের কোন কোন মনীষীর এই মত-ও জানা গেছে যে, তাকে আমানতের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শবী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি আমার উপর কিছু দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষণের বোঝা চাপিয়ে দিল। পরে আমার কাপড়ের মধ্য দিয়ে তা নষ্ট হয়ে যায়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' হামেদ ইবনে মুহাম্মাদ শুরাইহ্-ইবনে ইদরীস, হিশাম ইবনে হাসান, আনাস ইবনে সীরীন, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার নিকট ছয় হাজার দিরহাম আমানত রাখা হয়েছিল। পরে তা হারিয়ে যায়। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, তার সাথে তোমার কোন জিনিস গেছে কি? বললাম, না। তখন তার ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি আমাকে বাধ্য করলেন।

হাজ্জাজ আবূ যুবায়র-জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তির নিকট কিছু সামগ্রী গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। পরে তার নিজের সামগ্রীর সাথে মিলে তা হারিয়ে যায়। কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ দিতে হযরত আবূ বকর (রা) তাকে বাধ্য করেন নি। তিনি বলেছিলেন, 'তা ছিল আমানত'।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইসমাঈল ইবনুল ফযল, কুতায়বা, ইবনে লাহ্ইয়া, আমর ইবনে শুয়ার, তাঁর পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ -

যে ব্যক্তির নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখা হবে, তাকে সেজন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইবরাহীম ইবনে হাশিম, মুহাম্মাদ ইবনে আওন, আবদুল্লাহ ইবনে নাফে', মুহাম্মাদ ইবনে নবীহুল হজবী, আমর ইবনে শুয়ায়ব, তাঁর পিতা, তার দাদা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لَا ضَمَانَ عَلَى رَاعٍ وَلَا عَلَى مُؤْتَمَنٍ -

রাখাল ও আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না।

আবূ বকর বলেছেন, নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না'— ধারে নেয়া টাকার ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিপরীত অর্থ দেয়। কেননা ধারটাও এক ধরনের আমানত ধারে গ্রহণকারীর হাতে। কেননা ধারদাতা তাকে বিশ্বাস করেই ধার দিয়েছে। তবে গচ্ছিত জিনিসের যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, এ বিষয়ে ফিকাহবিদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই, যখন তাতে গচ্ছিত রাখা জিনিস গণনা করা হয় না। অথচ এই গচ্ছিত জিনিস বিনষ্টের ক্ষতিপূরণ দিতে হযরত উমর (রা) বাধ্য করেছেন। এর কারণ হতে পারে গচ্ছিত রক্ষক ব্যক্তি হয়ত এমন কিছু কথা স্বীকার করেছে যার কারণে তাঁর মতে ক্ষতিপূরণ দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়েছে।

কিন্তু ধারে গ্রহণ করা জিনিস ও টাকা-পয়সার ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে আগের দিনের মনীষীদের মধ্যে যেমন মতপার্থক্য ছিল, তেমনি পরবর্তীকালের ফিকাহবিদদের মধ্যেও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। উমর, আলী, জাবির (রা) এবং শুরাইহ্‌ ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, ধারের জিনিসে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন— না, তাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না যদি তা নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। ইবনে শাবরামাতা, সওরী ও আওজায়ীরও এ কথা। উসমান আল-বত্তী বলেছেন, ধারগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ দেবে যা সে ধার বাবদ নিয়েছে তার। তবে পশু বা আকিলার দিতে হবে না। হ্যাঁ, যদি পশু ও আকিলার ক্ষেত্রে তার শর্ত করা হয়, তা হলে অবশ্যই সে ক্ষতিপূরণ দেবে।

ইমাম মালিক বলেছেন, ধারে পশু নিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অবশ্য অলংকার, কাপড়-চোপড় ও অনুরূপ জিনিসের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। লায়স বলেছেন, ধার নিলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু মুসলমানদের শাসক আবুল আব্বাস আমার নিকট লিখেছেন যে, আমি তার ক্ষতিপূরণ দেব। তাই আজকের বিচার তো এই যে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শাফেয়ী বলেছেন, প্রত্যেকটি ধারেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, ধারে নেয়া জিনিস নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না যদি ধারে গ্রহীতা তাতে কোন অংশ গ্রহণ না করে থাকে। তার দলীল হল, ধার দাতা ধার গ্রহীতাকে যখন ধার দিয়েছে, তখন সে তাকে বিশ্বাস করেছে, সে কার্যত, আমানতদার হয়েছে আর আমানতদার হওয়ার কারণে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া কর্তব্য হবে না। কেননা আমরা নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন ঃ لَاضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ —বিশ্বাস করে যার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যায় না। আর সর্ব পর্যায়ের আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য না করার তা-ই হচ্ছে মৌলনীতি। উপরন্তু জিনিসটি যখন তার মালিকের অনুমতিক্রমে হস্তগত করা হয়েছে, তখন ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোন শর্ত করা হয়নি। অতএব এর কোন ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। যেমন গচ্ছিত রাখা জিনিস। ভাড়ায় নেয়া কাপড়ের-ও কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না মুনাফার ব্যয়ের শর্ত থাকলেও— হস্তগত করা জিনিসের ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্ত করা না হলে। অতএব ধারের ক্ষতিপূরণ না দেয়া উত্তমভাবেই প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্ত করা হয়নি কোনভাবে। অপর এক দিক দিয়ে যা ইজারা হিসেবে হস্তগত করা হয়েছে, তা হস্তগত করা হয়েছে মুনাফা পূর্ণ করে দেয়ার জন্যে। উপরন্তু 'হেবা' করা জিনিসের কোন ক্ষতিপূরণ যার জন্যে 'হেবা' করা হয়েছিল তাকে দিতে হবে না। কেননা তা তার মালিকের অনুমতিক্রমেই হস্তগত করা হয়েছে। তবে বিনিময় দেয়ার শর্ত করা হলে ভিন্ন কথা। আসলে একটা ভালো কাজ একটা মহানুভবতা। ধারের ব্যাপারটাও তেমনি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা তাও ভালো কাজ ও মহানুভবতা মাত্র। ধারে নেয়া জিনিসের যদি ব্যবহার করতে গিয়ে ত্রুটিযুক্ত হয়— কোন ক্ষতি ঘটে, তাহলে এই ক্ষতিরও ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না। তা হস্তগত করার পর তার কোন অংশের যখন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তখন সমস্তটা যদি হারিয়ে বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও ক্ষতিপূরণ না দেয়াই

স্বাভাবিক। কেননা যার ক্ষতিপূরণ হস্তগত করার সাথে সম্পর্কিত, তাতে সমগ্রটার হুকুম ভিন্নতর হতে পারে না। তার অংশেরও যেমন। যেমন ছিনতাই করা-কেড়ে লওয়া জিনিস ও অশুদ্ধ বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তগত করা জিনিস। সব ফিকহবিদ একমত হয়েছে এ বিষয়ে, অংশ যদি ক্ষতির দরুন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তখন সমস্তটাও যদি নষ্ট হয় তার ক্ষতিপূরণ দেয়া কর্তব্য হবে না। যেমন গচ্ছিত রাখা ও আমানতস্বরূপ রাখা জিনিস।

ধারে গ্রহণ পর্যায়ে সফওয়ানইবনে উমাইয়্যাতা বর্ণিত হাদীসের শব্দ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু তাঁদের অন্যান্যরা তার উল্লেখ করেন নি। শরীক আবদুল আযীয ইবনে রফী, ইবনে আবূ মুলায়কা, উমাইয়্যাতা ইবনে সফওয়ান, ইবনে উমাইয়্যাতা-তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) সফওয়ানের নিকট থেকে হুনায়ন যুদ্ধের দিন একটি লৌহ বর্ম ধার বাবদ গ্রহণ করেছিলেন, তখন সফওয়ান বলেছিলেন, হে মুহাম্মাদ, এটার কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। পরে তার একটি অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি চাইলে যে অংশ নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেব। তখন সফওয়ান বলেছিলেন ঃ হে রাসূল, তার পরিবর্তে আমি বরং ইসলামের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। ইসরাইল এ হাদীসটি আবদুল আযীয রফী, ইবনে আবূ মুলায়কা, সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূল (স) সফওয়ানের নিকট থেকে একটি বর্ম ধার বাবদ নিয়েছিলেন। তার কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন, তুমি চাইলে আমি তার ক্ষতিপূরণ তোমাকে দেব। তখন সফওয়ান বলেছিলেন, না হে রাসূল! শরীক এ বর্ণনাটির সূত্রসমূহ রাসূল (স) পর্যন্ত মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসরাঈলের বর্ণনা সূত্রে মুনকাতা, তাতে ক্ষতিপূরণের উল্লেখ করা হয়নি। কাতাদাতা আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাতার নিকট থেকে হুনায়ন যুদ্ধের সময় কতগুলি বর্ম ধার বাবদ নিয়েছিলেন। তখন সফওয়ান জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে রাসূল! এ ধার কি শোধ করে দেয়া হবে ? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। জরীর আবদুল আযীয ইবনে রফী, আনাস আবদুল্লাহ ইবনে সফওয়ানের বংশধর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) হুনায়ন যুদ্ধে সংকল্প গ্রহণ করেন, ... এরপর হাদীসটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাতে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। এও বলা হয়েছে যে, এ বর্ণনাকারী জরীর ইবনে আবদুল হামীদ অপেক্ষা হাদীস বর্ণনায় অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন, অধিক দৃঢ় ও অধিক স্থিতিশীল নন। তিনি ক্ষতিপূরণের কথাটিরও উল্লেখ করেন নি। বর্ণনাকারীরা সমান-সমান হলেও তা 'মুজ্‌তারিব'— শব্দের ওলট-পালট অবস্থা। অন্যান্য হাদীসসমূহ আবূ আমামা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) বলেছিলেন যে, ধার অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া হবে। সফওয়ান বর্ণিত হাদীসে ক্ষতিপূরণ দেয়ার যে উল্লেখ আছে তা যদি সহীহ্‌ হয়, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে ফিরিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা— যেমন সফওয়ান বর্ণিত কোন কোন হাদীসের শব্দ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এমনকি আমি তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব। যেমন আবদুল বাকি ইবনে কানে' ফিরয়াবী, কুতায়বা, লায়স,

ইয়াযীদ ইবনে আবূ হুবায়ব, সাঈদ ইবনে আবূ হিন্দু সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম যে ধারে নেয়ার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে, তা হল রাসূলে করীম (স) সফওয়ানকে বললেন ঃ তোমার হাতিয়ারসমূহ আমাদেরকে ধার দেও। তা আমাদের উপর চাপানো থাকবে, আমরা তা এনে তোমাকে ফেরত দেব। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তিনি তা ফিরিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। কেননা সফওয়ান তখন একজন কাফির যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূল (স) তা অন্যান্য সব যুধ্যমান জনতার ধন-মালের মতো তার হাতিয়ারগুলিও বোধ হয় তিনি নিয়ে নেবেন। সেই কারণে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এগুলি জোরপূর্বক নিয়ে নিচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, না, ক্ষতিপূরণসহ ফিরিয়ে দেয়া হবে, আমিই এগুলি তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব। ফিরিয়ে দেয়ার ধারস্বরূপ এটা নেয়া হচ্ছে। নবী করীম (স) এই কথা বলে জানিয়ে দিলেন যে, তা ফিরিয়ে দেয়ার ধারে নেয়া। যুধ্যমানদের মাল যেমন করে নেয়া হয় এটা ঠিক সেইভাবেই নেয়া হচ্ছে। যেমন কেউ কাউকে বলে ঃ আমি তোমার প্রয়োজন পূরণে জামিন হলাম। অর্থাৎ আমি তার দায়িত্ব নিলাম। আমি তা পূরণের জন্যে চেষ্টা করব।

আভিধানিকরা বলেছেন ঃ ضَمِنْتُهَا অর্থ, আমি উহার সংকল্প করেছি, উহার ইচ্ছা করেছি। উপরন্তু আমি বিরোধীদের জন্যে খবরের সত্যতা সমর্থন করছি, তাতে যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে মতপার্থক্য স্বরূপ আমরা বলব, তার কোন প্রমাণ তাতে নেই। কেননা তিনি বলেছেন, عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ 'এ এমন ধারে নেয়া যা ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।' তিনি যে বর্মগুলি নিয়েছিলেন, তা ফেরত দেয়ার দায়িত্বভুক্ত করে দিয়েছিলেন। এতে ঠিক যে জিনিসটা নেয়া হয়েছিল সেটাই ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল, তার মূল্য ফেরত দেয়ার নয়। কেননা তিনি বলেন নি, আমি এর মূল্যের দায়িত্ব গ্রহণ করছি। কথায় ব্যবহৃত শব্দের আসল ও প্রকৃত অর্থ-ই গ্রহণ করা উচিত, পরোক্ষ ও অপ্রকৃত অর্থ নয়। যতক্ষণ তা করার কোন দলীল না পাওয়া যাবে। উপরন্তু বিপরীত মতের লোক শব্দে যে সর্বনাম প্রমাণ করার দাবি করেছে তার-ও কোন দলীল নেই। অর্থাৎ মূল্যের নিশ্চয়তা। তাই তা প্রমাণ করা যাবে না। কেননা তার কোন দলীল নেই। তা একথাও প্রমাণ করে যে, ধারে নেয়া জিনিস ধ্বংস হলে তার মূল্যের ক্ষতিপূরণ দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। তাই নবী করীম (স) তার কয়েকটি বর্ম হারিয়ে গেলে তিনি সফওয়ানকে বলেছেন, তুমি চাইলে আমি সে কয়টির ক্ষতিপূরণ দেব। যদি মূল্যের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা থাকত, তাহলে তিনি কখনই বলতেন না যে, তুমি চাইলে তোমার জন্যে ক্ষতিপূরণ দেব। তাহলে তিনি জরিমানা আদায়কারী হতেন। বোঝা গেল, ধারে নেয়া জিনিস ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা দেয়া ওয়াজিব হয় না। সফওয়ান চাইলে নবী করীম (স) জরিমানা দিতে ইচ্ছা করেছিলেন। সে জরিমানাটা মহানুভবতা স্বরূপ হতো। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, নবী করীম (স) যখন আবদুল্লাহ ইবনে রবীআতার নিকট থেকে ত্রিশ হাজার এই যুদ্ধেই 'করয' নিয়েছিলেন, পরে তিনি তা আবদুল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ তুমি এটা নিয়ে নাও। কেননা 'করযের' প্রতিদান হল, তা ফিরিয়ে দেয়া এবং প্রশংসা করা। তা যদি বাধ্যতামূলক জরিমানা হতো যে সব বর্ম হারিয়ে গেছে তার জন্যে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন না, তুমি চাইলে তোমার জন্যে আমরা জরিমানা দেব।

এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের মূল্য দেয়ার ওয়াদাও ছিল না। কেননা সফওয়ান বলেছিলেন, এক্ষণে আমার দিলে ঈমান জেগে উঠেছে, যা পূর্বে ছিল না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স)-এর এই বর্ম গ্রহণ মূল্য দেয়ার নিশ্চয়তাপূর্ণও ছিল না। কেননা যা দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তা দেয়ার ব্যাপারে কুফর ও ঈমানের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য হতে পারে না।

আমাদের কোন কোন মনীষী বলেছেন, সফওয়ান যখন যুধ্যমান লোক ছিলেন তখন তার শর্ত তিনি অবশ্যই করতে পারতেন। কেননা আমাদেরও যুধ্যমানদের মাঝে শর্ত আরোপের ভিত্তিতে লেন-দেন করা খুবই সঙ্গত ছিল, যা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্গত হয় না। যেমন তাদের মধ্যে যারা স্বাধীন তারা রিহনের ভিত্তিতে মুয়ামিলা করতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে তা জায়েয নয়। আবুল হাসান আল-কারখী এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্ষতিপূরণের শর্ত করা সহীহ্ হতে পারে না যুধ্যমান লোকদের জন্যে যা ক্ষতিপূরণ দেয়ার জিনিস নয়, তাতে। যেমন আমরা যদি তাদের জন্যে গচ্ছিত রাখা ও মুজারিবাত ইত্যাদির শর্ত করি, তাহলে তা সহীহ্ হবে না।

যিনি ধারে নেয়া জিনিসের ক্ষতিপূরণ দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, তিনি একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি শুবা ও সাঈদ ইবনে আবূ আরুবা কাতাদাতা আল-হাসান সামুরাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ -

হাতে-হাতে তুমি যা নেবে তা অবশ্যই ফেরত দেবে।

আর মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে এ হাদীসটিও প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। কেননা তাতে যে জিনিসটি নেয়া হয়েছে ঠিক সেই জিনিসটিই ফেরত দেয়া কর্তব্য করা হয়েছে। তাতে জিনিসটি ধ্বংস হলে মূল্য দিয়ে তার ক্ষতিপূরণের উল্লেখ নেই। আমরা বলছি, ধারে নিলে তা ফেরত দেয়া কর্তব্য। আর এতে কোন মতপার্থক্যও নেই। আর মতপার্থক্যের স্থানের সাথে তার কোন সম্পর্কও নেই।

ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা পর্যায়ে আল্লাহ্‌র হুকুম

আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -

তোমরা যখন লোকদের মধ্যে হুকুম চালাবে তখন যেন তোমরা ন্যায়পরতা সহকারে হুকুম চালাও।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ -

আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে আদেশ করেছেন ন্যায় বিচার ও দয়া-সহানুভূতির। (সূরা নহল ঃ ৯০)

বলেছেন ঃ

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبٰى -

তোমরা যখন কথা বলবে তখন অবশ্যই সুবিচার করবে যদিও নিকটবর্তী ক্ষেত্রে হয়। (সূরা আন'আম ঃ ১৫২)

আবদুল বাকী ইবনে কানে' আবদুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে আবূ উসমান, উবায়দ ইবনে হুবাব আল-হুলী, আবদুর রহমান ইবনে আবুর-রিজাল, ইসহাক ইবনে ইয়াহ্য়া ইবনে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সাবিতুল আরায, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে আমাদের নিকট নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَا تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بِخَيْرٍ مَّا اِذَا قَالَتْ صَدَقَتْ وَاِذَا حَكَمَتْ عَدَلَتْ وَاِذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ -

এই মুসলিম উম্মাহ্ কল্যাণ ও মঙ্গলে ভরপুর থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা কথা বললে সত্য বলবে, শাসনকার্য চালাতে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করবে। আর তাদের নিকট রহম চাওয়া হলে তারা অবশ্যই রহমত করবে।

আবদুল বাকী বলেছেন, আমাদের নিকট বশর ইবনে মূসা আবদুর রহমান আল-মুকরী, কহমস ইবনে হাসান, আবদুল্লাহ আল-আসলামী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে গাল-মন্দ বলল। ইবনে আব্বাস লোকটিকে বললেন ঃ তুমি নিশ্চয়ই আমাকে গাল-মন্দ বলেছ। তিনটি চারিত্রিক ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কুরআনের আয়াত অনুযায়ী আমল করি। আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কামনা ও পছন্দ করি যে, সব লোক-ই তা জানে, আমি যা জানি। আমি যখন শুনি, মুসলমানদের কোন শাসক তার শাসন কার্যে সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করে, আমি তাতে খুবই উৎফুল্ল হই। সম্ভবত আমি তার নিকট হয়ত কোন দিনই বিচার নিয়ে যাব না। আমি মুসলমানদের দেশসমূহের কোন দেশে বৃষ্টিপাতের কথা শুনি, তাতেও আমি খুবই খুশী হই, যদিও আমার পালানে কোন পশু নেই।

আবদুল বাকী আল-হারিস ইবনে আবূ উসামাতা, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবনে সালাম, আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী, হাম্মাদ ইবনে সালামাতা, হুমায়দ, আল-হাসান সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَخَذَ عَلَى الْحُكَّامِ ثَلَاثًا اَنْ لَّا يَتَّبِعُوْا الْهَوٰى وَاَنْ يَّخْشَوْهُ وَلَا يَخْشَوْا النَّاسَ، وَاَنْ لَّا يَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ثُمَّ قَرَأَ : يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى -

আল্লাহ্ তা'আলা শাসকদেরকে তিনটি বিষয়ে শক্তভাবে পাকড়াও করেছেন। তা হল তারা নফসের খাহেশ অনুসরণ করবে না, কেবল আল্লাহ্‌কেই ভয় করবে, জনগণকে ভয় করবে না

এবং আল্লাহ্‌র আয়াত সামান্য মূল্যে বিক্রয় করবে না। তারপর পড়লেন হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্য বিধান অনুযায়ী শাসন ও বিচার কার্য সম্পাদন কর এবং নফসের খাহেশের অনুসরণ করো না।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا -

আমরা নিশ্চিতভাবে তওরাত নাযিল করেছি। তাতে হেদায়েতের বিধান রয়েছে এবং আছে নূর। তার দ্বারা ইসলামের সব নবী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

শেষের অংশ ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا - وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -

অতএব তোমরা জনগণকে ভয় করবে না, ভয় করবে কেবল আমাকে এবং আমার আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করবে না। আর আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারাই শাসন ও বিচার কার্য চালায় না, তারাই কাফির। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

উলিল আমর-এর আনুগত্য

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, অনুসরণ কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদেরও।

আবূ বকর বলেছেন, 'উলিল আমর' বলতে কাদের বোঝায়, এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস (একটি বর্ণনায়), আল-হাসান, আতা ও মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন ঃ 'উলিল আমর' বলতে ফিকাহবিদ ও ইলমওয়ালা লোক বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (অপর একটি বর্ণনায়) ও আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত— তারা হচ্ছে সদাশয় শাসকবৃন্দ । আর হতে পারে, এদের সকলের কথাই এর তাৎপর্যভুক্ত। কেননা কথিত নামটি এদের সকলের জন্যে প্রযোজ্য। শাসকরাই সৈন্যবাহিনী ও অভিযানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কাজ-ও তারাই করে। আর শরীয়তবিদ আলিমগণ শরীয়ত ভিত্তিক শাসন নিশ্চিত করে। যা জায়েয তার নির্ধারণ ও যা না-জায়েয তার নিরসন করে। আয়াতে জনগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে মেনে চলার জন্যে এবং শাসকগণ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলরা যে ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা করে তা কবুল করার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। এ কালের আলিমগণ ন্যায় পথের পথিক, সর্বজন পছন্দনীয় ও দৃঢ় আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁদের দ্বীনদারী ও আমানতদারী ছিল সর্বজনবিদিত। এ অর্থেরই আর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা নিজেরা না জানলে যারা জানেন তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭)

কারো কারো মতে উলিল আমর-এর এখানে প্রকাশমান তাৎপর্য হচ্ছে আমীর ও শাসকগণ। কেননা এর পূর্বেই ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য চালাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আইন কার্যকর করার অধিকারী ও কর্তৃত্বশালী লোকদেরকেই এ সম্বোধনটা করা হয়েছে। আর তারাই হচ্ছে শাসক-প্রশাসক ও বিচারকমন্ডলী। এর পর এর সাথে সংযোজন করে আদেশ দেয়া হয়েছে 'উলিল আমর'কে মেনে চলার জন্যে। ওরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পরিচালকবৃন্দ। ওরাই জনগণের উপর আইন ও শাসন চালায়। তাদের মানতে হবে যতদিন তারা ন্যায়পরতা সম্পন্ন ও আস্থাভাজন থাকবে। অবশ্য যুদ্ধাভিযান পরিচালক ও আলিমগণ— এ দুই পর্যায়ে কর্তৃত্বশালী লোকদের আনুগত্য করার আদেশও তা হতে পারে, হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কেননা অগ্রভাগে ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য চালানোর আদেশ দান নিশ্চিতভাবে বলে না যে, আনুগত্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে কেবল শাসকদের আনুগত্য করার মধ্যে, তার বাইরে আর কোন আনুগত্য থাকবে না। যদিও নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِىْ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ -

যে লোক আমার নিযুক্ত শাসককে মানল, সে আমাকে মানল।

জুহরী মুহাম্মাদ ইবনে যুবায়র ইবনে মুতয়িম, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) মিনায় অবস্থিত মসজিদে খায়ফ-এ দাঁড়ালেন এবং ভাষণ সূত্রে বললেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَوَعَا هَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَطَاعَةُ ذَوِى الْاَمْرِ -

আল্লাহ্ সে বান্দাহ্কে আলোকোজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শুনল, পরে সে তা পৌঁছিয়ে দিল যে তা শুনতে পায়নি তার নিকট। ফিকাহর অনেক বাহক-ই এমন যার ফিকাহ— সমঝ-বুঝ নেই, এবং ফিকাহর অনেক বাহক এমন যে তা বহন করে নিয়ে যায় তার নিকট, যে তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার। তিনটি জিনিসের উপর সাধারণত হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হয় না। মুমিনের দিল, আল্লাহ্র জন্যে আমলকে খালেস করা আর তৃতীয়টি সম্পর্কে কেউ বলেছেন, তা শাসকের আনুগত্য, কেউ বলেছেন, শাসকদের উপদেশ-নসীহত— কল্যাণ কামনা এবং মুসলিম জামা'আতের সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন। কেননা তাদের আহ্বান তাদের ছাড়া অন্যদেরও পরিবেষ্টিত করে।

এ হাদীস থেকে প্রকাশ্যভাবে জানা যায়, 'উলিল আমর' বলে শাসককুলকেই বুঝিয়েছেন। তারপরই হুকুম হয়েছে ঃ

فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

যদি তোমরা— শাসক ও শাসিত জনগণ— কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্যজনিত ঝগড়ায় লিপ্ত হও তাহলে (সে বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে) সে বিষয়টি আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।

শাসককুলকে আদেশ করা হয়েছে বিবাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে— তারই ভিত্তিতে চূড়ান্ত মীমাংসা করার জন্যে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'উলীল আমর' বলতে ফিকাহ— ইসলামী আইনবিদ্‌দের বুঝিয়েছেন। কেননা সমস্ত মানুষকেই তাদের আনুগত্য করার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। কেননা সাধারণ সব মানুষ ও যারা ইল্‌ম-ওয়ালাদের মর্যাদাসম্পন্ন নয়, তাদের প্রতি এ আদেশ হতে পারে না। তারা জানেই না ব্যাপারটি কিভাবে আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতে রাসূলের প্রতি ফেরানো যায় এবং ঘটনাবলীতে কুরআন ও সুন্নাহর আইন কার্যকর করার প্রকৃত পন্থা কি হতে পারে। বোঝা গেল, এ সম্বোধন আলিমগণের প্রতি।

এ আয়াতের দলীল দিয়ে কোন কোন মনীষী প্রমাণ করেছেন যে, 'ইমামত' পর্যায়ে রাফেযী খারেজীদের মত বাতিল। কেননা 'উলীল আমর'— যার আনুগত্য করা আদেশ দেয়া হয়েছে— হয় ফিকাহবিদ— আইনবিদরা হবেন, না হয় শাসকরা হবেন। কিংবা হবেন সেই ইমাম, যিনি জনগণের উপর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যদি এর অর্থ ফিকাহবিদরা ও শাসকরা হন, তা হলে এই ইমাম, ফিকাহবিদ ও শাসকগণ ভুল পথের পথিক, বিভ্রান্ত ও শরীয়ত অদল-বদল বা পরিবর্তনকারী হবেন, তা না-জায়েয হতে পারে না। কেননা তাদের আনুগত্য করার জন্যে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। এ মতে তো 'ইমামত' সংক্রান্ত ধারণাটাই বাতিল হয়ে যায়। কেননা তারা ইমামের মাসুম, নিষ্পাপ-নির্ভুল ও অদল-বদল-পরিবর্তনকারী হওয়া জায়েয নয় বলে মনে করে। আসলে শুধু ইমামই তার অর্থ হওয়া সঙ্গত নয়। কেননা কথার ধারাবাহিকতায়ই বলা হয়েছে ঃ

যদি তোমরা বিবাদে-ঝগড়ায় লিপ্ত হও কোন ব্যাপার নিয়ে, তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরাও।

তাই ইমাম যদি এমন হয় যাকে মান্য করা ফরয, তাহলে তার নিকটই বিবাদীয় বিষয়টি নিয়ে যাওয়া কর্তব্য হবে। সে-ই মতপার্থক্য ও ঝাগড়া-বিবাদ মিটমাট করে দেবে। আদেশ হয়েছে বিবাদীয় বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফেরানোর, ইমামের নিকট নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হয়নি। তাই প্রমাণিত হল যে, 'ইমামত' পর্যায়ে তাদের মত বাতিল। যদি এমন ইমাম-ই তার অর্থ হতো যাকে মেনে চলা ওয়াজিব, তাহলে আয়াতে বিষয়টি ইমামের নিকট নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হতো। কেননা তাদের মতে ইমাম-ই কিতাব ও সুন্নাহ্‌র কথা সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবে। কিন্তু আয়াতে অভিধান নেতৃবৃন্দ ও ফিকাহবিদদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং বিবাদ বা ঝগড়ার ঘটনাবলীতে মীমাংসার কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফেরাতে আদেশ করা হয়েছে; ইমামের দিকে নয়। তা থেকে প্রমাণিত হল যে, ইমামের আনুগত্য ফরয নয় ঝগড়া-বিবাদের ঘটনাবলীতে চূড়ান্ত বিধান পাওয়ার ক্ষেত্রে। অথচ প্রত্যেক

ফিকাহবিদকে আদেশ করা হয়েছে কিতাব ও সুন্নাহ্র থেকে তার দৃষ্টান্তের দিকে ফেরানোর জন্যে।

এই গোষ্ঠীর লোকেরাই ধারণা করেছে 'উলুল আমর' অর্থ আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)। কিন্তু এ এক অত্যন্ত খারাপ ব্যাখ্যা। কেননা 'উলুল আমর' বহু বচন, এক বচন নয়। তাই এক ব্যক্তি তার অর্থ হতে পারে না। অথচ আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) তো এক ব্যক্তি মাত্র। আর 'উলিল আমর'-এর আনুগত্য করতে আদেশ করা হয়েছে যা রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় ও। আর আলী (রা) রাসূলের জামানায় যে সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন না, তা তো জানা কথা-ই। এ থেকে প্রমাণিত হল, 'উলিল আমর' রাসূল (স)-এর সময় ছিল তাঁর চালিত সরকারের প্রশানিক কর্মকর্তাবৃন্দ। আর তারা যতক্ষণ আল্লাহ্র নাফরমানীর কোন আদেশ না করছে, তাদের আনুগত্য করা ছিল জনগণের জন্যে কর্তব্য। নবী করীম (স)-এর পরও তাদের এ মর্যাদা জনগণের উপর রয়েছে, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ সব মুসলমানের জন্যেই কর্তব্য। এখানেও সেই শর্ত যে, তারা কোন গুনাহের কাজের আদেশ না-করা পর্যন্তই তাদেরকে মানা যাবে।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

এ পর্যায়ে মুজাহিদ, কাতাদাহ, মায়মুন ইবনে মিহরান ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফেরানোর অর্থ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্র দিকে ফেরানো।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবী ও রাসূলের সুন্নাহ্র দিকে ফেরানোর এ আদেশ সাধারণ। তা যেমন রাসূল (স)-এর জীবনকালে, তেমনি তাঁর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও। কিতাব ও সুন্নাহ্র দিক ফেরানোর কাজটি দুভাবে সম্ভব। একটি তাতে যে সব বিষয়ে 'নস' রয়েছে তা তার নাম ও তাৎপর্য সহকারে কার্যকর করা। আর দ্বিতীয়, বোঝা যায়— প্রমাণ করে এবং তার ভিত্তিতে কিয়াস করা সম্ভব, এমনভাবে তা কাজে লাগানো। দৃষ্টান্ত, ও ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ তাৎপর্য দুটি জিনিসকে এক সাথে শামিল করে। তাই কোন বিষয়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে কুরআন ও সুন্নাহ্র 'নস' হবে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। যদি তার হুকুম 'নস' হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ্য় পাওয়া যায়। তাহলে অকুণ্ঠিতভাবে সকলকে তা-ই মেনে নিতে হবে। আর যদি তাতে কোন 'নস' না পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত তালাশ করতে হবে ওই দুটোতেই। কেননা সর্বাবস্থায়ই সে দুটির দিকে বিবাদীয় বিষয়াদি ফেরানোর জন্যে আমরা আদিষ্ট। কখনও ফেরাতে হবে আর কখনও হবে না, তা হতে পারে না। কেননা আল্লাহ কোন বিশেষ সময় নির্ধারণ করে দেন নি ফেরানোর জন্যে এই বলে যে, অমুক সময় ফেরাতে হবে, অমুক সময় ফেরানো জরুরী হবে না। কথার ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এবং বাহ্যতও মনে হয় যে, যে বিষয়ে কোন 'নস' নেই, কেবল সেই বিষয়ই বুঝি সে দিকে ফেরাতে হবে। কেননা যে বিষয়ে 'নস' রয়েছে, তাতে সাহাবীগণের মধ্যে কোন ঝগড়া বা মতপার্থক্যের কারণ দেখা দিতে পারে না। তারা তো ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তাঁরা ভালো ভাবেই জানতেন কোন্টার সম্ভাব্যতা আছে আর কোন্টার নেই। তাই বাহ্যত মনে হয়

যে, কিতাব ও সুন্নাহ নযীর বা অনুরূপ ব্যাপারাদির দিকেই বিবাদীয় বিষয়গুলিতে ফেরাতে হবে।

যদি বলা হয়, এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, বিবাদ-ঝগড়া পরিহার করা ও কিতাব ও সুন্নাহতে যা আছে তা অকপটে মেনে নেওয়াই কর্তব্য।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি মুমিনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। শুরুতে 'হে ঈমানদার লোকেরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তুমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছ, তা যদি হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মেনে চল এবং এই অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আর আমরা জানি যে, যে ব্যক্তিই ঈমান এনেছে, তার আকীদাই হচ্ছে আল্লাহ্র হুকুম ও রাসূলের সুন্নাহ মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা অনিবার্যভাবে মেনেনিতে হবে। তাহলে পরে বলা ঃ 'তা ফিরাও আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি'-এর ফায়দাটা নষ্ট হয়ে যায়। আর সে বিষয়ে তো আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে, নতুন করে আবার বলার তো প্রয়োজন পড়ে না। তাই যে বিষয়ে 'নস' নেই সেই বিষয়টা কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরালে এই কথাটির ফায়দা লাভ করা সম্ভব। কেননা 'নস' নেই বলেই ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সে ঝগড়ার মীমাংসা করতে হবে যে-বিষয়ে 'নস' আছে সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। এবং সে যত বিষয়েই মতপার্থক্য হোক সেইসব বিষয়ই সাধারণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ও মতপার্থক্য শেষ করতে হবে। দলীল ছাড়া কোন জিনিস বা বিষয়কেই তার বাইরে রাখা যাবে না।

যদি বলা হয়, এই আয়াতটিতে সাহাবায়ে কিরামকেই প্রথমত সম্বোধন করা হয়েছে এবং নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে সে বিষয়টি ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তাদেরকেই আদেশ করা হয়েছে। আর এটা তো জানা-ই আছে যে, নবী করীম (স)-এর উপস্থিতিতে তাঁদের নিজেদের রায় ও কিয়াসকে ঘটনাবলীতে প্রয়োগ করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ জায়েয ছিল না। বরং তাঁদের তো কর্তব্য ছিল তাঁর সামনে নত হওয়া ও তাঁর আদেশ পালন করা। কিয়াস-এর উপায়ে তা কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফেরানোর কৃত্রিমতা তাঁদের জন্যে জায়েয ছিল না। এতে প্রামণিত হল যে, যে যে বিষয়ে 'নস' রয়েছে, সে অনুযায়ী আমল করাই তাঁদের কর্তব্য ছিল, চিন্তা-বিবেচনা ও ইজতিহাদ পরিহার করাই তাঁদের কর্তব্য ছিল যে বিষয়ে 'নস' নেই সেই বিষয়ও।

জবাবে বলা যাবে, একথা ঠিক নয়। কেননা রায় ও ইজতিহাদ ব্যবহার করা ও ঘটনাবলীকে 'নস'-এর নযীরের উপর ফেলে হুকুম জানতে চাওয়া স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর জীবন-কালেও সম্পূর্ণ জায়েয ছিল— উভয় অবস্থাতেই। কোন একটি অবস্থায় জায়েয ও অপর অবস্থায় জায়েয নয়, এমনটা ছিল না। নবী করীম (স)-এর জীবনকালে যে দুটি অবস্থায় ইজতিহাদ করা জায়েয ছিল, তার একটি হল সেখানে রাসূলে করীম (স) নিজে অনুপস্থিত ছিলেন। যেমন হযরত মুয়ায (রা) ইয়ামেনে প্রেরণ কালে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ তোমার নিকট বিভিন্ন বিষয়ের বিচারের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারাদি পেশ হলে তুমি কিভাবে ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি বিচার করব, রায় দেব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে। বললেন, আল্লাহ্র কিতাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি না থাকলে বা না পেলে কি করবে? বললেন, তাহলে আল্লাহ্র নবীর সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করব।

বললেন, আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে তা না থাকলে বা না পেলে কি করবে ? জবাবে বললেন ঃ اجْتَهِدُ بِرَائِي وَلَاآلُو —আমি আমার রায় অনুযায়ী ইজতিহাদ করব এবং বিব্রত হব না। তখন নবী করীম (স) তাঁর হাত হযরত মুয়াযের বুকের উপর রাখলেন এবং বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِمَا يَرْضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ –

সমস্ত তারীফ সেই আল্লাহ্র জন্যে, যিনি আল্লাহ্র রাসূলের 'রাসূল'কে তওফীক দিয়েছেন সেই নীতি গ্রহণের যাতে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল সন্তুষ্ট হন।

রাসূলের জীবদ্দশায় যে দুটি অবস্থায় ইজতিহাদ জায়েয ছিল, এ হল তার একটি, আর দ্বিতীয় অবস্থা ছিল তাই, যেখানে স্বয়ং রাসূল (স) তাঁর উপস্থিতিতেই ইজতিহাদ করার ও অনুরূপ ঘটনার আলোকে ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন তার ইজতিহাদে তার অবস্থা নির্ভুল হয় এবং তা সেই অবস্থায় প্রযোজ্য কিনা তা নিঃসন্দেহে জানা যায়। ইজতিহাদকারী ভুল করলে ও বিচার-বিবেচনার পথ পরিহার করলে, তিনি নিজে তাকে জানিয়ে দিতে ও ঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন। রাসূল (স) তাঁর পরে সমীপবর্তী ঘটনাবলীতে শরীয়তের হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ করা কর্তব্য হবে, একথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর বেঁচে থাকা অবস্থায়ও ইজতিহাদ করা এভাবেই জায়েয। যেমন আবদুল বাকী ইবনে কানে' আসলাম ইবনে সহল, মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ, তাঁর পিতা হিফস্ ইবনে সুলায়মান, কাসীর ইবনে শমযীর, আবুল আলীয়াতা, উকবা ইবনে আমের সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, দুইজন বিবাদমান ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট উপস্থিত হল, তখন নবী করীম (স) উকবাকে বললেন ঃ হে উকবা, তুমি এই দুইজনের বিবাদের ফয়সালা করে দাও। উকবা বললেন ঃ আপনি উপস্থিত রয়েছেন, এ অবস্থায় আমি কি করে এদের দুজনের মধ্যে বিচার করতে পারি ? তার পর-ও তিনি তাকেই বললেন ঃ তুমিই এ দুজনের মধ্যে বিচার কর। এ বিচারে তুমি যদি সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করতে পার, তাহলে দশটি নেকী পাবে। আর যদি ভুল কর, তাহলেও তুমি একটি নেকী পাবে। এতে নবী করীম (স) নিজেই এবং তাঁর উপস্থিতিতেই ইজতিহাদ করা মুবাহ করে দিয়েছেন। এর তাৎপর্য ঠিক তাই, যা আমরা বলেছি। নবী করীম (স) নিজেই হযরত মুয়ায ও হযরত উকবা ইবনে আমের (রা)-কে ইজতিহাদ করার জন্যে আদেশ করেছেন। আমাদের মতে এই অনুমতি উপরোদ্ধৃত আয়াত থেকেই নিঃসৃত। কথাটি হল ঃ তোমরা যদি পারস্পরিক মতপার্থক্যে লিপ্ত হও, তাহলে বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে করে নাও। কেননা আমরা যখন রাসূল (স)-এর নিকট থেকে এমন কোন হুকুম পাব, যা কুরআনের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন, আমরা বুঝব, সে হুকুমটি অবশ্যই কুরআন থেকে পাওয়া এবং নবী করীম (স) নিজের থেকে প্রথমেই এই হুকমটা দেননি। যেমন চোরের হাতে কাটা ও যিনাকারীকে দোররা মারার হুকুম এবং এ ধরনের আরও বহু শত হুকুম। কাজেই নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় ঘটনাবলীর হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ করা প্রচলিত ছিল না বলা কোনক্রমেই সহীহ্ তথা হতে পারে না। তখন-ও প্রত্যেকটি নবতর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে শরীয়তের হুকুম জানা কর্তব্য ছিল। কাজেই কুরআন-সুন্নাহর যে সব বিষয়ে 'নস'

আছে, তাতে মতপার্থক্য ও ঝগড়া পরিহার করা ও সব কিছু মেনে নেয়াই কর্তব্য, এই তাৎপর্য বলা সহীহ্ নয়। হ্যাঁ, নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ইজতিহাদের অবকাশ ছিল না, তা হল তার উপস্থিতিতে হুকুম কার্যকর করা ও নিজ মতের উপর স্বৈরতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ। এরূপ ইজতিহাদ নিশ্চিতরূপেই পরিত্যক্ত, পরিহার্য এবং তা কারোর জন্যেই শোভন নয়।

রাসূল (স)-এর আনুগত্য

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ -

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং অনুসরণ কর রাসূলের।

বলেছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

এবং আমরা যে রাসূল-ই পাঠিয়েছি, তা পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাকে মেনে চলা হবে।

বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ -

আর যে লোক রাসূলকে মানল, সে আল্লাহ্কে মানল।

বলেছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

না, তোমার রব্ব এর শপথ। ওরা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না ওরা তাদের পারস্পরিক ঘটনাবলীতে তোমাকে— হে নবী ফয়সালাকারী মানবে। পরে তুমি যে ফয়সালা করে দেবে তা মেনে নিতে মনে একবিন্দু কুণ্ঠা পাবে না। বরং তারা মাথা পেতে দিয়ে সব কিছু পূর্ণরূপে মেনে নেবে।

এ সব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেই রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয বলে জানিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত তাগিদ সহকারে। স্পষ্ট করেছেন যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্র অনুসরণই আল্লাহ্র আনুগত্য ও আল্লাহ্র হুকুম পালন। আর এর দ্বারা এই ফায়দাও পাওয়া গেছে যে, রাসূলের নাফরমানীই আল্লাহ্র নাফরমানী।

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ -

যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধতা করে, তাদের ভয় করা উচিত, তাদের উপর কোন বিপদ আসতে পারে, পৌঁছতে পারে পীড়াদায়ক কোন আযাব। (সূরা নূর ঃ ৬৩)

এ আয়াতে রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধতা করার পরিণামে কঠিন বিপদ ও আযাব আসার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধতা ও তিনি যে দ্বীন ও বিধান নিয়ে এসেছেন তা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকা ও তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা ঈমান-বহির্ভূত কাজ। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কথাঃ 'ওরা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না, যদি ওদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারাদিতে— হে নবী— তোমাকে বিচারক না মানে এবং তুমি যে ফয়সালাই করবে তা অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে না নেবে ও মাথা নত করে পুরোপুরি মেনে না নেবে।

আয়াতে حرج শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে সংশয়। এটা মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। আসলে حرج শব্দের অর্থ হল সংকীর্ণতা (দ্বিধা-সংকোচও বলা যায়)। এ কথাটির তাৎপর্য এই হতে পারে যে, নবীর ফয়সালার ব্যাপারে মনে কোন সংশয় বা দ্বিধা-সংকোচ না রেখে-ই মাথা নত করে মেনে নেয়া ফরয। বরং সে ফয়সালার প্রতি হৃদয়ের উন্মুক্ততা, সমঝ ও দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে।

এ আয়াতটি এ কথাও প্রমাণ করে যে, সে লোক আল্লাহ্র কোন একটি আদেশও প্রত্যাখ্যান করবে অথবা রাসূলের কোন একটি আদেশ, সে লোক ইসলাম থেকে খারিজ গণ্য হবে। তা সন্দেহের কারণে হোক অথবা গ্রহণ না করা বা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকার কারণে হোক। আর এ কথাই প্রমাণ করে যে, যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, সাহাবাগণ তাদেরকে মুর্তাদ গণ্য করেছিলেন এবং তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের বাচ্চাদের বন্দী করেছিলেন, তা তাদের সহীহ্ ফয়সালা ছিল। কেননা আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেন যে, যারা রাসূল (স)-এর ফয়সালা ও হুকুম মাথা পেতে মেনে না নেবে, তারা ঈমানদার লোক নয়।

যদি বলা হয়, রাসূলের আনুগত্যই যদি আল্লাহ্র আনুগত্য হয়, তাহলে রাসূলের আদেশ কেন আল্লাহ্র আদেশ হবে না?

জবাবে বলা যাবে, রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য হয় এজন্যে যে, এ দুটির প্রত্যেকটি-ই আল্লাহ্র আদেশের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। কিন্তু আদেশ হল এক ব্যক্তির কথা ঃ কর। আর একটি আদেশের দুজন আদেশদাতা তো হতে পারে না। যেমন একটি কথা দুজনের কথা হতে পারে না, একটি কাজ দুজন কারকের হতে পারে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তার পরে তোমরা আলাদা-আলাদা ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বের হয়ে পড়, রওয়ানা দাও, কিংবা রওয়ানা হও সকলে একত্রে দলবদ্ধভাবে।

বলা হয়েছে, ثبات বহু বচনের শব্দ, এক বচনে ثبة। এ-ও বলা হয়েছে যে, ثبة গোষ্ঠীবদ্ধ বা বাহিনী হিসেবে চল। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী বা গোষ্ঠী হিসেবে রওয়ানা

হওয়ার জন্যে— এক গোষ্ঠীর পর আর এক গোষ্ঠী একদিকে, আর এক গোষ্ঠী আর একদিকে। অথবা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে নয়, সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, দহাক ও কাতাদাতা থেকে এ কথা বর্ণিত।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ خذوا حذركم -এর অর্থ, তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র। অস্ত্রকে حذر বলা হয়েছে কেননা তার দ্বারা ভয়কে দূর করা যায়। এই অর্থ হওয়াও সম্ভব ঃ তোমরা তোমাদের অস্ত্র ধারণ করে তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত কর। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ -

এবং যেন তারা ধারণ করে তাদের রক্ষা ব্যবস্থা ও তাদের অস্ত্র-শস্ত্র। (সূরা নিসা ঃ ১০২)

বোঝা গেল, এই আয়াতটিতে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে অস্ত্র ধারণের আদেশ বিদ্যমান। তা বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা কিংবা সকলের সম্মিলনের মাধ্যমে— তদবীর ও কৌশল হিসেবে যা-ই উত্তম বিবেচিত হবে, তা-ই করতে হবে। আর انفروا - تفوى থেকে, অর্থ ভীত হওয়া, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া। কেউ যখন ভয় পায়, তখন বলা হয় ঃ- نفرا اليه نفور - ينفر - نفر বলা হয় যখন কোন ব্যাপারে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এখানে انفرُواالى قتال عدوكم শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। النفر দল— কয়েকজন লোকের সমষ্টি, যারা অনুরূপ অবস্থায় ভীত হয়। এ থেকেই আসে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্যে যাত্রা করা। এ থেকে النافرة শব্দটি গঠিত। এর অর্থ, যেসব ব্যাপারে মতপার্থক্য হয় তাতে ভয় পেয়ে তার জন্যে অভিযোগ তোলা। এ কথাটির মূলে রয়েছে এই ব্যাপার যে, লোকেরা শাসককে প্রশ্ন করত, দল হিসেবে আমাদের মধ্যে অধিক শক্তিশালী কে ? এ আয়াতটি মনসূখ হয়েছে বলে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে জুরাইয, উসমান ইবনে আতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্র এ কথাটি ঃ

فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا -

এর বাহিনী, গোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অথবা সকলে একত্রিত হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্যে রওয়ানা হওয়ার আদেশ।

আর সূরা বারায়াত-এ বলা হয়েছে ঃ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا তোমরা বের হয়ে পড় হালকাভাবে— ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া-ই এবং হালকাভাবে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার ছাড়া-ই।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

তোমরা যদি বের না হও, তাহলে তোমাদের অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব দেয়া হবে।
(সূরা তওবা ঃ ৩৯)

এ আয়াতকেই মনসূখ করে দিয়েছে আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ -

ঈমানদার সব লোকই যে শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধে বের হবে, তা নয়। তবে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠী থেকে কতিপয় ব্যক্তি কেন বের হয়ে যাচ্ছে না ......? (সূরা তওবা ঃ ১২২)

আর কতিপয় ব্যক্তি রাসূলে (স)-এর সাথে অবস্থান গ্রহণ করবে। নবী করীম (স) এর সাথে অবস্থা গ্রহণকারীরাই হচ্ছে দ্বীন-সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। তারা যখন যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তারা তাদের ভাইদের পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করবে এ আশায় যে, সম্ভবত তারা ভীত হয়ে সতর্কতাবলম্বন করবে ও মেনে চলবে আল্লাহ্ তার কিতাবে যে ফয়সালা করেছেন তা এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে নেবে ও রক্ষা করবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

'যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে'।

বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্র পথে' অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্যে। কেননা এই আনুগত্য আল্লাহ্র নিকট থেকে সওয়াব হিসেবে জান্নাত পাওয়ার অধিকারী করে দেবে, যা বেহেশতী লোকদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। কেউ-কেউ বলেছেন, আল্লাহ্র পথে অর্থ, আল্লাহ্র সেই দ্বীনের পথে যা তিনি বিধিবদ্ধ করেছেন তাঁর সওয়াব ও রহমত পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে। তার অর্থ দাঁড়ায় ঃ আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যে .... 'তাগুত' অর্থ কেউ বলেছেন ঃ শয়তান, এটা আল-হাসান ও শ'বীর মত। আবুল আলীয়া বলেছেন, 'তাগুত' অর্থ যাদুরকর-গণকদার। বলা হয়েছে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যারই ইবাদত করা হবে তা-ই তাগূত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا -

নিশ্চয়ই শয়তানের ফাঁদ দুর্বল। كيد শব্দের অর্থ, কৌশলস্বরূপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে অবস্থার বিপর্যয় সাধনের চেষ্টা, যা শুধু ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। আল-হাসান বলেছেন, আল্লাহ 'শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল' একথা বলেছেন এজন্যে যে, তাদেরকে খবর জানানো হয়েছিল যে, ওরা ওদের উপর বিজয়ী হয়ে উঠবে। এ কারণে তা দুর্বল। এ-ও বলা হয়েছে, তাকে দুর্বল বলা হয়েছে, আল্লাহ মুমিনদেরকে যে সাহায্য করেন, তার তুলনায় ওদের জন্যে শয়তানের সাহায্য অত্যন্ত দুর্বল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا -

তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট থেকে এসে থাকত, তাহলে তারা তাতে খুব বেশি পার্থক্য দেখতে পেত।

এ পার্থক্য তিন প্রকারের। পরস্পরের বিরোধিতার পার্থক্য— দুটি জিনিসের সীমা এমন

হতো যে, তার ফলে অপরটির বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ত। আর একটি অমিলের পার্থক্য। তার অর্থ, তার কতক হতো অত্যন্ত উচুমানের ও আর কতক অংশ অত্যন্ত হীন নীচ, প্রত্যাহারযোগ্য। এই দুই প্রকারের পার্থক্য কুরআনের পরিপন্থী— কুরআনে তা হতে পারে না। আর তা-ই হচ্ছে কুরআনের মুজিযার একটি প্রমাণ। কেননা দুনিয়ার বড় বড় উচ্চমানের লেখক সাহিত্যের 'কালাম' কুরআনের যে-কোন দীর্ঘ সূরার মতো হলে তাতে অমিলের পার্থক্য অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর তৃতীয় হচ্ছে, সামঞ্জস্যহীনতার পার্থক্য, আয়াতের পরিমিতিতে পার্থক্য এবং না সেখ-মনসূখের বিধানে পার্থক্য। আয়াতটিতে কুরআন সম্পর্কে একটি অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপনের উদ্বোধন রয়েছে, এ সব দিকই পরম সত্য প্রমাণ করে, যা বিশ্বাস করা আবশ্যক এবং যে অনুযায়ী আমল হওয়া উচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -

যদি তারা তা রাসূলের নিকট এবং তাদের মধ্যকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত তাহলে তা জানতে পারত তারা, যারা তা থেকে সত্য উদ্ঘাটন করতে পারত।

আল-হাসান, কাতাদাহ ও ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, ওরা হচ্ছেন সমাজের মধ্যের ইলম ও ফিকাহ্ পারদর্শী লোকেরা। সুদ্দী বলেছেন, ওরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা।

আবূ বকর বলেছেন, হতে পারে এ কথার দ্বারা ইলম-ফিকাহ্ পারদর্শী ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল— এ উভয় শ্রেণীর লোকদেরই বুঝিয়েছেন। কেননা ব্যবহৃত নাম এই উভয় শ্রেণীর লোকদের উপরই প্রযোজ্য।

যদি বলা হয়, 'উলিল আমর' হচ্ছে তারা যারা লোকদের উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্বের অধিকারী। কিন্তু এটা ইল্‌ম-ফিক্‌হবিদদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ লোকদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী কথা তো বলেন নি। ফিকাহবিদরাও 'উলিল-আমর' হতে পারেন। কেননা তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল! আর অন্যদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কথা কবুল করা, মেনে নেয়া। এ কারণে তাদেরকে 'উলুল-আম্‌র' বলা খুবই সঙ্গত, যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

যেন তারা দ্বীনের সূক্ষ্ম সমঝ-বুঝ অর্জন করে এবং যখন তারা তাদের লোকদের নিকট ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করবে এই আশায় যে, সম্ভবত তারা সতর্ক হবে।

এ আয়াতে ফিকাহবিদদের ভীতি প্রদর্শনে ভীত ও সতর্ক হওয়া লোকদের কর্তব্য বলা হয়েছে এবং তাদের জন্যে তাদের কথা গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ কারণে তাদেরকেও

'উলিল-আমর' বলা যায়। অবশ্য শাসক সম্প্রদায়ই 'উলিল-আমর' হওয়ার অধিক উপযুক্ত। কেননা তাদের অধীন লোকদের উপর তাদের আদেশ-নিষেধই কার্যকর হয়ে থাকে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -

নিশ্চয়ই তা জানবে সে সব লোক, যারা তা থেকে মর্ম উদ্ধার করতে পারবে তাদের মধ্যে থেকে।

আয়াতের 'আল-ইস্তিম্বাত' অর্থ বের করা, উদ্ঘাটন করা। পানি বের করাও এর একটি অর্থ। ঝর্ণধারা প্রবাহিত করাও। যা-ই কোন কিছু থেকে বের করা হয়, তাকেই এই নামে অভিহিত করা চলে। এমন কি ঝর্ণাধারা দেখা; কিন্তু হৃদয়ের গভীর তত্ত্ব জ্ঞান অর্জন-ও এর অর্থ হতে পারে। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে 'ইস্তিম্বাত' অর্থ, সমান ঘটনার দলীল দিয়ে সমান ঘটনার জন্যে হুকুম বের করা ও জানতে পারা।

এ আয়াতে দলীল রয়েছে কিয়াস কবুল করা এবং নিত্য ঘটিত ঘটনাবলীতে শরীয়তের হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ করে রায় নির্ধারণ ওয়াজিব হওয়ার। কেননা তা এমন ব্যাপার যে, তাতে ঘটনাবলীকে রাসূল (স)-এর জীবনকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর ফেলে বিবেচনা করা ও সম্ভাব্য হুকুম জানা। বিশিষ্ট আলিমদেরও এ কাজ করা এবং তাঁদের ইন্তেকাল করে যাওয়ার পরও এ কাজ চলতে হবে। রাসূল (স)-এর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকা কালেও তা করতে হবে। অবশ্য তা নিশ্চয়ই সেসব ব্যাপারে ও ক্ষেত্রে হবে যেখানে কোন 'নস' নেই। কেননা যে-বিষয়ে 'নস' রয়েছে তাতে নতুন করে ইস্তম্বাত করে শরীয়তের হুকুম জানার কোন প্রয়োজন পড়ে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যে বিষয়ে 'নস' আছে, তা-ই আল্লাহ্র হুকুম। আর কতক তো 'নস'-এ নিহিত রয়েছে। দলীল ও যুক্তির বলে সে বিষয়ে ইলম লাভ করার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে হুকুম জানার কাজ আমাদের। ফলে দেখা যাচ্ছে, আয়াতটির বহু কয়টি তাৎপর্য হতে পারে। নিত্য ঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে যে বিষয়ে কোন 'নস' নেই— তবে 'নস' দ্বারা তা প্রমাণ করা বলে, তা সে ভাবেই প্রমান করতে হবে। এ হলো একটি। দ্বিতীয়, আলিমদের কর্তব্য হচ্ছে সেই হুকুম 'ইস্তিনবাত' করা— যে বিষয়ে 'নস' আছে তার উপর ফেলে যাচাই-পরখ ও তুলনা করে তা জানবার জন্যে চেষ্টা করা। আর তৃতীয় হল, নিত্য নতুন সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে আলিমদের ইস্তিনবাত করা হুকুমকে জনগণের মেনে নেওয়া উচিত। এটাই হচ্ছে 'আলিমদের তাক্লীদ'। আর চতুর্থ, নবী করীম (স) নিজেও এ পর্যায়ের হুকুম 'ইস্তিনবাত' করার জন্য আদিষ্ট ও দায়িত্বশীল ছিলেন। দলীল ও যুক্তি প্রমাণের দ্বারা নতুন ঘটনায় শরীয়তের হুকুম জানতে চাওয়ার কাজ তাঁকেও করতে হয়েছিল। কেননা আল্লাহ্ সেই ঘটনাকে রাসূল ও উলিল আম্র এর নিকট নিয়ে যেতে বা পৌঁছাতে বলে দিয়েছেন। তারপর বলেছেন ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -

নিশ্চয়ই তা জেনে নেবে সে সব লোক যারা তা তাদের মধ্য থেকে ইস্তিনবাত করবে।

কেবল উলুল-আমর-এর কথাই বলা হয়নি, রাসূলেরও সেই দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইস্তিনবাত' করা ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম জানতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।

যদি বলা হয়, ঘটনাবলীতে হুকুম জানার জন্যে এটা ইস্তিনবাত তো নয়। বরং এখানে শত্রুপক্ষের ভয় ও শান্তির সময়ের কর্তব্য বিশেষ। কেননা আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ কথাটি হল ঃ

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِالْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ -

তাদের নিকট যখন শান্তির বা ভয়ের কোন ব্যাপার এসে পৌঁছায়, তখনই তারা তা প্রকাশ ও প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি সে ব্যাপারটি রাসূল ও তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছাতো, তাহলে যারা তা ইস্তিনবাত করে, তারা জানতে পারত।

এই কথাগুলি সেসব বিক্ষোভকারী সম্পর্কে, যারা মুনাফিক ছিল ও এ সব ক্ষেত্রে তারা ঝগড়া-ফাসাদের সৃষ্টি করত। তাই আল্লাহ্ এ সব 'আমল করতে নিষেধ করেছেন। বরং ব্যাপারটিকে রাসূল (স) ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছাবার আদেশ করেছেন, যেন তারা মুসলিম সমাজের মধ্যে কোন বিভেদ-বিচ্ছেদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে না পারে। যদি বাস্তবিকই ভয়ের কোন কারণ ঘটে থাকে, তাহলে তা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব তো তাদেরই। আর যদি শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপার ঘটে থাকে এবং তাদের চেষ্টা থাকে যে, তারা যেন নিরাপত্তা পেতে না পারে, তাহলেই তারা জিহাদের যোগ্যতা হারাবে ও কাফিরদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে। তাহলে নিত্য নতুন ঘটিত ঘটনাবলীতে শরীয়তের হুকুম ইস্তিনবাত করার কোন কাজ হয় না।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِالْخَوْفِ -

যদি তাদের নিকট শান্তির বা ভয়ের কোন ব্যাপারে খবর আসে .....।

এটা তো কেবল শত্রুদের সাথে ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মুসলমানদের ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও শরীয়তের হুকুম— তা মুবাহ না নিষিদ্ধ, তা জানার ব্যাপারে তো শান্তি ও ভয়ের কারণ ঘটতে পারে। কি জায়েয ও কি নাজায়েয যে প্রশ্নও তো উঠতে পারে। আর এ সব-ই ভয় ও শান্তির ব্যাপার। আয়াতে যে ভয় ও শান্তির কথা বলা হয়েছে তা যে বিশেষভাবে শত্রুর প্রসঙ্গেই হয়, এমন কথা তো আয়াতে বিশেষভাবে বলা হয়নি। আর তা কেবল মুনাফিকদের সৃষ্ট শান্তি ও ভয়ের কথাও বলা হয়নি। তাই সে ভয় ও শান্তির ব্যাপার সাধারণভাবে সর্ব ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। আর সাধারণ লোকের মনে শরীয়তের হুকুমের প্রশ্নে তা নিষিদ্ধ না মুবাহ সে প্রশ্ন দেখা দেয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর সেই জন্যেই ব্যাপারটি রাসূল ও উলুল আমর-এর নিকট ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে, যেন তারা যুক্তির সাহায্যে ও 'নস্' যে বিষয়ে তার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে হুকুম ইস্তিনবাত করা সম্ভব হয়। উপরন্তু আমরা যদি তোমার

কথা মেনেও নেই যে, আয়াতটি বিশেষভাবে শত্রুপক্ষ সংশ্লিষ্ট ভয় ও শাস্তির প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে, তবুও আমরা যা বলেছি, তাতেও প্রমাণ যথারীতি বিরাজ করছে। কেননা জিহাদের কলা-কৌশল উদ্ভাবন ও শত্রুর ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করার উপায় উদ্ভাবন করতেই হয়, কখনও ভয়ে পেছনে সরে যেতে হয় আর কখনও অগ্রবর্তী হতে হয়, আর তৃতীয় কখনও শত্রুকে ছেড়েও দিতে হয়, আর এই সব অবস্থায়ই আমাদেরকে আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে তাঁর বিধান পালনকারী হয়ে কাজ করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তাদের উপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তাদেরকেই সে জন্যে ইজতিহাদ করতে হয়। তাই প্রমাণিত হল যে, নিত্য ঘটিত ঘটনাবলীতে শরীয়তের হুকুম ইজতিহাদের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করা যুদ্ধ কৌশল ও শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপার। কাফিরদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ব্যাপার। তাই এ পর্যায়ের ইজতিহাদ ও ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই, শরীয়তের খুটিনাটি ব্যাপারে হুকুম জানার ব্যাপারও তাই। কেননা এসবই আল্লাহ্র হুকুমের ব্যাপার। এ সব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতে নিষেধ করা নতুন বিষয়ে শরীয়তের হুকুম ইস্তিনবাত নিষিদ্ধ করা ঠিক সেই রকমের ব্যাপার, যেমন কেউ বিশেষভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে ইস্তিনবাত করাকে মুবাহ মনে করল আর বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। অথবা নামাযের ক্ষেত্রে তা মুবাহ বলল, কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ করল। কিন্তু এরূপ কথা অচল।

যদি বলা হয়, কেবল কিয়াস ও ইজতিহাদেই তো ইস্তিনবাত সীমাবদ্ধ নয়, সেসব দলীলের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া, যার ভাষার দিক দিয়ে একটি অর্থই হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে যে, দলীলের ভাষার দিক দিয়ে কেবল একটি অর্থই হয়, ভাষাবিদদের মধ্যে তা নিয়ে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি হয় না। কেননা শব্দের অর্থের ব্যাপারে তা-ই যুক্তিসঙ্গত। তাহলে এটা তো কোন 'ইস্তিনবাত' হল না। বরং তা হল কথা থেকেই বুঝতে পারা তাৎপর্য। আমাদের মতে তা আল্লাহ্র কথা ঃ وَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ 'এবং তাদের দুজনের জন্যে উহ্ বল না'-র মতোই। এ আয়াতে পিতা-মাতাকে মারধোর করতে, গালাগালি দিতে ও হত্যা করা নিষেধ করা হয়েছে— এ ধরনের অন্যান্য কাজসহ। কিন্তু তাতে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য ঘটে না। যে দলীলের একটি অর্থ হয় বলে যদি এই ধরনের দলীলের কথা মনে করে থাক, তাহলে তাতে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি হয় না। তাতে কোন ইস্তিনবাদেরও প্রয়োজন হয় না। আর দলীল বলতে কোন জিনিসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যদি বুঝে থাক, তাহলে প্রমাণ হবে যে, তার বিপরীতের হুকুমও সে হুকুমের বিপরীত। কিন্তু এটা তো কোন দলীল হল না। 'উসুলুল ফিকাহ' গ্রন্থে আমরা তো সবিস্তারে বলেছি। এ যদি এক ধরনের দলীল হয়, তাহলে সাহাবাগণ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত থাকতেন না এবং ঘটনাবলীর হুকুম জানার জন্যে অন্যভাবে নিশ্চয়ই যুক্তি উপস্থাপন করতেন না। আর তাঁরা যদি এ দলীলটিকে ব্যবহার করতেন, তাহলে তো তাদের দ্বারা সকলেরই নিকট পরিচিত হতো। কিন্তু তাদের থেকে তা যখন বর্ণিত হয়নি, তখন তোমার কথা গ্রহণীয় প্রমাণিত হল না। উপরন্তু এটা যদি এক প্রকারের দলীল উপস্থাপন হতো, তাহলে যে যে ক্ষেত্রে রায় ও কিয়াসের উপায় ছাড়া হুকুম ইস্তিনবাত করার অন্য কোন পথ নেই— প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ঘটনায় স্বতন্ত্রভাবে এ ধরনের দলীল পাওয়া সম্ভবও নয়— অথচ যে যে ক্ষেত্রে 'নস' পাওয়া যাবে না, যেসব ক্ষেত্রে ইস্তিনবাত করার জন্যে আমরা রীতিমত আদিষ্ট,

তাই যেসব ঘটনায় এ ধরনের দলীল পাব না, সেসব ক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তার হুকুম ইস্তিনবাত করা আমাদের জন্যে কর্তব্য। কেননা এ উপায় ছাড়া সেখানে আমাদের জন্যে আর কোন পথ উন্মুক্ত নেই।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -

অবশ্যই তা জানবে তারা, যারা তা থেকে ইস্তিনবাত করবে।

তখন কিয়াসের দলীল আমাদেরকে তার দ্বারা প্রমাণিত ইল্‌ম পর্যন্ত পৌঁছবে না। কেননা কিয়াসকারী নিজেই নিজের উপর ভুল করে বসতে পারে। তার ইজতিহাদ ও কিয়াস তাতে যেখানে পৌঁছিয়েছে তা-ই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া প্রকৃত সত্য, তা নিশ্চয় করে কিছুতেই বলা যায় না। এ থেকে আমরা বুঝলাম যে, এখানে নিশ্চয়ই কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ইস্তিনবাত করার কথা বলা হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, তোমার কথা ঃ কিয়াসকারী নিজেই নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, সে কিয়াস করে যা পেয়েছে তা-ই আল্লাহ্‌র নিকট-ও সত্য— এ কথা ভুল, আমরা তা বলব না। তা এজন্যে যে, ইজতিহাদের পথটা-ই হচ্ছে এই যে, মুজতাহিদকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তার ইজতিহাদ যা প্রমাণ করেছে, তা অবশ্যই অকাট্য এবং আল্লাহ্‌র নিকট-ও তা-ই সত্য। আমাদের জানামতে এটাই আল্লাহ্‌র হুকুম। তাই ঘটনাবলী পর্যায়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে পাওয়া হুকুম সহীহ্ ইলম দান করে এবং তার ইজতিহাদ যা পেয়েছে তা সহীহ্। যারা ইমামত সংক্রান্ত মতে বিশ্বাসী তাদের কথা যে বাতিল, তা আলোচ্য আয়াতও প্রমাণ করে। কেননা দ্বীন সংক্রান্ত সব হুকুম সম্পর্কেই যদি 'নস' থাকে, তাহলে তা ইমাম অবশ্য জানবে। আর তাহলে ইজতিহাদ ও ইস্তিনবাত করার কোন অবকাশই ইসলামে থাকে না। আর 'উলুল আমর'-এর নিকট কোন কিছু পৌঁছানোর আদেশ-ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বরং তা ইমামের নিকটই পৌঁছানো কর্তব্য হয়। কেননা ইমাম তো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'নস' দ্বারা সহীহ্ কোন্‌টি আর বাতিল কোন্‌টি তা অবহিত আছে-ই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا -

তোমরা যদি কোন প্রকারের সালাম দ্বারা সম্বর্ধিত হও, তাহলে তোমরা তার চাইতে উত্তম সালাম দিয়ে অথবা সেটাই ফিরিয়ে দিয়ে সালাম কর।

আভিধানিকরা বলেছেন ঃ التَّحِيَّةُ অর্থ الملك, লোকদের কথা ঃ حَيَّاكَ اللّٰهُ -এর অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাকে বাদশাহ বানাক। সালাম-ও এর অর্থ। কেননা আরবরা বলত ঃ حَيَّاكَ اللّٰهُ 'আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।' ইসলামের যুগে এটা পরিবর্তন করে সালাম-এর প্রচলন করা হয়েছিল এবং আগের কথার স্থানে এটা চালু হয়ে গেল।

হযরত আবূ যর আল-গিফারী বলেছেন, আমিই সর্ব প্রথম রাসূলে করীম (স)-এর ইসলামের নতুন চালু সংবর্ধনা বাক্য দ্বারা সংবর্ধিত করি। আমি বললাম ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আগের 'আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন' এই দো'আ মূলক সংবর্ধনার পূর্বে বলা হতো مَلَكَ اللّٰهُ 'আল্লাহ্ তোমাকে মালিক বানাক'-এর পর উপরোক্ত আয়াতকে আমরা যখন তা প্রকৃত বাস্তবতার আলোকে গ্রহণ করলাম, বোঝা গেল, যে লোক অন্যকে কোন জিনিসের মালিক বানায়, কোন বিনিময় ছাড়া-ই দেবে, তার অধিকার আছে মত বদলানোর যতক্ষণ তা হস্তান্তরিত না হবে। হস্তান্তরিত হয়ে গেলে তখন আর মত বদলানোর সুযোগ থাকবে না। কেননা সে জিনিসটি যখন নিয়ে আসা হল, তখন দুটি জিনিসের একটি ওয়াজিব করে দিয়েছে। নবী করীম (স) থেকে 'হেবা'য় মত বদলানোর ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ আস-সহ্‌রী ইবনে অহব, উসামা ইবনে যায়দ, আমর ইবনে শুয়ায়ব তার পিতা— তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَثَلُ الَّذِىْ يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىْءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ -

যে লোক দান করা জিনিস ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের মত— যে বমি করে এবং নিজেই সেই বমি খায়।

তাই দানকারী যখন তার দান ফেরত নিতে চায়, তখন যেন সে থেমে যায় এবং যে জিনিস সে ফেরত নিচ্ছে, তাকে যেন লোকদের নিকট পরিচিত করে। পরে সে যেন যা দান করেছিল তা তাকে দিয়ে দেয়।

আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাতা-আকী' ইবরাহীম ইবনে ইস্‌মাইল ইবনে মজম'— আমর ইবনে দীনার আবূ হুরায়রাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اَلرَّجُلُ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا -

প্রত্যেক ব্যক্তি তার হেবা হস্তান্তরিত না করা পর্যন্ত সে তা পাওয়ার অধিকারী।

ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِىْ عَطِيَّةً اَوْ يَهِبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا اِلَّاالْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِىْ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِىْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَاْكُلُ فَاِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَفِىْ قَيْئِهِ -

কোন ব্যক্তি কাউকে কোন দান দেবে বা কোন জিনিস হেবা করবে তার পরে মত পরিবর্তন করে তা ফিরিয়ে নেবে— এই কাজ কারোর জন্যেই হালাল নয়। তবে পিতা যদি তার সন্তানকে কোন জিনিস দেয়, তাহলে তার কথা ভিন্ন। যে ব্যক্তি কাউকে কোন জিনিস দেয়

পরে তাতে মত পরিবর্তন করে— না দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে সে সেই কুকুরের মত যে খায়— যখন পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় তখন সে তা বমি করে ফেলে। পরে সে তার বমিতেই ফিরে আসে।

এই হাদীসটি দুটি তাৎপর্য প্রমাণ করে। একটি, 'হেবা' বা দানের মত বদলানো সহীহ্। আর দ্বিতীয়, তা মকরূহ এবং তা নিন্দনীয় চরিত্র ও চরম মাত্রার হীনতা-নীচতা।

তা এজন্যে যে, হেবায় মত পরিবর্তন করাকে সেই কুকুরের সাথে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে যে তার বমিতে ফিরে আসে— বমি করা জিনিস পুনরায় ভক্ষণ করে। তা যেমন বলেছি— দুটি দিক দিয়ে প্রমাণিত হয়। একটি হল কুকুর যখন তার বমি করা জিনিস খায়, তখন তার সাথে তার সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। আর এ কাজ কুকুরের জন্যে যে হারাম নয়, তা তো জানা কথা। অতএব তার সাথে যাকে তুল্য করা হয়েছে সে তারই মত। আর দ্বিতীয়, হেবা'য় মত বদলানো যদি কোন অবস্থায়ই সহীহ না হতো, তাহলে তাকে বমিতে ফিরে আসা কুকুরের সাথে তার সাদৃশ্য দেখানো হতো না কখনই। কেননা যা আদৌ ঘটে না তার সাথে কোন জিনিসের সাদৃশ্য দেখানো জায়েয হয় না। তাহলে বোঝা গেল, তা কখন-ও না কখন-ও ঘটে। আর তাই প্রমাণ করে যে, হেবায় মত বদলানো সহীহ্— যদিও এ কাজ অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও জঘন্য। যবীল আরহাম ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে হেবায় মত বদলানোর বিষয় হযরত আলী ও উমর (রা) এবং ফুযালা ইবনে উবায়দ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কোন সাহাবী রাদীয়াল্লাহু আনহুম থেকে ভিন্নমত প্রকাশিত হয়নি। আগের মনীষীদের বিপুল সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ ব্যাপরটি সালামের জবাব দেয়ার পর্যায়ে গণ্য। এঁদের মধ্যে যাবির ইবনে আবদুল্লাহ উল্লেখ্য। আল-হাসান বলেছেন, সালাম দেয়া নফল বা মুস্তাহাব; কিন্তু তার জবাব দেয়া ফরয। একথা প্রমাণের জন্যে আলোচ্য আয়াতটির উল্লেখ করা হয়েছে। পরে তা নিয়ে বিভিন্ন মত হয়েছে এ প্রশ্নে যে, তা বিশেষভাবে মুসলিমদের জন্যে না মুসলিম ও কাফির সকলের জন্যে সাধারণ নিয়ম! আতা বলেছেন, তা-সালাম দেয়া— জবাব দেয়া— বিশেষভাবে মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইবনে আব্বাস, ইবরাহীম ও কাতাদাহর মত হল, তা উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে সাধারণভাবে চলবে। আল-হাসান বলেছেন, কাফিরের সালামের জবাবে শুধু وَعليكم 'এবং তোমাদের উপর-ও' বলবে। 'ওরা-রহমাতুল্লাহ' কখনই বলবে না। কেননা কাফিরদের জন্যে 'ইস্তিগফার'— গুনার মাফী চাওয়া জায়েয নয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন :

لَاتَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ بِالسَّلَامِ فَاِنْ بَدَؤُكُمْ فَقُوْلُوا وَعَلَيْكُمْ -

তোমরা আগে-ভাগেই ইয়াহুদীদের সালাম করবে না। ওরা যদি প্রথমেই সালাম দেয়, তাহলে জবাবে শুধু 'তোমাদের উপর-ও' বলবে।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সালামের জবাব 'ফরযে-কিফায়া'। বহু সংখ্যক লোকের প্রতি সালাম করলে তাদের মধ্য থেকে মাত্র এক জানের জবাব দেয়াই যথেষ্ট।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ بِأَحْسَنَ مِنْهَا 'তার চাইতেও উত্তম।' এ কথাটি যদি সালামের জবাব প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে, দো'আর মাত্রা বৃদ্ধি। আর তাহল, যখন বলবে ঃ 'আস্‌-সালামু আলাইকুম', তখন জবাবে বলবে ঃ ওয়া-আলাইকুমুস সালাম-ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ্‌। আর যদি বলে ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রহ্‌মাতুল্লাহ্‌' তাহলে জবাবে বলবে ঃ 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ ওয়া-বারাকাতাহু।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا -

মুনাফিকদের দুটি বাহিনীর ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য কি ? আল্লাহ্‌ তাদের কর্মফলে তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এমন লোকদের প্রসঙ্গে, যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করেছিল, অথচ তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করছিল। কাতাদাতা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আল-হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা মদীনায় এসে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পরে তারা মক্কায় ফিরে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা শিরক অবলম্বন করল। জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (স)-এর পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের প্রসঙ্গে। তারা বলেছিল, যুদ্ধ হবেই তা জানতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে যেতাম।

কিন্তু আয়াতের ধরন-বিন্যাসে এই শেষ ব্যাখ্যার বিপরীত দলীল রয়েছে। আসলে ওরা মক্কার লোক ছিল, ওদের সম্পর্কেই আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

ওরা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত ওদের মধ্য থেকে কোন লোককে বন্ধু পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَرْكَسَهُمْ —ওদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা) এ অর্থ বলেছেন। কাতাদাহ বলেছেন, এর অর্থ ঃ ওদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অন্যান্য মনীষীরা বলেছেন, উল্টিয়ে ফেলেছেন। নাসায়ী বলেছেন, اَرْكَسَهُمْ ও رَكَسَهُمْ এর একই অর্থ। আর তার তাৎপর্য হচ্ছে তাদেরকে কুফরীতে ফিরিয়ে দেয়া— ছোট ও হীন লাঞ্ছিত করা। বলা হয়েছে, তাদেরকে বন্দী করা, হত্যা করা। কেননা প্রথমে ছিল মুনাফিক, পরে পুরা মুরতাদ হয়ে গেল। তাদেরকে মুনাফিক হিসেবে পরিচিত করা হয়েছে। পরে তারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। কেননা পূর্বে তারা কুফর মনের মধ্যে লুকিয়া রাখত, পরে তাদেরকে সেই কুফর ও শির্‌ক-এর মধ্যে নিক্ষিপ্ত গণ্য করেছে। এটা আল-হাসানের ভাষ্য। আরবী ব্যাকরণবিদরা বলেছেন, শব্দের প্রথমে 'আলিফ' ও 'লাম' দ্বারা যে নির্দিষ্ট পরিচিত করা হয়েছে তা সত্ত্বেও এটা

ভাল। যেমন বলা হয় هٰذه العَجُوز —এই বৃদ্ধ, অথচ সে যুবতী, যুবতী ছিল। তাকে 'এই যুবতী' বলা সঙ্গত নয়। আল্লাহ্ এ আয়াতটি দ্বারা মুসলমানদেরকে অবহিত করেছেন এই মুনাফিক গোষ্ঠীর অবস্থা সম্পর্কে। ওরা তোমাদের নিকট ইসলামের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করে, কিন্তু পরে ওরা যখন ওদের লোকজনের নিকট ফিরে যায়, তখন তাদের কাফির মুরতাদ হওয়ার কথা প্রকাশ করে। ওদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন ওদের পক্ষ হয়ে বিসম্বাদ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوْنَ سَوَاءً -

ওরা অন্তর দিয়ে কামনা করে তোমরা যদি কুফর গ্রহণ করতে, তাহলে তোমরা ওদের সাথে সমান-সমান ও একাকার হয়ে যেতে।

অর্থাৎ এই লোক-সমষ্টির মন-মানসিকতা ও আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে, যেন মুমিনরা ওদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে শুরু না করে, ওদের বদ-অভ্যাসের কথা যেন তারা সত্য জানে এবং ওদের সাথে সম্পর্ক যেন ছিন্ন করে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা ওদের মধ্য থেকে বন্ধু— পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ ওরা হিজরত না করে অর্থাৎ ওরা মুসলিম না হলে ও হিজরত না করলে ..... কেননা ইসলাম গ্রহণের পর হিজরত করা জরুরী। ওরা ইসলাম কবুল করলেও হিজরত না করা পর্যন্ত ওদের সাথে আমাদের মুসলমানদের কোন বন্ধুত্বের সম্পর্কে হতেই পারে না। অপর আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا -

ওরা যতক্ষণ হিজরত না করবে ওদের সাথে কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। (সূরা আনফাল ঃ ৭২)

এই আয়াতটির প্রয়োগ ছিল তখন, যখন হিজরত ফরয ছিল। নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ مَعَ مُشْرِكٍ -

মুশরিকদের মধ্যে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলিমের সাথে আমি সম্পর্কহীন, দায়িত্বমুক্ত। যে মুসলিমই মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান নিয়েছে, তার দায়িত্ব আমার উপর নয়। এই কথা শুনে প্রশ্ন তোলা হয়, কেন হে রাসূল ?

জবাবে তিনি বলেন, এ দুই ব্যক্তির আগুন তো দেখা যাচ্ছে না। এ ভাবে মক্কা বিজয় কাল পর্যন্ত হিজরত ফরয ছিল। তার পরে এই ফরয বাতিল হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ-উসমান ইবনে আবূ শায়বা— জরীর-মনসূর-মুজাহিদ-তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল (স) বলেছেন ঃ

يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

মক্কা বিজয়ের দিন থেকে আর হিজরত নেই। অতঃপর আছে জিহাদ ও জিহাদের নিয়্যত। এক্ষণে যখনই তোমাদেরকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার আহ্‌বান জানানো হবে, তখন তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মুহাম্মাদ ইবনে আবূ দাউদ— মুসিল ইবনুল ফযল আল-অলীদ-আওজায়ী জুহ্‌রী আতা ইবনে ইয়াযীদ আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, একজন আরব বেদুঈন নবী করীম (স)-এর নিকট হিজরত সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন ঃ

وَيْحَكَ اِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ ؟ قَالَ نعم، قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَانَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا -

তোমার মন্দ হোক। হিজরত বড়ই কঠিন কাজ। তাহলে তোমার কোন উট আছে? বলল আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তার যাকাত দাও? বললে, হ্যাঁ, দেই। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তাহলে তুমি সমুদ্রের ওধারে কাজ করতে থাক। আল্লাহ্ তোমার কাজ থেকে একবিন্দু ছেড়ে দেবেন না।

এ হাদীসে হিজরত না করাকে নবী করীম (স) মুবাহ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে বকর আবূ দাউদ মুহাম্মদ-ইয়াহ্‌য়া ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ আমের সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের (রা) এর নিকট এসে বলল, আপনি রাসূল (স) থেকে শুনেছেন এমন কিছু কথা আমাকে বলুন। তখন তিনি বললেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ -

আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যার মুখের জবান ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমরা নিরাপদে থাকবে। আর মুহাজির-হিজরতকারী তো সে, যে আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কাজ পরিহার করল।

আল-হাসান থেকে বর্ণিত, উপরে উদ্ধৃত আয়াতের হুকুম এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই প্রযোজ্য, যে দারুল হরব— কাফিরদের দেশে— অবস্থান নিয়েছে। এতে দেখা গেল, দারুল ইসলাম ইসলামের রাজ্যে হিজরত করে যাওয়া এখনও ফরয বলবত আছে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ -

অতঃপর তাদেরকে ধর ও হত্যা কর।

কেননা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এর অর্থ, তারা যদি হিজরত করা থেকে পৃষ্ট প্রদর্শন করে।

আবূ বকর বলেছেন, এর অর্থ, ওরা যদি ঈমান ও হিজরত থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করছে— ঈমান ও হিজরত দুটো কথাকেই এক সাথে শামিল করে আছে।

আর আল্লাহ্‌র কথা فَاِنْ تَوَلَّوْا 'ওরা যদি পৃষ্ঠা প্রদর্শন করে' .... এই ঈমান ও হিজরত দুটোর প্রতি ইঙ্গিত করে। কেননা এ সময় যদি কেউ ইসলাম কবুল করে; কিন্তু হিজরত না করে, তাহলে ঠিক সেই সময়ই তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে না। বোঝা গেল, فَاِنْ تَوَلَّوْا ওরা ফিরে গেলে— অর্থাৎ ঈমান ও হিজরত করা থেকে, তাহলে তখন তাদেরকে ধর ও হত্যা কর।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ -

তবে তারা যদি এমন লোকদের সাথে মিলে যায়, যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে ..

আবূ উবায়দ বলেছেন ঃ يَصِلُوْنَ শব্দের অর্থ হচ্ছে, তাদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। আবূ বকর বলেছেন, এই সম্পর্কিত হওয়ার ব্যাপারটি রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে হতে পারে, হতে পারে কিরা-কসম ও চুক্তির ভিত্তিতে, বন্ধুর মৈত্রীর চুক্তির ভিত্তিতে। তাতে যে কোন ব্যক্তি শামিল হতে পারে তার সময়ে, যেমন রাসূলে করীম (স) ও কুরায়শদের মধ্যে সন্ধি-চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, এরই ফলে বনু খুজায়া রাসূলে করীম (স)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। আর বনু কিনানা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল কুরায়শদের সাথে। আর একটি মত হচ্ছে, আয়াতটি মনসূখ। জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান-আবূ উবায়দ-হাজ্জাজ-ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা আল-খুরাসানী ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا -

'আল্লাহ্ তাদের উপর তোমাদের জন্যে কোন পথ বানান নি' পর্যন্ত এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ -

যেসব লোক দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে

তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের সাথে তোমরা ভালো আচরণ করবে ও সুবিচার-ন্যায়পরতা করবে— তা থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

(সূরা মুমতাহিনা ঃ ৮

এসব মনসূখ করে দিয়েছে এ আয়াতটি ঃ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিক থেকে সম্পর্কহীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ তাদের প্রতি ....' (সূরা তওবা ঃ ১)

وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

যারা জানে তাদের জন্যে আমরা আয়াতসমূহকে আলাদা আলাদা করে বলছি .... পর্যন্ত। (সূরা তওবা ঃ ১১)

সুদ্দী বলেছেন, اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ। তবে যারা মিশে সম্পর্কিত হয়েছে সেই লোকদের সাথে যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি আছে ....'

এর অর্থ, যে লোকদের সাথে তোমাদের নিরাপত্তা ও যুদ্ধহীনতার চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা দাখিল হয়ে যাবে, তাদের জন্যে তার থেকে তা-ই হবে যা তাদের জন্যে রয়েছে।

আল-হাসান বলেছেন, ওরা হল বনূ মুদলাজ। তাদের ও কুরায়শদের মধ্যে এবং রাসূল (স) ও কুরায়শদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। তাই আল্লাহ্ বনূ মুদলাজ থেকে সেই কাজ হারাম করে দিয়েছেন, যা কুরায়শদের থেকেও হারাম করে দিয়েছিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান তার ও কোন কাফির জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি চুক্তি করে তাহলে তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে সেসব লোক-ই দাখিল হবে, যারা রেহমী সম্পর্ক বা কিরা-কসম অথবা বন্ধুত্ব প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত হবে— যারা তাদের আওতার মধ্যে ও সাহায্য সহযোগিতার মধ্যে গণ্য থাকবে। যারা অন্যান্য লোকদের মধ্যে গণ্য, তারা এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না তার শর্ত না করা পর্যন্ত। চুক্তিবদ্ধদের মধ্যে অন্যান্য যে গোত্রের শামিল হওয়ার শর্ত করা হবে, সে অবশ্যই সে চুক্তির মধ্যে শামিল হবে— যদি চুক্তিটা তার উপর সম্পাদিত হয়। যেমন বনু কিনানা কুরায়শদের সাথে চুক্তিতে শামিল ছিল। যে লোক বলেছেন, এ নিয়ম মনসূখ, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মুশরিকদের সাথে চুক্তি ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব-প্রীতির সম্পর্ক মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্র এ কথার দ্বারা ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাও। (সূরা তওবা ঃ ৫)

আল্লাহ্র এই কথাই এখন কার্যকর। কেননা আল্লাহ্ ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তাই তাদেরকে আরব মুশরিকদের কাছ থেকে ইসলাম ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ না

করতে আদেশ করা হয়েছে আথবা তরবারি দিয়েই চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ অনুযায়ী।

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْالَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ -

মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাবে। তাদেরকে ধর, তাদেরকে পরিবেষ্টিত কর এবং প্রতিটি ঘাটিতেই তাদের প্রতি ওঁৎ পেতে বসে থাক। পরে তারা যদি তওবা করে ও নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (সূরা তওবা ঃ ৫)

আরব মুশরিকদের ব্যাপারে এই হুকুম প্রমাণিত ও স্থায়ী। এ আয়াতের দ্বারা অব্যাহতি দেয়া, সন্ধি করা এবং তাদেরকে কুফর-এর উপর স্থিতিশীল হয়ে থাকা প্রভৃতি সব মনসূখ হয়ে গেছে। আর আহলি কিতাব লোকদের ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আমরা আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ তারা ইসলাম গ্রহণ না করবে, অথবা জিযিয়া দিতে শুরু না করবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ...... حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, ... যতক্ষণ তারা নিজেদের হাতে বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া না দেবে।

(সূরা তওবা ঃ ২৯)

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানদের জন্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদিগকে কুফর-এই উপর স্থিতিশীল হয়ে থাকতে দেয়া জায়েয নয়, যতক্ষণ তারা জিযিয়া দিতে শুরু না করবে। আরবের মুশরিকরা প্রায় সকলেই সাহাবীদের সময়ে ইসলাম কবুল করেছিল। তাদের মধ্যে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে হত্যা করা হয়। যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা ইসলামে ফিরে এসেছিল। কাফিরদের সাথে চুক্তি করা জিযিয়া ও যিম্মী না হওয়া ছাড়া-ই মনসূখ হয়ে গেছে, তার এটাই সহীহ্ কারণ। আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করেছিলেন এবং মুসলমানদের মুশরিকদের উপর বিজয়ী করে দিয়েছিলেন। তাই তারা তাদের সাথে কোনরূপ সন্ধি ও চুক্তি করার মুখাপেক্ষী থাকেনি, অতঃপর হয় তারা ইসলাম কবুল করবে, না হয় বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দেবে। তবে অবস্থা যদি কখনও এমন হয় যে, মুসলমানরা অক্ষম হয়ে পড়েছে, কাফিরদের মুকাবিলা বা প্রতিরোধ করতে পারে না, বা তাদের নিজেদের ও তাদের সন্তানদের ব্যাপারে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়, তখন সেই অবস্থায় শত্রুদের অব্যাহতি দান ও সন্ধি করা — জিযিয়া আদায় করতে বাধ্য না করা জায়েয হতে পারে। কেননা তারা যখন শত্রুর মুকাবিলায় শক্তিশালী হবে, তাদের উপর প্রভাব ও কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হবে, তখন তাদের সাথে কোনরূপ চুক্তি করা নিষিদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেইরূপ অবস্থা ছিল বলে তখন তা করা জায়েয ছিল। এই কারণের দরুনই তা নিষিদ্ধ ছিল। আর পরে এই কারণ যখন দূর হয়ে গেল, তখন

ব্যাপারটি সেই অবস্থায় এসে গেল, যে অবস্থায় মুসলমানরা আগে ছিল। তখন শত্রুদের ভয়ে তারা সব সময় আতংকগ্রস্ত ছিল। যবীল আহ্‌কামকে ওয়ারিস বানানোর পর চুক্তির কারণে মীরাস দেয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই যখন যবীল আরহাম ওয়ারিস কেউ থাকে না, তখন চুক্তির মাধ্যমে ওয়ারিস হওয়া জায়েয হয়।— আলোচ্য ব্যাপারটিও ঠিক তেমনি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

أَوْجَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ أَوْيُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ -

অথবা তারা তোমাদের নিকট এলো এ অবস্থায় যে, তাদের বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে গেছে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে; কিংবা যুদ্ধ করবে তাদের লোকজনের বিরুদ্ধে .....

আল-হাসান ও সুদ্দী বলেছেন, 'তাদের অন্তর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সংকীর্ণ হয়ে গেছে।' الحصور। অর্থ সংকীর্ণ হওয়া। পাঠের কাজে সংকীর্ণতা, কেননা সেখানে সব মত ও পথ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে তার পাঠের প্রতি লক্ষ্য দেয়া হয়নি। বন্দীকে الحصور। বলা হয়।

ইবনে আবূ নূজাইহ্ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, হিলাল ইবনে উয়াইমার আল-আসলমী বলেছেন, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে যাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়েছে বা তাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় অন্তর সংকীর্ণ হয়েছে, ওদের ও রাসূল (স)-এর মধ্যে চুক্তি ছিল।

আবূ বকর বলেছেন, বাহ্যত মনে হয়, যাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়েছিল, ওরা ছিল মুশরিক লোক, নবী করীম (স)-এর বিরোধী। ওদের অন্তর সংকীর্ণ হয়েছিল ওদের জনগণের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরোধিতা করার ব্যাপারে। কেননা ওদের ও রাসূল (স)-এর মধ্যে চুক্তি ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধ করতে পারছিল না। কেননা ওরা মুসলমানদের যবীল আরহাম ছিল। ওরা একই বংশের লোক ছিল। ওরা যখন মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে গেল, তখন ওদের হাতকে বিরত রাখা— ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে আল্লাহ্ মুসলমানদের আদেশ করেছিলেন। ফলে ওরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। আর মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়েও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি।

কোন কোন লোক বলেছেন, ওরা আসলে মুসলমানই ছিল, ওরা ওদেরই লোকজন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও পছন্দ করেনি। কেননা ওদের পরস্পরের মধ্যে রিহ্‌মের সম্পর্ক ছিল। আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ ও তার তাফসীর পর্যায়ে বর্ণিত হাদীস তার বিপরীত কথা প্রমাণ করে। কেননা মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করেনি নবী করীম (স)-এর জীবন কালে। যদিও তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে। কেননা এই ধরনের যুদ্ধ করার জন্যে তারা কখনই আদিষ্ট ছিল না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوْكُمْ -

আল্লাহ চাইলে ওদেরকে তোমাদের উপর কর্তৃত্বকারী বানিয়ে দিতেন, তখন তারা অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।

অর্থাৎ তোমরা যদি জালিম হয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে .... এই কথা প্রমাণ করে যে, ওরা মুসলমান ছিল না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا -

ওরা যদি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে যায় ও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, বরং তোমাদের প্রতি আনুগত্য পেশ করে, তাহলে তাদের উপর কোন কিছু করার তোমাদের জন্যে পথ করে দেন নি।

এ কথাটির দাবি হল, ওরা মুশরিক ছিল। কেননা আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা মুসলমানদের পরিচিতি হতে পারে না। এ থেকে স্পষ্ট হল যে, ওরা আসলেই মুশরিক ছিল, ওদের ও নবী করীম (স)-এর মধ্যে মৈত্রীর চুক্তি ছিল। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে ওদের দিকে আক্রমণের হাত প্রসারিত না করতে আদেশ করেছেন— যখন তারা মুসলমান ও মুশরিক উভয় থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে গেছে। আর তাদের আপনজন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও ওদেরকে বাধ্য করতে নিষেধ করেছেন।

আয়াতে تسليط কর্তৃত্বশালী বানানোর যে কথাটি বলা হয়েছে, তা দুটি দিক রয়েছে। একটি হল, ওদের অন্তরের শক্তিশালী হওয়া ও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহসী হওয়া আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে যুদ্ধ করা তাদের জন্যে মুবাহ্ হওয়া।

আল্লাহ্র কথা ঃ

سَتَجِدُونَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ -

অন্যান্যদেরকে তোমরা এরূপ পাবে যে, তারা তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে চায়, নিরাপত্তা দিতে চায় তাদের নিজেদের লোকদেরকেও।

মুজাহিদ বলেছেন, আয়াতটি মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। ওরা নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করত। পরে তারা কুরায়শদের নিকট ফিরে যেত এবং মূর্তি-প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হতো, ওরা আসলে এখানে ও ওখানে— উভয় স্থানেই নিজেদের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই ছিল ওদের লক্ষ্য ও বাসনা। ওরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে ও সন্ধি না করে, তাহলে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আদেশ করা হয়েছে।

সুদ্দীর ছাত্রদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক উল্লেখ করেছেন, সুদ্দী বলেছেন, উক্ত আয়াতটি নয়াম ইবনে মাসউদ আল-আশজায়ী সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। সে মুসলমান ও মুশরিক সকলের নিকট নিজের নিরাপত্তার সন্ধান করে বেড়াত। সে নবী করীম (স)-এর কথা

মুশরিকদের বলে দিত এবং মুশরিকদের কথা রাসূলে (স)-কে বলে দিত। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা অন্যান্য লোকদেরকে পাবে আর তারা তোমাদেরকে নির্ভয় করতে এবং তাদের নিজেদেরকেও নির্ভয় করতে চেষ্টা করে।'

আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, ওরা নবী করীম (স)-এর নিকট এসে নিজেদের ঈমানদার হওয়ার কথা প্রকাশ করত এবং পরে যখন তারা নিজেদের লোকদের নিকট ফিরে যেত তখন কুফর প্রকাশ করত। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا -

ওরা যখনই ফিতনার দিকে ফিরে যেত, ওরা তারই মধ্যে উল্টোভাবে নিক্ষিপ্ত হতো।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ওরা পূর্বে নিজেদের মুসলিম হওয়া প্রকাশ করত। এই জন্যে আল্লাহ মুসলমানকে আদেশ করেছেন ওদের উপর আক্রমণ না করতে, ওদের থেকে অস্ত্র বিরত রাখতে। অবশ্য যখন তারা আলাদা হয়ে যাবে ও মুসলমানদের প্রতি নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে থাকবে। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়'-এর সন্ধি করবে। যেমন আমাদেরকে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়েছে তাদের থেকেও, যারা আমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ লোকদের সাথে মিলে মিশে যাবে। তাদের থেকেও যারা আমাদের নিকট সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে আসে। যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি ও তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

এবং যেমন বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ -

এবং তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

(সূরা বাকারাহ ঃ ১৯০)

যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

পরে এই সব মনসূখ করে দিয়েছে এই আয়াত ঃ

মুশরিকদের যেখানেই পাবে, সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে।

এই পর্যায়ে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

অন্য কিছু লোকদের মত হচ্ছে, এই সব আয়াতের কোনটিই মনসূখ নয়। আজ-ও যে সব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ না করা সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা যেসব লোক আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ সম্বলিত আয়াতসমূহ যে মনসূখ হয়েছে তা প্রমাণিত

হয়নি। জিহাদ ফরয না হওয়ার মত যাঁর যাঁর বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইবনে শাবরামাতা ও সুফিয়ান সওরী। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ্।

তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, যে সব কাফির আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, তাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করা সম্পর্কে এ সব আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু মুশরিকরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেও তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষেধ এ কথা কোন ফিকাহবিদ বলেছেন বলে আমরা জানি না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা জায়েয কিনা এই বিষয়েই মতভেদ, তা নিষিদ্ধ হওয়া পর্যায়ে কোন মতপার্থক্য নেই। যে পরিচিতি আমরা উল্লেখ করলাম তা যাদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষেধ মনসূখ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে সকলেরই ঐকমত্য পাওয়া গেছে।

খায়রুন প্রকাশনী